

গেরিলা থেকে সম্মুখ যুদ্ধে

মাহবুব আলম

প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যিক বিস্তার ও গভীরতার প্রতিফলন করছে এমন একক গ্রন্থ সত্যিই দুর্লভ। যুদ্ধদিনের নানা স্মৃতিকথার ঘালা রচনা করে সেই ব্যাপ্তিকে স্পর্শ করতে চাইছি আমরা। কিন্তু তারপরেও প্রবল অত্প্রিয় বোধ সবসময়েই মনে গেঁথে থাকে। সেই অভাব মোচনে বড় ভূমিকা পালন করবে এই বই। ‘গেরিলা থেকে সমুখ যুদ্ধে’ মুক্তিযুদ্ধের এপিক গ্রন্থ হিসেবে অবিস্মরণীয় সংযোজন ঘটালো যুদ্ধদিনের স্মৃতিমালায়। এ-গ্রন্থকে বলা যাবে না শুধুই প্রামাণিক গ্রন্থ, যদিও যুদ্ধের তথ্য - প্রমাণ ও বিবরণীর অনন্য কথকতা এই বই। একে বলা যাবে না উপন্যাস, যদিও উপন্যাসের চাইতেও আশ্চর্যকর সব বাস্তব চরিত্র ও ঘটনাধারায় এই বিবরণী ঠাসা। বলা যাবে না এ মুক্তিযুদ্ধের দ্঵িনূলিপি, যদিও এক সাহসী মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন নোটবইয়ের ক্রৃত হাতের ইঙ্গিতভাষ্য থেকে নির্মিত হয়েছে পরবর্তী বিস্তারিত বিবরণী, যেখানে বর্ণিত হয়েছে প্রায় প্রতিদিনের যুদ্ধকথা। মাহবুব আলম এক গেরিলা দলের নেতা হিসেবে তাঁর সাথীদের নিয়ে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সাধারণ জনজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুগ্মে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়ে অজস্র চরিতমালার যে সহস্র পৃষ্ঠার কাহিনী রচনা করেছেন তার প্রথম খণ্ড এখানে নিবেদিত হলো। গেরিলা হিসেবে যুদ্ধযাত্রা শুরু করে সমুখ যুদ্ধে বিজয়ী হিসেবে তার পরিসমাপ্তি টেনেছেন তিনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এই এপিক কাহিনী রেমাকের 'অল কোয়ারেট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' ও এমনি অন্যান্য ধ্রুপদী যুদ্ধকথার পাশে স্থান পাওয়ার দাবিদার। আমাদের পরম গর্বের দিনগুলোর এই বিস্তারিত ভাষ্য জাতির যুদ্ধ - ইতিহাসে উজ্জ্বল সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ISBN 984-70124-0112

গেরিলা থেকে সম্মুখ যুক্তে
|প্রথম খণ্ড|

ଗେରିଲା ଥେକେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ

[ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ]

ମାହ୍ୱୁବ ଆଲମ

ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ



প্রকাশ : অশোক কর্মকাল

মানচিত্র : আলেক্সম্যান

কেচ ম্যাপ : কিলোটি বিশ্বাস

প্রক্ষম মুদ্রণ : বৈশাখ ১৪১৪, মে ২০১১

চতুর্থ মুদ্রণ : কার্তিক ১৪১৪, ডিসেম্বর ২০০৭

তৃতীয় মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪০৭, আগস্ট ২০০০

বিভীষণ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫, মার্চ ১৯৯৯

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৮, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২

ISBN 984-12-0022-8

মূল্য : চারশুণ্ঠ টাকা

প্রকাশক : মিল্ডল ইক, সাহিত্য একাশ, ৮৭ পুরানা পট্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

হস্ত বিন্দাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৮৭ পুরানা পট্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

মুদ্রক : কমলা প্রিস্টার্স, ৮৭ পুরানা পট্টন লাইন, ঢাকা-১০০০

উৎসর্গ

যিনি একাত্তরে একদল দামাল
মুক্তিযোক্তার পাশে থেকে সাহসী ও
সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন,
আমার সেই সহধর্মী
মর্জিনা বেগম-এর উক্তেশে
উৎসর্গিত

সূচিপত্র

যুক্তবাচ্চা

প্রত্নতি—পাহাড় থেকে নেমে আসা	১
মূরতি : যুজির ক্যাম্প	৩
ভাটপাড়া ক্যাম্প	৬
প্রথম অপারেশনে যাত্রা	৯
জুনের ২৭ তারিখ	১৩
ফিরে এলো ওরা	১৫
বিভীষণ অপারেশন	১৬
সামনে বাংলাদেশ!	১৮
সীমাঞ্চ অভিক্রম	২০
নিজেদের মানুষ	২৪
গাইড মকতু মিয়া	২৬
যুক্তে প্রথম সফলতা	২৯
জীবন, ছকে বাধা	৩৪
ইদে খিলাদুন্নবী	৩৫
ইত্তাহিমের আর্ত-চিংকার	৩৭
শালমারা ব্রিজে বিক্ষোরণ	৩৮
গাধা নিয়ে ফেরা	৪৫
সোনারবানের সোনা মিয়া	৪৮
হালিয় মাটারের বদলে ওসমান	৫১
রেকি মিশন—তালমা ব্রিজ	৫৮
একজন বিশ্বাসঘাতক সাইকেল মেকার	৬৩
মকতু মিয়ার আশ্রয়, বিনষ্ট যোগাযোগ পথ এবং মাটিতে আঁকা ম্যাপ	৬৬
অমরখানার বুধন মেষ্ঠার এবং শক্রপক্ষের বাজার	৬৭
মাঝপথে অতিযান পরিত্যক্ত—মিশন টোকাপাড়া	৭৩
ডাকাত! ডাকাত!!	৭৮
একটা নিঃসঙ্গ হেলিকপ্টার	৮০
রাখালদা	৮১

বৃষ্টি! বৃষ্টি!!	৮৩
বাক্তা মিয়ার ভূত দেখা	৮৬
জয় বাংলার মানুষ	৯০
টাগেটি অমরখানা, পাকবাহিনীর লঙ্ঘনখানা, প্রমোদ ধাঁচি	৯২
সফলতা ও শীক্ষণি	৯৫
অপারেশন অমরখানা	৯৭
ভাটপাড়া ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া হলো	১০৮
চাউলহাটি ইউনিট বেস	১০৯
টোকাপাড়া ক্যাম্প	১১১
জব্ববারের বদলে গোলাম গড়স	১১২
আক্রান্ত টোকাপাড়া ক্যাম্প	১১৬
শহিদ গোলাম গড়স	১১৯
টোকাপাড়ার যুদ্ধ	১২৩
রঙ্গন্তরের নিয়ে আবার অভিযান— টাগেটি হবি মেহার	১৩০
হারিয়ে গেল সোনামিয়া	১৩৩
মিশন সোনারবান— টাগেটি মদ্রাসা সুপার	১৩৬
এবার তেতরে যেতে হবে	১৩৮
পরিষিট— চাউলহাটি ইউনিট বেসের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (অসম্পূর্ণ)	১৪৩

হাইড আউট (এক)

হাইড আউট	১৫১
নতুন পরিকল্পনা : যুদ্ধের গতিধারার পরিবর্তন	১৫২
টাঙ্ক : মিশন বাংলাদেশ	১৫৪
প্রথম হাইড আউট	১৫৫
বদলুপাড়া	১৬১
শাস্তিবাহিনী	১৬৪
ভূটীয় 'হাইড আউট' : বারাথানের ধনার বাড়ি	১৬৫
কালীদেবী সর্বহরা তার ঝপ	১৬৯
রিপোর্টঁ	১৭০
ভালোবাসার যুৰ	১৭৩
প্রচণ্ড শক্তির বিক্ষেপক—প্রেসার চার্জ, রেমার চার্জ	১৭৬
অপারেশন বিসমনি	১৭৯
ভাবুরডাঙ্গা : ভূটীয় 'হাইড আউট'	১৮২
মজিব : বাদল দিনের আগতুক	১৮৫
ভাবলা মিয়ার বাড়ি	১৮৯
পাকবাহিনীর আগমন	১৯৩
নুরুন্দীন মিয়ার বাড়ি	১৯৬
বেরুবাড়ি	১৯৭

শরণার্থী শিবির	২০০
ঢাকাইয়া নৃত্য	২০৪
সাক্ষিৎ ক্যাম্প	২০৫
বাংলাদেশের হনুয় হতে	২০৭
নকশাল পরিচয়ে পরিচিত এক যুবকের কথা	২০৯
ওরা আসছে	২১১
মধুপাড়ার যুদ্ধ	২১৫
শহিদ আকাস	২১৮
বেঙ্গলডিতে বিষণ্ণ সন্ধ্যা	২২১
কোথায় যেন গরামিল	২২৪
মেজেরের গুর্বা মেজাজ	২২৬
একজন রাজনীতিবীদের সাথে বৈঠক	২২৮
নালাগঞ্জ হাইড আউট	২৩০
ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া	২৩৩
ভূইয়া ব্যত্য, ধূত সামাদ মাটোর	২৩৭
যুদ্ধের বাইরে যুদ্ধ	২৪১
বিড়াল্ডি হায়েনার পাল	২৪৫
নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়া	২৫০
যোগ্যতা ও আনন্দ্যার প্রফেসর	২৫৩
পিণ্ডি ও অন্যরা : শৎকা জাগানীয়া ভয়	২৫৫
জলপাইগ়ড়ি শহর	২৫৭
রাজাকার সামাদ মাটোর পালিয়ে গেল	২৫৯
পাক ঘাঁটিতে প্রথম আঘাত	২৬০
সম্মুখ্যুদ্ধ	২৬৬
আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘূমায় ঐ	২৭১
জনযুদ্ধ	২৭৪
অপারেশন সর্দারপাড়ি	২৭৬
অন্ত উদ্ধার অভিযান	২৮৪
স্ফতম রাজাকার বাধা বাহিনী	২৮৮
জয়বাংলার অব্রেষণ	২৯২
বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ	২৯৪
জয় বাংলাদেশ-মুক্তিযুদ্ধের ছবি	২৯৬
হাড়িভাসা আক্রমণ	২৯৯
আবার অশান্ত ডেতরগড়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ	৩০৩
জিনের আছর	৩০৬
গুড় যুদ্ধ নয়, পাশাপাশি অন্য কাজ	৩০৯
কিংবদন্তীর রাজকন্যা	৩১১
মকরুল মেছারের সৌভ ও হনুর খেমটা নাচ	৩১৫
এক গুলিতে এক শক্ত-অবাস্তব যুদ্ধত্ব	৩১৬
পানিমাছ ঘাঁটিতে আক্রমণ	৩১৮

তাৰি কি কইয়াম	৩২৪
মিশন ঠাকুৱ পাড়া	৩২৭
খতম রাজাকাৰ কমাত্মাৰ সৈমত	৩৩১
স্বাধীন বাংলা বেতাৰ কেন্দ্ৰ	৩৩৬
ফসল কাটাৰ অভিযান	৩৩৯
‘গুড বাই’ মেজেৰ দৰজি	৩৪১
গনি ভাই	৩৪৫
হাড়িভাস্য শক্তিৰ মোকাবিলা	৩৫০
সোনারবান হাইড আউট	৩৫৪
ৱেকি মিশন— বানিয়াপাড়া, পাকা সড়ক	৩৬০
মৰাল গ্ৰীবাৰ সেই তঙ্কণী	৩৬৪
অধিকৃত পঞ্চগড় এবং শক্তিৰ গতিবিধি	৩৬৬
লেক্টেন্যান্ট পুরি	৩৭২
বিৱেৱ আসৱ, শৱণাৰ্থী শিবিৱে	৩৭৫
চৈতনপাড়া ব্ৰিজ অপাৱেশন	৩৭৬
তুই ফেলে এসেছিস কাৱে মন	৩৮৪

নিজের কথা

দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল।

সময় বহমান নদীর মতোই। সেই সময়— নদীর প্রবহমানতার সঙ্গে সঙ্গে শৃতিতে জমতে থাকে পলি। তখন ক্রমশ তার ঝাপসা হওয়ার পালা। কিন্তু সেই শৃতি, সেই দুঃসহ দিনের এবং তাকে জয়ের, সেই শৃতি তো আমার ও আমাদের সকলের জীবনের এক গৌরবের সমাচার।

একান্তরের সেই ড্যাবহ দিনগুলোয় যুদ্ধের তাওবের তেজেরেই যে লেখা শুরু করেছিলাম, তা আর শেষ করতে পারি নি। যুদ্ধের পরের বছরগুলোয় একটু একটু করে এগোলেও তখন মনে হতো, আমি আবেগমুক্ত বা নির্মোহ হতে পারছি না। আবেগমুখিত শৃতিচারণে, জানি, প্রকৃত সত্য আর যত্ন বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুবিচার করা যায় না সর্বাংশে বর্ণিত চরিত্র বচনের বেলায়। তাই সময়ের ব্যবধান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের এই ব্যবধান সহায় করে নিরপেক্ষ আর নির্মোহ হতে। কেননা, আবেগ তখন স্বাভাবিকভাবে থাবে যায়, আর তখন কল্পনের ডগায় উঠে আসে সঠিক আর নিরেট বাস্তবতা।

আমার নিজের মনে ছিল অচল তাড়না। তাপিদ ছিল আমার সহধর্মীর, যিনি যুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলোতে আমার কাছাকাছি থেকে দেখেছেন আমাদের নিবিড়ভাবে। শহীদুল ইসলাম বাবুল, আমার সেদিনের যুদ্ধের সময়কার সাথি, তার অভিযোগ ছিল-, আমাদের কথা তো কেউ লিখলো না। আপনি পারতেন। আপনিও লিখলেন না। যেক্ষণতে গুলি খাওয়া হাসান, রংপুরের গঙ্গাচড়ার ছেলে, তারও অভিযোগ ছিল, তার কথা তো কেউ লিখলো না, পঞ্চগড়ের ছেলে জহিরুল, ঘেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে পিয়েছিল যার শরীর, কিছুদিন আগে সে তীব্র অতিমানহত হয়ে বলেছিল, সরকিছু ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের কথা কেউ কি লিখবে না তাহলে? পিটু, বকর, মুসা, আহিদার, একরামুল, শম্ভু, চৌধুরী, মতিয়ার, বলিল, মধুসূন্দন, জয়নাল, মঞ্জু, মালেকসহ আমার সেদিনকার প্রায় সব সাথির কাছ থেকে এই একই ধরনের অভিযোগ, আমাদের কথা কেউ লিখলো না। গোলাম গউস, আকাস, মতিয়ার, খালেক এরা আজ বেঁচে থাকলে হয়তো আজক্ষেপের বাংলাদেশে আমাদের মতোই ভালোমন্দে জীবনধারণ করতো, জীবনের দুর্বিষ্হতার ভাব বয়ে বেড়াতে তাদের

হয়তো কষ্ট হতো, সবকিছু মিলিয়ে আমাদের মতো হয়তো তারা মুক্ত আকাশের নিচে নিজের মতো করে বাস করতো। কিন্তু এখন ছায়া মিছিলের মতো তারা আমাদের কাছে আসে। তাদের কোনোরকম দাবি নেই। সকল দাবির উর্ধ্বে তারা আজ। সীমান্তের আশপাশে মাটির নিচে তাদের শুইয়ে রাখা হয়েছে নাম-ঠিকানাবিহীন সমাধিক্ষেত্রে! কিন্তু তাদের কাছে দেয়া আমাদের সেদিনকার অঙ্গীকার, আমরা কোনোদিন ভুলবো না তোমাদের, দেশ তোমাদের ভুলবে না কোনোদিন, এ কথাগুলো কুরে কুরে থায় আমাকে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে, সবকিছু ধীরে ধীরে আবছা হয়ে আসছে দিনের পর দিন। সেদিনকার তরুণ-যুবক আমরা আজ মধ্য বয়সে উপনীত। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। এখন মনের মধ্যে কেবল তাগিদের পর তাগিদের তোলপাড়, যা লিখবার তাড়াতাড়ি লিখে ফেলো। বড় ভাই নুরুল্ল হক, যুক্তের পর যুবই হতাশ ছিলেন। যুক্তের পরপরই তিনি বলেছিলেন, ‘দেখো, কিছু হবে না, কিছুই হবে না ...।’ তিনি তখন ঠাকুরগাঁওয়ে তার ফেলে যাওয়া চাকরিতে আবার যোগদান করেছেন। তার হারিয়ে যাওয়া শ্রী আর সন্তানদের পেয়েছেন ফিরে। কিন্তু তারপরও হারিয়ে যাওয়া যুক্তের দিনগুলোয় ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর অঙ্গীকার অস্তিত্বাকৃতার অন্ত ছিল না।

একাত্তর এখন আবছা, প্রায় ধূসূর কিছু ক্ষেত্রেও সে আমাদের এক প্রচণ্ড ভালোবাসার, স্বাভাবিকভাবে ভালোলাগার সূচী অন্যদিকে আজকের প্রজন্মের কাছে কোনো মুক্তিযুদ্ধের শৃতি নেই, প্রামাণ্য-প্রতিক্রিয়াত ইতিহাসও নেই। তাই এই মহান যুক্তের অনেক কিছুই তাদের কাছে অক্ষণ্ট। এক সময় মনে হতো, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বা তার শৃতি কিংবা ইতিহাস আমাদের সমাজজীবনে প্রতি অনুভূতের প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে অমলিন ধাককে পাই, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব অনুভূত হবে। সেদিনকার প্রত্যেকের কথা লেখা হবে গজ-কবিতা-নাটকে আর প্রবন্ধে। চমৎকার সব চরিত্র সৃষ্টি হবে সেদিনকার সেই বিবর ইতিহাস সুষ্ঠা দামাল ছেলেদের নিয়ে। কিন্তু হয় নি। কেন যে হয় নি ! এই না হওয়ার ব্যর্থতার জন্য মুক্তিযুক্তে সক্রিয় অংশীদার এক যুবকের নিজের কথা নিজে লিখবার এই প্রয়াস। তবে আমার বড় অক্ষমতা, আমি সাহিত্যিক বা ভাষা শিল্পী নই। কিন্তু নিজেদের গভীর শৃতিময় কথা লিখবার জন্য সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত বা যশস্বী সাহিত্যিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। দেশের একটা ঐতিহাসিক সময়ের প্রয়োজনে আমরা এক মহান মুক্তিযুক্তে শরিক হয়েছিলাম। সেই সময়ের সবাইর কথা আমরা লিখতে পারবো না। সেটা সম্ভবও নয়। আমরা শুধু আমাদের কথা লিখবো, আমাদের নিজেদের শৃতির কথা। সেটা অনেক দুঃখ আর কষ্টের, অনেক আনন্দ আর বেদনার, অনেক ভালোলাগা আর ভালোবাসার শৃতিচারণ।

একাত্তরের ঘটনাবলি নিয়ে ইতোমধ্যে অনেক কিছু লেখা হয়েছে। যদিও মুক্তিযুক্তের সেই ব্যাপক-বিশাল যজ্ঞের তুলনায় এখনো তা বুব বেশি কিছু নয়। এছাড়া যুক্তের কথা যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা মূলত পেশাদার সৈনিক। মুক্তিযুক্তে তাঁদের

ভূমিকা অনশ্বীকার্য, কিন্তু তাদের পাশাপাশি ছাত্র-জনতা-মজুর-চারী বা সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং ভূমিকার বিষয়টি যেভাবে অবহেলিত হয়েছে, সেটা সত্তাই দারুণভাবে চোখে লাগে।

এই ঘট্টে কেবল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে একটা গেরিলা দলের তৎপরতার কথা, তাদের প্রায় অতিদিনের সেই তৎপরতার বিবরণ, যারা এই যুদ্ধের সূচনায় এবং তার অন্তিমলগ্নে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। বর্তমান ঘট্টে সেই তাদের কথাই তুলে ধরবার চেষ্টা নেয়া হয়েছে। কোথাও কোনো অতিরঞ্জন নেই। যা সত্য, তাই শুধু অক্ষরে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে গৱে বলে যাওয়ার মতো করে। তবে সে গৱে শুধু গৱে নয়। একান্ত ব্যক্তি সেই গৱে।

আমি আমার লেখনী ক্ষমতার শক্তি আৰু সৈধাবদ্ধতা সম্পর্কে সুজৰিহিত। তবু লিখে গেলাম। লিখে গেলাম সেই সম্মতিয়ে সহকৰ্মী-সহযোগী বন্ধুদের শৃঙ্খল দিয়ে সমাজেটিক নতুন করে উঠে দেওয়ার জন্য। বিশ্বত্থায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আৰ তাৰ চেতনা তাতে আৰাব নতুন কৰিছিলো উঠবৈ, এটা আমার বিশ্বাস।

আমার আহ্বান, অন্যান্য প্রকারের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, যারা লিখতে পারেন, তাঁৰা নিজেদের মতো করে লিখে ফেলুন সেদিনকাৰ নিজেদের স্মৃতিময় কথা। কাৰণ, আৰ সময় নেই অপেক্ষা নিয়ে বসে থাকবাৰ এই আশা নিয়ে যে, আমাদের কথা অন্য কেউ বচনা কৰবে।

ডায়েরির শৈষ পাতা

১৭. ১২. ৭১

অবশ্যে তোর হলো। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম তোর। এমন তোর মানুষের জীবনে
ক'টা আসে? সূর্য উঠছে। ওর মুখ যেন ১০ লাখ শহীদের রক্তে রাঙানো। অন্যান্য
দিনের চেয়ে সৃষ্টা তাই বুঝি আজ অনেক লাল।

এবার ঘরে ফেরার পালা। গত ন' মাসের শত দুঃখ-কষ্ট আর ক্লান্তির অবসানে
এবার সত্যিকার ছুটি। ঘরে ফেরার তাই প্রবল তাগিদ। কে জানে, কে বেঁচে আছে,
আর কে মারা গেছে? আঞ্চলিক-পরিজনের সাথে মিলন বিয়োগাত্মক, না মিলনাত্মক হবে,
কে জানে?

না আমি বা আমরা মরি নি। তবে আমাদের জীবনেই মারা গেছে। কেমন করে
যেন বেঁচে গেছি বা বেঁচে আছি। স্বাধীনতা সংগীতে জয়ী হয়েছি। আজ যদি গোলাম
গউস বেঁচে থাকতো, আকাস, খালেক ক্লিনিস মতিয়ার বেঁচে থাকতো, কার কি ক্ষতি
হতো? যদি আজ্ঞা নামের কিছু থেকে খুকে, তাহলে নিশ্চিতই ওদের আজ্ঞা আজ সুর্খী
আর তৎ। প্রতিহিংসা নিবৃত্ত করেও জন্য ওদের আজ্ঞা এতোদিন ঘুরে বেড়িয়েছে।
আজ ওরা তাই সত্যিই তৎ।

বীরগঞ্জ। এই নাম বুকে এখনো কাঁপন আগায়। বীরগঞ্জের এই এলাকাটার কথা
মনে থাকবে চিরকাল। এখান থেকে ডিফেল্স নিয়েই আমরা স্বাধীনতার সূর্য দেখেছি।
মুক্ত বাংলার বাতাস প্রহণ করেছি। এবার হিসেব-নিকেশের পালা। গেরিলা যোদ্ধা
থেকে শুরু করে সশুখ্যানের সৈনিক। এই পর্যায়ে কত কী দেবেছি, শুনেছি, উপলক্ষ
করেছি। শিখেছিও অনেক কিছু। বাঙ্কার আর টেক্সের জীবন। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে
যাওয়ার মতো আরো কত ঘটনা। পরিচয়ও হয়েছে অনেকের সাথে। অনেক চরিত্রের
সাথে। মনে রাখবার মতো প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র। যেমন— খালেক সাহেব, শাহাদত,
মোসাদ্দেক, বারেক সাহেব, সফি সাহেব, ডাক্তার দাদু, লে. মাসুদসহ দেশি-বিদেশি
কতো লোক। এইদের কথা মনে থাকবে চিরদিন।

ଛୁ ହେ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ଭେ ୨୧

ଶବ୍ଦାବ୍ୟାସ ପାଇବି ଯଜ୍ଞର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମହାବ୍ୟାସ
ଭେଦା । ତାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ
ପାଇବି ମୁଁ । ତାହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ?

ଅଥ ଉଦ୍‌ବେଦ । ତାହା ତାହା ଲାଭ କରିବାକୁ
ପାଇବି ମହାବ୍ୟାସ । ତାହା ପାଇବି
ତାହା ପାଇବି ମହାବ୍ୟାସ ।

ଏଥାବଦି ପାଇବି ମହାବ୍ୟାସ । ଏଥାବଦି
ଏଥାବଦି ଆପଣ ପୂର୍ବର ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରି
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ । ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି
ଏଥାବଦି ପାଇବି ମହାବ୍ୟାସ । ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି
ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି ଆପଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରି
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ । ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି
ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି ଆପଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ।

ଏ ମହାବ୍ୟାସ ପାଇବି ଆପଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରି
ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ । ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି
ଏଥାବଦି ଏଥାବଦି ଆପଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ।

বিজয় বার্তা ভেসে আসে

১৬ তারিখের বিকেল চারটার দিকে ওয়াকিটকি সেটে ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে
এসেছিল হঠাতে।

- টু ফোর ওয়ান-টু ফোর ওয়ান—ক্যান ইউ হিয়ার মি? ওভার।
- ওয়ান ফোর টু-ওয়ান ফোর টু-লাউড এন্ড ক্লিয়ার-ওভার।
- কঞ্চাচুলেশনস মাহবুব। বিরাট সুখবর। আজ বিকেলে ঢাকা রেসকোর্সে
পাকবাহিনী স্যারেভার করেছে। ওভার।
- কঞ্চাচুলেশনস স্যার। বিরাট সুখবর। যুদ্ধ তাহলে শেষ। স্বাধীনতা এলো,
ওভার।
- ইয়েস বহেজ। এ আনন্দের বার্তা সকল বাঙ্কার-টেক্সে সব ছেলের কাছে
পৌছে দাও। কিন্তু সংঘত থাকবে সবকিছু আজই আনন্দ করবে না।
সামনে অনেক কাজ। ওভার।
- ঠিক আছে স্যার, আপনার মাধ্যমে প্রাণ বিজয়ের প্রথম বার্তা সকলের
কাছে পৌছে দেব। ওভার।
- আমাদের সম্মুখের সৈমান্ধের রণাঙ্গনের পাক সৈনিকরা ভাতগা নদীর
ওপারে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, তারা আজ রাতে সারেভার করতে পারে।
সারেভারের বিষ্ণুয়ামী তাদের সারেভার করাতে হবে। ফ্রন্টের কেউ
ঘূমাবে না, হেটে করবে না, সারারাত ঝেঁগে থাকবে। আজ রাতে হয়তো
আমাদের শেষ কষ্ট। আগামীতে আনন্দ, বুরাতে পেরেছো? ওভার।
- ইয়েস স্যার। নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মানা হবে। আমাদের সকলের তরফ
থেকে ফিল্ড কমান্ডার হিসেবে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন। ওভার।
- ধন্যবাদ। ওভার।
- ওভার।

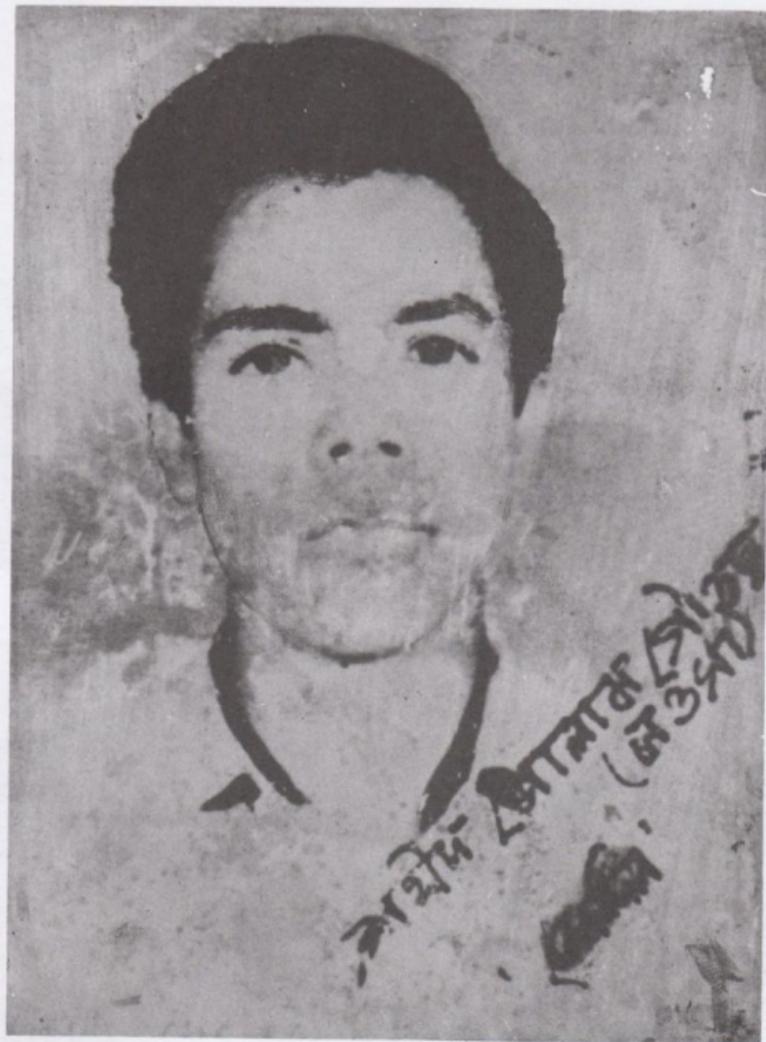
কথোপকথন শেষে সুবেদার খালেক জড়িয়ে ধরলেন। হাউমাট করে কেইনে
ফেললেন। পাশে দৌড়ানো আমার কোম্পানি সেকেন্ড-ইন-কমান্ড পিটু। সেও জাপটে
জড়িয়ে ধরলো আমাকে। তারপর ছেড়ে দিয়ে দু'পাক ঘুরে নাচার ভঙ্গিতে হাত ওপরে
তুলে চিরকার করতে লাগলো, ‘স্বাধীনতা স্বাধীনতা -মুক্তি-মুক্তি-সারেভার-সারেভার’
এবং সবশেষে তার কষ্ট থেকে বেরিয়ে এলো সেই চিরায়ত শ্লোগান, ‘জয় বাংলা...।’

শীতের সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে। চারদিকে কুয়াশার চাদর। সুবেদার থালেক তার সহকর্মী সেনাসদস্যদের নিয়ে চলে গেলেন তার বি কোম্পানির অবস্থানের দিকে। পিটুসহ আমি চলে গেলাম আমাদের ৩-এ মধুপাড়া কোম্পানির অবস্থানের দিকে। প্রতিটি বাঙারে-টেকে শিয়ে ছেলেদের জানানো হলো এই আনন্দ সংবাদ। পাক সৈন্য সারেভার করলে কী কী পদ্ধতি নিতে হবে, তা বুঝিয়ে দেয়া হলো। ছেলেরা ছাড়তে চায় না। উঞ্চ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। সকলের চোখে-মুখে আবেগ আর উচ্ছ্঵াসময় আনন্দের আভা। কেউ বাধা মানে না। কাউকে থামানো যায় না। সমস্ত ফ্রন্টে আনন্দ-উল্লাস আর 'জয় বাংলা' ধ্বনি উত্তল তরঙ্গের মতো জেগে ওঠে।

রাত আটকার দিকে আমরা বৌশ ঝাড়ের তৈরি ঘন অঙ্ককার আঙ্কাদিত বাঙারে ফিরে আসি। ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় বস্তুজোব। প্রথমে কোনো একটা বাঙারে খড়ের চালে আগুন জ্বলে ওঠে। তারপর আঙ্কায়। এরপর ফ্রন্টজুড়ে বাঙার আর টেকের ছাউনিগুলো আগুনের কুঙ্গলীতে পরিষ্কৃত হয়। এর সাথে চলতে থাকে উদ্বাম ছুটোছুটি। হাঁকড়াক আর উল্লাসধর্মী উৎসব। মুক্তির আনন্দবার্তা আজ আর কাউকে কোনোরকম নিয়ম-শৃঙ্খলার বন্ধনে আটকাতে পারবে না।

সারাটা রাত এমনি করেই চলে গেল। ভোরের আকাশ ফিকে হয়ে এলো অবশ্যে। বাঙারের ভেতরে উজ্জ্বল অঙ্ককার। পিটুকে বললাম ম্যাচ জ্বালাতে। নোটবই আকারের ডায়েরিটা হতে তুলে নিলাম। যুদ্ধের মাঠে শেষবারের মতো লেখা শুরু করলাম। এই লেখার তাগিদ মনের ভেতরে কেমন করে, কোথা থেকে এলো, বুঝতে পারলাম না। তাই একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তকে ধরে রাখবার তাগিদে আমি লিখতে শুরু করলাম। পিটু একটার পর একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে চলেছে। এভাবে রাতের কুয়াশা ভেদ করে ভোরের আলো ফুটে উঠলো। সোনার থালার মতো রঙিম সূর্যের প্রথম উদয় হলো শাধীন বাংলাদেশের আকাশে।

দিনাঞ্জপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার নিচপাড়া নামের একটা জায়গায় এক ছায়াঘন বীশতলায় তৈরি আমার বাঙারে বসে শাধীনতার উষালগ্নে লিখিত যুদ্ধের শেষ দিনের ডায়েরির পাতা দিয়েই স্কুল করতে চাই আমাদের নিষেদের কথা। যুদ্ধদিনের সেই ন' মাসে সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথা।



শহীদ গোলাম গুস



অমরখানা ত্রিজের সামনে পাকবাহিনীর বিধ্বস্ত বাক্সার

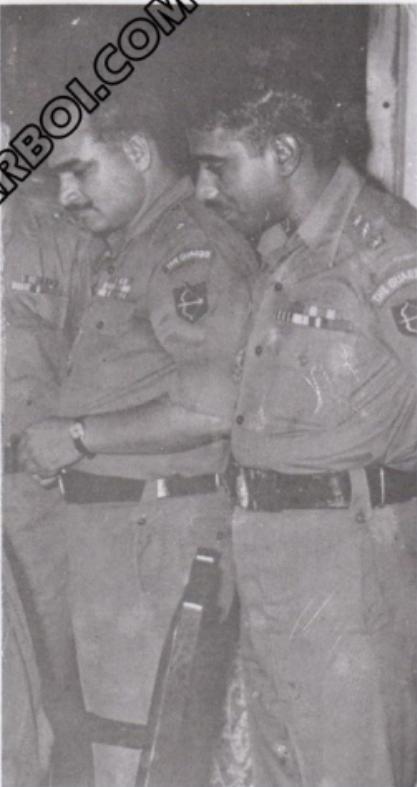


মুক্তিযুক্তের বিজয়ের পর পুনর্নির্মিত চৈতনপাড়া ত্রিজের সামনে লোথক



মেজর এইচ বলবীর সিং শংকর।
চাউলহাটী এফ এফ ইউনিট ব্যাচের
প্রথম কমান্ডিং অফিসার

AMARBOI.COM



মেজর শংকর বায়ে, ক্যাটেন নন্দা ডানে।
একটি অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে ব্রিফিং সেশন



ধৰংসপ্রাণ টোকাপাড়া ক্যাম্পের বর্তমান অবস্থা

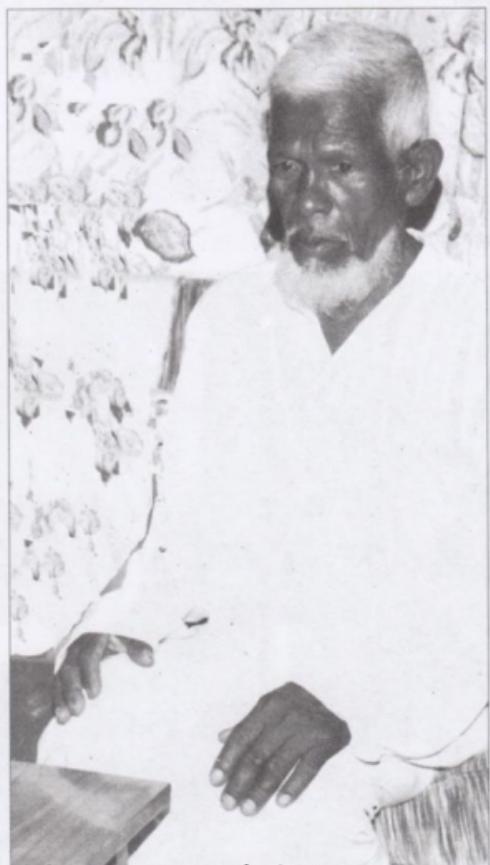
‘৭১-এর নালাগঞ্জের হাইড আউটে ‘৯২-এ মাহবুব আলম এবং পিন্টু



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~



গাইড জোনাব আলী
(বাঁয়ে) ও সহযোকা
সজিমউদ্দীন



মকতু মিয়া
প্রথম গাইড



ধৰংসপ্রাণ বিসমনি ব্ৰিজেৱ বৰ্তমান অবস্থা

পেয়াদাপাড়া হাইড আউট





পাক ডিফেন্স লাইন, পেছনে তালমা নদী, পঞ্চগড়

প্রথম হাইড আউট বদলুপাড়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেকি মিশন থেকে প্রাণ তথ্যের ভিত্তিতে ডায়েরিতে ফি হ্যান্ডে ভুলে নেয়া
অমরখানা, বোর্ড অফিস, জগদলহাট পাক-ডিফেন্সের ক্ষেত্র ম্যাপ

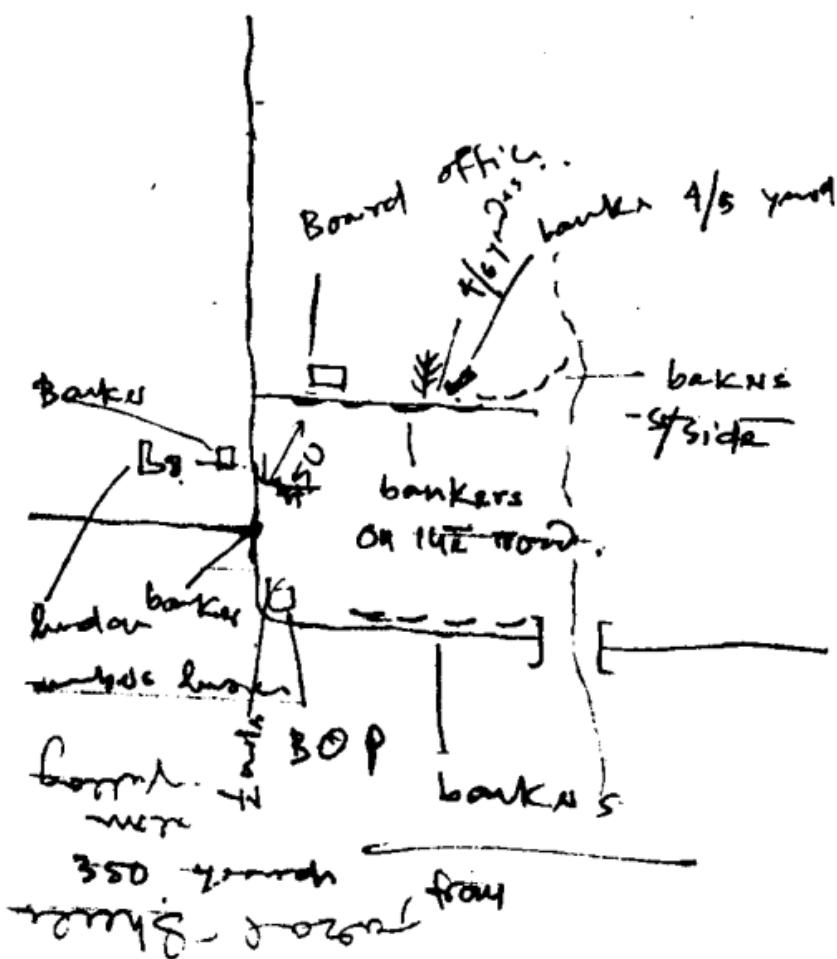
5.7.71



অমরখানা, বোর্ড অফিস, জগদলহাট পাকবাটি
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

15.7.71

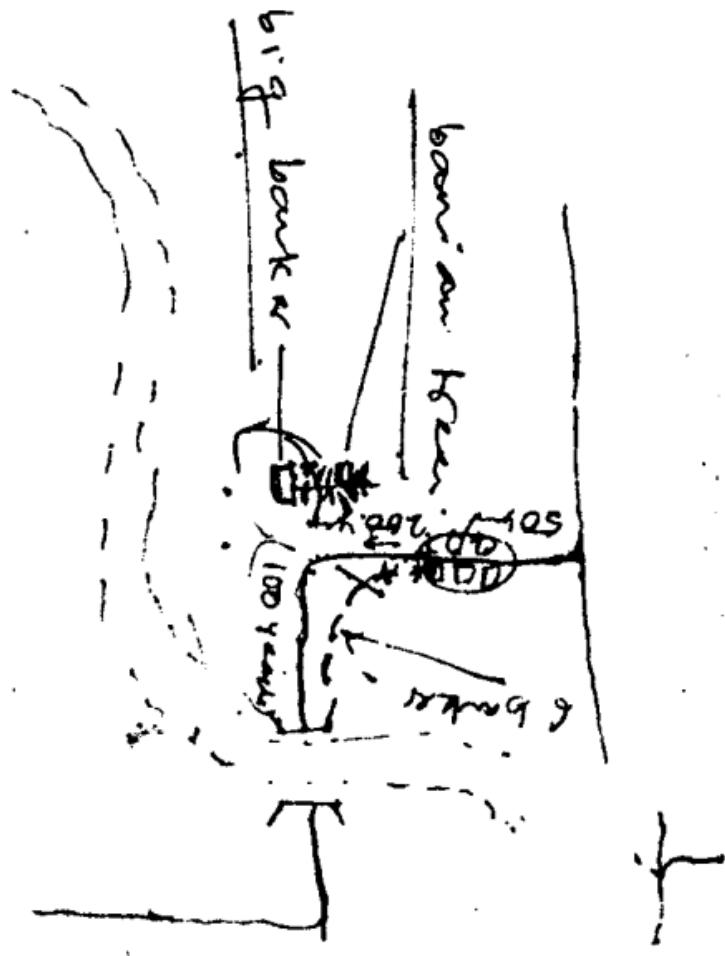
ENLARGEMENT OF ⁶⁵ AMARKHANA



23.8.71

66

ENLARGEMENT OF
JAGDAL HAT.



জগদলহাট পাক্ষিকী

AMARBOI.COM
যুক্তিবিদ্যা

প্রস্তুতি—পাহাড় থেকে নেমে আসা

প্রথম রাতে জবরার ভাই যাবেন ঠিক হলো। তার সাথে যাবে আরো ছয়জন। মোট সাতজনের দল। বিকেলে মেজের শংকর এসে বিস্তারিতভাবে সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই গুরুত্ববহু। তার অধীনস্থ ফ্রিটম ফাইটারদের আজ তিনি প্রথম বাংলাদেশের মাটিতে অনুপ্রবেশ করাবেন। এখানে বিপদ আর ঝুকি, দুটোর সম্ভাবনাই অত্যন্ত বেশি। তাই প্রথম রাতের দলটিকে তিনি ব্রিফ করেছেন। বারবার। অসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে।

আসলে, দু'দিন আগ থেকেই সাজসাজ রব পড়ে গিয়েছিল। এবার অপারেশন শুরু হবে। আমাদের সবার কাছেই ব্যাপারটা ছিল খুবই রোমাঞ্চকর আর গা শিউরে উঠবার মতো খবর।

মুরতি পাহাড়ের ও হাজার ফুট উচুতে স্থাপিত উত্তরপ্রকলের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পেরিলা প্রশিক্ষণ শিবির। মুজিব ক্যাম্প থেকে এখনে সোজাসুজি এসে তাঁর গেড়েছি। সংখ্যায় দু' প্লাটুন অর্থাৎ ৯০ জন স্বাধীনজনক সেঞ্চামী। প্রশিক্ষণ শিবিরের দেড় মাসকালের প্রায় দমবক্স-করা পরিবেশ প্রয়োজন এখানে এসে হাঁফ ছেড়েছে সবাই।

এখানে এই ক্যাম্পে রণাঙ্গনের বিপরোল শৃঙ্খলা আর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সকলের বসবাস। সবাইকে প্রায় মুচুতে সজাগ আর সচেতন থাকতে হয়, যাকে যুদ্ধের ভাষায় বলে 'স্ট্যান্ড-অ্যাজশন'। প্রবল-প্রথর কড়াকড়ির ভেতরে এখানে সকলের কৃটিনবঁধা জীবন। তবুও তো সমতল ভূমি, চিরন্তন বাংলার শ্যামল সবুজ পরিবেশ। ও হাজার ফুট উচুতে অবস্থিত প্রশিক্ষণ শিবিরের চারদিকে বিস্তৃত সেই পাথরের পর পাথরের টাই আর কাঁকরের রাজা এবং সুউচ্চ পাহাড়ের পাঁচিল ঘেরা বন্দিত্ব থেকে আমরা সবাই এখানে মুক্ত। যদিও এটা আমাদের নিজের দেশ নয়, তবুও বাংলারই তো একটা অংশ। সেই দিগন্ত জোড়া সবুজ শ্যামলিমা, আকাশের পট জুড়ে ভেসে যাওয়া মেঘের তেলা, আর উদার নীল আকাশ। পায়ের নিচে ভেজা মাটির সৌন্দা গুৰু। পরিচিত গাছগাছালি, ফসলের সুবিস্তৃত মাঠের সবুজের হাতছানি। গাছের শাখায় শাখায় পাথিরের কলমুখের চিরাচরিত গান। এখানকার পরিবেশ, মাটি, গাছ, রাস্তাঘাট, মানুষজন, তাদের কথাবলার ভঙ্গি ও ভাষা, সব, সবকিছুই আমাদের

নিজেদের। বড় আপন ওরা। পাহাড়ের সেই দেড় মাসকালের কষ্টকর জীবনের অস্তিত্ব এখানে নেই। পাহাড় থেকে নেমে আসবার পর তাই বড় আপন মনে হয় এই জায়গাটিকে। তাছাড়া, সামনে সোজাসুজি এক মাইলের মতো দূরত্বে সীমান্ত। উত্তর-দক্ষিণে চলে যাওয়া উচু লম্বা একটা গড়। গড়টার ওপারেই 'ভেতরগড়' নামের যে জায়গাটা, সেটা আমাদের দেশ। বাংলাদেশ। ওদিকপানে তাকালেই ঢোক দুটো জ্বালা করে ওঠে। বাংলা আজ পরাধীন।

একপাল হায়েনা-বুনি দেশটাকে দখল করে রেখেছে। খাবলে খাবলে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে তারা দেশটাকে। ওদের কঠিন বুটের তলায় পিট আর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে বাংলার কোমল মাটি। বাংলাদেশের মানুষ, যারা পালাতে পারে নি, তারা আজ সবাই এক অসহনীয় বন্দিত্বের জীবনযাপন করছে। ওরা সবাই কেমন আছে এখন?

এখনে তাঁরু ফেলার পাঁচ দিনের মাথায় ঠিক হলো, অপারেশনে যেতে হবে। মুছে যেতে হবে। প্রশিক্ষণ শিবির থেকে আমাদের সাথে এসেছিলেন মেজর শর্মা। তিনি আমাদের তুলে দিলেন মেজর শংকরের দায়িত্বে। মেজর শংকর হলেন আমাদের নতুন সি.ও. বা কমান্ডিং অফিসার।

জায়গাটার নাম জহরি। ভাটপাড়া বিওপি ভিট্টি-বিএসএফ ক্যাম্পের প্রায় ১০০ গজ পেছনে বেশ কিছু গাছের সমাহারে একটা প্রাচীবাগান। মাথার ওপর ঝোকড়া আম গাছগুলোর আড়ালের সুবিধা নিয়ে ক্ষেত্র হয়েছে দু'সারিতে ৮টি তাঁরু। একটা সেকশনের জন্য বরাদ্দ একটা তাঁরু উখনও প্রত্যেকের শরীরে প্রশিক্ষণ শিবিরের গন্ধ। তাই সবাই প্রাণ প্রশিক্ষণ নেওতা আপনাপন দায়িত্বে প্রদর্শন করতে ব্যক্তিগত। কারো কোনো কাজে অগ্রসর আন্তরিকতার ঘাটতি নেই। বড় ভাই মুরল হক হাঁকড়াক ছেড়ে সবকিছু দেখাশোনা করছেন। তাঁর সুষৃ তদারকিতে সবকিছু চলছে ঠিকঠাক মতোই। সব গুছিয়ে নেয়া সম্বন্ধে স্বল্প সময়ের মধ্যেই।

তরা বর্ষাকাল তখন। দিনরাত শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই সবাইকে সব কাজ করতে হতো। পলিথিন মাথায় দিয়ে সবাই বৃষ্টির মধ্যেই কাজ করে যেতো। তাঁরুর বাইরের মাটি ভিজে থকথকে হয়ে থাকতো। তাঁরুর চারদিকে ড্রেন কেটে এবং বাঁধ দিয়ে বৃষ্টির পানির চলকে আটকালো হতো, যাতে তাঁরুর ভেতর পানি চুকে সবকিছু ভিজিয়ে না দেয়। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হতো লঙ্গরখানার বৃষ্টির পানি লঙ্গরখানার চুলো আর কাঠ-লাকড়ি সব ভিজিয়ে দিতো। আগুন জ্বালানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা করতো সেই অবস্থায় লঙ্গরখানার কমান্ডার। সবার আহার-বিহারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার ওপর। সুতরাং এ গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তার চেষ্টা আর আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি ছিল না। এর মধ্যেই কোনো কোনো দিন বৃষ্টি না হলে আকাশ থাকতো পরিষ্কার। বাংলাদেশের দিক থেকে হেসে উঠতো সূর্য। আমরা তখন গান ধরতাম, 'আমার সোনার বাংলা ...'

মুরতি : মুজিব ক্যাম্প

প্রশিক্ষণ শিবির থেকে চলে আসবার দিনটির কথা সবার শৃঙ্খিতেই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। সমতল ভূমি থেকে তিনি হাজার ফুট উচুতে একটা এবড়োখেবড়ো সমতল ভূমি। নুড়ি পাথর আর কাঁকরযুক্ত লাল মাটি। পাশাপাশি দাঁড়ানো টিনের ছাউনি আর মূলি বাঁশের তৈরি লোহা লম্বা ব্যারাক। ব্যারাকের পাশে তাবু। ব্যারাক এবং তাবুতে ছেলেদের থাকবার জায়গা। প্রতিটি ব্যারাকের জন্য আলাদা আলাদা লঙ্ঘনস্থান। ব্যারাকের সামনে পিটি গ্রাউন্ড। প্রতিটা প্লাটুনের জন্য একটি ব্যারাক আর পাঁচটি তাবু বরাদ্দ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রশিক্ষণ শিবিরটার নাম মুরতি ক্যাম্প। জলপাইগুড়ি জেলার মেটলি থানার মুরতি পাহাড়ের ওপর এর অবস্থান। তাদের ভাষায়, এটা পেরিলা আর কমাডো প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের অন্যতম সেরা ক্যাম্প। এরা আমাদের প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করেছে। প্রথমে এক প্লাটুন অর্ধাৎ ৪৫ জন, পরবর্তীকালে আরও এক প্লাটুন যোগ করে মোট ৯০ জনের দু' প্লাটুন নিয়ে একটা উইং। প্রতিটা উইংের জন্য আলাদা আলাদা ব্যারাক বরাদ্দ। দুটো বা তিনটি ব্যারাক এবং ৪-৫টা তাবু নিয়ে উইংের ছেলেদের থাকবার জায়গা। প্রতিটা উইংের নাম কর্তৃপক্ষের ভাষায় রাখা হয়েছে 'আলফা' 'ব্রেডো', 'ইকো' ও 'চার্লি'। তারা প্রতিটি উইংকে এভাবেই চিহ্নিত করে যাবেন্ট কিথার্বার্তা বলতেন। কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ব্রত নিয়ে যারা এখনে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে, তারা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দেয়া নামের মধ্যে আবজ্ঞা প্রতিক্রিয়া করে চায়নি। প্রথম ব্যাচ, যারা মাত্র ক'দিন আগেই প্রশিক্ষণ শেষ করে চলে গেছে, তারা প্রশিক্ষণ শিবিরটাকে নিজেদের মতো করে সাজিয়েছে। নাম রেখেছেন দেশবরণে নেতাদের নামানুসারে। পুরো ক্যাম্পটার নাম 'মুজিব ক্যাম্প', আলফা উইংের নাম 'তাজউদ্দিন উইং', ব্রেডোর নাম 'মুশতাক উইং', চার্লি'র নাম 'সৈয়দ নজরুল ইসলাম উইং' এবং ইকোর নাম 'ভাসানী উইং' আমরা আজাদের নিজেদের পরিচয় আমাদের রাখা নামানুসারেই দিতাম। এবং এতে করে এক ধরনের প্রচন্দ গর্ব অনুভব করতাম।

পরপর সাজানো চারটি ব্যারাক। 'তাজউদ্দিন' আর 'মুশতাক' পাশাপাশি। 'নজরুল ইসলাম' মাঝখানে। আর 'ভাসানী' একটু দূরে। ব্যারাকের অবস্থানের পাশ দিয়ে কাঁকর বিছানো ঢালু পথ। প্রায় ৩০ ফুট নিচে আরেকটা সমতল ভূমি। এটা ট্রেনিং গ্রাউন্ড। সব ধরনের অস্ত্র এবং খালি হাতে যতো রকমের মারপ্যাচের কমাডো ট্রেনিং হয় এখানে। ট্রেনিং গ্রাউন্ড পার হয়ে প্রায় ২৫ ফুট উচুতে আর একটা সমতল ভূমি। এটা আর একটা ট্রেনিং গ্রাউন্ড। সকল ধরনের এক্সপ্রোসিভ তথ্য বিস্কেবক তৈরি এবং কীভাবে তা ব্যবহার করতে হবে, তারই প্রশিক্ষণের জায়গা এটা।

ব্যারাক এবং প্রশিক্ষণ গ্রাউন্ডের খাড়া প্রায় ৬০-৭০ ফুট নিচে বিস্তীর্ণ একটা উপত্যকা। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে উজ্জ্বল একটা পাহাড়ি নদী ছলাছল মুখর শব্দ তুলে সদা প্রবহমান। নদীর ওপারে আবার পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের ওপারে গভীর বনভূমি। বনভূমির ডেতের দিকে ফাঁক ফাঁক সর্পিল পাকা রাস্তা। মাঝে মধ্যে হস হস করে গাঢ়ি চলে যায় সেই রাস্তা ধরে। যাত্রীবাহী বাসগুলোর কোনোটির সামনে লেখা

থাকে ঝালং, কোনোটার কাৰ্সিয়াং, শিলং আবাৰ কোনোটাৰ জলচাকা ইত্যাদি।

প্ৰতিটি উইংহের দায়িত্বে একজন মেজেৱ। ছেলেদেৱ প্ৰশিক্ষণ দেয়াৰ জন্য প্ৰতিটি প্ৰাটুনেৱ জন্য তিনজন কৱে ইনস্ট্ৰুক্টৱ। জে. সি.ও পৰ্যায়েৱ ব্যাক তাঁদেৱ। সবাৱ কাছে তাৰা ‘ওস্তাদ’ নামেই পৰিচিত। সমস্ত ক্যাপ্সেৱ দায়িত্বে একজন কমান্ডান্ট। একজন কৰ্নেল পৰ্যায়েৱ বাঙালি অফিসাৱ তিনি। কৰ্নেল দণ্ড নামে পৰিচিতি তাৱ।

ভোৱ সাড়ে চারটাৰ মধ্যে ঘূৰ থেকে উঠতে হয়। আধ ঘটাৰ ভেতৱে প্ৰাতঃকৰ্ম সেৱে পাঁচটাৰ মধ্যে বাধ্যতামূলকভাৱে তৈৱি হয়ে নিতে হয়। এৱপৰ নৱেন্দ্ৰ ওস্তাদেৱ পু-পু-উ-পু-উ বাঁশি কৰ্কশ সুৱে বেজে উঠে। আৱ ঘূৰে তিনি বলতে থাকেন, ‘ফল-ইন ফল-ইন’। প্ৰতি প্ৰাটুনেৱ ছেলেৱা সেকশন অনুযায়ী আলাদাভাৱে দাঁড়ায়। তাৱপৰ কমান্ডাৱদেৱ রিপোর্ট দেয়া শেষ হলে নিৰ্দেশ আসে বাঁয়ে ঘোৱো। সবাই বাঁয়ে ঘূৰে দাঁড়ায়। এৱপৰেৱ নিৰ্দেশ ‘দৌড়কে চল’ অৰ্থাৎ দৌড়াতে থাকো। ব্যাবাক থেকে ‘কোত্’ অৰ্থাৎ অস্তাগার প্ৰায় দেড় মাইল। ওখানে যাওয়াৰ সবটা পথই ছেটবড় নুড়িতে ছাওয়া। সবাৱই পৱনে খাকি হাফ প্যান্ট। গায়ে শাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। পায়ে খাকি কাপড়েৱ জুতো। প্ৰতিটা সেকশন কমান্ডাৱকে দৌড়াতে হয় তাৱ দলেৱ পাশাপাশি। অৰ্থাৎ তাৱ দলকে দৌড়ে নিয়ে যাওয়াৰ দায়িত্ব তাৱ। আৱ পাশ থেকে, পেছন থেকে, সামনে থেকে নৱেন্দ্ৰ ওস্তাদেৱ কৰ্ণান্ত চলতে থাকে, দৌড়কে চল, জোৱছে, আৱও জোৱছে ...। সেই সাথে তাৰ বাশিৰ কড়টা কাৱো কাৱো পিঠে পড়তে থাকে সপাং সপাং কৱে। এক সময় পুঁজি আসে। দৌড়ানোড়ি থেমে যায়। ছেলেৱা কুস্তিতে হঁ কৱে নিষ্পাস নিতে পুঁজি। কমান্ডাৱদেৱ কোত অৰ্থাৎ অস্তাগারে চুকতে হয়। রাইফেল, এসএলআই এলএমজি, আৱ ২ ইঞ্জি মটৱাৰ—এগুলো দেয়ালেৱ সাথে হেলান দেয়া থাকিব। সেখান থেকে অন্তগুলো বাইৱে নিয়ে আসতে হয়। প্ৰত্যেককে দেয়া হয় দু'হাতে অন্ত ভাতিয়াৰ। একটা বাঁ হাতে আৱ একটা ডান হাতে। এৱপৰ দু'হাতে দুটো অন্ত ভাতিয়ে শুৰু হয় ফিৰতি দৌড়। একইভাৱে। এবাৱ দু'হাতে শক্ত কৱে ধৰে থাকা দুটো অন্ত। আৱ সেই অন্ত হাতে নিয়েই আবাৱ শুৰু কৱতে হয় দৌড়ানো। হাতেৱ পেশিতে টান পড়ে। মনে হয়, বাছ থেকে বুৰি হাত খসে পড়লো। এক প্ৰাণস্তুকৰ কষ্ট। যন্ত্ৰণাদায়ক ক্লান্তি। বুকেৱ মধ্যে ধৰে থাকা দম আৱ শৰীৱেৱ শক্তি বুৰি শেষ হয়ে আসতে চায়। চোখ অক্ষকাৱ হয়ে আসে। কিন্তু এক সময় এই কষ্টেৱ শেষ হয়। ব্যাবাকে চলে আসে। আসতেই ছেলেৱা তাৱ গায়ে হেলান দিয়ে হাতিয়াৱগুলো দাঁড় কৱিয়ে রাখে। তাৱপৰ নিজেদেৱ মগ আৱ থালা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে লঙ্ঘৱাখানা�ৰ লাইনে শামিল হয়। লঙ্ঘৱাখানা�ৰ কমান্ডাৱ প্ৰত্যেকটি থালায় একটা বড় সাইজেৱ লুটি আৱ মগজ্জিতি চা তুলে দেয়। ছেলেৱা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ে। যতো দ্রুত সংভব বৰাদ আহাৱ ও পানীয় শেষ কৱে আবাৱ হাতিয়াৱেৱ কাছে ফিৱে আসে। ততোক্ষণে সূৰ্য পুৰ আকাশে চোখ মেলে জেগে উঠেছে।

এৱপৰ হাতিয়াৱ নিয়ে সোজা টেনিং গাউড়ে। প্ৰতিটি সেকশনেৱ জন্য আলাদা আলাদা জায়গা। রাইফেলেৱ ‘খোল্না আওৰ জোড়না’ অৰ্থাৎ হাতিয়াৱটিৱ খোলা এবং জোড়া দেয়াৰ প্ৰাথমিক এই কাজটুকু দিয়েই শুৰু হয় টেনিং। প্ৰতিটি ক্লাসেৱ

সময়সীমা ৪৫ মিনিট করে। এরপর বাঁশি বেজে ওঠে। পাঁচ মিনিট বিরতির পর আবার শুরু হয় ক্লাস। এভাবেই চলে দুপুর একটা পর্যন্ত। এরপর বিরতি। আবার অন্তসহ দোড়ানো কোত অভিযুক্তে। সেখানে পৌছে অন্ত জমা দেয়ার পর আবার ধূলোবালিতে একাকার অবস্থায় থালা আর মগ নিয়ে সেই লঙ্গরখানায়।

যাওয়ার পর বেলা তিনটা পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপর আবার বাঁশি। এবার এক্সপ্লোসিভ গ্রাউন্ডে। বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এরপর এক ঘণ্টা ছুটি। পাহাড়ি নদীতে উচ্চল বয়ে যাওয়া স্ফটিক বৃক্ষ পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা পানিতে ঘৰামের পর সারাদিনের ক্লাস্টি কোথায় ধুয়েমুছে যায়! সক্ক্যার মুখে আবার সেই লাইন: লঙ্গরখানায়। রাতের আহারপর্ব শেষ হয়ে যায় সক্ক্যা নামার সাথে সাথেই। এরপরের সময়টুকু একান্ত নিজের। কেবল রাতের বেলা যদি পেটেল অর্থাৎ পাহারা দেয়ার কাজ না থাকে। প্রথম হঙ্গায় এসব কর্মসূচি পালন করার ব্যাপারটিতে ধাতস্তু হতে গিয়ে অন্য কোনো দিকে খেয়াল দেয়ার কোনো রকম ফুরসত হয় নি। যত্রের মতো কেবল আদেশ মানতে হয়েছে। দোড়ুতে হয়েছে। শাস্তি পেতে হয়েছে সামান্য কারণেই ঘন ঘন। কিন্তু দ্বিতীয় হঙ্গার শেষেই প্রশিক্ষণের চাপ কিছুটা কমে যায়। তখন গুলি কীভাবে চালাতে হয়, চলে তার প্রশিক্ষণ, বিক্ষেপকের নানা ধরনের চৰ্জ। বিক্ষেপণের মহড়াও। সেইসাথে ড্যামি অপারেশন। নাইট পেটেল। চতুর্থ হঙ্গার মাথায় শুরু হয় আমাদের যেসব হাতিয়ার দেয়া হবে তার ওপর জোরদার প্রশিক্ষণ। ডেমোলিশন এক্ষেপের যারা অর্থাৎ বিক্ষেপণ ঘটাবে যারা, তাদের জন্য স্ট্রাইকে থাকে আলাদা প্রস্তুতি। এর মধ্যে আছে দুটো উইংয়ের একে অপরকে অ্যাক্রাইট করা, ডামি যুদ্ধ এবং এক সাথে চারটি উইংয়ের শক্তির প্রতি আক্রমণের জন্য আগুয়ান মহড়া। সেন্ট্রি সাইলেন্ট। শক্তির রসদের ডিপোসহ তাদের ঘাঁটি আঁকিয়ে দেয়ার মহড়াও। পঞ্চম হঙ্গায় এসব মহড়ার সাথে যোগ হয় ম্যাপ রিডিং এবং যাপ তৈরির প্রশিক্ষণ। শুধু তাই নয় ম্যাপের মধ্যে নিজেদের ও শক্তির অবস্থান চিহ্নিত করার বিষয়টি।

এভাবেই ট্রেনিং শেষ হয়ে আসতে থাকে। এক বিকেলে আসেন ক্যামেরাম্যান। একটা স্লেটে নিজের বডি নামার অর্থাৎ এফ.এফ. নামার চক দিয়ে লেখা থাকে। সেই স্লেটটা খালি গায়ে বুকের ওপর ধরে থাকতে হয়। ক্যামেরাম্যান এক এক করে প্রত্যেকটি ছেলের ছবি তোলেন। উইং কমান্ডার প্রত্যেক ছেলের পারফরমেন্স নোট করেন। শেষদিন তিনি আর তার ইন্ট্রোট্রো এক হয়ে বসেন। এক এক করে ডাকেন প্রতিটি ছেলেকে। তাদের মৌখিক পরীক্ষা হয়। সমস্ত ট্রেনিংয়ের পারফরমেন্স এবং মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা একমত হয়ে কমান্ডার এবং কে কোন্ হাতিয়ার পাবে, সেটা ঠিক করেন। ঠিক করেন কে কোন্ দলে থাকবে, তাও। এরপর ইস্যু করা হয় হাতিয়ার। প্রত্যেক কমান্ডার বুরো নেয় তার দলকে। প্রত্যেকের জন্য ভাতা নির্দিষ্ট হয় মাসে নগদ ৫০ টাকা। আর ইস্যু করা হয় এক সপ্তাহের রেশন। তাঁর দেয়া হয়। দেয়া হয় গোলাবারুদ, বিক্ষেপক, ঘোনেড আর মাইন। রান্না করার সরঞ্জামও দেয়া হয়। তারপর ঘনিয়ে আসে বিদায়ের লগ্ন। ছেলেরা ওসাদদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক এক করে অপেক্ষমাণ ভ্যানগুলোর পেছনে গিয়ে ওঠে।

এরপর 'আলবিদা' অর্থাৎ 'বিদায়' জানাই ট্রেনিং সেন্টারকে। গাড়ি চলতে থাকে। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে থাকে পাহাড় বেয়ে। এবার যাত্রারগানে অভিমুখে। যাতার মুহূর্তে কাউকে জানানো হয় না, কোথায় কোন ফ্রন্টে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শেষের দিন, আমরা সবাই যখন এখান থেকে চলে যাওয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে আর্মি ভ্যানে চড়বার জন্য অপেক্ষা করছি, সেই তখন একটি অস্তুত দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। চিরদিন মনে রাখবার মতো ঘটনা সেটা।

চারদিকে তখন মুষলধারে বৃষ্টি। কাঁদছিল প্রতিটি ছেলে। ওস্তাদরাও কাঁদছিলেন সকলকে জড়িয়ে ধরে। জগদীশ ওস্তাদ, জ্ঞান ওস্তাদ, নরেন্দ্র ওস্তাদ, লঙ্গরখানার কমান্ডার এবং অন্য সবাই। জগদীশ ওস্তাদ এক কঠিন মনের মানুষ। ছেলেদের প্রচুর শাস্তি আর কষ্ট দিয়েছেন তিনি। তাকে বাঘের মতো তয় করতো সবাই। কিন্তু এ কী! বিদায় বেলায় তাঁরও চোখে পানি! জগদীশ ওস্তাদ কাঁদছেন! অবিশ্বাস্য। ভাবাই যায় না।

ভাটপাড়া ক্যাম্প

জুনের ২৩ তারিখ। বৃষ্টির প্রচণ্ড বর্ষণ। এরকম আবহাওয়ার ভেতরেই আমরা মুজিব ক্যাম্প ছেড়ে মুরতি পাহাড় থেকে মেঝে এলাম স্কুলের আগেভাগে। এক সাথে সবগুলো লরিই নেমে এলো আগপিছু করে। কল্পনাৰাপত্তাৰ ভেতরে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত। এরপর চারটি ইউনিট বেসের জন্য প্রিস্টি লরিগুলো আলাদা হয়ে গেল। এই ইউনিট বেসগুলো ছিল হেমকুমারী, সেন্টারার্ট, থুকরাবাড়ি এবং চাউলহাটি। আমরা চললাম চাউলহাটির দিকে। মনে হচ্ছে জীবনে আর কোনোদিন বুঝি দেখা হবে না আলাদা হয়ে যাওয়া বন্ধুদের সাথে।

গভীর রাত। লরি এগিয়ে চলছে। বাইরে ঘূরযুষি অঙ্ককার। জলপাইগুড়ি শহর পেরিয়ে ৭/৮ মাইল এগুন্তো পর হঠাতে যেন বাঁকুনি লাগলো শরীরে। মনেও। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে কি সামনে? না হলে কান ফাটানো শেলের আওয়াজ আর মেশিনগানের শোলাশুলির এতো প্রচণ্ড শব্দ কেন? ক্রমাগত সেই শব্দ নিকটবর্তী হচ্ছে। আমরা কি তাহলে কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পড়েছি?

লরি এগুচ্ছিল যতোই, মারণাক্ষের সেই শব্দের প্রচণ্ডতা ততোই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছিল। সামনেই আমরখানা ডিফেল। যুদ্ধ চলছে সেখানেই। প্রায় প্রতিদিনই স্বাধীন বাংলা বেতার কিংবা আকাশবাধীর খবরে ছাগলনাইয়া, শমসেরনগর, আখাউড়া, কসবা, ভুরসামারী আর হিলি ইত্যাদি নামের সাথে অমরখানা ফ্রন্টের যুদ্ধের খবরও প্রচারিত হয়। আমরা সেই অমরখানা ফ্রন্টে এসে পড়েছি। লরি আরো খানিকটা দূর এগুনোর পর হঠাতে করেই বাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। দুতিনজন সৈনিক দৌড়ে এলো। আমরা সামনের লরিতে। টর্চের আলো ফেলে দেখলো লরির ভেতরটা। ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলো হেড লাইট নিভিয়ে ফেলার জন্য। সামনে যেহেতু তুমুল যুদ্ধ চলছে, গাড়ির হেড লাইট যে কোনো মুহূর্তেই শক্রের টাগেতি হয়ে উঠতে পারে। শক্রীরটা কঁটা দিয়ে উঠলো। লরি অঙ্ককার চিরে এগুচ্ছিল এবার। হঠাতে

এক জায়গায় এসে আবার থামলো। এবার বুধি নামতে হবে। এই অবস্থায় মনে হঠাৎ করেই প্রশ্নের উকিবুকি, আমাদের কি সরাসরি ফ্রন্টে নিয়ে যাওয়া হবে? কিন্তু এমনটাতো কথা ছিলো না। আমাদের টেনিং দেয়া হয়েছে গেরিলা অপারেশনের জন্য, ফ্রন্ট ফাইটে যাওয়ার কথা তো আমাদের নয়। কী জানি, এরা সর্বশেষ কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে? সামনে বিরামহীন গোলাগুলি আর বোমা বিস্ফোরণের গগনবিদারী শব্দ। অঙ্ককার, ধোয়া আর বারুদের গক্ষের ভেতরেই আমরা কিছুসংখ্যক যুবক বসে আছি লরির পেছনে ত্রিপলের ভেতরে। শরীর ঘামছে। বুকের ভেতরে দ্রুত আর অবিরাম হাতুড়ির আঘাত। মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশীতল একটা কিছু যেন শিরশির করে নেমে যেতে থাকে। তবু আমরা বসে আছি, নির্দেশের অপেক্ষায়।

মেজের শর্মা, যিনি টেনিং সেক্টার থেকে চাউলহাটি ইউনিট বেস পর্যন্ত আমাদের দায়িত্বাণ্ড অফিসার হয়ে এসেছেন এবং যিনি সবসময়ই তাঁর ভ্যানে চেপে আমাদের সামনে আসছিলেন, এই সময় তাকে দেখা গেল। লরির পেছনে এসে তিনি বললেন, ‘কেয়া ইয়ার, তোমলোগ ডো গিয়া?’

তার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে আমরা তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, এখানেই নামতে হবে কি না? তিনি জানালেন, এখানে এখন সময় সংক্ষিপ্ত নয়। পাক আর্মি কাউন্টার অ্যাটাক করেছে। আমাদের পিছিয়ে গিয়ে ক্ষেত্রস্থী নিরাপদ জায়গায় যেতে হবে। তোমরা তব পেয়েও না। চুপচাপ বসে থাকো। কেউ জিগ্যেস করলে তোমাদের পরিচয় দেবে না। মনে রাখবে, দিস ইজ প্রেসিডেন্সি। কিছুক্ষণ পর লাইট নেভানো অবস্থায় গাড়ি আবার ফিরে চললো। প্রশ্নে চলছে একটানা যুদ্ধ। এ যাত্রা আর আমাদের ফ্রন্টে যেতে হলো না। ব্যাধান্তি আপত্ত স্বত্ত্ব এনে দিলো সবার মনে।

আমাদের ভারপ্রাণ অফিসার মেজের শর্মা স্থানীয় কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে চাউলহাটিতে সে রাতে ক্ষেত্রস্থী করার সিদ্ধান্ত নেন। অমরখানা পাকবাহিনীর উত্তরাঞ্চলের শেষ অগ্রবর্তী ঘাট। যুবই শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছে তারা এ ঘাঁটিকে। অমরখানা ঘাঁটির পাকসেনাদের সে রাতের প্রচণ্ড কাউন্টার অ্যাটাক, গোলাগুলি আর শেল বর্ষণের মধ্যে চাউলহাটিতে একএফদের ক্যাম্প দাঁড় করানোই অসম্ভব ছিল। তাই দু’ মাইল পিছিয়ে জহুরী নামের একটা জায়গায় লরি এসে থামলো। এখানেই রাত কাটাতে হবে। তবে রাতের বেলা লরি থেকে নামা চলবে না, মেজের শর্মা জারি করলেন এ আদেশ। সুতরাং রাতটা কটলো লরিতেই। অসম্ভব টেনশনে।

সকাল। ফল-ইন করানোর পর মেজের শর্মা গেলেন চাউলহাটিতে স্থানীয় কমান্ডারের সাথে আলোচনা করে ক্যাম্প স্থাপনের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে আসতে। তিনি ফিরে এলেন দুপুরের দিকে। তার সঙ্গে আর একজন। তিনি মেজের শংকের। স্থানীয় এলাকাটা দু’জনে ভালোমতো জরিপ করে সিদ্ধান্ত নিলেন, ভাটপাড়া বি.এস.এফ. ক্যাম্পের পেছনে আমবাগানের ভেতরেই ক্যাম্প স্থাপন করা হবে। জায়গাটা জহুরী বাজার থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে। বাংলাদেশের ভেতরগড় সীমান্ত থেকে সোজাসুজি এক মাইল উত্তরে।

বিকেলের দিকেই ক্যাম্প স্থাপনের কাজ শেষ হয়ে গেল। মোট আটটা তাঁবু।

লঙ্ঘরখানা ও স্থাপন করা হলো। মালপত্র সব লরি থেকে নামিয়ে আনা হলো। অন্ত আর গোলাবারগুদ সব জমা দেয়া হলো বি.এস.এফ. ক্যাম্পে। ক্যাম্পের সার্বিক দায়িত্ব দেয়া হলো নুরুল হকের ওপর। বয়সে তিনি আমাদের সকলের চেয়ে প্রবীণ। তাই সবারই তিনি 'বড় ভাই'। এ ডাকেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। প্রায় চার্লিশোর্ধ্ব বয়সের একজন সর্বতাগামী দেশপ্রেমিক আর সৎ মানুষ হিসেবে তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন। তাই তিনি হলেন আমাদের উইং কমান্ডার, কোর্যার্টার মাস্টার নিয়োজিত হলো মিনহাজ। মমতাজ হলো লঙ্ঘরখানার কমান্ডার। তার সহকারী ইব্রাহিম।

সন্ধ্যার আগেই ফল-ইন হলো। শর্মা পরিচয় করিয়ে দিলেন নতুন অফিসার কমান্ডিং মেজের শংকরের সাথে। তারা ক্যাম্পের নিরাপত্তা, যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা বললেন ছেলেদের উদ্দেশে।

সামনেই কিছুটা দূরে বাংলাদেশ। ডানে অমরখানা। যুদ্ধ শুরু হয়েছে ওখানেই। নাতিদূরে চলমান সেই যুদ্ধের ডামাডোলের ভেতরে সে রাতও আমাদের জেগে কাটাতে হলো।

চাউলহাটি ইউনিট বেসের প্রথম ক্যাম্প স্থাপিত হলো ভাটপাড়ায়। সংখ্যায় মোট দু' প্লাটানে ৯০ জন এফ এফ। প্রতি প্লাটানের সংখ্যা পঞ্চাশ। আহিদার রহমান প্রথম প্লাটানের প্লাটুন কমান্ডার এবং সহকারী প্লাটুন কমান্ডার পানোয়ার রহমান ভূজ্যা পিন্টু। দ্বিতীয় প্লাটানের কমান্ডার এবং সহকারী কমান্ডার যৈথাক্রমে গোলাম মোস্তফা ও খলিল (বড়)। প্রতিটি প্লাটানে চারটি করে সেকশন। প্রতি সেকশনে একজন কমান্ডার ও তার সহকারী সেকশন কমান্ডার। খলিল (বড়), মধুসূদন, মতিয়ার, মিনহাজ, মোতালেব, একরামুল, নাদের, আখতার ও মুক্তসুল চৌধুরী—এরা সবাই সেকশন কমান্ডার। আবদুল জব্বার এবং গোলাম গুল্মস এরা দুজন জুনিয়র লিডার আর আমি নিজে ডেমোলেশন কমান্ডার অথবা বিস্ফোরক বিশ্বজ্ঞ কমান্ডার। এজন্য একটা সেকশন আলাদাভাবেই গঠন করা হয়েছে বাছাই করা কিছু চোকস ছেলে নিয়ে।

প্রতিটা সেকশনের ওপর দায়িত্ব পড়লো সেন্ট্রি ডিউটির। দুঃঘটা পরপর সেন্ট্রি বদল হবে। ক্যাম্পের চারদিকে থাকবে চারজন সেন্ট্রি এবং চারজন থাকবে ক্যাম্পের আশপাশে প্রেটলের দায়িত্বে। মেজের শর্মা কাছেই পুরুর পাড়ে তাঁর একটনি ভ্যানের পেছনে ত্রিপলের ছাদের ভেতরে ক্যাপ্সখাট বিছিয়ে তার অস্থায়ী আস্তানা পাতলেন। সবকিছুই হলো প্ল্যান মাফিক। ছেলেরা সেন্ট্রিতে দাঁড়িয়ে গেল। অমরখানায় যথারীতি যুদ্ধ চলতে লাগলো। ৬-এ সাব-সেক্টরের ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় এলাকার প্রথম এফ.এফ. ব্যাটের অভিযানের সূচনা এভাবেই ভাটপাড়া ক্যাম্প থেকে শুরু হলো।

দু'দিন পর মেজের শর্মা ভাটপাড়া ক্যাম্পের দায়িত্ব মেজের শংকরকে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। তিনি আবার ফিরে যাবেন মুরতি ট্রেনিং ক্যাম্পে। ওখানে নিজেকে আবার নিয়োজিত করবেন নতুন দল গঠন ও তাদের ট্রেনিংয়ের কাজে। বড় ভাই নুরুল হক, তাঁর জন্য মোটামুটি একটা বিদায় সভার আয়োজন করলেন। ট্রেনিং সেটার থেকে শুরু করে ভাটপাড়ায় ক্যাম্প স্থাপন—এসব করতে গিয়ে শর্মা

আমাদের অত্যন্ত আপনজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিদায়ের সময় তাই খুবই বিমর্শ আর আবেগাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সবাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তিনি আবার তাঁর ছেলেদের সাথে দেখা করবেন, এই আশা আর সকলের মঙ্গল কামনা করে তিনি যখন গাড়িতে উঠেছিলেন, তখন তাঁর দু'চোখে পানি টলটল করছিল। নতুন কমান্ডার শংকরকে তিনি বারবার বলে গেলেন ছেলেদের দিকে ভালো করে খেয়াল রাখতে। তাদের যেন কোনোরকম জ্ঞতি না হয়।

কোথাকার এক শর্মা, যাওয়ার সময় তিনি ভাবছেন, তাঁর নিজের ছেলেদেরই বুঝি তিনি রেখে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস মেজর শর্মার মতো এমন অনেকেই আছেন, যারা এ পর্যন্ত নেপথ্যেই রয়ে গেছেন। তাদের উজ্জ্বল ভূমিকার কথা খুব একটা লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। না লিখুক কেউ। কিন্তু তাঁর সংস্পর্শে আসা মৃক্ষিযোদ্ধারা তাদের ভূলতে পারবে না কোনোদিনই।

পরদিন শংকর এলেন। আমরা ফল-ইনে দাঁড়ালাম। আমাদের খৌজখবর নিলেন। ক' দিনের ভেতরেই তিনি অপারেশনের টাঙ্ক দেবেন বলে জানালেন। প্রতিদিন আমরা অস্থিতি আর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করি, আজই বুধি টাঙ্ক পাওয়া যাবে। শুরু হবে যুক্তে অংশগ্রহণের পালা। কিন্তু টাঙ্ক আসে না। শংকর আগের মতোই যথারীতি আসেন, খৌজখবর নেন। আবার কিন্তু যান। আমরা দিনরাত কেবল অমরখানার যুদ্ধের গোলাগুলির শব্দ শুনি তাঁর অপেক্ষা করি, কবে আমাদের ডাক আসবে যুক্তে যাওয়া। অবশ্যে একেবারেই ডাক। ডাক এলো এখানে তাঁর গাড়ির পাঁচদিনের মাথায়। তারিখটা ছিল মাঝেভাবে ২৭ জুন।

প্রথম অপারেশনে যাত্রা

সেদিন তাঁর ছেলেদের মধ্যে আবেগময় কানার ছড়াছড়ি। এই প্রথম তাঁর অপারেশনে অর্থাৎ প্রথম যুদ্ধক যাত্রা করতে যাচ্ছে, তাই। আজ রাতে ওরা যাবে সাতজন। নূরুল হকের পর জবাবার বয়সে দ্বিতীয় প্রবীণ ব্যক্তি। মুজিব ক্যাপ্সে জুনিয়র লিডার হিসেবে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দু'প্লাটনের সাথে এসেছে দু'জন জুনিয়র লিডার, জবাবার আর গোলাম গটস। জবাবার বয়সে প্রবীণ বলে নূরুল হকের মতো তিনিও সকলের কাছে জবাবার ভাই হিসেবেই পরিচিত।

জবাবার ভাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই অপারেশনের। একজন মৃক্ষিযোদ্ধা হিসেবে জীবনে এই প্রথম অপারেশনে যাওয়া তার। আজ রাতেই প্রথম শক্তির মুখোমুখি হবেন তারা। অধিকৃত বাংলার মাটিতে প্রথম অনুপ্রবেশ। ক্ষমতার দাপটে মদমত এক হিংস্র ঘাতক বাহিনীর মুখোমুখি হতে হবে তাদের। তবে তারা কোথায়, কীভাবে অবস্থান নিয়ে আছে, সঠিক জানা নেই কারো। অনুপ্রবেশ পথের ধারে তারা ওঁ পেতে আছে কি না, তাও জানা নেই। তাদের অপারেশনের সময় বাংলাদেশের পরাধীন মানুষজনের ভূমিকা কী হবে বা হতে পারে, সে সম্পর্কেও কোনো ধারণা নেই। তারা মনেপ্রাণে এখনো তাদের স্বাধীনসন্তা বা স্বাধীন হওয়ার স্থূল অঙ্কুর রেখেছে, না ক্ষমতার দঙ্গের কাছে মাথানত করেছে, তাও জানা নেই তাদের।

তবে অনেক ছিটেফোটা খবর আসে। সেসব খবর খুব একটা সুখের নয়। 'শান্তি কমিটি' ও 'রাজাকার'—এধরনের নতুন নতুন শব্দ তখন কানে আসছে। আসলে অধিকত বাংলাদেশের ভেতর থেকে তখন যেসব খবর পেতাম, তাদের অধিকাংশই মন খারাপ করে দিতো। মনে হতো, দেশের ভেতরের মানুষজনের সবাই অন্টকে মেনে নিয়েছে। জুলুমকারীদের সঙে মানিয়ে নিয়েছে নিজেদের। আবার পাকিস্তানিমন হয়ে গেছে। ওরা হয়তো আর বাংলাদেশ চায় না, মৃত্যুকৃ চায় না। ওরা অন্য রকম হয়ে গেছে। আসলে কি তাই? কে জানে!

আবার ভাবতাম, বিশাল ক্ষমতা আর অত্যাচার-নির্যাতনের কাছে ওদের মাথা নোয়ানো ছাড়া আর কী-ই-বা করার আছে। আমরা তো পালিয়ে এসেছি। সবাই কি পালাতে পারে? পেরেছে? পারে নি। কিন্তু তবুও ভয়।

ভয় ওদের, যারা দালাল হয়েছে, রাজাকার হয়েছে, শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছে। আমাদের অনুপবেশের ব্যাপারটি টের পেয়ে ওরা যদি খবর দেয় পাকবাহিনীকে? তাদের ডেকে নিয়ে এসে যদি আমাদের ধরিয়ে দেয়? দু'ধরনের শক্তি তখন আমাদের সামনে। পাকবাহিনী আর দালাল। একদল বিদেশি আর একদল দেশি। দেশি শক্তিকেই ভয় বেশি। কারণ ওরা ঘরের লোক। শক্তিদের অনুচর ওরা। তাদের গাইড। ওরা ধরিয়ে না দিলে শক্তি কোনোদিন কেউজ পাবে না আমাদের।

ভাটপাড়া ক্যাম্প গোছগাছ করে উঠবার পর ক'টা দিন ভালোই কেটেছে আমাদের। কিন্তু অপারেশনে যাওয়ার খবর পেন্সিলেট একটা শোকের ছায়া ফেলেছে তাঁবু ক'টাতে। সাতজন যাচ্ছে আজ রাতে। জববার ভাই আজকের লিডার। তিনি ছাড়া বাকি আর ছ'জন এদিককার ছেলে হত্তেরগড় এলাকার রাস্তাঘাট সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রয়েছে কেবল গনি আর তাঁদের মিয়ার। অন্য আর সবাই পঞ্জগড়-ঠাকুরগাঁও এলাকার হলেও এদিককার রাস্তাঘাট সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। আর রংপুর-ডোমারের ছেলে জববার তো কোনোদিন এদিকে আসেই নি। নামও শোনে নি ভেতরগড়, অমরখানা ও তালমা এসব জায়গার। যা হোক, আজ ওদের যেতে হচ্ছে।

সক্ষ্যার পর থেকেই সারা তাঁবুতে একটা অঙ্গতির ভাব। সেই অঙ্গতি যেন সহজেই দূর হওয়ার নয়। সবাই কেমন অন্যমনস্ক। সক্ষ্যায় ফল-ইনের সময় ওরা সাতজন আজ আলাদাভাবে দাঁড়ালো। ওদের আজ আলাদা সশ্নান। তিনি দৃষ্টিতে ওদের দেখছে সবাই।

ফল-ইন শেষ হলো। সবাই ফিরে গেল তাঁবুতে। সেন্ট্রি ডিউটি ভাগ হয়ে গেল। 'পাস ওয়ার্ড' বা সাকেতিক শব্দ ঠিক করা হলো। ক্যাম্পের চার কোনায় দাঁড়িয়ে গেল চারজন সেন্ট্রি। মিনহাজ আর মমতাজ প্রত্যেককে রাতের খাবার খাইয়ে দিলো। ধীরে ধীরে একসময় অক্ষকার ঘনিয়ে এলো চারদিকে। আর সেই সাথে অক্ষকারের ভয় যেন সঞ্চারিত হলো একে একে সবার মনে। অনেকে নফল নামাজ পড়া শুরু করলো। সেই সাথে দোয়া-দুর্লভ আর মোনাজাতও। আজকের অপারেশনের দুই সদস্য ঠাঁদ মিয়া আর গনিও তাঁবুর ভেতরে নামাজে দাঁড়ালো। বড় ভাইয়ের তাঁবুতে জববার ভাইকে ঘিরে আমরা ক'জন। তাঁবুর ভেতরে হারিকেনের টিমটিমে আলো। মৃদু ঝরে কথা

হচ্ছে । সবাই খুবই সিরিয়াস । উচ্চল ভাবটা আজ আর কারোর মধ্যে নেই । সদা-
রসিক পিন্টুরও মুখ থেকে কোনো কোতুক বেরনেছে না । তাঁবুর ভেতরে একটা গুমোট
আর থমথমে ভাব । যেন বিরাট একটা শূন্যতা এসে গ্রাস করেছে সবকিছু । এই রকম
এক পরিবেশে প্রত্যেকের মুখ কঠিন আর কুক্ষ দেখাচ্ছিল । দাঢ়ি-গোফের আড়ালে
জব্বারের ফরসা মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে । বারবার সে তার দাঢ়ির জঙ্গলে আঞ্চলের
চিরনি চালিয়ে যাচ্ছে । অবস্থি কাটানোর জন্য বড় ভাই নুরুল হক লঙ্ঘরখানার
কমান্ডার মমতাজকে চা দিতে বললেন । রাত দশটা বাজতে তখনও অনেক দেরি ।
ঠিক হয়েছে, রাত দশটায় ওরা এখান থেকে রওনা দেবে । যুক্তে যাত্রা করবে ।

ধীরে ধীরে আরো রাত হলো । ঘনিয়ে এলো সময় । প্রশিক্ষণ শিবির থেকে
আমাদের নামে বরাদ্দ করা অন্ত আর গোলাবারুদ বি.এস.এফ ক্যাম্পে জমা রাখা
হয়েছে । সেখান থেকেই আজকের রাতের অপারেশনের জন্য আমাদের যুদ্ধান্ত নিয়ে
আসা হলো । একটা টেনগান, তিনটা রাইফেল আর দুটো ফ্রেনেড । প্রতিটা
হাতিয়ারের জন্য ১০টা করে গুলি । কমান্ডার জব্বার নেবে টেনগান, দুজন দুটো
রাইফেল আর দু'জন দুটো ফ্রেনেড । অবশিষ্ট দু'জন অবশ্য খালি হাতে যাবে না ।
একজন নেবে দা এবং অন্যজনের হাতে থাকবে কুড়াল এই হলো প্রথম রাতের যুদ্ধ
সরঞ্জাম । পাক আর্মির মতো শক্তিশালী একটা সেন্টারের মোকাবিলায় এই সামান্য
অন্তসজ্জায় কোনো দলকে পাঠানো যেমন হাসপুর, তেমনি একটা করুণা উদ্বেকী
ব্যাপারও । কিন্তু কী করা যাবে? যুদ্ধের যাত্রাটে কমান্ডারের নির্দেশই চূড়ান্ত । শূন্য
হাতে শক্ত সম্মুখে ঠেলে দিলেও সৈনিকের তলার কিছু থাকে না । আদেশ, আদেশই ।
তা পালন করাই সৈনিকের ধর্ম । কিন্তু এটা পেশাদার সৈনিকের বেলায় প্রযোজ্য
হলেও যুক্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আর অপেশাদার একটা বাহিনীর সামান্য ক'দিনের
প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে গেম্বজে যুদ্ধের জন্য যাদের তৈরি করা হয়েছে, তাদের বেলায়
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর এই সামান্য উপকরণ নিয়ে প্রচুর মনোবল না থাকলে
কোনো অবস্থাতেই যুদ্ধের জন্য এগুনো যায় না ।

ওদের রওনা দেয়ার সময় সব ছেলে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পড়লো
সারিবদ্ধভাবে । এক এক করে ওরা প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় কান্নার
রোল পড়ে গেলো । পরম্পরাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদছে সবাই । সে এক
হৃদয়বিদ্যারক দৃশ্য । ‘তয় নেই’ বলে প্রচুর সাব্বন্ন দিলাম আমরা সবাইকে । কিন্তু
যুদ্ধযাত্রায় কোনো ভয় নেই, এটা তো সর্বাংশে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার হতে পারে না ।
বিশ্বাসযোগ্য করে বললেও, তা বিশ্বাসের আওতায় আসে না । সুতরাং আবেগাপুত
ছিল বলে ওদের কান্নার বেগ বেড়েই চললো । জব্বার কাঁদতে পারলো না আর সবার
মতো । শুধু জড়িয়ে ধরে বললো, ‘চলি, খোদা হাফেজ ।’

ওরা সাতজন ফল-ইন হলো । লাইন করে দাঁড়ালো । পরনে লুঙ্গিসার্ট, আর খালি
পা । অঙ্ককারের তুতুড়ে ছায়ায় অন্ত হাতে অন্যরকম লাগছিল ওদের । জব্বার
সবাইকে চূড়ান্ত ব্রিফিং করলো । অন্ত আর গোলা-বারুদ পরীক্ষা করা হলো । তারপর
লেফ্ট টার্ন করে একের পেছনে এক করে রওনা দিলো ওরা । এক সময় মিশে গেল

অঙ্ককারে। ওদের গমন পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রহিলাম আমরা ক'জন।

মনে পড়ছে সেই হাসির কথা। গোফের নিচে হাসি নিয়ে মেজের শংকর সবসময় কথা বলেন। আজ বিকেলে এসে তিনি এই মিশন পাঠানোর ব্যবস্থা করে গেছেন। আসলে দু'তিন দিন আগ থেকেই তিনি বলছিলেন, এখন অপারেশন শুরু করতে হবে তোমাদের। ক্যাম্প গোছানো শেষ হয়েছে, বিশ্রামও পেয়েছো তোমরা ক'দিনের। এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকো, যে-কোনোদিন তোমাদের অনুগ্রহেশ করতে হতে পারে।

ইউপির মানুষ মেজের শংকর। শক্ত-সমর্থ দেহের একজন পোড়-খাওয়া সৈনিক। তাঁর নিজের ইউনিট ভারতীয় ফার্স্ট গার্ড। তিনি তাঁর ইউনিটের সাথে অমরখানার সামনাসামনি অবস্থানে আছেন। একটা কোম্পানিকে কমান্ড করছেন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তেছে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে।

দিনে দু'বার আসতেন তিনি তাঁর কমান্ড পোস্ট চাউলহাটি থেকে। একবার সকাল নটার দিকে আর একবার বিকেল চারটার পর। বিকেলে আমরা ছেলেদের ফ্ল-ইন করাতাম। তিনি ছেলেদের চেকআপ করতেন। কিছু বলতেনও ছেলেদের উদ্দেশে— যেমন যুক্তের কথা, জয়বাংলার কথা, স্বাধীনতার কথা। আর সেই জয় বাংলার জন্য, দেশ মুক্তির জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন যুক্তে। প্রচণ্ড যুদ্ধ। যুক্ত ছাড়া দেশ হানাদারযুক্ত হবে না। এ জন্য তাঁই লড়তে রয়েছেন মনে রাখতে হবে হিস্ত, রাখতে হবে সাহস। দেশটা তোমাদের ধূস করে দিয়েছে। তোমাদের লোকজনদের মাঝে কুকুর-বিড়ালের মতো গুলি করে। তোমাদের মা-বোনদের ইঞ্জিন লুটেছে ওরা। সুতরাং তোমাদের প্রতিশোধ নিতে হবে। ভাণ্ট-কাপুরুষ হলে দেশ উঞ্জার করা যাবে না, জয়বাংলা হবে না। তোমাদের হিন্দু-সাম্পদের মতো হতে হতে হবে। রাতের অঙ্ককারে শিয়ে ওদের হত্যা করে আসতে চাই চরম নিষ্ঠুরতা নিয়ে। এসব কথা তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভার সঙ্গে বলতেন। বরতেন তাঁর উপলক্ষ আর বিশ্বাসের ওপর ভর করে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা, হিন্দি আঁড় ইংরেজি মেশানো তাঁর কথাগুলো গমগম করে উঠতো। প্রতিধ্বনি করে ফিরতো আমবাগানের চারাদিকে। তাঁর প্রতিটি কথা আমাদের উদ্দীপ্ত করতো। একটা আত্মবিশ্বাস এসে ভর করতো মনের গভীরে। হামলোক তুমহারা সাথে হ্যায়, ডরে মাত বয়েজ, হামলোগ তুমকো মদদ দেগো, অল শর্টস্ অব হেলপ ...।

বক্তৃতা শেষে তিনি ছেলেদের সাথে খোলামেলাভাবেই কথা বলতেন। প্রচুর রসিকতা করতেন। যেতেন প্রতি তাঁবুতে। ক্যাম্পের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে খৌজখবর নিতেন। আর বিকেলে চায়ের সময় সবার সাথে চা খেতেন। তাঁরপর সবাইকে ইংশিয়ার থাকতে বলে নিজের গাড়িতে চেপে চলে যেতেন। তাঁর আন্তরিকভায় ব্যবহারের জন্য তিনি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন আমাদের মধ্যে।

মেজের শংকর যখন বিকেলে তাঁর রঞ্জিন পরিদর্শনে আসতেন এবং ছেলেদের উজ্জীবিত করার জন্য ভরাট অর্থচ গভীর কঢ়ে কথা বলতেন, তখন পুব-দক্ষিণে দু'মাইল দূরের অমরখানা ডিফেন্স থেকে আসতো আটিলারি আর মার্টারের দিগন্ত কাঁপানো শেল ফাটানোর শব্দ। আর সেই সাথে মেশিনগানের একটানা আর্টিলাই ঠা-ঠা-ঠা-ঠাস্-ঠাস্..।

আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠতাম সে শব্দে। শুকিয়ে যেতো অনেকের মুখ। কেমন ভাবলেশহীন হয়ে উঠতো চোখের দৃষ্টি। শংকরও তখন চপ্পল হয়ে উঠতেন। দূরে ঝণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতেন, ‘দেখো, শুরু হো গ্যায়া, ইয়ে মিউজিক সারে বাত চলেগা।’ বলেই প্রাণ খুলে হাসতেন। আর জিগ্যেস করতেন কেয়া, ডর লাগতা হ্যায়?

নেহি স্যার, বলে আমরা মাথা নাড়তাম। কিন্তু মুখে বললেও একটা ভয় মেশানো অঙ্গস্থিদায়ক অনুভূতি যেন বুকের ওপর চেপে বসে থাকতো।

জুনের ২৭ তারিখ

শংকর সোদিন সকাল দশটায় এলেন। গাড়ির শব্দে আমরা সবাই সজাগ হয়ে উঠি। বড় ভাই নুরুল হক তার স্বভাবসূলভ অঙ্গস্থিতা নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করে দেন। শংকর গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন। ক্যাম্পের বৌজবৰ নিলেন। তারপর সব কম্বান্ডারকে নিয়ে বসলেন উচু আমগাছটার তলায়, ঘেটাকে আমরা ওপি বা অবজারভেশন পোষ্ট হিসেবে ব্যবহার করছি।

মেজর বলছেন আর আমরা শুনছি। শুনছি আমি, পিন্টু, আহিদার, গোলাম গউস, জব্বার, নুরুল হক আর গোলাম মেনফ্যান্স। আজরা বসেছি একটা বেঞ্চে। মেজর একটা চেয়ারে সামনাসামনি। তাঁর কথা, আজ থেকে অপারেশন শুরু করতে হবে। পাঁচদিন বিশ্রাম হয়েছে, আর নয়। অঙ্গকের প্রথম অপারেশনে জব্বার কম্বান্ডার থাকবে। ঠিক হ্যায়? জব্বারের পাঁচকে তাকিয়ে মেজর প্রশ্ন করেন। জব্বার ভাই হচকচিয়ে যান প্রথমটায়। অঙ্গের মাথা নাড়েন। মুখে হাসি আনবার চেষ্টা তাঁর। কিন্তু মুখের হাসিটা কেমান্দেয়েন ফ্যাকাসে। যাওয়ার আগে মেজর শংকর জব্বারের সাথে যাবে এখন তাঁকে ছেলেকেও বাছাই করে দিলেন। তারপর বিকেলে এসে টাঙ্ক দেবেন বলে চলে গেলেন।

বিকেলে শংকর এলেন প্রথম অপারেশনের পরিকল্পনা নিয়ে। জব্বারসহ আমাদের সবাইকে নিয়ে বসলেন। খুঁটিনাটি সবকিছু বিজ্ঞারিতভাবে ত্রিফিং করলেন আজকের রাতের অপারেশনের ‘টাঙ্ক’ বিষয়ে। তিনি বলে যেতে লাগলেন, সামনের উচু গড়টার এপারে ভারত, ওপারে বাংলাদেশ। ওপারে বাংলাদেশের এলাকাটার নাম ভেতরগড়। ভেতরগড় হাইস্কুলে দু'দিন আগে কিছু পাকসেনা এসে ক্যাম্প করেছে। ইট-ইজু আওয়ার ইনফরমেশন। ইউ স্যুড গো আপ টু দা স্কুল। পহলে রেকি করো। ইফ ইউ ফাইভ দেম দেয়ার দেন চুপচাপ ক্রিলিং করকে যেতনা পসিবল ক্যাম্পকা কাছ তাক যায় গা। ইউ লোকেট দেয়ার সেন্ট্রি এন্ড কিল হিম বাই ফায়ারিং। আওর ধমাধম দু'গ্রেনেড ফিককে চলা আওগে...। আভার স্টান্ড?

— ইয়েস স্যার, আমাদের জব্বার।

এটা ছিলো কমান্ডিং অফিসার মেজর শংকরের ত্রিফিং, সেই সাথে অর্ডারও। সুতরাং যেতেই হবে। উপায় নেই। ভেতরগড় স্কুল সীমান্ত থেকে ৫ মাইল। কে জানে কোথায় কি আছে? তখনও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মায় নি। তাই

অন্ত নিতে বলা হলো তিনটা করে। একটা টেনগান আর দুটো রাইফেল। প্রতিটা অন্তের জন্য ১০ রাউণ্ড করে গুলি।

— অসম্ভব! ইট ইজ সিম্পলি ইমপিসিবল টু গো উইথ সাচ শল আরম্ব এন্ড এ্যামুনেশনস্, বড়ভাইয়ের প্রতিবাদী কষ্ট।

— হোয়াই নট? যেন ছক্ষার দিলেন মেজের শংকর। ইউ আর গেরিলা ফাইটার, নট রেগুলার আর্মি। এক গোলিছে তুমলোগ এক খানকো মারনে চাহিয়ে। সো, এ্যালোটেড আর্মস এন্ড এ্যামুনেশনস আর মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। ওকে?

আমরা চৃপচাপ। আবার মেজের শংকরের গলা।

— দেন গো অন, উইশ ইউ সাকসেস। মেজের উঠলেন। সবার সাথে করলেন উষ্ণ করমদ্দন। তারপর গাড়িতে চড়লেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। তাঁর অদৃশ্য হতে থাকা গাড়ির দিকে তাকিয়ে একটা বাস্তব উপলক্ষি এলো মনের মধ্যে। যুক্তি আমাদের। কিন্তু অস্বীকৃত আর কমাত্ত ওদের। ওরা আমাদের সাহায্য করছে আমাদের স্বাধীনতার জন্য। সুতরাং, বর্তমান অবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া আমাদের আর করণীয় কিছু নেই। তবুও কেমন যেন অবিষ্কাসে মনটা ভরে ওঠে। আমরা অস্বীকৃত যুদ্ধের নামে যুক্ত যুদ্ধ খেলায় নামি নি-তা? তা না হলে সাতজন ছেলেকে সাত তিনটা হাতিয়ার আর ১০ রাউণ্ড করে গুলি দিয়ে পাকবাহিনীর সামনে তেলে দেয়ার এই অর্থহীন প্রয়াস কেন মেজের শংকরের?

— কে ওখানে? সেন্ট্রির ডাক্তেক ভাঙে।

— আমি, সাড়া দিয়ে আপনায়ে দিই আমার অস্তিত্ব। বাচ্চা মিয়ার সেন্ট্রি ডিউটি চলছে। রংপুরের ছেলে বাচ্চা মিয়া। ১৬ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে, সেও এসেছে যুদ্ধে।

— কিরে বাচ্চা ভয় লাগছে নাকি? জিগ্যেস করি তাকে।

— নাঃ, ভয় লাগবে কেন?

— বাড়ির জন্য তোর মন খারাপ করে না?

— হ্র-উ, কিন্তু আর বোধহয় দেশে ফেরা যাবে না।

— দূর, কি যে বলিস? এই তো অপারেশন শুরু হলো। দেখিস একদিন ঠিকই আমরা দেশে, আমাদের বাড়িতে ফিরে যাবো।

শেষের দিকে আমার নিজের গলার স্বর যেনো কেঁপে ওঠে। তবুও ভাবনা : এভাবে যুক্ত করে আদৌ দেশ স্বাধীন করা যাবে কি? একটা টেনগান, দুটো রাইফেল আর দশটা করে গুলি। তাই দিয়ে গেরিলা যুদ্ধ! স্বাধীনতা! নাহ, বিষ্পাস হতে চায় না। এই সময় অমরখানা থেকে মেশিনগানের একটানা ঠা-ঠা-ঠাস্ শব্দ ভেসে আসে। তাঁবুর ভেতরে ঘুমন্ত ছেলেদের ভারি ঝাস-প্রশ্বাসের শব্দ। গভীর ঘুমে অচেতন ওরা সবাই। কে জানে ওদের ক'জন স্বাধীনতার মুখ দেখতে পারবে!

ফিরে এলো ওরা

কিন্তু ওরা ফিরে এলো রাত তিনটার দিকে। সীমান্ত অতিক্রম করে কিছুদূর এগুবার
পর ওরা আর বিশ্বাস করতে পারে নি দেশের মাটিকে। কে জানে অঙ্ককারে কোথায়
শক্ত ওঁ পেতে বসে রয়েছে। সামনের গ্রামের মানুষজন জেগে রয়েছে। মাঝে মাঝে
চিৎকার করছে। সে চিৎকারের ধ্বনি তরঙ্গায়িত হয়ে ভেসে যাচ্ছে দূর থেকে অনেক
দূরে। জেগে থাকা ঐ মানুষজন যদি ধরিয়ে দেয় ওদের? সত্যি বলতে কি প্রথম রাতে
জবাব ভাই ঝুকি নেয়ার সাহস পান নি।

সকালেই মেজের শংকর এলেন।

— মিঃ জবাব, খবর কি?

নত হয়ে এলো জবাবের মাথা। সেই সাথে আমাদেরও। প্রথম অপারেশনের
ব্যর্থতা আমাদের সবার জন্য এক লজ্জাজনক অবস্থার সৃষ্টি করে।

— কেয়া বাত, তুমলোগ জানে নেহি সাকা?

— নেহি স্যার।

— কিউ?

জবাব কোনো জবাব দিতে পারলো না। গৌফ-দম্ভিতে ঢাকা তার মুখটা নড়ে
উঠলো শুধু। ভীষণ অসহায় আর বোকা বোকা দেখালে ভাকে। আর সবাই চুপ।

— শালে লোগ ডারতা হ্যায়? তুমলোগ দেশ-ভাষীন করেগা, কাওয়ার্ড, রেগে
ধমকে উঠলেন মেজের শংকর।

— নেহি স্যার, মুখ খুললাম আস্তে ত্রুটি ভাবলাম, জবাব ভাইকে, সেই
সাথে বাঙালিরও ইঞ্জিন রক্ষা করা দরকার। তাই বললাম, নেহি স্যার, উন লোগকো
কোই গাইড নেহি মিলা, আওর রাষ্ট্রীয় মালুম নেহি হয়া, আওর —

— আওর কেয়া?

— ইট ইজ আওয়ার ফ্লাট অপারেশন।

— তুম ফাইট কারনে নেহি আয়া?

— ইয়েস স্যার।

— তব কিউ ডারতা হ্যায়?

— স্যার, হামলোগকো এক আওর চাস দিজিয়ে, প্রিজ গিভ আস এনাদার
চাস। হামলোগ আজ যায়গা।

প্রথম দিনের ব্যর্থার কালিমা ঢাকা দরকার। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা সব
কম্বারই যাবো আজ। শুধু বড় ভাই মুরগল হক থাকবেন তাঁবুতে। ছেলেদের সাথে।

কেমন একটা জেদ এসে গেলো। দিনমান প্রস্তুতি চললো। আশপাশের
দু'একজন স্থানীয় লোক, পঞ্চগড় এলাকা থেকে আসা শরণার্থী, এদের সাথে
যোগাযোগ করা হলো। কিন্তু কেউই রাজি হলো না গাইড হিসেবে যেতে। এদিকে
সারাদিন ধরে অমরখানার ওপর চললো দিগন্ত কাঁপানো শব্দে শেল বর্ষণ, আর
আমাদের ছটফটিয়ে মারলো রাতের ভাবনা।

বিকেলে মেজের শংকর এলেন। দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, আজকের কাজ

হচ্ছে তোমরা ভেতরে যাবে এবং গাইড যোগাড় করে নেবে। ভেতরগড় হাইস্কুল রেকি করবে। তারপর যাবে তালমা শালমারা ত্রিজে। ওটা ঠিকভাবে রেকি করে আসবে। যদি ত্রিজের ওপর শক্রপক্ষের কোনো সেন্ট্রি থাকে, তাকে পুলি করে মেরে ফেলবে। পারলে তার লাশটা নিয়ে আসবে। ফেরার সময় সোনা মিয়া নামের একজন কুখ্যাত দালাল রয়েছে, তাকে হত্যা করবে। আর বাড়িতে হ্রেনেড চার্জ করে উড়িয়ে দেবে তার বাড়িটা।

— আওর, আমাদের উৎসুক দৃষ্টির সামনে তাঁর চওড়া পোফের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে মেজের বললেন, ‘বাস্, দিস ইজ দা টাসক্ ফর টু নাইট। ইউ উইল টেক প্রি রাইফেলস্, ওয়ান এসএমজি এড ফাইভ হ্রেনেডস্। টেন বুলেট্স্ ফর ইচ আর্মস, ওকে?’

— ইয়েস স্যার।

— হ আর গোইঁ টু নাইট।

— উই বলে আমরা দাঁড়ালাম বুকটান করে। মোট ১০জন।

— অল কমার্ডার্স্ হাসলেন মেজের। তারপর এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। মেহবুব ইউ আর লিডিং টু নাইট, ওকে?

— ইয়েস স্যার বলে সোজা হয়ে আবার দাঁড়ালাম।

— ও. কে, দেন উইশ ইওর সাকসেস।

উষ্ণ করমদন করে বিদায় নিলেন মেজের শক্রপক্ষের।

দ্বিতীয় অপারেশন

আজ রাতেই আমাদের দ্বিতীয় অপারেশন। আজকের কমান্ডার আমি নিজে। দায়িত্বটা অবশ্যই বড় এবং ঝুঁকিপূর্ণও। আজকের সফলতা-ব্যর্থতার দায় বর্তাবে সম্পূর্ণ আমার ওপর। তাই অপারেশনে যুগ্ময়ার প্রস্তুতিতে লেগে গেলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন তার চাদর বিছোঁজে চারদিকে। পেছনে হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি তখনও সোনালি আলোর মুকুট পরে আছে।

রাত এলো। মৃত্যুর শক্তা ধিরে ধরলো সব কঢ়া তাঁবুকে। সেন্ট্রিরা ডিউটিতে নিয়োজিত। নিম্নরখনার কমান্ডার মমতাজ সবাইকে পরিবেশন করছে খাবার। আজ কোনো রকম আলো জ্বালানো হয় নি। খোলা আকাশের নিচে মিটিমিটি তারার আলোয় সবাই খেতে বসেছে।

ধীরে ধীরে রাত আরো গভীর হলো। আদেশ জারি করা হয়েছে আজ কেউ নফল নামাজ পড়বে না। কাঁদবে না কেউ। কান্নাকাটি আর শোকের পরিবেশে সবার মন ভেঙে যায়। আজ ঘটা করে কেউ কাউকে বিদায় জানাবে না।

বড় ভাই নুরুল হকের তাঁবুতে বসে আছি আমরা ক'জন। রাত বাড়ছে ত্রুমাগত। বাইরে ঘন কালো অন্ধকার। দূরে বাংলাদেশের সীমানায় থেকে থেকে গর্জে উঠছে ঘর্টার আর মেশিনগান। মানুষ মারছে ওরা। আমরাও তো পড়তে পারি ওগুলোর সামনে। মাথার খুলি উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে মর্টারের শেল। মেশিনগানের

বুলেটের ঝাঁক এসে আবরা করে দিতে পারে আমাদের বুক। কোনো এক অজন্ম প্রস্তরে পড়ে থাকতে পারে আমাদের প্রাণহীন দেহ। একদিন, দু'দিন। তারপর শেয়াল-কুবুর তাদের খাদ্য হিসেবে টানাটানি করে খেয়ে ফেলবে আমাদের নিষ্পাপ দেহগুলো। ওদের আহার-বিহারের পর কেবল হাড়গুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে চারপাশে। মাথার ঝুলিটাও পড়ে থাকবে ভুতুড়ে হাঁ মেলে। লোকে বলবে ওটা কোনো একজন মুক্তিফৌজের মাথা। কেউ জানবে না। কোনো আঞ্চীয়বজন না। পরিচিত কেউ থাকবে না কান্নাকাটি করার। এমনটা কি হতে পারে না যুদ্ধের মাঠে? অবশ্যই পারে। আর সেটা কি আজই হবে? কে জানে? দু'চোখ জ্বালা করে ওঠে মুহূর্তেই।

— চা নাও মাহবুব, বড় ভাইয়ের গলা। চমকে উঠি। এসব কি ছাইপাশ ভাবছি আমি? এখন এসব কথা ভেবে মন আরাপ করার কোনো মানে হয় না। ঠিক এই সময় কী একটা কথা নিয়ে তাঁবুর মধ্যে হাসির রোল ওঠে। হাসছে সবাই আহিদারের দিকে তাকিয়ে। হাসির লক্ষ্য এবং উৎস আহিদারই। বেচারা লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে।

— কি হয়েছে? জানতে চান বড় ভাই।

— না, কিছু না।

— তবে?

— তবে কিছু একটা আছে। আহিদারকে নিয়েছি। ঘটনাটা মজার। তাঁবুর জীবনে কোনো কিছুই তো আর গোপন থাকে না। আহিদারও গোপন করতে পারে নি। তাই আজ খাবার সময় কথাটা হঠাতে কিছুই বেরিয়ে গেছে পিটুর মুখ থেকে। আহিদারকে চাপাচাপি করার পর থেকে হাসির হল্লা। পরিবেশটা হালকা হয়ে আসে। চা-পান শেষ হয়। আমাদের হাত্তার সময় ঘনিয়ে আসে।

বি.এস.এফ ক্যাম্প থেকে অঙ্গোলাবারুদ নিয়ে আসা হলো। সবাই দাঁড়ালো ফল-ইন-এ। আজ আমি মিস্ট্রি ক্ষমতার। কাঁধে চেনগান ঝুলিয়ে শেহবারের মতো চেক-আপ করে নিলাম সব্বক্ষিছু। হাতিয়ার-গোলাবারুদ-ফ্রেনেড। সবার পরনে লুঙ্গি আর হাফ হাতা শার্ট। রাতের অধারে শাদা শার্ট পরা নিষিদ্ধ। তাই আমাদের পরনে অনুজ্ঞল কালো আর রঙিন শার্ট। অঙ্ককারে মিশে থাকবে, ক্যামোফ্লেজের ব্যাপারটা হবে চমৎকার।

ছেলেরা সবাই তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে। বলা ছিলো, আজ কোনো শোকাবহ ঘটনার অবতারণা করা চলবে না। আনুষ্ঠানিক বিদায় নেয়া চলবে না। কাঁদবেও না আজ কেউ। জীবন যেখানে শুধু যুদ্ধ আর গোলাবারুদের ভেতরে আবর্তিত হবে, যেখানে মৃত্যু একটা সাধারণ ঘটনা, জীবন যেখানে ছকে বাঁধা অঙ্কের মতো, সেখানে আবেগ থাকতে নেই, ভালো লাগা আর ভালোবাসা থাকতে নেই, মায়া-মমতা আর শ্রেষ্ঠত্বি থাকতে নেই। আমরা এখন এক কঠিন সত্যের মুখোমুখি আর সেই কঠিন সত্য যুদ্ধ আর মৃত্যুর বাস্তবতা, গোলাবারুদের গুরু, রক্ত আর মৃত্যুর আর্তনাদ। বীভৎসতা আর নিষ্ঠুরতা।

রাত দশটা তখন। বড় ভাই নুরুল হক সবার সাথে হাত মেলালেন। আর একবার চেক আপ করা হলো।

— সবাই রেডি?

— ইয়েস।

— ও. কে, মার্ট অন।

কম্বুনার হিসেবে যুদ্ধযাত্রায় দলের প্রতি প্রথম নির্দেশ আমার। নির্দেশ পেয়ে সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। তারপর ফরোয়ার্ড মার্চ। প্রথমে খলিল, তারপর মতিয়ার, গোলাম গউস, পিন্টু, জব্বার তাই, আহিদার, গোলাম মোস্তফা, শামসুল চৌধুরী, আখতার এবং সব শেষে আমি। তাঁবুর গও ছাড়িয়ে বিওপির পাশ ঘৰে আমরা বড় কাঁচা রাস্তাটায় গিয়ে পড়লাম। এরাস্তা আমাদের নিয়ে যাবে ভেতরগড়—বাংলাদেশে।

সামনে বাংলাদেশ!

পেছনে বাঁদিকের আমগাছের ঘন ছায়ার আড়ালে তাঁবুর তৈরি ক্যাম্প হারিয়ে গেলো। বিওপি মিলিয়ে গেলো আবছা হতে হতে এক সময়। সামনে এখন বাংলাদেশ। আমাদের টানছে যেনো অমোঘ এক নিয়তির মতো। আমরা দশজন হাঁটছি। চুপচাপ। পায়ের নিচেকার ডেজা মাটি শুধু লয় যুক্ত চুপচাপ পদক্ষনির শব্দ তুলে দশজন চলমান মানবের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে।

এসে গেলাম অবশ্যে। দাঁড়ালাম সবাই। সেইনা বহুদিন পর ভালোলাগা আর ভালোবাসার সেই অনেক পরিচিত দেশ-মার শুধুমাত্র আমরা আজ। যেনো কতো যুগ পর নিজেদের অস্তিত্বের সামনাসামনি হুঁচেন। নিজেদের আস্থার মুখোমুখি হওয়া। সামনেই অধিকৃত বাংলাদেশ। আমরাই তামখানে অনুপ্রবেশ করবো বলে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। বিচ্ছিন্ন এক অনুভূতি স্বর্বার মধ্যে সঞ্চারিত। সবার মুখের দিকে আর হাবভাব থেকে সেটা বুঝতে পুরো গেলো। নিজের দেশে পরবাসীর মতো আমাদের চুক্তে হচ্ছে আজ। বিশ্বাস হতে চায় না আমরা আবার কোনেদিন ফিরতে পারবো নিজের দেশে। কিন্তু এটাই এখনকার বাস্তবতা। আজ আমরা চুক্তি মুক্তিযোদ্ধার বেশে। যুদ্ধের জন্য অনুপ্রবেশ করছি। আজ হাতে আমাদের হাতিয়ার, যুদ্ধের কৌশল করায়ত। যুদ্ধের প্রশিক্ষণ মিশে গেছে রঞ্জ-মাংসের সাথে। আজ ১৯৭১-এর ২৮ জুন।

ঘটনাগুলো কতো দ্রুত ঘটে গেলো! অথচ এই তো সেদিন। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউন। পাশবিক হত্যাযজ্ঞ। প্রাণভয়ে সবাই পালাচ্ছে। পলায়নপর মানুষের অগুনতি মিছিল। সারাদেশের মানুষ পৈশাচিক নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার মিছিলে শরিক। শহর থেকে শুরু করে গভীর গ্রামগঞ্জ, সেখান থেকে শুরু করে আরো দূরে একই চিত্র। দেশের ভেতরে মানুষ শুধু পাগলের মতো আশ্রয় খুঁজে ফিরছে। সেই সাথে অন্য আর এক ধরনের মিছিল। সেটা শরণার্থীদের। তারা চলেছে পার্শ্ববর্তী দেশে। যেখানে জীবন অনিচ্ছিত হলেও এখনকার মতো মৃত্যুভয় তাড়া করবে না পেছন থেকে।

দেশ জুড়ে তখন লাশের পর লাশ নিয়ে দিনে-রাতে কুকুর-শোয়ালের টানাটানি। একটা বুলেটে একটা মৃত্যু। বাংলাদেশের মানুষ কত সহজেই লাশ হয়ে যাচ্ছিলো

তখন। লাশে লাশে হয়ে গিয়েছিলো তখন বাংলাদেশের মাঠঘাট, নদী-বন-প্রস্তর। পচে যাছিলো, ফুলে-ফেঁপে যাছিলো, নির্লজ্জের মতো কুকুর-শেয়াল করছিলো টানাটানি। দুর্গঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিলো চারদিকে। মৃত মানুষের পচা মাংসের গক্ষে বাতাস তখন ভারি। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য পালাতে হচ্ছিলো মানুষকে। অজ্ঞাত-অ্যাক্ট পাড়াগাঁও তখন কূলীন হয়ে উঠেছিলো। শহরের অভিজাত চকচকে মানুষের ভিড়ে চাষাভূমো অজ্ঞাত-অবহেলিত গ্রামগুলোর চেহারাও তখন পাল্টে গিয়েছিলো। গ্রামের হাটে-মাঠে-বন্দরে সবখানে নতুন নতুন মানুষজনের উপস্থিতি। গ্রামে বসবাসকারী দূর আঘাজনের কথা যাদের কোনোদিন ভুলেও মনে আসে নি, তারাই এখন আশ্রয়প্রার্থী মানুষজনের একমাত্র ভরসাস্থল। সে এক ভয়ানক সময় তখন।

কিন্তু তারপরও নিরাপদ আর নিশ্চিত হওয়া গেলো না। অনিচ্ছয়তা আর দুশ্চিন্তা ভূতের মতো তাড়া করে ফিরতে লাগলো। তাই সবাই চিন্তাক্রিট আর উদ্বিগ্ন। চারদিক থেকে আসতে থাকে শঙ্কা জাগানো বিক্ষিণু সব খবর। রাতের অঙ্ককারে দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ। দিব্যদিনের বেলায় দূরের কোনো গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে পোড়ানোর পাকিয়ে-ওঠা আকাশচেরা ধোয়া আর বাতাসের সাথে ভেসে আসা পচা লাশের গুৰু, নদীতে ভেসে যাওয়া অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের ফুলে ওঠা মৃতদেহ, যে-কোনো মৃহূর্তে পাকবাহিনীর অতিরিক্ত স্বাক্ষরণের সংজ্ঞাবনা, এসবই তো মাত্র গতকালকের তরতাজা শৃঙ্খল। মানুষজনের স্তুকিত ভয়ভীতি, ঘোরনোছল তরুণী আর যুবতী, ঘরণীদের নিয়ে পরিবারের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে অন্তহীন দুশ্চিন্তা, কোথায় যাবেন, কী করবেন, কোথায় লুকোবেন, সেয়েদের নিয়ে? সে এক ভয়ঙ্কর সময় গেছে। এখনো কি তার শেষ হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ নি।

আর রাতের বেলা? রাতের বেলা নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরা হতো রেডিও সেটে। স্বাধীন স্বত্ত্বপূর্ণে শোনা হতো। ভিড় জমে থাকতো রেডিওর চারপাশ ঘিরে। স্বাধীন বাংলা শেষ হলে বিবিসি, আকাশবাণী আর ভয়েস অব আমেরিকা। তারপরও ত্রুটি হতো না। নতুন আরো খবর জানবার অন্তহীন আকাশফন তাদের অশাস্ত্র করে রাখতো। ভারত কবে স্বীকৃতি দেবে, বিষ্ণু-বিবেক আমাদের এই জীবন-মৃত্যুর সংগ্রামে কীভাবে সাড়া দিছে, সেইসব খবরের জন্য তারা উন্মুখ হয়ে থাকতো।

চারদিকে তখন চাপা গুমোট আর দম-বক্ষ-করা পরিবেশ। বাতাস ভারি হয়ে থাকতো। সময় পেরুতে চাইতো না। সবকিছু থির, নিষ্পাণ। দিনের ভাগটা কোনোরকমে কাটলেও রাত আর কাটতে চাইতো না। রাতের অঙ্ককারে এক সর্বাঙ্গীন ভয় এসে গ্রাস করতো সবাইকে। রাতে টহল দেয়ার ব্যবস্থা হতো। পাহারা দেয়ার জন্য লোক পালা করে জেগে থাকতো। যুবক আর কিশোর ছেলেরা ব্রহ্মকূর্তভাবে পাহারার কাজ ভাগ করে নিতো। ঘরের আনাকেোনাচে টর্চলাইট জ্বালিয়ে তারা এই কাজ করতো। আর যাদের ঘরে সেোমন্ত মেয়ে ছিলো, ছিলো যুবতী বউ, তারা বাড়ির আশপাশের বোপবাড়গুলো ঠিক করে রাখতো, যেনো প্রয়োজনে ওখানে তারা লুকিয়ে থাকতে পারে।

কিন্তু তবুও শেষ বক্ষা হতো না। হাজার সতর্কতার পরও একদিন হায়েনার দল থাবা বিস্তার করে বসতো, প্রবল আক্রমে তারা ঘৌপিয়ে পড়তো নিরন্তর মানুষগুলোর ওপর। তরুণ আর যুবকদের গুলি করে মারতো সকলের সামনেই। লুটরাজ আর ভাঙচুরের তাওব শেষে তারা আগুন লাগিয়ে দিতো বাড়িয়রের পর বাড়িয়রে। পলায়নপর আর লুকিয়ে থাকা যুবতী মেয়েদের ধরে খুঁজে খুঁজে তারা বের করতো আর তাদের ওপর চালাতো পাশবিক অত্যাচার। তাদের কাউকে কাউকে বেছে বেছে ধরে নিয়ে যেতো পাক হায়েনারা তাদের আস্তানায়। এমনি ধ্রংসযজ্ঞ আর অত্যাচার চালানোর পর তারা ফিরে যেতো। কিন্তু ব্রহ্ম পেতনা ভীত-সন্তুষ্ট মানুষেরা। শুধু তাই নয়, আবার পাক হায়েনাদের আক্রমণ হতে পারে, এই ভয়ে চিরকালের আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতো নতুন আশ্রয়ের খোঁজে। এই ছিলো তখনকার প্রতিদিনের দৃশ্য আর ঘটনা। আর এই অবস্থায় দেশ জুড়ে চলতে থাকে আশ্রয়হীন, ভীতসন্তুষ্ট আর ভেঙেপড়া মানুষজনের মিছিল। দেশের ভেতরে জীবনের নিরাপত্তাহীনতার গভীর বোধ নিয়ে সে মিছিল এক সময় পরিণত হয় শরণার্থীদের কাফেলায়। সে কাফেলা এক সময় শেষ হয় ভারতের সীমান্ত পার হওয়ার পর। সীমান্তের কাছেই গড়ে উঠেছে শরণার্থী শিবির। প্রতিদিন মানুষের কাফেলা যদ্বাই বাড়ে, ততোই বাড়তে থাকে শরণার্থী শিবিরের সংখ্যা।

একদিন আমি নিজে এবং যারা আমার অঙ্গীকৰণ সাথি তাদের সকলেই ভিড়ে গিয়েছিলাম সেই ধরনের মিছিলের সাথে। প্রিভিস উদ্দেশ্য ছিলো একটাই। ভারতে যেতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে, অন্ত নিষ্ঠে হবে এবং দেশে ফিরতে হবে সশ্রাবস্থায়। মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ওই হিতাহিতকুম্ভন্যা হায়েনা পালের। প্রতিশোধ নিতে হবে প্রতিটি অত্যাচারের, প্রতিটি মন্তব্য। আবার বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে সবাইকে। দেশকে রক্ষা করতে হবে, দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। আনতে হবে মানুষের মৃত্তি।

আজ সত্ত্বাই ফিরছি দেশে, প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে। তবে খালি হাতে নয়। অন্ত হাতে, গোলাবারুদ সঙ্গে নিয়ে। আর সেই সাথে রয়েছে শক্তকে মোকাবিলা করার মতো ট্রেনিং। গেরিলা ট্রেনিং।

সীমান্ত অতিক্রম

সীমান্ত পোষ্টের কাছে একটা ছোট মতোন লোহার কালভার্ট। সেই কালভার্টটার ওপর এসে দাঁড়াতেই ঘটলো আমাদের যাত্রাবিরতি। প্রচও অস্ত্রির আর উৎকৃষ্টত সকলে। জীবনে প্রথম যুদ্ধে যাওয়ার মতো মানসিক চাপের প্রচও ধ্বনি সামলাতে হচ্ছে সবাইকে। অনেক দিন পর নিজেদের দেশে ঢুকবার একটা আবেগ মথিত মানসিক ব্যাপারও কাজ করছে সকলের মধ্যে। সুতরাং মানসিকভাবে সকলেরই ধাতঙ্গ হওয়ার দরকার। আর এর জন্য প্রয়োজন কিছুটা সময়ের। এই সময়টা আমাদের নিজেদের মুখোমুখি হওয়ার নিজস্ব সময়।

সীমান্ত পোষ্টটার ধার ঘেঁষে বিরাট উঁচু গড়। চারদিকে ঘুটঘুটে অক্ষকার।

অঙ্ককারের ডেতরে কালো একটা উচু দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে গড়টা। বাংলাদেশের সীমানার শুরু এই গড়টা থেকেই। কালভার্টের ওপর তখন আমরা ১০টি অশুরীয়া মূর্তিময় ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে। এবার বাংলাদেশের সীমানায় চুকবার পালা। এটাই এখনকার চরম এবং কঠিন বাস্তবতা।

সবাই 'ফল-ইন'-এ দাঁড়িয়ে। শেষবারের মতো অন্ত এবং গোলাবারুদ পরীক্ষা করে নেয়া হলো। চূড়ান্ত ব্রিফিং শেষে পরিকল্পনা মতো এই ১০জনের বাহিনীকে একত্র করা হলো; প্রথমে মতিয়ার, তারপরে খলিল। ওরা দু'জন ক্ষট, সামনে রেকি করতে করতে এগুবে ওরা। ওদের একজন থাকবে রাস্তার ডান পাশে, একজন বাঁ পাশে, দশ গজ আগু-পিছু করে। মতিয়ার প্রথমে এগিয়ে গিয়ে পজিশন নেবে। সামনে-বাঁয়ে-ডানে যতদূর দৃষ্টি যায়, লক্ষ্য রাখবে। থারাপ কিছু না থাকলে ইশারা দেবে শিস বাজিয়ে। এগিয়ে গিয়ে পজিশন নেবে খলিল মতিয়ারের বাঁ পাশে। তখন মতিয়ার হাতিয়ার তাক করে ধরে বুব সাবধানে সামনে এগিয়ে গিয়ে পজিশন নেবে। খলিল তখন পেছনে পজিশনে থাকা অপেক্ষমাণ দলকে ইশারা দেবে। পেছনের দল এগুবে তখন দু'সারিতে আগুপিছু করে। শার্দুলের দৃষ্টি আর ক্ষিপ্ততা, সেই সাথে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সর্বোচ্চ সতর্কতা কাজ করবে সবার মধ্যে।

পরিকল্পনা অনুসারে সকলেই দাঁড়ালো।

— রেডি?

— ইয়েস।

— মার্চ অন।

গড়ের মাঝখান দিয়ে একটা গজেক্ষতা এবড়োবেবড়ো রাস্তা। সেই রাস্তাটা ধরে এগুলাম আমরা। গাঢ় অঙ্ককারে পাঁচমছম করা অনুভূতি নিয়ে একসময় গড় পার হয়ে ভেতরে চুকলাম। এবং এই সাথে মাটি স্পর্শ করে হামাগুড়ি দেয়ার পজিশনে চলে গেলাম সবাই। সামনে বিত্তীর্ণ সমতল ভূমি। গড় থেকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সামনে এদিকে-ওদিকে কিছু ঘোপঘাড়। ঘন কালো অঙ্ককার জমাট বেঁধে আছে সেখানে। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশ। সেখানে উজ্জ্বল তারার মিছিল। সামনে, আশপাশে, চারদিকের অঙ্ককারে জোনাকির জুলা-নেতা। আর এর ভেতর দিয়েই পথ করে নিয়ে ওদের ছুটোছুটি। বুকের নিচে ভেজা ঘাস আর মাটি। বাংলাদেশের মাটিতে আমরা শুয়ে আছি দশজন এফ-এফ। বাংলাদেশ! আহ! অন্তু এক রোমাঞ্চ আর অনাবিল আনন্দে মনটা ভরে ওঠে।

মতিয়ার আর খলিল সামনের দিকটা রেকি করতে গেলো। বাংলাদেশের মাটি বুক দিয়ে অলিঙ্গন করে আমরা তেমনি শুয়ে রইলাম। কেনো যেনো, সেই মুহূর্তে আমার নিজের মনে পড়লো বাড়ির কথা। রংপুর শহরের সেই বাড়িতে এখন যারা আছে, তারা হয়তো ভাবতেও পারছে না, আমি এখন কোথায়, কীভাবে আছি, কে জানে একথা কোনোদিন ওরা আদৌ জানতে পারবে কি না!

খলিল ফিরে এসে ইশারা করতেই আমরা উঠে দাঁড়ালাম। রাস্তা পরিষ্কার। মতিয়ার সামনে তখনে পজিশনে। ভেতরগড়ের সোজা রাস্তাটা ধরে এগুতে লাগলাম

আমরা। মতিয়ার সামনে ভালে, খলিল পেছনে, রাস্তার বাঁ দিয়ে এগুচ্ছে। পেছনে আমরা। কিছুদূর এগুনোর পর রাস্তার দু' পাশে মুখ করে আমরা শোয়া অবস্থায় পজিশনে যাচ্ছি। সামনে ওরা দু'জন রেকি করছে। ওদের ইশারা পাওয়া মাত্র দাঁড়িয়ে উঠে আবার এগুতে থাকি। মতিয়ার-খলিলের ঠিক পেছনেই আমি। আমার পাশেই পিন্টু, তারপর অন্যরা। জব্বার ভাই সকলের পেছনে।

রাস্তাঘাট আমরা কিছুই চিনি না। এখানকার লোকদের জানি না। রাস্তার বাঁকে বাঁকে কোনো মৃত্যু ফাঁদ পাতা আছে কি-না, তা-ও অজানা। তবুও এগিয়ে যেতে হবে। রাস্তা একটা বের করতেই হবে। এখানকার লোকদের জানতে হবে। তাদের সাথে মিশতে হবে। তাদের বন্ধুত্বের হাত নাগালের মধ্যে পেলে সেটা হবে আমাদের জন্য প্রাথমিকভাবে একটা বিরাট বিজয়ের মতো। আর ধীরে ধীরে ওদের সহায়তা আর বিশ্বাস অর্জন করতে পারলেই এ এলাকাটা আমাদের নির্ভয় বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হবে। তখন সহজ হয়ে আসবে সবকিছুই।

উচু দেয়াল ঘেরা মতো একটা জায়গা পার হতেই হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠতে হলো। মনে হলো পেছন থেকে শৌ গৌ শব্দ তুলে কয়েকটা লরি আসছে এবং সেগুলো এসে পৌছেছে প্রায় পেছন দিয়ে একেবারে স্মার্ডের ওপর। হঠাৎ করেই একটা ভ্যাবাচ্যাকা খাবার মতো অবস্থা। ইত্তত নিষিঙ্গভাবে সবাই পজিশনে চলে গেলাম। সবকিছু যেনে এলোমেলো হয়ে গেলো। এই বিপদটা সামনে দিয়ে আসবার কথা, সেটা যে পেছন দিক থেকে আসবে নিষিঙ্গ কারুর ভাবনাতে আসে নি। তাই রাস্তার নিচেকার খাদ্যটায় দ্রুত অবস্থান করে আমরা অধীর উদ্দেশ্যনায় নিজেদের হৎপিণের ছটফটানি শুনতে থাকলাম।

কিন্তু না। শক্র নয়, কেমনে বিপদও নয়। সীমান্তের ওপার দিয়ে ভারতীয় সামরিক লরির চলমান কনচুন স্থানের বেলা অনেক দূরের শব্দও কাছের বলে মনে হয়। সীমান্তের কাছ দিয়ে যাতের অঙ্ককারের আড়াল নিয়ে সামরিক লরি চলাচল করছে। এক সময় লরির শব্দ মিলিয়ে যায়। সারা শরীর ঘায়ে ভিজে গেছে। এই অবস্থায় গা ছাড়া দিয়ে উঠি। অক্কারে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা এবং তার মোকাবিলা প্রতীক্ষার, যদিও সেটা ভুল প্রমাণিত হলো, তার ভেতর দিয়েই হয়ে গেলো আমাদের একটা সফল মহড়া। প্রশিক্ষণ শিবির থেকে শিখে আসা বিদ্যা সফলভাবেই কাজে লাগলো সবাই।

রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম আমরা আগের মতোই। মতিয়ার-খলিল আগে আগে চলতে থাকলো। আমরা পেছনে। এবার আর রেকি করে পজিশন নিয়ে এগুনো নয়। সোজাসুজি এগিয়ে চলা। আমাদের যেতে হবে অনেক দূর। কাজ করতে হবে অনেক। সুতরাং, চোখ-কান খোলা রেখে চলার নির্দেশ দিলাম সবাইকে।

একসময় এইভাবে জনবিরল সীমান্ত এলাকা পার হয়ে বুরাতে পারলাম, আমরা ধীরে ধীরে লোকালয়ে চুকচি। দু'একটা ছাড়া ছাড়া বাড়িয়র, তবে মনে হলো, জনমানবহীন। আরো বেশকিছুটা পথ বিনা বাধাতেই এগুনো গেলো। এবার হঠাৎ করেই মনে হলো, না, এলাকাটা জনবিরল নয়। আর কিছুটা দূর এগুতেই ধীরে ধীরে

প্রাণের সাড়া কানের পর্দায় বেজে উঠলো । ক্রমশ সেটা আরো জোরদার হতে লাগলো । মনে হলো, সামনের এবং আশপাশের গ্রামের লোকজনদের কেউই বুঝি ঘুমোয় নি । দূর থেকে একদল লোক চিংকার করে উঠছে, সে চিংকারে সাড়া দিছে পাশের গ্রাম । তারপর আর এক গ্রাম । সেই গ্রাম থেকে দূরের অন্য গ্রাম । এভাবে রাত জাগরণের চিংকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় জাগরণের চিংকার মুহূর্তে আমাদের শিহরিত করে তুললো । ডান দিকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে অমরখানায় শক্রবাহিনীর একটানা মেশিনগানের গুলিবর্ষণ, আর মাঝে মাঝে দিগন্ত কাঁপানো কামানের শেল ফাটানোর শব্দ, আর তার মধ্যেই নিজেদের রক্ষা করার জন্য মানুজনের সচেষ্ট জাগরণ । সত্যিই এ এক নিরাকৃশ অভিজ্ঞতা । একদিকে মৃত্যুর ভয়ল তাওব, আর তার ভেতরেই বেঁচে থাকবার স্বাভাবিক আকৃতি থেকে সতর্ক জাগরণ ; বর্ণনাতীত কেমন একটা অনুভূতিতে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায় । যা প্রকাশের কোনো খুঁজে ভাষা পাওয়া যায় না ।

অবশেষে, মহারাজ হাটে পৌছুনো গেলো । গতকাল এখান থেকে জবাবার ভাই তার দলবল নিয়ে ফিরে গেছেন । এখানে এসে ঢেখে পড়লো, একটা প্রকাও প্রাচীন বটগাছ । তার অসংখ্য কাও : ডালপালার নিবিড়তা অসমীয়া-শ্রাবণ বিস্তার সমন্বয়ে বাজারটাকে যেনো ঢেকে রেখেছে । পাশেই মহারাজ দিঘি । দেখবার মতোই । বিরাট তার আকার । চারদিকে উচু পাড় । কয়েকটা ঝোটে ঝুপড়ি দোকান । চালার ঘর । পাশে একটা টিনের একচলা ছাউলি প্রবেশ মসজিদ । চারদিকে ছড়িয়েছিটিরে ঝোঁজা হলো । না, কোনো মানুজনের অন্তর্ভুক্ত নেই । বাজারের চারদিকে সেন্ট্রি বিসিয়ে আমরা একটা ঝুপড়ির নিচে বসলে পুরবর্তী সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য । ফিসফিসিয়ে নিচু হৰে চলতে লাগলো সে অঙ্গুলী । জবাবার ভাই বললেন, এখান থেকে আর এগুবার উপায় নেই । কিন্তু পিন্টু জন্মার ভাইকে থামিয়ে দিয়ে বললো, দেখাই যাক না ।

হঠাতে চমকে উঠতে হলো । দলের সবাই হতচকিত হয়ে চলে গেলো পজিশনে । ঠিক আমাদের সামনের রাস্তার বাঁকটায় যে বাঁশবাড়, তার তলা থেকে এক সাথে বেশ কটা কষ্ট চিংকার করে উঠলো, ‘বন্তি জাগো-ও-ও’ । সেই চিংকারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তরঙ্গ তুলে বাজতে লাগলো নিষ্কর্ষ চরাচর জুড়ে, ধারে কাছে, দূর থেকে বহুদূর পর্যন্ত । তাই ধাতব্ব হতে সময় লাগলো । বটগাছ আর রাতের ঘন জমাট অঙ্ককারের সাথে মিশে গিয়ে আমরা বসে থাকলাম নিঃস্বাড়, চুপচাপ । উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, লোকগুলো দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করলো নিজেদের মধ্যে । তারপর আবার তাদের মিলিত চিংকার জেপে উঠলো আর তা আগের মতোই ছড়িয়ে গেলো দূর থেকে বহুদূরে । শেষে ফিরে গেলো ওরা ।

সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত । একটা পথ বের করা দরকার । মাথার মধ্যে অস্ত্র ভাবনার জট । সামনে এগুবার একটা উপায় বের করতেই হবে । বাঁ-দিক দিয়ে এগুনো সঙ্গব নয় । দিঘির উচু পাড় ঘেঁষে ঘন জনবসতি । সামনে বিস্তুর ঝোপবাড় আর ধানক্ষেত । ডান পাশের রাস্তা ধরে যেটা দিয়ে লোকগুলো এসেছিলো, এগুতে হলে,

সেটাকেই বেছে নিতে হয়। এছাড়া অন্য আর কোনো উপায় নেই। ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা, মতান্তর। অবশ্যে সিদ্ধান্ত হলো: এগুলে হবে এই রাস্তা ধরেই, যেটা দিয়ে আমরা এতোদূর পর্যন্ত এসেছি, যার বুক বেয়ে কিছুক্ষণ আগে একদল লোক এসে জাগরণী চিক্কারে চরাচর কাঁপিয়ে এইমাত্র অদৃশ্য হয়ে গেলো।

নিজেদের মানুষ

আমরা চারজন এগুচ্ছি। আমার সাথে রয়েছে খলিল, মতিয়ার আর গোলাম গড়স। সবার হাতেই হাতিয়ার। ট্রিগারে আঙ্গুল। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। পরিস্থিতি যা-ই হোক, তড়িৎ গতিতে তা মোকাবিলা করার সজাগ প্রস্তুতি সবার মধ্যে। জব্বার ভাইসহ পিন্টু ওঁ পেতে থাকলো বটের ছায়ায়। যে-কোনো পরিস্থিতির মুখে এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার প্রস্তুতি নিয়ে।

কাঁধে ঝোলানো টেনগান বুক সোজা সামনের দিকে তাক করে ধরে ঘন নিকষ কালো বাঁশঝাড়টা পার হলাম। সামনে অঙ্ককার, কিছুই দেখা যায় না। কেবল ভরসা পায়ের নিচেকার রাস্তাটা। সে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে, কে জানে!

কিন্তু বাঁশতলাটা পেরতেই একেবারে সেই ওদের ঝোমুখি পড়ে গেলাম। মাত্র আট দশ গজের ব্যবধানে এখন ওরা। সেই লোকগুলো, যারা কিছুক্ষণ আগে বাঁশতলাটায় গিয়ে বস্তি জাগার ডাক দিয়েছিলো—কিন্তু কে এই লোকগুলো? কী তাদের পরিচয়? মনের গভীরে তড়িৎ জেগে উঠে সন্দেহ আর শঙ্কার চেউ। তাই চট করে রাস্তার বাঁ পাশের গলা সমান উচ্চ ঝোলুকেতটায় গিয়ে পজিশনে চলে গেলাম। দেড় মাসের সেই কটকের গেরিলা হোল্ডিং চমৎকারভাবে কাজ দিলো। লোকগুলো আমাদের অস্তিত্ব টের পায় নি।

ভূটা ক্ষেত্রের ভিজে ঝাঁক্কিস্তে মাটিতে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে আছি এখন। মুখ রাস্তার দিকে। এই অবস্থাটি দেখলাম, এবার লোকগুলো এসে দাঁড়ালো একেবারে আমাদের নাক বরাবর সামনে। আর ঠিক সেই সময়টাতেই শুরু হলো অমরখানায় শেলিং বুম-বুম-বুম... একটার পর একটা। চরাচর কাঁপিয়ে ফাটতে লাগলো সেগুলো। আর সেই শব্দের ভয়ঙ্করতা সচকিত করে তুললো সবাইকে। বুকের নিচেকার মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগলো। চারদিকের গাঢ় অঙ্ককার আরো বিভীষিকাময় হয়ে উঠলো। ধীতব অঙ্গগুলো শরীরের সাথে একাত্ম করে নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকা আমরা চার যুবক। হৃৎপিণ্ডে আতঙ্ক আর শিহরণ নিয়ে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! আমাদের সামনের দাঁড়ালো লোকগুলো কিন্তু এককম ভীতিকর পরিস্থিতিতেও পুরোপুরি থির। দিগন্ত কাপানো কামান দাগানোর শব্দের ভেতরে ওরা অচঙ্গল। নড়চড় নেই কোনো। 'বস্তি জাগো-ও-ও' উচ্চারণময় জাগরণী ঝন্নি তাঁদের মুখ থেকে বের হলো না এবার। ওরা শুধু দাঁড়িয়ে থাকলো। উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো কামানের গোলার্বর্ষণের শব্দ। এক সময় শেলিং-এর তাওবীলার অবসান হলো। আর তারপরই শুনলাম গভীর ক্ষেত্রের সাথে আকাশের দিকে মুখ তুলে ওদের একজন বলছে, 'খোদ কবে এ আজাব শেষ হবে, কবে তুমি আজরাইলদের হাত

থেকে বাঁচাবে আমাদের?

লোকটার স্পষ্ট দীর্ঘস্থাসও আমাদের কানে এলো। আর তখনি আপনা থেকেই মন বলে উঠলো, এরা তো আমাদেরই লোক! এদের জন্যই তো আমাদের যুক্ত, নিজেদের উৎসর্গ করার প্রস্তুতি! এরাই তো সেই লোক, যাদের আমরা খুজছি। “জনগণের ভেতরে থেকে জনগণকে দিয়ে যুক্ত করার” গেরিলা যুদ্ধের যে তত্ত্ব, সেই তত্ত্বে উল্লেখ করা জনগণ তো এরাই। সুতরাং, শুরু করা যাক এদের দিয়েই।

লোকগুলোর জটিলা সরে গেলো। আমরা উঠে দাঁড়ালাম। দ্রুত চলে এলাম মহারাজ হাটে অপেক্ষমাণ আমাদের বক্ষুদের কাছে। ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো। আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, লোকগুলো আমাদের শক্ত নয়, মিত্র। তাই আর দেরি নয়, এবার ওঠা যাক। চলো ওদের মুখোযুবি হই। ফলো আপ।

রেকিতে যাওয়া আমরা চারজন আগে। দলের অন্য সদস্যরা পেছনে। সবধরনের বিধাবন্দু আর জড়তা বেড়ে ফেলে পা টিপে-টিপে এবার শব্দহীন এগুতে থাকলাম। স্টেনগান হাতে সামনে আমি নিজে। পেছনে, আমার প্রায় গা ঘেষে গোলাম গউস। চারদিকে নিকষ কালো অঙ্ককার। রাত্তার পাশের বৌপোড় থেকে ভেসে আসা বিঁকি পোকাদের একটানা কোরাস। পাশাপাশি অমরখানা থেকে ভেসে আসা মেশিনগানের অবিরাম ত্রাশের শব্দ। মাঝে মাঝে কামানের গর্জন করে রকম অবস্থায় ছায়ামূর্তির মতোই আমরা হঠাৎ করে আবির্ভূত হলাম নেমেলোর মুখোযুবি। হাতে উদ্যত হাতিয়ার, ট্রিগারে আঙুল, চোখে তীক্ষ্ণতা আর স্বিচ্ছেন্নের তত্ত্বাতে হাজার তানের বীণা।

— এই যে শোনেন, রাতের অঙ্কুরে চিরে চিরে আমার গভীর কঠ ভেসে গেলো লোকগুলোর দিকে। তারপরেই সিদ্ধেশের সুরে বলি, আপনারা যে যেখানে আছেন, নড়বেন না। আপনাদের প্রতির অঙ্গুলো ফেলে দিন। টর্চ জ্বালবেন না। ভয়ের কোনো কারণ নেই।

লোকগুলো যেনো ঘট্টার আকস্মিকতায় মুহূর্তেই স্থবির হয়ে গেলো। নড়লো না। স্থির পাষাণবৎ হয়ে গেলো। তাই দেখে আবার বলি, আমরা আপনাদের শক্ত নই, বৰু। আমরা মুক্তিফৌজ।

— মুক্তিফৌজ—মুক্তিফৌজ—মুক্তি..., একটা গুঞ্জন ধৰ্মি উঠলো ওদের মধ্যে। অঙ্ককারের ভেতরে ছায়াঞ্জলি নড়ে উঠলো আবার ওরা। ততক্ষণে পেছন থেকে পিন্ডু আর জব্বার ভাই তাদের দলসহ পৌছে গেছে। আমরা এগিয়ে গোলাম লোকগুলোর দিকে। তারাও এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। তারপর এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা। এলোমেলোভাবে দৌড়ে এলো ওরা। ছেলে-যুবক-বৃন্দ সবাই উষ্ণ অলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলো আমাদের। আর কাদতে লাগলো, প্রায় সবাই—হাউয়াউ করে।

— বাবা, আপনেরা আইছেন, এক প্রবীণ শৃঙ্খলাভিত্তি মানুষ তার বুকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কঢ়ে, আবেগ মথিত ভাষায় একটানা বলে যেতে লাগলো, বাবারা, আপনেরা আইছেন! আপনাগো লাগি আমরা কতোদিন অপেক্ষা করতে আছিলাম, আপনেরা আইছেন, বাপজানেরা আমার, এবার আমরা বাঁচমু, হাসমু।

আসেন বাপেরা, বসেন।

প্রবীণ ব্যক্তি রাস্তার ধারের বাড়িটায় আমাদের নিয়ে গেলেন। রাস্তার দু'পাশে সেন্ট্রি দাঁড় করিয়ে আমরা বাড়ির সামনেকার উঠোনের মাটির ওপরেই বসে পড়লাম। ভৌষংগ সাবধানী মানুষগুলো। আমাদের সাথে ক'জন থেকে বাকি সবাই রাস্তার ওপরে চলে গেলো। টহল দিতে লাগলো আগের মতো করেই। সেই জাগরণী চিৎকার খনিত হতে লাগলো ঘন ঘন। তার প্রতিউত্তরও আসতে লাগলো আশপাশের গ্রামের জেগে থাকা মানুষজনের কাছ থেকে। ওদিকে অমরখানা থেকে আরো কয়েক দফা কামানের গর্জন ভোসে এলো। মেশিনগানের একটানা শব্দও।

আমরা এখন মুখোয়াখি মাটিতে বসে। ওই লোকগুলোর সঙ্গেই। ওদের ভেতর থেকে প্রবীণ সেই ব্যক্তি ছটফট করছেন, কী করবেন না করবেন ঠিক যেনো বুঝে উঠতে পারছেন না।

যাই হোক আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যে পৌছুতে পেরেছি। মিত্র খুঁজে পেয়েছি। এরা আমাদের লোক। প্রস্তুত হয়েই ছিলো আমাদের আগমনের অপেক্ষায়। এদের ভেতরে থেকে এদের সঙ্গে নিয়েই আমরা এগিয়ে যাবো আমাদের লক্ষ্যের দিকে। মন বলে উঠলো, মেজের শংকর, ভূমি দেখো, আমরা ঠিকই ফিরে আসবো আমাদের নিজেদের দেশে।

কিছুক্ষণ আলোচনা, তারপর সিদ্ধান্ত।

— রেডি?

— হ্যা

— কে যাবে আমাদের সাথে?

— আমি, মকতু মিয়া।

এবার আমি উঠে দাঁড়ান্ম। আমার সাথে জব্বার ভাই, গোলাম গউস, মতিয়ার আর খলিল। পিন্টুর নেতৃত্বে পাঁচজন। ওরা রইলো এখানে। যে-কোনো বিপদের মুখে আমাদের সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে যাবে ওরা। বিপদে পড়লে সিগনাল হবে একটা রাইফেলের ফাঁকা গুলির আওয়াজ।

— লেট আস মুভ।

— ইয়েস।

২৮.৬.৭১

গাইড মকতু মিয়া

মকতু মিয়া আগে আগে। আমরা তার পেছনে থেকে দ্রুত অনুসরণ করছি তাকে। লোকটা হাঁটছে না, যেনো বাতাসের বেগে ছুটে চলেছে। এইভাবে কিছুদূর এগিয়ে রাস্তা ছেড়ে আমরা কোমর সমান একটা ধানক্ষেতের ভেতরে নেমে পড়লাম। ধানক্ষেত অতিক্রম করার পর চুকলাম মাথা ছাপিয়ে ওঠা একটা কাশবনে। দু'হাতে কাশবন সরাতে সরাতে এগুতে লাগলাম আমরা। সেটা শেষ হলো একটা উঁচু গড়ে এসে। গড় পার হয়ে আবার ধানক্ষেত, উঁচু উঁচু মাটির টিবি, এবড়োথেবড়ো পিছল কাদাময় মাটি।

মকতু মিয়াকে সামনে রেখে আমরা শুধু এগুচ্ছি। কোনো প্রশ্ন নেই। হাতে হাতিয়ার। নিজেদের সজাগ রেখে কেবল এগিয়ে চলা। পেরিয়ে যাওয়া ফসলের মাঠ, বোপঝাড়, এবড়োবেবড়ো অসমতল প্রান্তর। এগুচ্ছ যতোটা সম্ভব দ্রুত। তবে নিঃশব্দে। মকতু মিয়ার নিদেশিত পথ ধরে। ওর বিষ্ণুষ্টতার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে।

মকতু মিয়া, আমাদের প্রথম গাইড। আমরা বলতাম গাইডার।

— আর কতদূর মকতু মিয়া? অনেকক্ষণ এগুবার পর প্রথম জিজ্ঞাসা।

— এই তো সামনে। মকতু মিয়ার সংক্ষিপ্ত জবাব।

এবার একটা পায়ে চলা থাহের রাস্তা। একটার পর একটা বাঁক পেরিয়ে গেলাম। কখনও ডালে, কখনও বাঁয়ে, কখনও সোজা। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর একটা জায়গায় এসে মকতু দাঁড়িয়ে পড়লো।

— কী হলো মকতু মিয়া?

— স্যার, সামনের বাড়ি কয়টার লোকজন দালাল। একটু সাবধানে আসতে হবে।

মকতু মিয়ার দিকে এতোক্ষণ পর একটু ভালো করে তাকালাম। দেখলাম, বেটেখাটো শক্ত গড়নের মানুষ। গায়ের রঙ কালো। কাতের অঙ্ককারেও তার মুখে একটা ভয়হীন হাসির রেশ। চমৎকার শাদা দাঁতের পুরু। না, এ লোককে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। ওকে এগুতে বললাম। জায়গাটা পার হলাম। বাড়ি কটাকে ঢিনে রাখলাম। লোকজনের সাড়ে পঞ্চাশ। শুধু একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলের কঁকিয়ে কঁকিয়ে কানার শব্দ পেলাম। মকতু মিয়া এবার থামলো। তাকালো আমাদের দিকে।

— এসে গেছি স্যার।

বসলাম সবাই। মকতু সবসতে বললাম।

— সামনের ওই খেপটার ওপারেই ব্রিজ, মকতুর দাঁত সেই অঙ্ককারে চিকচিকিয়ে ওঠে। হাসছে সে।

— এগুনো যাবে মকতু?

— বোধহয় যাবে, দেইখা আসি, যামু? উৎসাহে টগবগ করছে মকতু। কিন্তু মকতুকে ছাড়তে চাই না। শক্রকবলিত এ লোকায় মকতুকে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হবে না। ওকে আমাদের বিশ্বাসের আওতায় আনতে এখনও অনেক সময়ের দরকার।

— না, তুমি একা যাবে না, বলেই প্রশ্ন করি, খানেরা আছে নাকি মকতু?

— বোধহয় না। রাতের বেলা ওরা থাকে না। কেবল দিনে এসে ঘুরে যায়।

— তুমি জানো?

— হ স্যার।

— কেমন করে জানো?

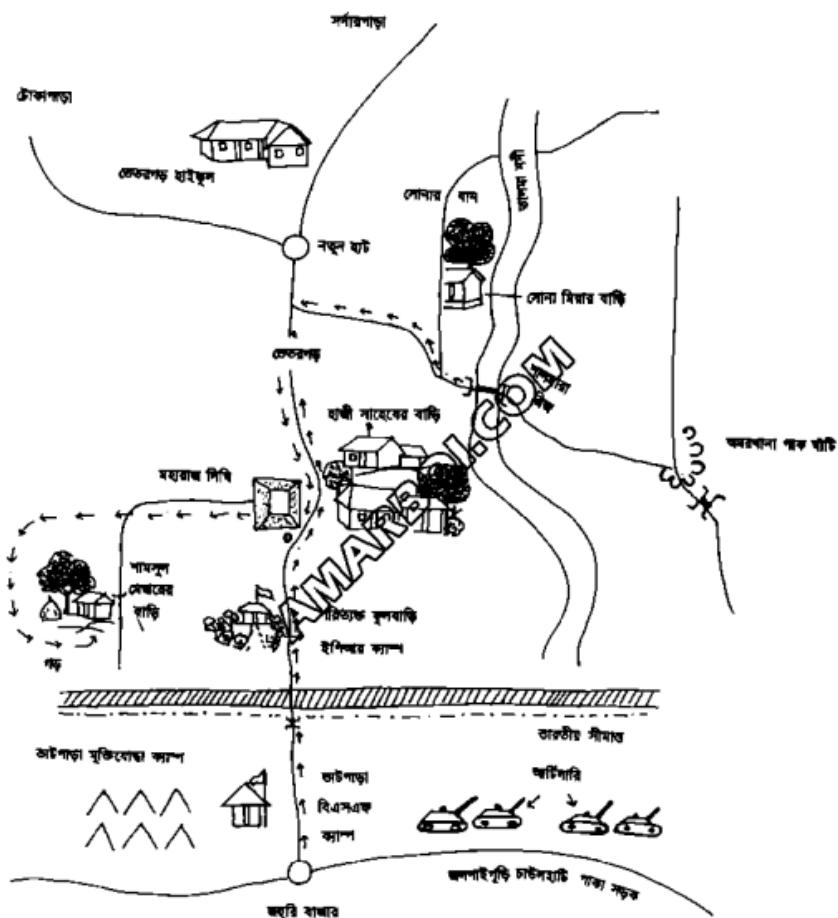
মকতু এ কথার উত্তর দেয় না। কেবল চুপচাপ থাকে কিছুক্ষণ। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরিবেশটা আঁচ করে নেয়। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

— লন ছার উঠেন।

প্রথম অগ্রয়েশন

১৮ জুন '৭১

(কেরাণ হাট)



মকতুকে এ মূহূর্তে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ওর নির্দেশিত পথে এগুনো ছাড়া গত্যন্তর নেই। সুতরাং প্রচও অস্থিরতা নিয়ে উঠে দাঢ়ালাম। সঙ্গী-সহযোগিদেরকেও উঠতে বললাম। রাস্তা ছেড়ে শর্টকাট পথে আসতে গিয়ে মকতু মিয়া যেভাবে আমাদের জলা, খালবিল আর এবড়োবেবড়ো, উচুনিচু প্রান্তর দিয়ে নিয়ে এসেছে, তাতে করে সবাই ঝাল্ট আর বিধ্বস্ত, কিন্তু উপায় নেই। সামনে অনেক কাজ।

যুদ্ধে প্রথম সফলতা

ঠিক হলো, মতিয়ার আর আমি ব্রিজে উঠবো। মকতু থাকবে মাঝ বরাবর। ওর পেছনে থাকবে গোলাম গউস, খলিল আর জব্বার ভাই।

— রেডি?

— ইয়েস।

— লেট্‌স মুভ, আজ্ঞা ভরসা।

ব্রিজের মাথায় এসে পৌছুলাম বিনা বাধায়। এপারে কেউ নেই। লোহার রেলিং দেয়া মজবুত ব্রিজ। ব্রিটিশ আমলের তৈরি। কাঠের পাটাতন, মোটা কাঠের পিলার। নিচে তালমা নদীর তরঙ্গিত চলমান প্রবাহ। ডান পাশে ঝালুর চোরা, অঙ্ককারেও শাদা ধূবধূ হয়ে আছে। নদীর দু'পাশে খাড়া পাড়। ঘন-ঝুঁঝু আর ঝোপঝাড়। ব্রিজটা রেকি করতে হবে। দু'দিন পরেই হ্যাতো এটা ভুজির দেয়ার দায়িত্ব দেবেন মেজের শংকর। তাই এর অবস্থান ভালোভাবে দেখে নিহিত বলেছেন তিনি। আজ আমাদের এটাই প্রথম কাজ।

ব্রিজের মাথায় রাস্তার দু'ধার জড়ে আমাদের অবস্থান। মতিয়ারকে ইশারা দিয়ে আমি উঠে দাঢ়ালাম। ব্রিজের প্রথম পাটাতনে পা রাখলাম। তারপর অনেকটা ভাবলেশ আর অনুভূতিশূন্য অবস্থায় এগিয়ে গেলাম খানিকটা দূর। শুয়ে পড়লাম কাঠের পাটাতনের ওপর। পেছন থেকে মতিয়ার এলো একইভাবে। সামনে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে সেও পজিশনে চলে গেলো। এবার আমি উঠলাম। বেশ বড় ব্রিজ। লম্বায় ৫০ থেকে ৬০ ফুটের মতো। চওড়ায় প্রায় ১২ ফুট। আমরা হিসেব করে করে এগুচ্ছি। অঙ্কের ছক অনুযায়ী। এগুবার সময় কাঠের পাটাতনগুলো একেকবার শব্দ করে উঠে আবার থেমে যাচ্ছে। নিচে প্রবাহিত নদীর ছলাং ছলাং শব্দ। এইভাবে সন্তুর্পণে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের মাঝ বরাবর পার হয়ে এলাম। এবার ওপারটা দৃশ্যমান হলো। ব্রিজের দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড়। ওপারে কেউ ওঁ পেতে আছে কিনা জানি না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি এক বাঁক জুলত বুলেট ছুটে এলো বুকখানা বাঁকবারা করে দিতে। বুটিয়ে পড়ছে একের পর এক আমাদের প্রাণহীন দেহ পাটাতনের ওপর। এই অবস্থায় শুনতে পেলাম বুকের টিপ্পিচ্চ শব্দ। হাতুড়ি পেটানোর মতো। নিষ্কাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

আর সামান্য পথ এবং সেটাও শেষ হয়ে এলো এক সময়। ওপারে পা রাখলাম প্রথমে আমি। দ্রুত ক্রিলিং করে ডান দিকে সরে গিয়ে পজিশন নিলাম। ইশারা পেয়ে মতিয়ারও এলো একইভাবে। ওকে পজিশন নিতে বললাম বাঁ ধারে। তারপর বেশ

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। অমরখানা থেকেও কোনো কামানের গর্জন বা মেশিনগানের শব্দ নেই, এই মুহূর্তে। চারদিকে নিকষ কালো অঙ্ককার। মৃত্যুর হিম নিষ্ঠকতা চরাচর জুড়ে। আমরা দুই সৈনিক নিঃসাড় নিঃকৃপ শুয়ে আছি ভেজা ঘাসের সাথে বুক লাগিয়ে। মাঝেমধ্যে মাথা তুলে সন্তর্পণে দেখবার, সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে অনুভব করবার চেষ্টা করছি অন্য কারোও অবস্থান, অন্য কোনো কিছুর সত্ত্বিভূত কিংবা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত।

না, নেই। মতিয়ারকে পজিশনে থাকতে বলে উঠে দাঁড়ালাম। এবার সোজাসুজি হেঁটে চলে এলাম অপেক্ষমাণ বকুদের কাছে। তারপর আগুপিছু করে সবাই ত্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে এপারে এসে দাঁড়ালাম। মতিয়ার তখন উঠে দাঁড়ালো। অমরখানা ও ভেতরগড়ের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র এই সড়ক, তালমা নদীর ওপরকার এই শালমারা ত্রিজ আমাদের দখলে এসে গেলো বিনা বাধায়। আমাদের প্রথম এ্যাসাইনমেন্ট বা দায়িত্ব সম্পন্ন হলো। জববার ভাই ও গোলাম গউস ১০ মিনিটের মধ্যেই ত্রিজটা রেকি করে ফেললো। খলিল আর মতিয়ার ত্রিজের নিচে নেমে গিয়ে কাঠের পিলারগুলোর মাপ এবং মোট সংখ্যা গুণে ফিলে এলো। এখানকার কাজ আপাতত শেষ। এবার ফিরে চলা। সামনে শুরু হবে হিন্দুজী কাজের পালা।

ফিরবার পথে দেখলাম সবারই মন প্রসন্নতামুছে। মকতু মিয়ার মুখ সাফল্যের হাসিতে উজ্জ্বল।

— এবার কিন্তু রাস্তা দিয়ে নিয়ে আবে মকতু মিয়া, যে পথ দিয়ে এনেছো, সেদিকে আর নয়, আমি বললাম।

— হ' ঠিক আছে, লন পা টেলান, মকতু তার স্বাভাবিক গতিতে পা চালায়। আমরা প্রায় দৌড়তে দৌড়তে খালির হই ওর ধারমান গতির সঙ্গে। রাস্তায় কোনো বিপদ হলো না। নিশাচর স্তুনুষ মকতু মিয়া গাইড হিসেবে আমাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে গেলো।

আমরা ফিরে এলাম। আমরা ফিরাই না দেখে পিন্টুসহ অন্যরা ততোক্ষণে আস্তির হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে ঘন্টা দুয়েক গড়িয়ে গেছে। ওরা নিশ্চিত ধারণা করে বসেছিলো, আমরা নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়েছি। আর সেই ফাঁকে ওরা এ্যাডভাস করার প্রস্তুতি ও সম্পন্ন করে ফেলেছে। রওয়ানা দেবে, এমন সময় আমরা এসে পৌছুলাম। বুকের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে জড়িয়ে ধরলো ওরা আমাদের। তারপর কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম।

বয়েস প্রবীণ তিনি। হাজি সাহেব। আমাদের জন্য সামান্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এই মধ্যরাতেই, চিঠ্ঠে ভাজা আর গরম চা। চিনির আকাল, তাই গুড় দিয়েই বানানো হয়েছে সেই চা। নির্দেশ ছিলো, অপারেশনে অজানা কোথাও কোনো কিছু খাওয়া চলবে না। কিন্তু বৃক্ষ হাজি সাহেবের আন্তরিকতার টান এড়ানো গেলো না। প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রমের পর তেজপাতার সুগন্ধময় গুড়ের চা অস্ত সমান মনে হলো। সমস্ত ক্লান্তি মুহূর্তখালেকের ভেতরে কোথায় যেনো দূর হয়ে গেলো।

এবার দ্বিতীয় অপারেশন। টাগেট সোনারবান গ্রামের পাকবাহিনীর দালাল সোনা মিয়া। তার বাড়িতা ঘেনেড মেরে উড়িয়ে দিতে হবে। মকতু মিয়া এবারও গাইড। কিন্তু রওনা দেয়ার মুখে মকতু মিয়া একটুক্ষণ দাঢ়ানোর অনুরোধ করে তার লোকজনের কাছে গেলো একটা কিছু পরামর্শের জন্য। ফিরে এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। ফিরে আসবার পর তার মধ্যে, বিশেষ করে কথাবার্তার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠলো কেমন যেনো একটা দেনোয়োমো ভাব। তবে বিনয়ের অভাব লক্ষ্য করা গেলো না।

— স্যার, একটা কথা।

— কী কথা মকতু মিয়া?

— সোনা মিয়া মুসলিম লীগ করলেও আসলে খুব ভালো লোক, কারো ক্ষতি করে নাই। আর এখন সে মুসলিম লীগও ছাইড়া দিছে, পাটিফাটি করে না। শান্তি কমিটি ও হয় নাই। দালাল নয়, তেনার জন্যই আমরা এখন তরি এই হানে থাকতে পারতেছি। কথাগুলো গড়গড় করে বলেই মকতু মিয়া থামে। সবার মুখের দিকে চায়। যেনো সে সোনা মিয়ার জীবন ভিক্ষা চাইছে, এমন একটা স্পষ্ট আকৃতি তার চাউনিতে। দোহাই স্যার, ওনাকে মারবেন না।

প্রবীণ ব্যক্তি হাজি সাহেবও পেছন থেকে এসে আকতিভরা কঠে আমার হাত জড়িয়ে ধরেন। তার পেছনে অন্য আরো ক'জন। অন্যেও ওই একই অনুরোধ। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে হলো। ব্যাপারটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হলো। আমরা আমার প্রচেরে বদল করলাম।

কৃত্যাত দালাল শামসুল মেঝারের একটা আমাদের টাগেট। আমরা সেদিকেই যাচ্ছি এখন। শামসুল মেঝারের বাড়িতে আস্তে চার্জ করে সম্পন্ন করতে হবে আমাদের অপারেশন। এবার অন্য রাস্তা ধরে এগুচ্ছি আমরা। গাইড মকতু মিয়া। তার সেই নিজস্ব গতিতে আগে আগে যাচ্ছে। আমরা দ্রুত তার সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছি পেছনে পেছনে। এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে আবার এসে পৌছুলাম সেই মহারাজ হাটে। সেই হাট অতিক্রম করে আমরা অবশ্যে এলাম মহারাজ দিঘিতে। বিরাট দিঘি, উচু পাড়। দিঘির ঢালু প্রাণে পানির কোল ঘেঁষে পায়ে চলার রাস্তা। আমরা সেই রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম। দিঘি ছাড়িয়ে সরু পায়ে চলার পথ। বাড়িঘরের পাশ ঘেঁষে, ঝোপঝাড় আর কাঁটাবনের ভেতর দিয়ে, কখনও মাটির ঢিবির মতো উচু জায়গা দিয়ে, কখনও নিচ কোনো সূর্যের মতো পথের ওপর দিয়ে মকতু মিয়া আমাদের নিয়ে যেতে লাগলো। গভীর অঙ্ককারের গোলক ধাঁধা পার হয়ে যখন আমরা চওড়া মতো একটা রাস্তায় এসে পড়লাম, তখন দেখা গেলো, পিন্টু, গোলাম গউস এবং আরো দুজন আমাদের সঙ্গে নেই। কোথায় গেলো ওরা? না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও ওদের কোনো পাস্তা মিললো না। সম্ভবত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে ওরা। কিন্তু দেরি করাও যাচ্ছে না আর। তাই আমরা আবার সামনের দিকে পা বাঢ়ালাম।

এইভাবে আর কিছুক্ষণ চলার পর মকতু মিয়া হাঁটাং সামনের ঘনীভূত একটা অঙ্ককারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো, এই যে ধার্মটা দেখছেন, ওখানেই শামসুল মেঝারের বাড়ি। রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। রাইফেল-বন্দুকসহ লোক

পাহারা দেয়। যেতে হবে জমির ওপর দিয়ে।

সুতরাং জমিতে নেমে পড়তে হলো। জমি মানে হাঁটু সমান, কোমর সমান ধানক্ষেত। ধানক্ষেতের আলপথ ধরে হাঁটিতে হচ্ছে। অসমতল আলপথ যেমন কর্দমাক্ত, তেমনি পিছল। ব্যালাস রাখাই কষ্টকর।

আলপথ ছেড়ে এবার নামতে হলো সরাসরি ধানক্ষেতে। পানিতে হৈথৈ করছে ফসলের মাঠগুলো। পা ফেললে শব্দ হয় ছপ্-ছপ্ ছপ্-ছপ্। যতোটা সঙ্গে হঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে ফেলতে আমরা সেই অক্ষরাটা লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম। মকতু যে ভীষণ সাবধানী মানুষ, সেটা বুঝতে পারলাম, যখন সে শাহসুল মেষ্টারের বাড়ির সামনে এসেও সোজাসুজি না এগিয়ে প্রায় ১৫ মিনিট ঘূরপথে হাঁটিয়ে সেই নির্দিষ্ট বাড়ির পেছন দিককার প্রায় ২০০ গজের মধ্যে আমাদের নিয়ে এলো, তখন। দু' পাশে পাটক্ষেত। মাথা সমান উঁচু পাটগাছ। মাঝ দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তা। ঠিক বাড়ির কাছেই রাস্তাটা নিচু এবং পানিতে ভুবে গেছে। কোমর সমান পানি। সামান্য ইতস্তত করার পর আমরা নেমে গেলাম পানিতে এক এক করে। পানি পার হয়ে বাড়ির বাইরের উঠোনের ওপর এসে উঠলাম। চট করে দেখে নিলাম বাড়িটা। দেখলাম, টিনের দোচালা বিরাট বাড়ি। উঁচু করে বাঁশের বেড়া দিয়ে যেরা। চারদিক নিম্নুম। বাড়ির সামনে দুজন পাহারারত। তাদের মৃদু কথাকথ শোনা গেলো। লোকগুলো সশন্ত কি? কে জানে?

— আর দেরি করা যায় না। আমার পাখি আহিদার আর শাহজাদা। তিনজনের হাতে তিনটা ছেনেড়ে। পেছনে মতিয়ার রাইফেল হাতে।

— রেডি?

— হ্যাঁ, রেডি।

— চার্জ।

— কিন্তু ছেনেডের পিস্টল যে খুলছে না। দাঁত দিয়ে পিন সোজা করে নিয়েও টান মেরে খোলা যাচ্ছে না। এ এক চরম মুহূর্ত। উত্তেজনায় শরীর কাঁপছে। না, আহিদার এবার তার ছেনেডের পিন খুলতে পেরেছে। প্রবল শক্তিতে টান মেরে আমারটাও খুলে ফেললাম। শাহজাদা তখনও টানাটানি করছে। ঠিক এই সময় সেই ঘটনাটা ঘটলো। প্রহরারত লোকগুলো টের পেয়ে গেলো। 'কে-কে' শব্দ তুলে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে চিন্কির করে উঠলো। আর এই রকম অবস্থাতেই আমাদের হাতের ছেনেডে উড়ে গিয়ে পড়লো বাড়ির ভেতরে। দুম দুম শব্দ তুলে ছেনেডগুলো গিয়ে পড়লো টিনের চালের ওপর। পজিশন নেয়ার কথা ভুলে গিয়ে মুহূর্তে মাথা নিচু করে আমরা দৌড় দিলাম। তীব্র আলোর ঝলকানির সঙ্গে কান ফাটানো গর্জনে ছেনেডগুলো বিক্ষেপিত হলো। সেই শব্দের সাথে মতিয়ারের রাইফেল গর্জে উঠলো বার কয়েক। তারপর কোমর সমান পানি পেরিয়ে, পাটক্ষেতের মাঝ বরাবর রাস্তা দিয়ে আমরা যখন প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছি, তখন আমাদের কানে এলো হৈচে-চিঁকার আর কান্ধাকাটির শব্দ। আমরা দ্রুত সরে গেলাম। এইভাবে এক সময় এসে পৌছলাম উঁচু গড়টার কাছে। ওখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো জবরার ভাইসহ অন্যরা।

শাহজাদা তার ছেনেড় থ্রো করতে পারে নি ।

গড়টার ঢালুতে বসলাম । তারপর একরাশ ক্লান্তি নিয়ে শুয়ে পড়লাম । প্রত্যেকেই সাংঘাতিক ক্লান্তি আর বিধ্বণ্ট । সারারাত সবার নার্তের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মাত্রাতিরিক্ত চাপ । পিন্টুদের কোনো খোজ পাওয়া গেলো না । আজকের মতো কাজ শেষ । রাতও প্রায় শেষ হয়ে এলো ।

— লেট আস রিটার্ন ব্যাক ।

উঠে দাঁড়ালো সবাই । ক্যাপ্সে ফিরে যাওয়ার তাগিদ নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম আমরা ।

আমরা ফিরছি । মেজের শংকরের দেয়া দুটো এ্যাসাইনমেন্ট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । মেজের নিচ্ছয়ই খুশি হবেন খুব । প্রথম অপারেশনের সফলতা আমাদের যুদ্ধজয়ের আনন্দ এনে দিলো । মনের মধ্যে এক অনাবিল প্রশান্তি নিয়ে ফিরছি আজ । দলচুট পিন্টুর দলও হয়তো পথ চিনে পৌছে যাবে ভাটপাড়া ক্যাপ্সে ।

বাংলাদেশের সীমানায় উচ্চ গড়টার ওপর দিয়ে আমরা তখন হাঁটছি । কট হচ্ছে । তবুও চলতে হচ্ছে । প্রচণ্ড ক্লান্তি সারা শরীরে । কিন্তু সেই ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছিলো এই অনুভূতির অনুরণনের ধ্বনি, আমরা ফিরছি, আমরা ফিরছি যুদ্ধ শেষে, ফিরছি প্রথম যুদ্ধ জয়ের সফলতা নিয়ে । ধীরে ধীরে অঙ্গুলু স্মিকে হয়ে এলো । জাগতে লাগলো সবকিছু ।

হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গটা জেগে উঠলো প্রত্যেকে । তারপর ধীরে ধীরে নিচেরগুলো । আমরা গড় থেকে নেমে এলাম । ভেঙ্গে পিঙ্ক আলোয় সীমাত্ত পেরিয়ে এলাম । সীমাত্ত পার হওয়ার পর এবার নিজেজ্যুন্দারুণ নিরাপদ মনে হতে লাগলো । নিজের দেশের নিরাপত্তাশূন্য আর ভয়ের স্বাজ্ঞ থেকে যেনো আমরা পরদেশের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে এলাম ।

আমরা এখন উত্তরমুক্তো হয়ে সোজাসুজি ফিরছি । সামনে হিমালয় পর্বতমালা তার অপার বিশালতা নিয়ে, মাথায় সোনালি মুকুট ধারণ করে আকাশ স্পর্শ করবার গর্ব নিয়ে যেনো দাঁড়িয়ে আছে । অপরূপ এক মনোহারী দৃশ্য । বিরাপিরে পিঙ্ক বাতাস । সেই বাতাসের সজীব স্পর্শ সারা শরীরে মেঝে নিয়ে এগুচ্ছি আমরা ক'জন আগতত ক্লান্ত প্রাণ রাত জাগা যুবক ।

তাঁবুতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো সবার উদ্ঘোকুল সংবর্ধন । আমাদের দেখতে পেয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠলো সবাই । উঁঁ সাদুর অভ্যর্থনা জানালো ওরা । কিছুক্ষণ পর পিন্টুরাও এলো । মেজের এলেন সকাল ন'টাৰ দিকে । বিজ্ঞারিত শুনলেন । তাঁৰ নোটবুকে টুকে নিলেন সব ঘটনা । আমাদের সফলতা যেনো তার নিজেরই সফলতা । আর সেই সফলতার আনন্দ উপচে পড়ছে তাঁৰ মুখের হাসিতে । তার কথাবার্তায় । চা এলো । চা খেয়ে তিনি উঠতে উঠতে বললেন, ঠিক হ্যায়, আজ রেষ্ট করো, কাল ফের অপারেশন যে যান হোগা । গাড়িতে উঠবার সময় তিনি আমাকে ডাকলেন, মেহরুব, হোয়াট ইঞ্জ ইওৱ কোয়ালিফিকেশন?

— সায়েপ গ্রাজুয়েট স্যার । এম.এস.সি টুর্নেন্ট ।

— ইজ ইট? আই এ্যাম অলসো সায়েন্স গ্রাজুয়েট। ওকে, আভি রেষ্ট করো, গুড বাই, গুড লাক এভরিবডি।

মেজরের গাড়ি ধোয়া উড়িয়ে চলে গেলো। এরপর মহতাজের পরিবেশন করা নান্তা থেয়ে, তাঁবুর ভেতরে ঢুকে মাটির মেঝেতে খড়ের ওপর কঙ্কল বিছানো শয়ায় শরীর এলিয়ে দিতেই রাজ্যের ঘূম এসে বাঁপিয়ে পড়লো। রাতে ছেলেরা কেউই ঘুমোয় নি। তাই রাত জাগার ক্লান্তিতে তাঁবুর ভেতরে দলা পাকিয়ে ঘুমুতে লাগলো সবাই। সাবা ক্যাম্প যেনো পরিণত হলো ঘুমের রাজ্যে। দিনভর চললো এই ঘুমের পালা। কেবল বড় ভাই মুকুল হক তাঁবুতে তাঁবুতে গিয়ে মাঝে মাঝেই তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন সবার ঘুম।

২৯.৬.১৯৭১

জীবন, ছকে বাঁধা

একটা ছকে বাঁধা জীবন। তাঁবুর পরিধির বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। প্রশিক্ষণ শিবিরের সেই বাধ্যবাধকতা যেনো সবার পায়ে শিকল পরিয়ে রেখেছে। ক্যাম্পের চৌহদ্দির বাইরে শুধু পুরুর ঘাট পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি তার বাইরে নয়।

— জহুরী বাজার পর্যন্ত কেউ যেতে পারবে না। কমান্ডিং অফিসারের কড়া নির্দেশ। স্থানীয় লোকজনের সাথে মিশবে না। বাহিরের কাউকে তাঁবুতে ঢুকতে দেবে না। সবার গতিবিধি হবে নিয়ন্ত্রিত। কঠোর শর্করাসে বজায় রাখতে হবে ক্যাম্পে।

সুতরাং আমাদের গতিবিধি তখন ছান্তুর আশপাশে মাত্র কিছুদুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবসরেও খেলো, গাও, গল্প করো, কাজ করো, ফল-ইন হও, সেক্সি কমান্ডার হও, সোন্টি ফিল্টার করো, রাতে প্রেটলিং করো, ব্যক্তিমূল করে বৃষ্টি এলে তাঁবুর ভেতরে বসে থাকো প্যাজাও, পিন্টুর গান শোনো, তাস পিটিয়ে টুয়েননি নাইন খেলো, ছেলেদের বাপড়া-বিবাদের নালিশ শোনো, মেটাও সেগুলো, সকাল আর বিকেলে কমান্ডিং অফিসারের জন্য অপেক্ষা করো, অপারেশনের চিন্তা করো, বিকেলে খেলাধুলো করো, পি টি করো, ব্যায়াম করো, মাঝে মাঝে এ-তাঁবু বনাম ও-তাঁবু হাত্তু খেলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করো, উৎসাহ ভরে ছেলেদের জলে-কাদায় মাখামাখি দেখো, নিয়ম করে থাও, ঘুমোও—এই হচ্ছে আমাদের তাঁবুর জীবন।

জীবনটা সে সময় সত্তিই ছকে বাঁধা একটা নিয়মের দাস হয়ে গিয়েছিলো। শুধু ডিসিপ্লিন আর ডিসিপ্লিন; তাই আমবাগান যেনো তাঁবুর জীবনচক্রে তখন সবার মধ্যে এক অস্ত্রিতার প্রকাশ। সবাই যেনো মুক্তির জন্য ছটফট করতো। কিন্তু কোনো উপায় ছিলো না। কিছু করারও ছিলো না। সুযুথের বিস্তীর্ণ অক্কারাছন্দ হিমালয় পর্বতমালার ছড়েগুলো চকচক করতো। হিমশীতল বরফ ধোয়া বাতাস নেমে আসতো। যেদিন আকাশে মেঘ থাকতো না, বৃষ্টি থাকতো না, সে রাতে স্পষ্ট দেখা যেতো হেডলাইট জুলিয়ে গাড়িগুলো আঁকাবাঁকা সর্পিল পথে দাঙিলিং-এ উঠছে-নামছে। সীমান্তের এপারের জীবন কতো শাস্ত, স্বাভাবিক। অথচ পেছনে মাত্র সামান্য দূরে অধিকৃত বাংলাদেশ। সেখান থেকে নিয়মিত ভেসে আসতো বিভাষিকাময় মুক্তের

তাওবলীলা। তাই বাড়ির কথা, ফেলে আসা আঞ্চীয়-স্বজনদের কথা মনে পড়তো খুব করে। মনের দুচৈথে ভেসে উঠতো প্রিয়জনদের মুখ। আর তখন এই তাবুর জীবন ছেড়ে ভীষণভাবে ইচ্ছে করতো পালাতে।

অবশ্য আমরা মাঝে মাঝে পালাতাম। জব্বার ভাই, আমি, গোলাম গউস আর পিন্টু চলে যেতাম জহুরী বাজারে। জহুরী, চাউলহাটি, জলপাইগুড়ি পাকা সড়কের ধারে একটা ছোট বাজার। বাসস্ট্যান্ড আছে। আছে গুটিকতক রিক্ষা। রাস্তার দু'সারিতে কয়েকটা মনোহারী দোকান। আর দুটো চায়ের স্টল। চায়ের স্টলে বয়ামভর্তি বিস্কুটের পাশাপাশি জিলাপি, গজা আর ঝুড়ি-বুনিয়াও আছে। ঝুড়ি-বুনিয়া আমাদের দেশে পাওয়া যেতো না। থেতে খুবই সুস্বাদু। আমরা চায়ের স্টলে আধ ভাঙা বেঁকে বসে ঝুড়ি-বুনিয়া আর চা খেতাম। পূরনো পত্র-পত্রিকা পড়তাম। শুনতাম লোকজনের গল্প-গুজব। আর দেখতাম বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের। মাথা গুঁজবার এবং নিজেদের লজ্জা ঢাকবার জন্য এরা মেনে নিতে বাধা হয়েছে এক অবণিয় পরিস্থিতিকে। শরণার্থী হিসেবে পাওয়া কার্ড দেখিয়ে শুধু রেশন তোলা আর রেডিওর খবরে আশার কথা, স্বীকৃতির কথা শোনা ছাড়া তাদের অন্য আর সব ভাবনা-চিন্তা যেনো শরণার্থীর খাতায় নাম লেখাবার পর মুছে গেছে। ওরাও কথনো কথনো এই চার স্টলে বসতেন। আর জিগ্যেস করতেন—দেশ কি স্বাধীন হবে? ফ্রন্টের খবর কি? ইত্যাদি স্বীকৃতি দেয় না কেনো? অন্যান্য দেশ স্বীকৃতি দিছে না কেনো? দেশে বিফেরা যাবে? আপনারা কি যুদ্ধ করে পারবেন ওদের সাথে?

আমরা তাদের কোনো প্রশ্নের উত্তরই আমাদের কাছে তখন ছিলো না। আর তখনি, এ রকম পর্বের ভেতরেই ধাম-ধাম অমরখানায় শেল ফাটতো। উৎকীর্ণ হয়ে শুনতো সবাই। এক একটা আলিওরির গোলা ছুটে যেতো এপার থেকে আর শক্তির অবস্থানের ওপর দিগন্ত কাঁপানো শব্দ তুলে ফাটতো সেগুলো। সেই শব্দ তরঙ্গ যেনো কিছুটা আশার সম্ভাব করতো পালিয়ে আসা ছিন্মূল শরণার্থী মানুষগুলোর মনে। জুলজুল করে উঠতো তাদের চোখগুলো। আশাভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকাতো আমাদের দিকে। আমরা কিছু বলতে পারতাম না। শুধু দিগন্ত কাঁপানো গোলাবর্ষণের দিকে ইঙ্গিত করতে চাইতাম। যেন তাদের সব প্রশ্নের সমাধান লুকনো রয়েছে সেখানে।

ঈদে মিলাদুর্রবী

ঈদে মিলাদুর্রবী এলো। আমরা মিলাদ পড়বো। ক্যাপ্সেই পালন করবো ঈদে মিলাদুর্রবী। মেজর শংকর খুশি হলেন। জানালেন, তিনি নিজেও শরিক হবেন অনুষ্ঠানে। বললেন, মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মের ব্যাপারে টান থাকা তালো। তাতে করে শৃঙ্খলা আর মনের বল বৃক্ষি পায়, সাহস বেড়ে যায়।

জব্বার ভাই, আহিদার, গোলাম গউস আর পিন্টুকে নিয়ে আমাদের মিলাদ মহফিলের মিষ্টি এবং অন্যান্য জিনিসপত্র কেনার জন্য পাংগা যেতে হলো। এ-

ব্যাপারে সব ছেলেই চাঁদ দিয়েছে। বড় ভাই নুরুল হককে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে স্থানীয়ভাবে মৌলবী খোজার জন্য। বিকেলে মিলাদ মহফিল, রাতে 'বড়খানা'। 'বড়খানা' মানে পোলাও আর মাংস। এই রকম আয়োজনের মুখে তাঁবুতে মোটামুটি একটা উৎসবের ভাব। সবাই কাজে ব্যস্ত। আজ রাতে অপারেশনও নেই, তাই খুশির বহরটা একটু বেশি।

পাংগ একটা বেশ বড়োসড়ো লোকালয়। ভারতীয় বর্জর সিকিউরিটি ফোর্সের একটা বড়ো ছাউনি। একটা বিমান ঘাটিও আছে এখানে। আমাদের চোখের সামনেই একটা বিমান নেমে এলো। দোকানপাটও অনেক। প্রচুর জনসমাগম। রিক্ষা-বাস-ট্যাক্সি চলছে হৃদম। ব্যস্ততা, চিৎকার, হৈচেমের ভিড়ে যেনো আমরা ক'জন হারিয়ে গেলাম। তাঁবুর বাঁধাধাৰা গণিতক জীবনের বাইরে অনেক দিন পর একটা মুক্তিৰ স্বাদ। কিছুক্ষণের জন্য হলেও মানুষজনের ভিড়ে হারিয়ে গিয়ে আমরা যেনো এক শৃঙ্খলিত জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

দুপুরের কিছুক্ষণ পর মিটিৰ ঝুড়ি নিয়ে ফিরলাম আমরা। তাঁবুর কাছাকাছি এসে থমকে দাঢ়াতে হলো। মিটিৰ ঝুড়িটা হাত থেকে খসে পড়বার উপক্রম হলো। এ কী, এ যে এক সাধ্যাতিক দৃশ্য সামনে! সব ছেলে ফল-ইন-এ দাঢ়িয়ে। চারজন অফিসারসহ সামনে দাঢ়িয়ে ক'জন ভারতীয় সৈনিক। অফিসারদের একজন ছেলেদের উদ্দেশে কী যেনো বলছেন। তাঁর পেছনে দাঢ়িয়ে বড় ভাই নুরুল হক।

মিটিৰ ঝুড়িটা পেছনের তাঁবুতে চুক্কি দেখে জড়িত শ্বলিত পায়ে এগিয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ আমরা ক্যাম্পে ছিলাম না। আর ক্যাম্পে না থাকাটা মন্ত অপরাধ। মনের মধ্যে সেই অপরাধ চুক্কিটা বারবার হানা দিতে লাগলো। তাই দ্বিধা না করে বক্তৃতারত অফিসারের সৈন্যনে গিয়ে এ্যাটেনশন হয়ে দাঢ়ালাম। বক্তৃতা করছিলেন যিনি, তিনি আর কৃত নন, বি.এস.এফ.-এর ডাইরেক্টর জেনারেল। ঘুরে তাকালেন তিনি আমাদের ছিক।

— দে আর অল কমান্ডারাস্ স্যার, বড় ভাই আমাদের দেখিয়ে বললেন।

— ইয়েস, দ্য ইয়াং কমান্ডারাস্। হাউ ডু ইউ ফিল?

— ও. কে স্যার। উত্তর দিলাম তাঁর প্রশ্নের।

তারপর তিনি আবার সামনের দিকে তাকালেন। বললেন, তোমাদের দেখে আমি খুশি হলাম। তোমরা সবাই বয়সে তরুণ। সবাই লেখাপড়া ছেড়ে এসেছো। এদেশে এসে প্রশিক্ষণ নিয়েছো। তোমরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রেখেছো। তোমাদের দেশ, তোমাদেরই স্বাধীন করতে হবে, লড়তে হবে, রক্ত দিতে হবে, মরতে হবে। প্রতিটা জাতিৰ স্বাধীনতাৰ পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষৰ আত্মত্যাগ। তোমরা পাৱে। দেখো, একদিন-না-একদিন তোমহারা দেশ স্বাধীন হোগা। আওৱ ইয়ে হোনেই চাহিয়ে। আমি তোমাদেৰ মুখ দেখে বলে দিতে পাৰি, জলদি সে জলদি বাংলাদেশ স্বাধীন হো জাওগা। সো, গুড লাক বয়েজ, জয় বাংলা।

ডাইরেক্টর জেনারেল রাস্তা দিয়ে চাউলহাটি যাওয়াৰ সময় যুক্তিযোক্তাদেৰ ক্যাম্প দেখে নেমে পড়েন। তাঁবুগুলো ঘুৰে ঘুৰে দেখেন। বড় ভাই দ্রুত ছেলেদেৰ ফল-ইন

করিয়ে ফেলেন। ছেলেদের উদ্দেশে বজ্রাতা দিতে যাওয়ার সময় বড় ভাই তাঁকে তার স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে চা পানের অনুরোধ করতে থাকেন, প্রিজ স্যার, হ্যান্ড ওয়ান কাপ টি ওনলি স্যার, আওর কিছু না স্যার। কিন্তু বি.এস.এফ.-এর ডি.জি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। বড় ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে শুধু বললেন, নেহি ইয়ার, নট টু-ডে। স্বাধীন হোনেকে বাদ, তুমহারা ঘর যায়েগা আউর চা খায়েগা, ও. কে? থ্যাঙ্ক যু।

বড় ভাই খুশি হলেন। অন্দরোককে ভালো লাগলো খুব। একটা পিত্তসূলভ ভাব রয়েছে তাঁর চেহারায়, কথাবার্তায়।

ইব্রাহিমের আর্ত-চিত্কার

হঠাৎ করে ইব্রাহিমের আর্তচিত্কারে সমস্ত তাঁর আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। রংপুরের বদরগঞ্জের ছেলে ইব্রাহিম। আমাদের কমন ভাতিজা। চাচা মিয়া করে ডাকতো আমাদের সে। কী হলো সেই ইব্রাহিমে? গিয়ে দেখি চিত্কার দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি থাক্কে সে আর বলছে, মুই মরি গেনু বাহে, মোক বাঁচান ...। ছেলেদের মধ্যে হৈচে পড়ে গেলো। ডাক্তার দরকার। মেজর শংকরকে খবর দেয়া দরকার। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কী হয়েছে ওর। বড় ভাই নুরুল্ল হক পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন।

আহিদারসহ আমি ছুটলাম জহুরী বাজারে। একটা প্লাইডির ব্যবস্থা করা দরকার। শংকরের কাছে যেতে হবে। তাদের মেডিকাল ইনিটিউটে ডাক্তার রয়েছে। কিন্তু কোনো গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বিস্তৃত নেই। এই রকম অবস্থায় পাওয়া গেলো পঞ্জগড় চিনিকলের কর্মচারী মুনিয়াজাহের এক অন্দরোককে। জহুরী বাজারের পাশে রাখাল বাবুর বাড়িতে তিনি শৰৎপুরী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্যাপারটা তাঁকে বলতেই তিনি তার সাইকেলটা দিয়ে এলেন। সাইকেলের সামনের রডে আমি বসলাম, আর আহিদার উরুবুরে প্যাডেল মারতে শুরু করলো। সাইকেল ছুটছে। আহিদারের ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। আর আমি মনে মনে জপ করে চলেছি, খোদা, ডাক্তার আসা পর্যন্ত ইব্রাহিম যেনো বেঁচে থাকে।

একটা ঘন বাঁশতলায় বোপবাড়ের জঙ্গলে পাওয়া গেলো মেজর শংকরের ইউনিটকে। একজন সেন্ট্রি দেখিয়ে দিলো শংকরের বাক্সার। মাটির তলায় বাক্সার, ওপরে মজবুত পাটাতন দেয়া পুরু ছাদ। একটা সুরক্ষ মতো ঢেকার পথ। বাক্সারেই ছিলেন মেজর। খোশমেজাজে আপ্যায়ন করলেন আমাদের। ইব্রাহিমের অসুস্থের খবর শুনবার সাথে সাথে তার ইউনিটের ডাক্তারকে পাঠিয়ে দিলেন। আহিদারের সাথেই একটা গাড়িতে করে। আমাকে বসতে বললেন।

একটা শোয়ার ক্যাম্পখাট। দুটো বসবার মতো হালকা চেয়ার। লিখবার একটা টেবিল। টেবিলের ওপর ফিল্ডম্যাপ, চার্ট, ম্যাগাজিন আর কিছু বইপত্র। মেজরের পরনে ইউনিফর্ম। বোঝা গেলো কোথাও বেরুবেন হয়তো। আমাকে বললেন, মেহেরুব, হি উইল বি অলরাইট। সিট ডাউন প্রিজ। আই উইল গিভ ইউ টাক। ম্যায়পুরা অপারেশন তুমকো ব্রিফ করেগা, আওর তুম এ্যাইসি মাফিক ডেসক্রিপ্ট করোগে তুমহারা ইউনিটকো। আই হেপ ইউ উইল সাকসেসফুলি কমপ্লিট ইউর টাক

টু নাইট। ওকে?

— ইয়েস স্যার।

— দেন টেক টি, মেহরুব।

— থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

চা খাবার পর বিছানায় বসে বিরাট ফিল্ড ম্যাপটা খুলে ফেললেন। ম্যাপের ওপর লাল পেসিল চালিয়ে তিনি নিদিষ্ট জায়গাগুলো এবং রুট চিহ্নিত করলেন। তারপর একটা জায়গায় গোল চিহ্ন দিয়ে অপারেশনের টার্পেট দেখালেন। মুখে বিস্তারিতভাবে বললেন, কী কী করতে হবে। আমি সব নোট করে নিলাম। আমাদের অপারেশনের সুবিধার জন্য এ-ধরনের একটা এনলার্জড ম্যাপ দেয়া যাবে কি না জিগ্যেস করলাম তাঁকে। তিনি বললেন, দেয়া যাবে। এই রকম কথাবার্তার মুখে হঠাতে কেবল কাছ থেকে দুম দুম শব্দে আর্টিলারি গর্জে উঠলো। ওপার থেকেও আসতে লাগলো জবাব। কানে তালা লাগিয়ে ফাটতে লাগলো সেগুলো। কাছেই কোথাও দু'পক্ষের কামান-যুদ্ধের ভামাড়োলের মধ্যে হঠাতে করে বিহুল হয়ে পড়েছিলাম যেনো। অথচ মেজের হাসলেন শব্দ করে।

— কেয়া, ডরতা হ্যায়?

— নেহি স্যার।

— ও, কে কমান্ডার। ডরো মাত। আজ বন্ধু-বাসে দু' বাজে তাক হামলোগ হেভি ফায়ারিং আওর শেলিং ডালেগা এনেছি কো উপ্পার। দে উইল বি বিজি উইথ আস, আওর তুমলোগ ওহি পিরিওড মে অ্যারেশন পুরা কারোগে, ঠিক হ্যায়?

— ঠিক হ্যায়, আমি মাথা নাজুক্কি।

— দ্যান, খোদা হাফেজ, জামি মালা।

ফিরতি পথে সাইকেলে ভাসে একা।

শালমারা ব্রিজে বিস্ফোরণ

চল্লিশ পাউন্ড বিস্ফোরক। হলদে রঙের কারটস ১০০ ফুট, ৮টা ডেটোনেটের, সেফটি ফিউজ ও সেফটি ম্যাচ, সাথে দুটো স্টেনগান, ৪টা রাইফেল ও ৬টা গ্রেনেড। প্রতিটি স্টেনগানের জন্য দুটি করে ২০ রাউন্ড এবং রাইফেলের জন্য ১৫ রাউন্ড গুলি। এই ছিলো সে রাতের অপারেশনের অন্তর্ভুক্ত। সে রাতের টাক ছিলো ভেতরগড়-অমরখানা রাস্তায় তালমা নদীর ওপরকার শালমারা ব্রিজ ডেমোলিশন বা বিস্ফোরকের আঘাতে উড়িয়ে দেয়া।

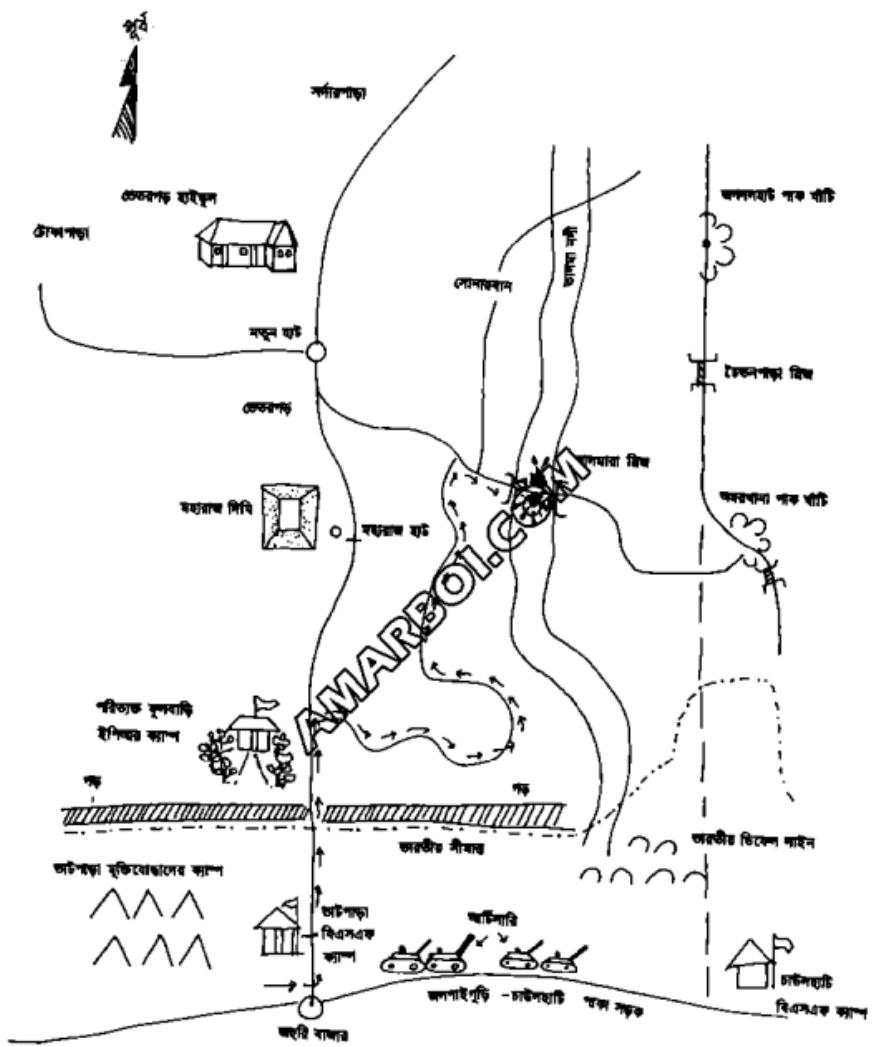
প্রথম রাতে শালমারা ব্রিজ রেকি করে এসে রিপোর্ট দেয়ার পর মেজের শংকুর আজ তা উড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি সকালে কিছুটা আলোচনা করে গিয়েছিলেন। সেটা ছিলো একটা সম্ভাবনাময় অপারেশনের কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেন, তাঁর মাটির তলার বাঙ্কারে বসে, আজ যখন অসুস্থ ইব্রাহিমের জন্য ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলাম তাঁর ইউনিটে। আহিদারকে ডাক্তারসহ ভাটপাড়া ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর অপারেশনাল ফিল্ড ম্যাপটা খুলে

বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেন আমাকে অপারেশনের প্ল্যান। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে, শালমারা ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। ফলে অমরখানা ঘাঁটি থেকে পাক আর্মির ভেতরগড় এলাকায় যাওয়ার একমাত্র পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর তাতে করে মুক্ত রাখা যাবে ভেতরগড়। তিনি বললেন, ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তোমাদের। কেমন করে এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ব্রিজ ওড়াতে হয়, সেটাতো ট্রেনিংয়ের সময় তোমাদের শেখানো হয়েছে। এ অপারেশন অত্যন্ত রিস্কি। পাকবাহিনী রেগুলার পেট্রোল করে ও-রাস্তায়। তাছাড়া ওরা জেনে গেছে, তোমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে। ফলে ওরা অত্যন্ত সতর্ক থাকবে। ভেতরগড় এলাকায় যাওয়ার একমাত্র রুট তারা স্ট্র্যাটেজিক কারণে হারাতে চাইবে না। অবশ্যই তারা তালমার শালমারা ব্রিজ রক্ষা করবার জন্য ব্যবস্থা নেবে। এখন পর্যন্ত ওরা সে ব্যবস্থা না নিয়ে থাকলে শিগ্গিরই নেবে। একবার ওরা ব্রিজ প্রোটেকশনের জন্য এলে শক্তভাবে গেড়ে বসবে। তখন খুবই কঠিন হবে ব্রিজ ওড়ানো। সুতরাং, আমাদের এই কুইক সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। অপারেশন অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ, তবে তোমাদের সেফটির জন্য রাত ঠিক বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত অমরখানা পাক ডিফেন্সের ওপর হেভি শেলিং এবং ফায়ারিং করা হবে। ওরা এদিকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আর সেই সুযোগে আমরা এক্সপ্লোসিভের চার্জ লাগাবে, উড়িয়ে দেবে ব্রিজ। যদি ব্রিজের ওপর প্রক্রিয়াইনীর সেন্ট্রি পাও, তাহলে তাদের এ্যাটাক করবে। ওদের প্রচুর ক্যান্জুয়াল এবং ওভার রান করে ব্রিজের পজিশন দখলে নেবে। এইভাবে পালন কর্তৃত তোমাদের টাঙ্ক। এন্ড আই হোপ, তোমালোগ ইয়ে করণে সাকোগে।

আজকের অপারেশনে বেছে যেকুন ইউনিটের ভালো ছেলেদের নেয়া হয়েছে। মোট ১৫ জনের একটা শক্ত দল। আজকের কমান্ডার বড় ভাই নূরুল হক।

সীমান্ত পোষ্টটা পার হচ্ছে একটা ছোট ঝাঁকড়া গাছ। সেই গাছটার নিচে জমাট বাঁধা অঙ্ককারের সাথে মিশে গিয়ে থেমে গেলাম আমরা। এখানে বসেই প্রতৃতি নিতে হবে আমাদের। বিক্ষেরক— যেগুলোর নাম প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বা চার্জ, মাঝানো ময়দার মতো অনেকটা, সেগুলো মোড়ক থেকে খুলে নেয়া হলো। গামছায় বেঁধে নেয়া হলো এগুলো। এরপর আরো কিছু প্রস্তুতি। ফিসফিসিয়ে চলতে লাগলো আলোচনা। পাশাপাশি সকলের দ্রুত হাত চালনা।

অপারেশন চালানো হবে ঠিক রাত একটায়। হাতে এখনো বেশ কিছু সময়। মূরতি ট্রেনিং সেন্টারের সেই এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারের শিক্ষা আজ কাজে লাগাতে চলেছি। ট্রেনিং সেন্টারে ওস্তাদ মানে ইনস্ট্রাক্টররা হাতেকলমে এক্সপ্লোসিভের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের চার্জ তৈরি করতে শিখিয়েছেন। তাদের সাথে থেকে বহুবার সেইসব চার্জের সাহায্যে ডেমোলেশন করেছি। বিকেলের দিকে প্রায়ই থাকতো ডেমোলেশনের মহড়া। ট্রেনিং প্রাইভেটের নিরাপদ উচুতে বসতো সব উইংয়ের ছেলেরা। নিচু সমতল ভূমিতে পাহাড়ি নদীটার ধার ঘুঁমে তৈরি কৃতিম ব্রিজ, শক্র বাস্কার, ঘাঁটি, কাঁটাতারের তৈরি ফেনসিং, সরবরাহ লাইন, রেশন আর পেট্রোল ড্যাম্প— এগুলো ডেমোলেশন করতে হতো। সমস্ত উইং থেকে বেছে নেয়া



আমাদের ক'জন যুবককে এ মহড়া নিয়মিত দেখাতে হতো। ছেলেদের সাথে একটা উচু মতো জায়গায় বসে থাকতেন ইন্ট্রাকটর এবং অফিসাররা। কমান্ডান্টও মাঝে মাঝে থাকতেন। অসমৰ বুকিপূর্ণ আর কষ্টকর মহড়া হলেও, সেগুলো ছিল নিতান্ত প্রশংকণমূলক। নকল সেই যুদ্ধের পরিবেশ কষ্টকর হলেও ছিলো বেশ নিরাপদ। কারণ, যুদ্ধটা ছিলো নকল, শক্র ঘাটির ব্যাপার-স্যাপারগুলো ছিলো সাজানো। যাদের বিরুদ্ধে লড়াই সেই শক্রের কোনো রকম বাস্তব অস্তিত্ব ছিলো না। কিন্তু আজ, এই এখনঃ এখন, এই মুহূর্তে সত্যিকার যুদ্ধক্ষেত্র এবং শক্রের বাস্তব উপস্থিতি সামনে রেখে সেইসব এক্সপ্লোসিভ আর যুদ্ধের সরঞ্জাম নিয়ে যেতে হচ্ছে। অনেকটা আন্দাজের ওপর নির্ভর করেই একটা বড় মজবুত লোহার ত্রিজ উড়িয়ে দিতে যেতে হচ্ছে শক্রকবলিত এলাকায়। মনে দিখা আর সংশয়, ওড়ানো যাবে তো ঠিকমতো? পরক্ষণেই আবার বেপরোয়া একটা ভয়ের সংঘার। দেখা যাক না, কী হয়?

দারুণ এক অবস্থা নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। নেতৃত্বের ভার যদিও ঠিক আমার ওপর নয়, তবুও এই অপারেশন সফল করার দায়িত্ব পুরো আমার ওপরেই। মেজর শংকরের স্থাপিত বিশ্বাস এবং আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। দলের সবাই আমার ওপর নির্ভর করে নিঃশব্দে পথ চলছে। অঙ্গকারে কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না। বড় ভাই নুরুল হক পাশে হাতচেন আজকের দলনেতা তিনিই। আমার কাঁধে হাত রেখে বারবার নিচিত হচ্ছে কাছেন। কেননা, অপারেশনের সাফল্যের ব্যাপারটা শুধু একা নুরুল হক নয়, মিজেদের সকলের ওপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং, আমরা সবাই তো আছিই। মিজেদের ডেমোলেশন ফ্রপের স্পেশাল ট্রেনিং দিয়ে ডেমোলেশন কমান্ডার হিসেবে আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং, নিজের ওপর আঘাতিষ্ঠাস রাখতেই হচ্ছে।

মক্তু মিয়াদের গ্রামে প্রচুরতেই রাত প্রহরী সেই দলটি অভ্যর্থনা জানালো। তাদের খবর, শক্রপক্ষের তোনো দল আজ এদিকে আসে নি। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসলো সকলে। রাতজাগা লোকদের ‘বন্তি জাগো’ চিৎকার বারবার বাংলাদেশের বাতাসের সাথে ভেসে বেঢ়তে লাগলো। সারারাত জেগে থেকে পাহারা দেয়া আর নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের এই সাড়া জাগানো আর্তনাদ যেনো বাংলার চিরস্তন শান্তিময় রূপকেই পাল্টে দিয়েছে।

একটা কোদাল কাঁধে নিয়ে মক্তু মিয়া আমার পাশে। সামনে খলিল আর মতিয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছে। রাস্তা ধরে এগুচ্ছি আজ আমরা। মক্তু আর তার পঞ্চগড় কলেজে পড়া শ্যালক মতিন আমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বড় ভাই নুরুল হকের জীবনে আজ এটাই প্রথম অপারেশন। স্বাভাবিকভাবেই সাবধানতার পাশাপাশি কিছুটা ভীতিও কাজ করছে তার মনে। এই রকম অবস্থায় কিছুদূর এগুতেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, রেকি করতে হবে আগে। তখন সবাইকে বসতে হয়। মতিয়ার আর খলিল রেকি করে এসে ক্লিয়ারেন্স দেয়। তারপর এগুনো শুরু হয়। এভাবে যাত্রা কিছুটা শুরু হলেও এক সময় আমরা পৌছে যাই।

ঘন কালো অঙ্গকার রাত। চারদিকে নিম্ন নিঃসাড় একটা থমথমে পরিবেশ।

সক্ষ্যার দিকে বৃষ্টি ছিলো। এখন আকাশ পরিষ্কার। বৃষ্টিভেজা মাটি: নির্দিষ্ট জায়গায় সবাইকে পজিশনে রেখে মতিয়ারসহ আমি এগুলাম শার্দুলের ভঙ্গিতে। ব্রিজের ওপরে উঠে গিয়ে রেকি করে এলাম, না, কেউ নেই। এরপর পুরো দল এগুলা, ব্রিজ দখলে নেয়া হলো। ব্রিজের ওপরে বড় খলিল আর নাদেরকে পজিশনে রাখা হলো। ওরা শক্র পক্ষকে আসতে দেখলে বাধা দেবে। সমস্ত দলের নিরাপত্তাই নির্ভর করছে এখন ওদের দু'জনের ওপর।

এক প্রবল উভেজনা এসে ভর করেছে সকলের ওপর। শক্রকবলিত এলাকা, যে-কোনো সময় ওরা এসে যেতে পারে, হঠাৎ করে শুরু হয়ে যেতে পারে প্রচণ্ড গোলাগুলি, পরিস্থিতি তখন হয়ে যেতে পারে অন্যরকম। আর এ শক্ষাটাই প্রবলভাবে কাজ করছে সবার উপলক্ষিতে, তাই প্রচণ্ড উভেজনা আর অস্ত্রিভায় কাঁপছে সবাই।

জব্বার ভাই, পিন্টু, খলিল এবং বড় ভাই নুরুল হক— এরা ওপরে। গোলাম গড়স আর মতিয়ারসহ আমি নিচে নদীর এক কোমর পানিতে। কাঠের মজবুত মোটা থাম ব্রিজটাকে শক্র করে দাঢ় করিয়ে রেখেছে। দু' সারিতে ১২টা থাম। অন্তত চারটা থাম না ওড়াতে পারলে ব্রিজটাকে কাত করা যাবে না। আন্দাজ মতো চারটা থাম বেছে নিয়ে বুক সমান, কোমর সমান পানিতে দাঢ়িয়ে আমর থামের গায়ে কাটিং চার্জ লাগাতে লাগলাম। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিজের প্রাইমেন্টের ওপর ওরা প্রেসার চার্জ লাগাচ্ছে— ব্রিজের দু'পাশের গার্ডেরে ওপর-নিচ করে পাচ-ছয়ট প্রেসার।

নরম ময়দার ডেলার মতো গোলাকার চুপচাপ ইঞ্জিন লবা এক একটা প্লাটিক এক্সপ্রেসিভ। ব্রিজের গোলাকৃতির কান্দুকে থামের গায়ে ওপর-নিচ করে দু'ধারে আটকে দেয়া হচ্ছে সেগুলো, চাপ দিয়ে দিয়ে। মাথায় গিট দিয়ে কারটেকেসের একটা প্রাত চুকিয়ে দেয়া হয়েছে এক্সপ্রেসিভের তেতরে আগেই। সুতলি পেঁচিয়ে বাঁধতে হচ্ছে থামে আটকময় এক্সপ্রেসিভ। দু'পাশ থেকে কারটেক্স টেনে নিয়ে ওপরে তুলে সেগুলোর সাথে প্রাইমারের মধ্যে ডেটেনেটের চুকিয়ে ভালো করে বাঁধতে হচ্ছে। এমনিভাবে, নিচের থামের কাটিং চার্জের সাথে ওপরে বসানো চার্জগুলোর সংযোগ বিভিন্নভাবে ঘূরিয়ে দেয়া হলো এবং অবশ্যে মোট পাঁচটি সাকিট তৈরি করা সম্ভব হলো।

ডেমোলেশনের কাজ খুবই ঠাণ্ডা মাথায় নিজেকে সুস্থির রেখে ভেবেচিস্তে করতে হয়। কিন্তু ভেতরকার প্রচণ্ড উভেজনার তাড়নায় আসলে মাথা ঠাণ্ডা রাখাই মুশকিল হয়ে পড়ছিল। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কাজগুলো প্রায় সবাই এলোমেলো করে ফেলছিলো। ভুল হচ্ছিলো বারবার। গোলমাল হচ্ছিলো কানেক্ষানে। একদম কথা না বলে চুপচাপ ইশারা-ইঙ্গিতে কাজ যেখানে সারার কথা, সেখানে কাজ করতে করতে কথা বলছিলো সবাই। জায়গাটা ঘিরে একটা রীতিমতো শোরগোলময় অবস্থা। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে খলিলের চোখে দু'জন পাক আর্মি ধরা পড়লো। ওপারে যোপের ধারে। কিন্তু না, ওটা তার মনের এবং চোখেরও ভুল। কিন্তু তারপরও কাজ ফেলে রেখে পজিশনে থাকতে হলো কিছুক্ষণ। বড় ভাই নুরুল হক তখনো একটানা বক্বক করে চলেছেন। আস্তে কথা বলো, সাবধানে কাজ করো, শব্দ করো না।

ঘাবড়াবে না কেউ ... এই রকম সতর্কতামূলক উচ্চারণের পরও, যখন শব্দ করে কথাবার্তা থামছিলো না, তখন ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে জববাব প্রচও এক ধরমক দিয়ে তাকে বসিয়ে দিলো। গুটিসুটি মেরে বড় ভাই টেনগানটা নিয়ে বসে থাকলেন।

অমরখানা ঘাঁটির ওপর তখন প্রচও বেগে আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে : এক সাথে সব ধরনের অঙ্গের ফায়ার ওপেন করা হয়েছে। কামান আর মার্টারের দিগন্ত কাঁপানো গর্জন, মেশিনগানের একটানা আর্টিলারি, থেমে থেমে হালকা অন্তর্শক্তির ঠুস্-ঠাস্ শব্দ তরঙ্গ, বোৰা যাছিলো, মোটামুটি একটা নৱক সৃষ্টি করেছে। মেজের শংকর সত্যিই তাঁর কথা রেখেছেন। এদিকে এলোমেলোভাবে হলেও আমাদের কাজ শেষ হয়ে এসেছে প্রায়, সার্কিটগুলো সম্পূর্ণ হতে আর সামান্য বাকি।

প্রায় দুঁঘটা ধরে একটানা শারীরিক আর মানসিক ধক্কল নিয়ে কাজ করে, যখন কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ঠিক তখনি মনে হলো, কয়েকটা আর্মি ভ্যান শক্রপক্ষের লোকজনসহ এসে যেনো ঝাপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। ঘটনার আকস্মিকতায় সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। বড় খলিল আর নাদের ওপারে ওদের পজিশন ছেড়ে ধূপধাপ করে দৌড়ে এলো। এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে যে যার মতো পজিশনে চলে গেলো সবাই। আমি ত্রিজের মুখে বাঁ পাশের বোপটায় গিয়ে পজিশন নিলাম। চুপচাপ নিস্তাড়, চেপে চেপে স্ক্রিপ্টগ্রাহাস নেয়ার চেষ্টা। যাতে করে শক্রপক্ষ নিষ্পাসের শব্দও টের না পায়। এবুন শুধু অপেক্ষা। পেরিয়ে যাচ্ছে মুহূর্ত— সেকেন্ড আর মিনিটের যোগফল অন্তর্ভুক্ত সময়। এইভাবে প্রায় দশ মনের মিনিট জড়বৎ থাকবার পর আবার সন্তুষ্য হয়ে উঠলাম। দেখবার চেষ্টা করলাম, অঙ্ককারের ফিকে আলোয় ত্রিজের উপর কোনো ছায়ামূর্তি নড়াচড়া করে কি না। না, তেমন কিছু দৃশ্যগোচর নয়। তাঁ শাহিসে তর করে ত্রুলিং করে ত্রিজের মাথায় চলে গেলাম। চোখের দৃষ্টি যতোটু অক্ষর প্রখর করে ওপার পর্যন্ত দেখবার চেষ্টা করলাম। না, ত্রিজের এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত যতোদূর চোখ যায়, কারো উপস্থিতি, কোনো ধরনের মুভমেন্ট বা চলাফেরা নেই। ফিরে এলাম আবার সেই আগের পজিশনে। গলা নামিয়ে ডাকলাম সবাইকে। আপনাপন অবস্থান ছেড়ে সতর্কতার সঙ্গে সবাই এগিয়ে এলো। ত্রিজের মাথায় আবার সমবেত সবাই। আবার রেকি করা হলো ত্রিজটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত। না, কেউ নেই, কিছু নেই। মধ্যরাতে সীমান্ত ঘেঁষে পাকা সড়কের ওপর দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর দ্রুত ধাবমান আর্মি ভ্যান আমাদের অবস্থানের ওপর চলে আসা শক্রপক্ষের গাড়ি বলে আমাদের সকলের মনে ভ্রম ধরিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয়বারের মতো। প্রথম রাতে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে চুকবার পর এই একই ধরনের ভ্রান্তি ভর করেছিলো আমাদের ওপর। আবার নাদের আর খলিলকে ত্রিজের ওপারে তাদের অবস্থানে পাঠানো হলো।

কিন্তু এ ঘটনার ফলে আমাদের ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। আর সেই ক্ষতিটা সর্বনাশ পর্যায়েরই। ঘটনার আকস্মিকতায় দোতুবার সময় সার্কিটগুলো সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। উত্তেজনার জের তাই তখনও কাটে নি। বুকের ডেতের দাপাদাপি। নিষ্পাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু দেরি করবার মতো সময় আর হাতে নেই। অঙ্ককারে

ছিড়ে যাওয়া সার্কিটগুলো হাতড়ে হাতড়ে যতোদূর সম্বব ঠিক করার প্রচেষ্টা শুরু হলো। গোলাম গটস, জৰকাৰ ভাই আৱ মতিয়াৱেৰ সহায়তায় যতোদূর সম্বব কানেকশনগুলো ঠিক কৰা হলো। বড় ভাই নুৱলু হক আৱ পিণ্ডু মকতু মিয়া আৱ মতিনেৰ সাহায্য নিয়ে বড়ো বড়ো মাটিৰ চাকতি এনে চাৰ্জগুলোৰ ওপৰ চাপা দিতে লাগলো। গোলাম মোস্তফা আৱ আখতাৱও তাদেৱ সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিন্তু এখন সতৰ্ক থাকতে হচ্ছে চলাচলেৰ সময় তাদেৱ পা লেগে আবাৱো যাতে সার্কিটগুলোৰ ক্ষতি না হয়। মাটি চাপা দেয়াৰ কাজ শেষ হলো। এবাৱ সবকিছু প্ৰস্তুত।

ওৱা সবাই পেছনে চলে গেলো। নাদেৱ আৱ খলিকে উইথ ড্র কৰা হলো। ঠিক হলো, আমি আৱ গোলাম গটস—আমৰা দু'জন সেফটি ফিউজে আগুন দেবো। সেফটি ফিউজ মিনিটে দু' ফুট কৰে জুলবে। তিন ফুটেৱ এক একটি সেফটি ফিউজেৰ অপৰ প্ৰাপ্ত ডেটোনেটোৱ মধ্যে ঢোকানো। ডেটোনেটোৱ আবাৱ বোতলেৰ কৰ্কেৰ মতো দেখতে প্ৰাইমারেৰ মাঝখানকাৰ সৰু গৰ্তে ঢোকানো। বিভিন্ন চাৰ্জেৰ সাথে গিট দিয়ে লাগানো কাৱটেক্সেৰ লাইনগুলোকে এনে প্ৰাইমারেৰ চাৱদিকে শক্ত কৰে বাঁধা হয়েছে মাথাৰ দিকেৰ কিছুটা বাদ দিয়ে। এখন সেফটি ফিউজে আগুন দিলে, মিনিটে দু' ফুট কৰে জুলে এসে ডেটোনেটোকে ফাটাবে। ডেটোনেটোৱ ফাটাবে প্ৰাইমাৰ। প্ৰাইমাৰ ফাটাবে কাৱটেক্সকে। আৱ কাৱটেক্স সেকেন্ড স্প্ৰিং ৬০ মিটাৰ হাৱে ফাটবে এবং সেই সাথে প্ৰচণ্ড বিস্ফোৱণ ঘটবে এক্সপ্ৰেসভেৰ তৈৱি চাৰ্জগুলোতে। সেই বিস্ফোৱণ ত্ৰিজেৰ কাঠেৰ থামগুলোকে গুড়িয়ে দিয়ে। ওপৱে পাটাতনেৰ সাথে গাৰ্জাৰে লাগানো প্ৰেসাৰ চাৰ্জগুলো বিস্ফোৱিত হয়ে আজিটাকে বসিয়ে দেবে নিচেৰ দিকে। মোট পাঁচটা সার্কিটেৰ মাথায় লাগানো সেক্ষত ফিউজে আগুন দিতে হবে।

— গোলাম গটস, রেডি?

— ইয়েস।

— দেন টার্ট।

দু'জনার হাতে সেফটি ম্যাচ জুলে উঠলো। সেফটি ম্যাচেৰ আগুন কিন্তু সাধাৱণ ম্যাচেৰ কাঠিৰ মতো জুলে না। সাধাৱণ ম্যাচেৰ মতো দেখতে হলেও এৱ কাৱটিগুলোৰ মাথাৰ বাৰুদ কিছুটা লালচে রঙেৰ এবং বাৰুদেৰ পৰিমাণ বেশি থাকায় মাথাগুলো মোটা দেখায়। সাধাৱণ ম্যাচে পাশ ঘষেই এৱ কাঠিৰ বাৰুদ জুলাতে হলেও, এৱ আলো উজ্জ্বল হয় না এবং দূৰ থেকে দেখাও যায় না। সিগারেটেৰ মাথাৰ জুলন্ত আগুনেৰ মতোই অনেকটা দেখতে এৱ আলো।

আগুন দেয়া হলো। চাৱটিতে আগুন জুলছে ফ্ৰঞ্চ শব্দ তুলে। কিন্তু পঞ্চম সেফটি ফিউজটাতে আগুন লাগছে না। আমি চেষ্টা কৰছি একটাৰ পৰ একটা কাঠি জুলিয়ে। গোলাম গটস অস্থিৰ হয়ে উঠেছে। বললো, ওঠেন, চলেন মাহবুব ভাই। পালান, এখনই বাৰ্ষ হবে।

— দাঁড়াও এটা লাগিয়ে নিই।

— না না, আৱ সময় নেই, ওঠেন—বলেই ও দৌড়াতে লাগলো, আৱ ঠিক সে সময়ই জুলে উঠলো পঞ্চম সেফটি ফিউজ। মাথা নিচু কৰে প্ৰাণপণে দৌড়ে এসে

বিজের মাথার কাছে রাস্তার বাঁকটার ওপর মাটিতে বুক ঠেকিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথা ফেরাতেই দেখি প্রচণ্ড আলোর বলকানি। এবং তার পরপরই কড়াৎ-বুম-কড়াৎ-বুম শব্দ তুলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের সেই শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা। বুকের নিচেকার মাটি ধাক্কা দিয়ে উলটে ফেলতে চাইলো, বিপুল বেগে ঝাকুনি খেতে লাগলো যেমনো আশপাশের সবকিছু। পরপর চারটা বিস্ফোরণ হলো, কিন্তু পঞ্চমটা? হায়, সেটা বিস্ফোরিত হলো না।

বিস্ফোরণের তাওব শেষ হওয়ার একটা অস্বাভাবিক উভ্রেজনাকর অবস্থা থেকে স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগলো। আর সেটা হতেই বিজ ধৰ্মসের পরিমাপ করার জন্য বন্য জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলাম বিজের মাথায়। চারদিক ঘোয়ায় আচ্ছন্ন। বাতাসে পোড়া বারুদের গন্ধ। তার ভেতরেই দেখলাম, বিজের বাঁ পাশটা বসে গেছে। প্রায় দশ বারো ফুট এলাকার কাঠের পাটাতন গেছে উড়ে। নড়বড় করছে এবন বিজটা। কেবল একটা চার্জ বার্ষ হয় নি। এছাড়া ছিঁড়ে যাওয়া সাকিটগুলোও ঠিকমতো লাগানো যায় নি। সবকিছু ঠিকঠাক মতো হলে আর পঞ্চম চার্জটা বিস্ফোরিত হলে, বিজটা পুরোপুরি ধসে পড়তো। কিন্তু তা আর হলো কই! মনটা তাই ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। অবিস্ফোরিত চার্জ এবং কারটেক্সগুলো টেনে টেনে খুলে নেয়া হলো। দলপতি বড় ভাই তাড়া দিলেও চলো, যা হওয়ার হয়েছে, দেরি করলে বিপদ হতে পারে।

— ফিরছি।

— একটু দাঁড়ন, একটা প্রেনেড মার্জ করি, গোলাম গড়স কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে গেলো বিজের মাথায় এবং অনেকটা উদ্ভাবনের মতোই পিন খুলে হাতে ধরা প্রেনেডটা গড়িয়ে দেড়ে দিলো বিজটার ওপর। এবার আর পজিশনে নয়, দৌড়ে পিছিয়ে এলাম স্বত্ব। একটা অগ্নিশমক তুলে সশব্দে বিস্ফোরিত হলো প্রেনেডটা। কিন্তু না, প্রেনেড চার্জেও বিজটার তেমন বিশেষ ক্ষতি হলো না। না হলেও এতে করে গোলাম গড়স যেনো কিছুটা সাজ্জনা পেতে চেয়েছিল। বিজটা পুরো ধৰ্ম করতে না পারার দৃঢ়থে বাচ্চা ছেলের মতোই কাঁদছিলো সে।

১. ৭. ৭৩

গাধা নিয়ে ফেরা

আহিদার টেনগামটা নিয়ে গেটে দাঁড়িয়েই একটা ফায়ার করে বসলো। রাতের নেশ্চন্দ হঠাৎ করেই সেই গুলির আওয়াজে ভেঙে খানখান হয়ে গেলো। ঘনিয়ে আসতে থাক অঙ্ককারয় পরিবেশটা হয়ে উঠলো আরো ভীতিময়।

বাড়িটা চারদিক থেকে উঁচু করে বাঁশের ফালায় তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা। চুকবার মতো রাস্তা নেই। বাঁশের তৈরি মজবুত গেটটা শক্ত করে লাগানো। অঙ্ককারে ছাপিসারে বাড়িটা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কয়েকবার মফিজ মিয়ার নাম ধরে ডাকবার পর আমরা যখন বাড়ির ভেতরে চুকবার রাস্তা খুজছি, ঠিক তখনি আহিদারের টেনগান থেকে সশব্দে একটা গুলি বেরিয়ে গেলো।

বাড়ির ভেতর থেকে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ির শব্দ, কান্না, আর ভীতসন্ত্রিত মানুষের আর্তনাদের শব্দ পাওয়া গেলো। তারপর সব চুপচাপ। শিকার পালিয়ে যাচ্ছে ভেবে ক'জন মিলে বাড়ির পেছন দিকটায় দৌড়ে গেলাম। দেখতে পেলাম, থপথপ শব্দ তুলে হাঁটু পরিমাণ পানি ভেঙে ধানক্ষেত্রটার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কিছু ছায়াযুর্তি। পেছন থেকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলা হলো দু'জনকে। একজন যুবতী মেয়ে, অন্যজন এক বৃন্দ প্রীণ। ঠকঠকিয়ে কাঁপছে মেয়েটা বৃক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে। আর অঙ্ককারে আমরা দু'জন তাদের সামনে যেনে প্রেতাত্মার মতো দাঁড়িয়ে।

— কে তোমরা?

— ও বাড়িতে থাকি। আমি মফিজের বাবা, আর এইটা তার মেয়ে। বৃক্ষের গলায় রীতিমতো ভয়ের কাঁপন।

— মফিজ মিয়া কোথায়?

— পালাইছে।

— আপনারা পালাছেন কেনো?

বৃন্দ কিছু একটা বলতে চাইছেন। কিন্তু ঠিকমতো কথা ফুটছে না গলায়।

— তয় পাবেন না, আমরা মুকিফোজ। আপনাদের কেউ ক্ষতি করবে না। আসুন আমাদের সাথে।

ওদের সাথে নিয়ে ফিরলাম। বাড়িটা সার্ট করা দরকার। মফিজ মিয়া না পালিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে কোথাও। এছাড়া জিনিসেরকম আগ্রহযুক্ত থাকতে পারে। বৃক্ষের সাথে বাড়ির ভেতরে চুকলাম। হাঁকিস্তেনের আলোয় মেয়েটাকে দেখলাম। কম বয়সী শ্যামলা বর্ণের। পরনে রঙিন খামড়। চমৎকার মুখের গড়ন। কিন্তু এখনও ও ভয়ে সিটিয়ে আছে। আমাদের মোটে ঠিকমতো বিশ্বাস করতে পারছে না।

বাড়িতে চুকবার সময় আমাদের সবাইকে সাবধান করে দেয়া হয়েছিলো, খবরদার একটা জিনিসও তেজি ছোবে না। কোনো লুটপাট চলবে না। কেউ কোনো জিনিসের ব্যাপারে লোভ করলে চরম শাস্তি দেয়া হবে তাকে। বাড়ির ভেতরে-বাইরে সেন্ট্রি দাঁড় করিয়ে পিন্টু, আহিদার এবং আরো তিনজনকে সাথে নিয়ে শুরু হলো প্রতিটা ঘরে সার্চের কাজ। মফিজ মিয়া অত্যন্ত ধৰ্মী মানুষ। টিনের দোচালা ঘর সবগুলোই। মোটমাট চারটা ঘর। প্রত্যেকটা ঘর খোলা। অজন্তু মালামালে ভরা। কিছুক্ষণ আগেও ঘরগুলোতে যে লোকজন ছিলো, বিছানাপত্রের অবস্থা সেকথাই বলে দিছে। আমাদের আকস্মিক উপস্থিতি টের পেয়ে তাড়াহুড়ো করে ছুটে পালিয়েছে তারা। প্রত্যেকটা ঘর তন্মতন্ম করে খোঝা হলো। বাড়ির আনাচে-কানাচে টৰ্চ জ্বালিয়ে দেখা হলো। না কোথায়ও নেই মফিজ মিয়া। আহিদার বৃন্দকে ভয়নকভাবে জেরা আর ধমক দিয়ে চলেছে। এক পর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সে বৃক্ষের বুকে টেনগান ঠেকিয়ে বলে উঠলো, বলেন মফিজ কোথায়, তা না হলে গুলি করে দেবো। একটা বন্দুক থাকার কথা, সেটা কোথায়? আমি আহিদারে হাত টেনে ধরে ওকে নিবৃত্ত করে বললাম, মফিজ মিয়া তো পালিয়েছে। যাওয়ার সময় নিচয়ই সে তার বন্দুকটা সাথে করেই নিয়ে গেছে। তার বাবা, এই ইনোসেন্ট বৃন্দকে অথবা অত্যাচার করে লাভ কি?

বাড়ি থেকে দলের সবাইকে নিয়ে বের হয়ে আসবার সময় বৃক্ষকে বারবার করে বুঝায়ে বলা হলো, মফিজ মিয়াকে আমাদের কাছে আধ্যাসমর্পণ করার জন্য, আমাদের হাতে ধরা দিলে সে বেঁচে যাবে। এটাই তার শেষ সুযোগ। অবশ্য তাকে পাকা কথাও দিতে হবে যে, সে আর পাকবাহিনীর দালালি করবে না, তাদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখবে না এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধী কোনো কাজ করবে না। এসব যদি সে ছেড়ে না দেয় এবং সারেভার না করে, তাহলে সে যেখানেই থাকুক, মৃত্যু তার অনিবার্য। আমাদের কথা শুনে বৃক্ষ হঠাৎ করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে আমার দু' পা জড়িয়ে ধরলো আর বলতে লাগলো, হবে বাবা, সব হবে, তোমহারা মোর ছইলটাক্ মারেন নাগে, ওহো আর দালালি কইর বার নাহে—।

এবার নজর গেলো ঘরের দাওয়ার দিকে। গুটিসূটি মেরে মেয়েটি বারান্দার একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গীদের দাঁড়াতে বলে এগিয়ে গেলাম মেয়েটার কাছে।

— তুমি পড়?

— হ্যাঁ, মাথা নাড়লো সে।

— কোন্ ক্লাসে, কোথায়?

— ক্লাস টেনে, ভেতরগড় কুলে।

— আমাদের ভয় পেয়েছো?

নিরুত্তর ও। তবে চোখের চাউনিতে উজ্জ্বলতা। বড় মায়াকাড়া চেহারা মেয়েটার।

আবার জিগ্যেস করি ওকে—

— কি নাম তোমার?

— মুনিরা, মুনিরা বেগম।

— আচ্ছা ঠিক আছে, ক্ষয় পেয়ো না আমরা যাচ্ছি। দেখলেতো, আমরা তোমাদের কোনো ক্ষতি ক্ষতি নি। মুক্তিফৌজুরা কখনো কারো ক্ষতি করে না। তোমার আকরাকে বলবে আমাদের কথা।

— বলবো।

— তুমি স্বাধীনতা চাও না?

মুহূর্ত কয় নীরব থাকার পর মুনিরার স্পষ্ট জবাব, চাই, চা-ইতো।

— তাহলে দেখে নিও, আমরা ঠিকই স্বাধীনতা আনতে পারবো।

খাটি দালাল, পাকিস্তানপ্রেমিক মফিজ মিয়ার ক্লাস টেনে পড়া কিশোরী মেয়েটিও স্বাধীনতা চাইছে। অবাক ব্যাপার! মন বলে উঠলো, স্বাধীনতাকে ঠেকাবে কেমন করে পাকবাহী? সে ঠিকই আসবে।

দালাল পাকবাহিনীর দোসর মফিজ মিয়াকে ধরা গেলো না। কিন্তু কিছু একটা তো নিয়ে ফিরতে হয়। তাই মালেক আর খলিল একটা শাদা খচর নিয়ে টানাটানি করতে লাগলো। তিনটা গরু গোয়াল থেকে বের করে আমলো একরামুল আর মিনহাজ। মিনহাজ আসলে হিসেবি মানুষ। সে আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার। এখান থেকে নেয়া গুরুগুলোকে সে লঙ্ঘনখনার কাজে লাগাবে বলেই তার এতো পশু

টানাটানি নিয়ে কসরত ।

ফিরতিপথে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি । বৃষ্টির প্রচও ধারা মাথায় নিয়ে আমরা ফিরছি ।
পেছনে পেছনে আমাদের সেই গাধা আর গরুর গলায় দড়ি পরিয়ে তা টানছে ওরা ।

সকালে শংকর আসতেই তার নজর গেলো শাদা গাধাটার দিকে । হাসি মুখে
তিনি বললেন—

— ইয়ে কেয়ারে?

— ঘোড়া, টাটু ঘোড়া ।

— নেহি ইয়ার, ইয়ে তো গাধা হ্যায় ।

— নেহি ।

— তব শালে ইয়ে গাধেকো কিউ ঝ্যাহা লায়া হ্যায়?

তিনি বসলেন সকলের সাথে । চা এলো । চায়ের মগ হাতে নিয়ে মেজের তার
কথা বলে চললেন । ওরা অমানুষ, হীন পশুদের চেয়েও অধম । ওরা তোমাদের মা-
বোনদের ইঞ্জিত লুট করছে, আর দালালরা তাদের মদদ দিছে, তোমাদের মা-
বোনদের ধরে নিয়ে গিয়ে যোগান দিছে তাদের ঘাঁটিতে । পাক আর্দ্ধ তাদের
অত্যাচার করছে, রেপ করছে, হত্যা করছে । এটা অত্যন্ত অন্যায় আচরণ, অমানবিক
ভূলুম ।

কথা বলতে বলতে মেজের উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তোমরা এর প্রতিশোধ নিতে
পারো না! যাও, তোমরাও সেই দালাল আর পিকবাহিনীর পাচাটা কুসাদের ওপর
প্রতিশোধ নাও, তাদের মা-বোনদের অত্যাচার চালাও । ধরে নিয়ে এসো
তাদেরও ইয়ং মেয়েদের । রেপ করে ক্ষমতার সেইভাবে, যেভাবে ওরা করছে । ছাড়বে
না কখনও দালালদের, কখনও না কখনে রাখবে, ঘরের শক্র বিভীষণ ।

মেজের শংকর হয়তো উত্তেজিত বেশি বলে ফেলেছেন । মুঞ্জের ময়দানে তাঁর
প্রস্তাৱ সৈনিকদের জন্য লেক্টুনায় সম্দেহ নেই । কিন্তু ঠোটের মুখে জবাব এলেও, তা
বলতে পারি নি । বলতে পারি নি, স্যার কাল রাতে হাতের মুঠোয় দালালের মেয়ে
পেয়েও আমরা ছেড়ে দিয়ে এসেছি । কিছু করতে পারি নি । আমরা পাকিস্তানি পশু
হতে পারি নি । হোক না ওরা দালালের শক্রপক্ষের মেয়ে । কিন্তু ওরা তো বাঙালি ।
আমাদেরই ফেলে আসা মা-বোনদের মতো অসহায় । নিজের বোনের ইঞ্জিত কি
কেউ নিতে পারে?

২. ৭.১৯৭১

সোনারবানের সোনা মিয়া

সোনারবানের সোনা মিয়া খবর পাঠিয়েছে, সে সারেভার করতে চায় । খবরটা নিয়ে
এলো মকতু মিয়া । আমরা ক'জন গোল হয়ে বসেছি বড় ভাইয়ের তাঁবুতে । দালাল
সোনা মিয়ার সারেভারের ব্যাপারটা নিয়েই আলোচনা চলছে । কোয়ার্টার মাস্টার
মিনহাজ চা-পানের আয়োজন সম্পন্ন করতে ব্যস্ত । কিছুক্ষণের মধ্যেই এক রংগ করে
চা এসে গেলো প্রত্যেকের হাতে হাতে ।

প্রথম রাতে মকতু মিয়া, হাজী সাহেব এবং তাদের দলের প্রচণ্ড অনুরোধ ও কাতর অনুনয়ের জন্য সোনা মিয়ার বাড়িতে অপারেশন করা হয় নি। কিন্তু সে এখনও টাগেট হয়ে রয়েছে আমাদের। সে রাতে সে বেঁচে গেলেও যে-কোনো রাতে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আমরা হাজির হতে পারি সোনা মিয়া মেষারের বাড়িতে। সে আমাদের টাগেট এবং তাকে হত্যা করা হবে, এ খবরটা ভালোভাবেই পৌছে গেছে তার কাছে। স্থাভিকভাবেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে সে। আর সে কারণেই মুসলিম লীগার শাস্তিবাহিনীর সদস্য সোনা মিয়া খবর পাঠিয়েছে সারেভার করবে বলে। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন সে হাত মেলাতে চায় দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধরত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে।

আলাপ হচ্ছিলো এ ব্যাপারটি নিয়েই। সোনা মিয়া একজন ইউনিয়ন পরিষদের মেসার। মাতৰুর ব্যক্তিও। আর এ হিসেবে সে তার নিজ গ্রাম সোনারবানসহ আশপাশের এলাকায় অত্যন্ত জনপ্রিয়। তার মতো লোক হাতে থাকলে, ভেতরগড়ের দক্ষিণাঞ্চল, তালমা নদীর এ-পার পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণটাই আমাদের হাতে এসে যাবে। শুধু তাই নয়, সোনা মিয়া আর তার লোকদের সাহায্য নিয়ে শক্ত এলাকার অনেকদূর পর্যন্ত যাওয়া যাবে, অমরখানা পক্ষগড়ের মাঝ বরাবর শক্তির ঘাটি জগদলহাটের উপর আঘাত হানা যাবে। আক্রমণের গতিও করা সম্ভব কিপুর। আর এইভাবে প্রচুর ক্ষতি করা সম্ভব হবে শক্তপক্ষের। সুতরাং সিদ্ধার্থ কুমাৰ, সোনা মিয়ার সারেভারের গ্রহণ করা হবে। আলোচনা শেষে নির্ধারণ করা হয়ে সারেভারের স্থান। স্থানটা হলো বাংলাদেশ-ভারতীয় সীমান্তের উচু গড়। একদিন সকাল ১০টা থেকে ১১টাৰ মধ্যে সোনা মিয়াকে সেখানে আসতে হবে।

জবাব ভাই, পিটু, আহিমাৰ আমি, এ চারজন নির্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে ভারতীয় দিক থেকে গড়টাৰ ক্ষেত্ৰে এসে উঠলাম। ওপারে বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ। একটা নাম-না-জানা আবেগ এসে উঠৱ কৰলো মনের গভীৰে। অন্য রকম একটা অনুভূতিতে মনটা ছেয়ে যেতে লাগলো। দিনেৰ বেলায় দেশটা যেনো আমাদের নয়। রাতে ছাড়া দিনেৰ আলোতে সীমান্ত পার হতে পারি না, নিজেদেৰ দেশে চুকতে পারি না। নিরাপত্তাজনিত কাৰণে দিনেৰ আলোয় দেশে চুকবাৰ অনুমতি নেই আমাদেৰ। এসব ভাৰতে ভাৰতেই বাংলাদেশেৰ দিকে গড়েৱ ঢালুৰ প্রাণ্টে এসে বসলাম আমৱা চারজন।

ওৱা এলো গড়েৱ দক্ষিণ দিকেৱ ঢালুৰ প্রাণ্টে দিয়ে। ধীৱ পায়ে উঠে আসতে লাগলো ওৱা। ওদেৱ দেখে আমৱাও উঠে দাঁড়ালাম এবং এগুতে লাগলাম ওদেৱ লক্ষ্য কৰে। লৰা চওড়া আৱ শক্ত কাঠমোৰ শৰীৰ এবং উজ্জ্বল গায়েৰ বৰ্ণেৰ সোনা মিয়াকে পৱিচয় কৰিয়ে দিতে হলো না। অনেকটা দৌড়ে এসে আমাদেৰ সবাৱ সাথে হাত মেলালো সে। আমৱা হাসলাম, হাসলো ওৱাও। তাৱপৰ আমৱা বসে পড়লাম গড়েৱ ঢালুৰ প্রাণ্টে।

এই সেই সোনা মিয়া— মুসলিম লীগার, শাস্তি কমিটিৰ সদস্য, পাকবাহিনীৰ বড় ধৰনেৰ দালাল হিসেবে সে পৱিচিত, যাকে ক'দিন আগে আমৱা হত্যা কৰতে

ଗିଯେଛିଲାମ, ମେ ଏବନ ଆମାଦେର ହାତେର ମୁଠୀୟ । ତାର ମନେର ଭେତରେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଭୟ ଏବଂ ସନ୍ଦିକ୍ଷ ମନୋଭାବ ଏହି ମୁହଁରେ ସେ ଲୁକୋତେ ପାରଛେ ନା । ମୁଖ୍ୟାନା କିଛୁଟା ଫ୍ଳାକାଶେ, ଘନ ଘନ ଇତିଉତ୍ତି ତାକାଛେ । ଆର ଯମହେ ଭୀଷଣଭାବେ । ଗାମଛାର ଖୁଟ ଦିଯେ ମୁଖ ମୁଛଛେ ବାରବାର ।

- କେମନ ଆହେନ ସୋନା ମିଯା? ମୁଖ ଖୁଲଲାମ ଆମି ।
— ଭାଲୋ, ଆପନେରା?
— ଭାଲୋ, କିଛୁକଣ ତାର ଚୋଖେ ଦୃଷ୍ଟି ବେବେ ଜିଗ୍ଯେସ କରିଲାମ । ସାରେଭାର କରିବେନ?
— ଜି । ମାଥା କାତ କରେ ରାଜି ହୋଇବାର ବୀକୃତି ଜାନାଲୋ ମେ ।
— ସତିଯିଇ ସାରେଭାର କରିବେନ?
— ଜି, ସତି ।
— ଓଦେର ସାଥେ ଆର ଯୋଗାଯୋଗ ରାଖିବେନ ନା?
— ଜି ନା, ନା । ଦୃଢ଼ତା ସୋନା ମିଯାର କଟେ ।
— ଠିକ?
— ଠିକ, ଯେ-କୋଣେ ଧରନେର କସମ ଥାଇତେ କନ, ରାଜି ଆଛି ।

ବେଶ କିଛୁକଣ ତାକିଯେ ଥାକଲାମ ସୋନା ମିଯାର ମୁଖର ଦିକେ, ଚାଇଲାମ ପିନ୍ଟୁ, ଆହିଦାର ଆର ଜବାର ଭାଇୟର ଦିକେ । ତାଦେର ଚୋଖେ ପ୍ରକଟିତ ହିସିତ ।

— ଠିକ ଆଛେ, ହାତ ମେଲାନ ସୋନା ମିଯା, ଅପରାଧର ସାରେଭାର ଗ୍ରହଣ କରା ହଲୋ ।
ସୋନା ମିଯା ସବାର ସାଥେ ଉଠେ ଏସେ ହାତ ମେଲାଲୋ ଏକ ଏକ କରେ । ଆର ବଲତେ ଲାଗଲୋ, ଆମାକେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଦେବତା, ଆମି କଥନ ଓ ବୈମାନି କରମୁ ନା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରମୁ ନା ।

ସାରେଭାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ହଲେ ମିତାତ ସାଦାମାଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଲେ ଓ ଘଟନାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମାଦେର କାହେ ।

ଏହି ମଧ୍ୟେ ସୋନା ମିଯାର ଲୋକଜନ କିଛୁ ଖାବାର ବେର କରେଛିଲୋ । ଆମାଦେର ଜନ୍ମାଇ । ନିଷେଧ କରିଲାମ । ଆମରା ତାକେ ସିଗାରେଟ ଦିଲାମ ଚାର ମିନାର । ତାର ବଦଳେ ମେ ନିଜେର ପାଞ୍ଜାବିର ପକେଟ ଥେକେ ବେର କରିଲୋ ମତି ବିଡ଼ି । ଆମରା ତାର ମତି ବିଡ଼ି ଟାନିତେ ଲାଗଲାମ । ମେ ଆମାଦେର ଚାର ମିନାର । ଏ ପର୍ଯ୍ୟାମେ ସୋନା ମିଯା ତାର ନିଜେର କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରିଲୋ ।

ମେ ନିଜେ ଏକଜନ ମୁସଲିମ ଲୀଗର ଏତେ କୋଣେ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । ପିସ କମିଟିତେ ତାର ନାମ ଆଛେ, ଏଟାଓ ଠିକ । ଏତୋଦିନ ପାକିସ୍ତାନେ ପକ୍ଷେ ଦାଲାଲି କରେଛେ, ତାଓ ମେ ଅସ୍ଥିକାର କରେ ନା । ପାକ ଆର୍ଥି ତାର ବାଡିତେ ଏସେହେ କଯେକବାର । ମେ ନିଜେ ଓ ପାକିସ୍ତାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲୋ । ଶେଲ ସନ୍ତାହେତେ ତାର ବାଡିତେ ଖାନସେନାରୀ ଏସେଛିଲୋ । ପ୍ରାୟ ୧୨/୧୩ ଜନ । ଏ ଘଟନା ଶାଲମାରା ତ୍ରିଜ ଓଡ଼ାନୋର ଦୁର୍ଦିନ ଆଗେକାର । ମେ ତାଦେର ଯଥେଷ୍ଟ ଆପ୍ୟାଯନ କରେଛେ । ଗାଛ ଥେକେ ଡାବ ପେଡ଼େ ଦିଯେଛେ । ଖାସ ଜବାଇ କରେ ପୋଲାଓ-କୋର୍ମା କରେ ଖାଇଯେଛେ । ଦୁଟୋ ଖାସି ଏବଂ ଏକ ଡଜନ ମୁରାଗି ଯୋଗାଡ଼ କରେ ଦିଯେଛେ । କିନ୍ତୁ ଖାନସେନାରୀ ତାତେତେ ଖୁଣି ହ୍ୟ ନି । ତାରା ବାଡିର ଭେତରେ ଚୁକେଛେ । ତାର ଶୋବାର ଘରେ ଢୁକେଛେ । ମେଖାନେ ଗିଯେ ତାରା ପେଯେଛେ ତାର ଛୋଟ ବଉକେ । ପେଯେଛେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରେଓ

লুকিয়ে থাকা অন্য আর বউ-বিদের। আর পালাক্রমে পাশবিকভাবে ধর্ষণ করেছে তাদের। তার বউকে ধরার সময় সে বাধা দিতে গিয়েছিলো। তখন তারা প্রচণ্ডভাবে প্রহার করেছে তাকে। এ পর্যন্ত বলে সোনা মিহা কেঁদে ফেলে ঝরঝর করে। গামছা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সে বলে, ঘরের ইজ্জত গেলে আর কী থাকে বলেন?

সোনা মিয়া কান্নাজড়িত কঠে বলছিলো, আমার কর্মের ফল আমি পেয়েছি। পাপীদের সাথে থেকে আমিও অনেক পাপ করেছি। আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি। আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাই, প্রাণভিক্ষা চাই। এ পাকিস্তানি কুতু আর শয়তানের বাচাদের সাথে আর নয়। বলেন, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন? আপনারা আমাকে বাঁচান, আমার প্রাণভিক্ষা দিন।

সোনা মিয়া স্বত্বাবতই তার প্রাণভিক্ষা পেলো। আর আমরা পেলাম ভেতরগড় এলাকায় আমাদের অপারেশন পরিচালনার কাজে বিরাট এক সহায়ক শক্তিকে। সোনা মিয়া আমাদের সব ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো এবং দেখিয়ে দিলো, তার অনুগত বশব্বদ জোনাব আলীকে। এখন থেকে জোনাব আলী তার পক্ষ থেকে সব ধরনের যোগাযোগ রাখবে আমাদের সঙ্গে।

হালিম মাস্টারের বদলে ওসমান

টার্গেট সরদার পাড়ার হালিম মাস্টার এবং ওসমান শুসলিম লীগার হালিম মাস্টারের কাছে রাইফেল আছে এবং তার নিয়মিত যাহাতে আছে দখল করে রাখা পঞ্জগড় এলাকায়। হালিম মাস্টার তার ছেলেদের মধ্যে সরদার পাড়ার আর সবাইকে সঙ্গে করে বীতিমতো একটা প্রতিরোধ গড়ে তৈরেছেন। পাকবাহিনীকে নিয়ে আসছে তার বাড়িতে। তাদের সাথে রাখছে নিয়মিত মেগামোগ। শুধু তাই নয়, এদিককার সব খবরাখবরের যোগান দিচ্ছে পাকবাহিনীকে স্মার্যিমত। সুতরাং হালিম মাস্টারকে ধরতে হবে। আমাদের এই অভিযানে যেকোনো রকম বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে খতম করে দেয়া হবে তাকে। হালিম মাস্টারকে না পাওয়া গেলে ওসমানকে ধরতে হবে। আজকাল পাকবাহিনীর এজেন্ট হিসেবে সে কেবল কাজ করছে না, এলাকায় সৃষ্টি করেছে সন্ত্রাসেরও। পাকবাহিনীকে প্রায় নিয়মিত গাইড করে নিয়ে আসছে এলাকায় এবং তাদের অত্যাচার ও ধ্বন্দ্বলীলায় করছে সহযোগিতা। ওসমান নিজে একজন টেরের হয়ে উঠেছে এ অঞ্চলে। সুতরাং তার জন্যও পরোয়ান বয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা।

রাত দশটার দিকে সীমান্ত পার হলাম। আজকের দলটা বেশ বড়ো এবং শক্তিশালীও। জবাব ভাই, পিন্টু, আহিনীর আর গোলাম গউসসহ প্রায় সব ছোটবড় কমান্ডার আজকের এই অপারেশনের কাজে দলভূক্ত। এবং আমাদের সকলের চাইতে বয়সে প্রবীণ বড় ভাই নুরুল্ল হক দলনেতা।

এর মধ্যেই ক'দিনের চলাফেরায় সব রাস্তাঘাট আমাদের মোটামুটি চেলা হয়ে গেছে। আমের লোকদের সঙ্গে জনাশোনা হয়ে গেছে। তাদের বিষ্঵াস, আঙ্গ আর বন্ধুত্ব অর্জন করা গেছে। তাদের ভেতর থেকে তলান্টিয়ার হিসেবে গাইড পাওয়া গেছে। সুতরাং, চলার পথে এখন আমরা অনেকখানিই নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ।

মতিয়ার আর খলিল ক্ষট হিসেবে আগে আগে যাচ্ছে। আমরা পেছনে পেছনে, আগুপিচু করে এগুচ্ছে সবাই। যথারীতি রাতের নিষ্ঠকতা ভেদ করে হামের মানুষজনের রাত-প্রহরার চিংকার ভেসে আসছে কানে। শায় থেকে গ্রামাঞ্চলের অবধি দ্রুণিত-গ্রতিধ্বনিত সেই শব্দ।

দিনে খানসেনাদের ভয়, রাতে ডাকাতের। মানুষের শ্বষ্টি আর শাস্তি বলতে কিছুই নেই। কী অস্তুতভাবে পরিবর্তিত আজ চির শাস্তিময় গ্রামীণ বাংলা!

হাজি সাহেবের বাড়ির বাইরের উঠোনে বসা গেলো কিছুক্ষণ। সেন্দিনকার সংবাদ পরিবেশন করলো ওরা আমাদের কাছে। রাস্তাঘাট নিরাপদ। খানসেনারা এদিকে নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে এগুনো যেতে পারে। যকতু মিয়া এবারও আমাদের সঙ্গী। কিছুদূর এগিয়ে এলে মতিনদের বাড়ি। মতিন আমাদের অপেক্ষাতেই ছিলো। সেও সাথি হলো। আজকের রাতের গাইড মতিন।

মতিনের দিকনির্দেশনাতো এগুতে লাগলাম আমরা। আগের দিন মালেককে পাঠানো হয়েছিলো সর্দারপাড়ার হালিম মাস্টারের বাড়ি রেকি করবার জন্য। মালেক বেঁটেখাটো ধরনের ১৫/১৬ বছরের একজন কিশোর মাত্র। এমনিতে তাকে দেখে কারুরই বুঝবার উপায় নেই, সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তি মিয়ার সাথেই গিয়েছিলো মালেক দিনের বেলা। হালিম মাস্টারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে হেঁটে, লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলে সে সমস্ত সর্দার পাড়াটা রেকি করে আসছে। বড়ো রাস্তা থেকে নেমে একটা ছেট ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যেতে হালিম মাস্টারের বাড়ি। রাস্তাটা চলে গেছে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে। চারপাঁচের নানান ধরনের গাছগাছালি, বিরাট বাঁশবাগান। বড় বড় বেশ কটা নেহানো খড়ের ঘর। মোটামুটি সচল পরিবার। মালেক মিয়ার কাছ থেকে বারবুর দেখে মোটামুটি একটা ছুক ছেঁটে ফেলেছি বাড়িটার। পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে মেল্লিবেহ। বাধা যদি না আসে, তবে ভালোই হয়। কিন্তু বাধা যদি আসে সিদ্ধান্ত হয়েছে, তাহলে সবকিছু খতম করে দেয়া হবে।

কথাটা মতিনই বললো, ওসমানকে ধরবেন? ও আজ বাড়িতে আছে।

— সত্যি?

— হ্যা।

ওসমানের বাড়ি পার হয়ে তারপর যেতে হবে হালিম মাস্টারের বাড়ি। হালিম মাস্টারের বাড়ি হামলা হলে ওসমান পালাবে। ওকে আর ধরা যাবে না। এবং এই ঘটনার পরিণতিতে কাল সে নিশ্চিতই খানসেনাদের নিয়ে আসবে গ্রামে এবং এলাকা জুড়ে বইয়ে দেবে অত্যাচার আর ধর্ষনের তাওবলী। সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য চলার বিরতি দেয়া হলো। নিজেদের মধ্যে করা হলো পরামর্শ। পরামর্শের পর গ্রহণ করা হলো এই সিদ্ধান্ত। হালিম মাস্টারের বদলে ওসমানকেই ধরা হবে আগে। সময় সুযোগ পেলে আজ রাতেই কিংবা পরে হালিম মাস্টারকে ধরা হবে।

ওসমানের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই মতিন পিছিয়ে গেলো। চাদর দিয়ে মাথা মুড়ে সে হাঁটছিলো। ভয়, যদি কেউ তাকে চিনে ফেলে। আমরা তো ফিরে যাবো, তাকে তো থাকতে হবে এ এলাকাতেই। মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড করছে সে, এ খবরটা প্রচার

হলে যে-কোনো মুহূর্তে তার এবং তার পরিবারের ওপর নেমে আসতে পারে বিপদ। সেজন্যই এই সাবধানতা।

জেলা বোর্ডের রাস্তা থেকে ২০০ গজের মধ্যে ওসমানের বাড়ি। একটা আলপথ গেছে বাড়িটা পর্যন্ত। খুব দ্রুততার সঙ্গে ঘিরে ফেলা হলো বাড়িটা। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে কারা যেন শুপধাপ শব্দ তুলে পালাবার চেষ্টা করছে। থামতে বলা হলো সবাইকে। কিন্তু লোকগুলো থামলো না।

নির্দেশ পেয়ে মোতালেব ফাঁকা ফায়ার করলো কয়েক রাউন্ড। কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ দৌড়ে এসে পারে পড়ে গেলো মুহূর্তেই। ভয়ে-আতঙ্কে কাঁদতে লাগলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। একটা যুবতী মেয়ে জবুথুবু হয়ে বসে আছে এক পাশে। ভয়ে কাঁপছে সে। সবাইকে উঠতে বললাম। উন্নত পাশের কাঁচা ঘরটার বেড়া যেষে লাইন করে দাঢ়ালো সবাই।

আকাশে মেঘ চেরা বাঁকা চাঁদ। চেরাচর ভুড়ে জ্যোৎস্নার নরম শিশু আলো। তয় পাওয়া লোকগুলোর উদ্দেশে বলা হলো, আমরা মুক্তিকৌজ। কারো কোনো ক্ষতি হবে না। কোনো লুটরাজ হবে না। মুক্তিকৌজদের তয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা শুধু ওসমানকে চাই। ওকে আমরা নিয়ে যাবো। ওসমান কোথায় বলো?

কোনো উন্নত নেই লোকগুলোর তরফ থেকে। যাকের জিগ্যেস করলাম, ওসমান কোথায়?

এবারও উন্নত নেই।

চাঁদের আবছ আলো-আঁধারিতে মুক্তিকুলোর মুখ অতোটা ভালো করে দেখা যায় না। তাই আহিদারকে এবার ওর দ্রুততর ধরা টর্চলাইটটা জুলাতে বললাম। মোতালেবকে বললাম এগিয়ে আসতে। আহিদার এগিয়ে এসে টর্চ জুলিয়ে আলো ফেললো প্রত্যেকের মূখে। একজন বৃক্ষ, দু'জন কাজের লোক, একজন বৃক্ষ মেয়েমানুষ এবং সবশেষে উজ্জিসিত হঠোঁ একজন কিশোরীর কমনীয় মুখ। মোতালেব তাক করে ধরে আছে তাদের দিকে রাখিফেল। হঠাৎ করে সেই কমনীয় মুখের কিশোরী মেয়েটি এসে পায়ে পড়ে গেলো। কেন্দে উঠলো আর্তন্ত্রে। হাত ধরে মেয়েটাকে তুললাম।

— কোনো তয় নাই তোমার, আমরা তো মুক্তিকৌজ। তোমাদের ভাই। বললাম তাকে।

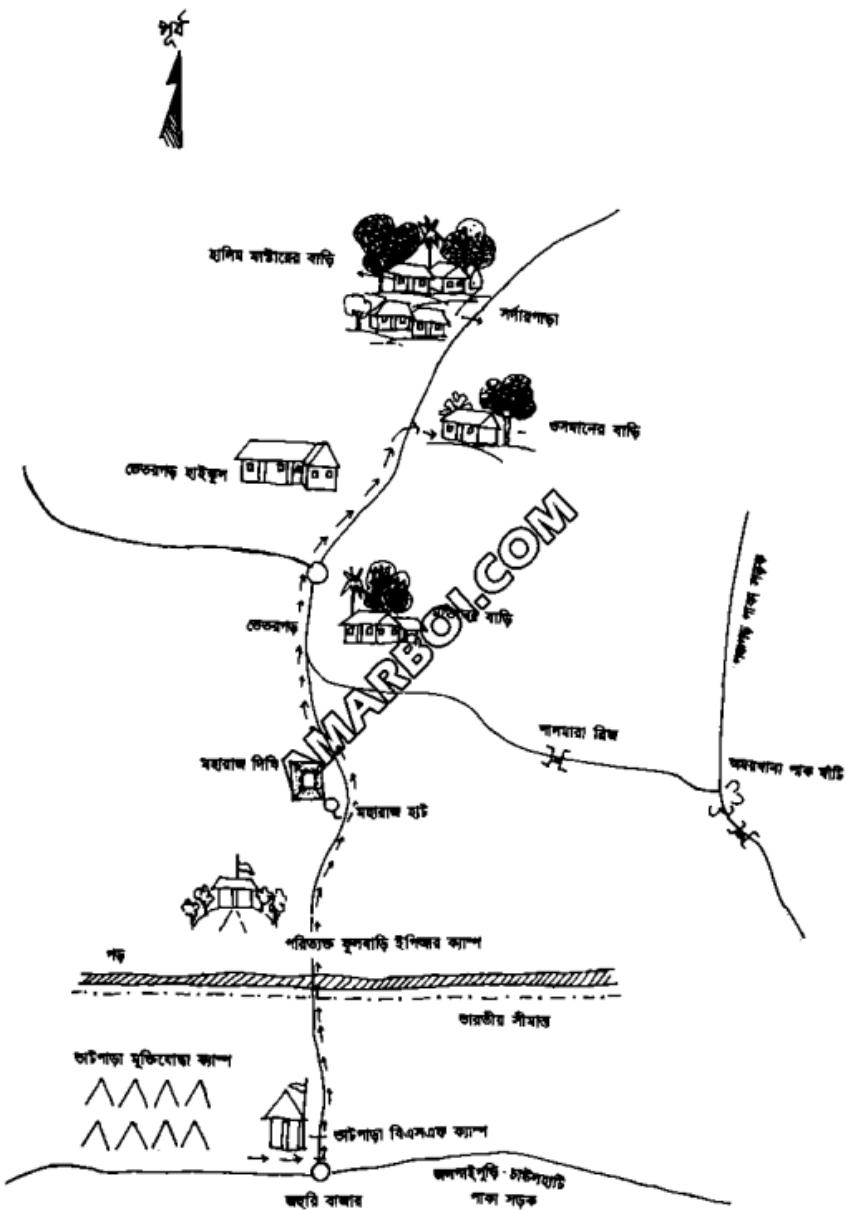
— ভাই? অক্ষুট স্বরে বলে উঠলো মেয়েটি। চাঁদের আলোয় তখন চকচক করছিলো তার চোখ জোড়া। বৃক্ষসহ মেয়েটাকে ঘরে যেতে বললাম। আহিদারকে ইশারা করতেই সে এগিয়ে এলো এবং প্রথম লোকটার পেটের সাথে স্টেনগানের নল ঢেকিয়ে বললো, বল বাটা, ওসমান কোথায়?

— মুই জানো না গো?

— তুই? দ্বিতীয় লোকটাকে আহিদারের প্রশ্ন।

— মুই কহিবা পারিম নি।

— আর তুই? বলে ধৈর্যহীন আহিদার এবার তৃতীয় লোকটার পেটে সোজা প্রচও জেরে স্টেনগানের নল দিয়ে গুঁতো মারলো।



— বাগে বলে বসে পড়তেই তাকে চুল ধরে খাড়া করিয়ে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে এবার বললো আহিদার, বল শালা, নাহলে তোকে মেরেই ফেলবো !

— কহছি কহছি— বলে মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে ইশ্বারায় পুবের বড় ঘরটা দেখিয়ে বললে, ঘরে, ঐ ঘরে ।

ঠিক এমন সময় গুলি হলো পরপর কয়েক রাউন্ড। কার অন্ত থেকে বের হলো, বোঝা গেলো না, কিন্তু ঘরটার ভেতরে ছুটোছুটি আর দাপাদাপির শব্দ হতে লাগলো। তখন বড় ভাই মুকুল হক আদেশের সুরে বলে উঠলেন, ওসমান কোনোদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করো না, আমরা মুক্তিফৌজ, তোমাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে ।

কিছুক্ষণ চৃপচাপ থাকবার পর ঘরের ভেতর থেকে আবার দাপাদাপি শুরু হলো। কেউ যেনে ঘরের পেছনের দিকের বেড়া কিছুটা ফাঁক করবার চেষ্টা করছিলো আর সেটা নজরে পড়তেই আহিদার চিংকার করে উঠলো আরে, এদিক দিয়ে ভাগছে শালা। কথাটা শেষ হতেই ঘরের ছাদের দিকে জুলত অগ্নিছটা নিয়ে ছুটে গেলো তার হাতে ধরা টেনগান থেকে ত্রাশ। টিনের ছাদ ফুটো হয়ে বেরিয়ে গেলো জুলত সীসাগুলো। ওসমান তখন ঘরের সব দিকের বেড়া ভেঙে বের হয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। আমরা বাইরে থেকে বারবার তাকে সারেভার করতে বলছি। সারেভার না করলে ছেনেড দিয়ে ঘর উড়িয়ে দেয়া হবে, কিংবা অন্যভাবে ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হবে বলে তাকে ভয়ও দেখানো হচ্ছে। কিন্তু সে দরেজা বুলে বের হচ্ছে না। এভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেলেও তার বাইরে বেশীসমাঙ্গস্থ নেই। আমরাও ঘরের বেড়া ভেঙে ঢুকতে পারছি না। ওর হাতে অন্ত স্থানে মেরে বসতে পারে। এ এক উভয় সংকূট পরিস্থিতি। আর বড় ভাইও কোনে কোনোতে দিতে পারছেন না। তিনি শুধু একবার পেছনে, একবার সামনে যাচ্ছেন আর আসছেন। কাঁধে খোলানো তার টেনগান। কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার। হততোমধ্যে কয়েক রাউন্ড গুলি করা হয়েছে। বেশ শোরগোলও হচ্ছে। শুক্রবার্ষিক এলাকায় এভাবে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় ।

বড় ভাইকে বললাম, এবার যদি বের না হয়, তাহলে বেড়া ভেঙে ঢুকতে হবে। দেখো কী করা যায় বলে বড় ভাই ছুটে গেলেন আবার পেছন দিকটায়। তখন জব্বার ভাই ওসমানকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, ওসমান, তুমি যদি এবার বের না হও, তাহলে আমরা আগুন ধরিয়ে দেব ঘরে, বের হয়ে এসো, আমাদের কাছে সারেভার করো, তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা ডাকাত নই, মুক্তিফৌজ।

জব্বারের কথা শেষ হতে-না-হতেই হঠাৎ করে ঘরের উত্তর দিকের কোনাটা ফাঁক করে প্রবল বেগে বের হয়ে এসে পালাতে চাইলো ওসমান। কিন্তু সদা প্রস্তুত গোলাম গাউস বাঁপিয়ে পড়ে সাপটে ধরলো তাকে। সেই সাথে আহিদার এবং আমি। তিনজনে মিলে কাবু করে ফেললাম তাকে মুহূর্তে। ওর বুকে রাইফেল টেকিয়ে হাত পিছমোড়া করে শুরু করে বাঁধা হলো। এরপর ঘরটায় ঢেকা হলো সার্চ করার জন্য।

বেশ সাজানো পরিপাটি ঘর ওসমানের। টেবিলের ওপর একটা ফটোট্যান্ড। সেখানে বাঁধানো একটা মেয়ের ছবি। নিঃসন্দেহে মেয়েটি সুন্দরী। মুখ দুরিয়ে হাসছে মেয়েটি। ছবিটা নেয়া হলো। মতিয়ার ছাদে উঠেছিলো। টেনে-হিচড়ে সে একটা

ভাঙা পুরনো গ্রামোফোন আর কয়েকটা রেকর্ড নিয়ে নেমে এলো। ওসমানের পকেট হাতড়ে কিছু টুকিটাকি জিনিস, কাগজপত্র, পাক আর্মির দেয়া আইডেন্টি কার্ড, কিছু লোকের নামের তালিকা, একটা নেট বই এবং একটা টর্চলাইট পাওয়া গেলো। সবকিছু দেখেশুনে বের হতে রাত প্রায় চারটা বেজে গেলো। ওসমানকে নিয়ে আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। সফল অপারেশন। সবাই খুব খুশি।

ওসমান পুরোভাগে। পিছমোড়া করে তার হাত বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত ধরে মোতালেব-মালেক। আমরা পেছনে। অনেকক্ষণ ধরে প্রচও ধকল গেছে আমাদের ওপরে। ক্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসতে চাইছে। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। পা চলতে চাইছে না। সেই অবস্থাতেই মতিয়ার তার কাঁধে একটা বাঁশের দু'পাশে ঝুলিয়ে নিয়েছে বেশ ওজনের দুটো গাঁটি-বোঝা। অর্থাৎ সেই ভাঙচোরা পুরনো মডেলের ডাউস গ্রামোফোন আর একটা হারমোনিয়াম।

ডেরগড় পৌছুতে পৌছুতে ভোর হয়ে গেলো। ওসমানের চোখ বেঁধে নেয়া হলো।

হিমালয় জেগে উঠলো তার মাথায় সোনালি মুকুট নিয়ে। আমরা সীমান্ত পার হয়ে এলাম।

মেজর শংকর ওসমানকে পেয়ে তো মহাশুশি প্রক্টোস্ট্যান্ডে বাঁধানো মেয়েটার ছবি দেখে ওসমানকে জিগ্যেস করলেন,

— কে হয় মেয়েটা তোমার?

— মায়াতো বোন।

— এখন কোথায়? তাকে তুমি কৈবল্য করবে নাকি?

— ইভিয়াতে, ভইস ভিটা শিশুর্ধী ক্যাম্পে।

— শালে লোগ, তের প্রচুর শরণার্থী ক্যাম্পে রাহতা হ্যায়, আর তোম পাক আর্মিকা সাথ মিল গিয়া আরও গান্দারি করতা হ্যায় তেরা দেশকি সাথ?

ওসমান ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মেজর শংকরের দিকে। ওর চোখে-মুখে প্রবল আতঙ্ক। ওসমান, শংকরের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিলো। মাপ চাইলো বারবার করে।

তাঁবুর বাইরে এসে মেজর শংকর পিন্টুর হাতে ছবিটা দিয়ে বললেন, মিষ্টার ইজ নট শি এ বিউটিফুল গার্ল!

— ইয়েস স্যার, পিন্টুর সকৌতুক সম্পত্তি।

— ডু ইউ লাইক হার? উইল ইউ গো এন্ড সার্চ হার আউট ফরম ভইস ভিটা ক্যাম্প?

— কিসকো লিয়ে স্যার?

— আরে ইয়ার, তেরা লিয়ে, বলে গোফের নিচে বিলিক তুলে হাসতে থাকেন মেজর শংকর। পিন্টুর তখন অশ্঵িন্তে কাঁচুমাচু ভাব। তার অবস্থা দেখে মেজর হেসে উঠলেন হো- হো করে, তার সে হাসি সংক্রান্তি হ্য আমাদের সকলের মধ্যে।

সারাদিন ধরে ওসমানের ওপর জেরা চললো। সরলভাবেই সে সব কথার জবাব

দিলো। জানালো যে, যুদ্ধের আগে সে পঞ্জগড় কলোজে ছাত্রলীগ করতো। জয়বাংলার জন্য অনেক কিছু করেছে। পাকবাহিনী আসার পর সে ইতিয়াতেও কিছুদিন ছিলো। তারপর কী যে হলো, ওসমানের নিজের স্থীকারোভি এরকম, তারপর ফিরে এলাম বাড়িতে। পঞ্জগড় গেলাম। শান্তি কমিটির লোকজনের নজরে পড়ে গেলাম। ওরা তয় দেখালো, প্রলোভন দেখালো। আমি ওদের দলে ভিড়ে গেলাম। আমার জন্য একজন ইপিআর মারা গেছে মহারাজহাটে, আমিই ডেকে এনেছিলাম পাকসেনাদের, ইপিআরটাকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর অনেকটা আচ্ছন্নের মতো সে বলতে থাকে, আমি দোষ করেছি, অন্যায় করেছি, আপনারা আমাকে মেরে ফেলবেন, না?

হঠাতে করে সে আমার পা জড়িয়ে ধরে জোরে ঢুকরে কেঁদে ওঠে, মাহবুব তাই, আমাকে আপনারা মারবেন না।

ক্যাম্পে আমার প্রাধান্যের কথা ওসমান টের পেয়ে বারবার সে আমাকে উদ্দেশ করে অনুনয়-বিনয় করতে থাকে। মাহবুব তাই, আমাকে বাঁচান, আমাকে মারবেন না, আমি আর ফিরে যাবো না, আপনাদের সাথে থেকে যুদ্ধ করবো। আমাকে আর একবার সুযোগ দেন।

রাতে তাকে রাখা হলো বি.এস.এফ ক্যাম্পের হাজার্জাহারে।

পরদিন সকাল দশটায় মেজর শংকর এলেন। কিছুক্ষণ নতুন অপারেশন নিয়ে আলোচনার পর তিনি ওসমানকে তার গাড়ির পেছনে তুলে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কেমন করে ওসমানের বিশ্বাস জনোছিলো? এই আমি তাকে বাঁচাতে পারবো। চোখ বাঁধবার সময় বারবার করে সে ডাকছিলো, মাহবুব তাই, মাহবুব তাই। গাড়িতে তোলার সময়ও তার আকৃতি ভেঙে আসছিলো, মাহবুব তাই আপনি কোথায়, আমাকে বাঁচান। আমি তখন পদচালনার ছিলাম তাঁরুর ভেতরে।

যাওয়ার সময় পিন্টু মেজর শংকরকে মেয়ের ছবিটা প্রেজেন্ট করলো। শংকর ছবিটা নিলেন। বললেন, ইয়েস শি ইজ এ লাভলি গার্ল, আই উইল টেক ইট টু মাই হোম।

মেজরের গাড়িটা চলে যেতেই আমি তাঁরু থেকে বের হয়ে এলাম। দু'চোখ জ্বালা করছিলো। বারবার ওসমানের কাকুতি ভরা কষ্ট ভেসে আসছিলো, আমাকে বাঁচান মাহবুব তাই।

ও হয়তো ভেবেছিলো, আমি ওকে বাঁচাতে পারবো। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তাঁরুর বাইরে অলস পায়ে আমগাছগুলোর তলায় হাঁটছিলাম। হঠাতে নজর পড়লো মতিয়ারের তাঁরুর দিকে। গতকালকের আধা ভাঙা পুরনো ফ্রামোফোনটা ঠিকঠাক করে ওরা ক'জন মিলে বাজানোর চেষ্টা করছে। ভিড় করেছে অনেকেই সেখানে। ফ্রামোফোনে চাপানো রেকর্ড থেকে এক আর্টনাদের মতো গানের সুর আর কথা ধ্বনিত হচ্ছে।

ওসমান গেলো, কিন্তু ওর ফ্রামোফোনটা থাকলো আমাদের সাথে।

রেকি মিশন-তালমা ত্রিজ

এবারকার অপারেশনের টার্গেট তালমা ত্রিজ। প্রথমে রেকি করে আসতে হবে। জানতে হবে ত্রিজের অবস্থান, এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, নির্মাণ পদ্ধতি, সেইসাথে এর প্রতিরক্ষায় শক্তিপঙ্কজ কী ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে এইসব বিষয়।

পঞ্চগড় শহরের প্রায় উপকল্পে এই ত্রিজের অবস্থান। পঞ্চগড় থেকে বেরিয়ে শক্তিপঙ্কজকে ভেতরগড়, হাড়িভাসা, গলেয়া এলাকায় যেতে হয় এই ত্রিজ পার হয়েই। এটা উড়িয়ে দিতে পারলে এইসব এলাকায় শক্তিপঙ্কজের অবাধ বিচরণে বাধার সৃষ্টি হবে, একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল শক্তিমুক্ত রাখা যাবে। স্ট্র্যাটেজিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তালমা ত্রিজকে সুচারুভাবে রেকি করে উড়িয়ে দেয়ার প্রাক-জরিপ বা পরিকল্পনা করে আসতে হবে। সময় মাত্র দু'দিন। মিশনের অন্য দু' সদস্য আমার সাথে রয়েছে অর্থাৎ গোলাম গটস আর মতিয়ার। আমাদের তিনজনের কাছেই একটা করে ঘোড়ে। আর কোনো হাতিয়ার নেই।

সঙ্গে রাতেই রওনা দিলাম আমরা তিনজন। দলনেতা আমি। আমার সহযোগী গোলাম গটস আর মতিয়ার খুবই নিরবেদিত আর সাহসী এফ, এফ। গত ক'দিনের অপারেশনে তাদের অতুলনীয় সাহসিকতা আর যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া গেছে। সফল গেরিলা যোদ্ধা হওয়ার মতো সব ধরনের প্রশংসনীয় অধিকারী ওরা। তাই অনেকটা ভাবনামুক্ত।

এবারের অপারেশনটাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বেং বিপদসমূল। বাংলাদেশের প্রায় ১০/১২ মাইল ভেতরে তালমা ত্রিজের অঞ্চল। শক্তিপঙ্কজ এলাকা। শক্তির মরণ ফাঁদ কোথায়, কীভাবে পাতা, জানা হচ্ছে। রাস্তা ধরে সোজাসুজি যাওয়া চলবে না। তালমা ত্রিজের আশপাশে রাতটা ব্যাপটাতে হবে। দিনের বেলা ত্রিজটা ভালোভাবে দেখতে হবে। রেকি করতে হবে শূটনাটি সবাকিছু। রাত কাটাবার ব্যবস্থাটা আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। সেটা কোনো বাড়িতেও হতে পারে। হতে পারে আবার কোনো ঝোপঝাড়, জঙ্গলের মধ্যেও। এ মিশনে সফল হওয়ার সুযোগ যতোখানি, শক্ত এলাকায় ধরা পড়বার আশক্তাও ততোখানি। ধরা পড়লে হতে হবে নির্ধারণ মৃত্যুর মুখোমুখি। আর সেই মৃত্যু কি ফেরানো যাবে মাত্র তিনটা ঘোড়ে দিয়ে? কে জানে? দেখা যাক কী হয়!

বড় ভাই নুরুল হক রওনা দেয়ার আগে দু'দিনের খাবার হিসেবে শুকনো ঝুঁটি আর চিনি বেঁধে দিয়েছেন স্বত্ত্বে। প্রত্যেকের কোমরে সেই শুকনো ঝুঁটি আর ঘোড়ে গামছা পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

জুলাইয়ের প্রথম দিকের বৃষ্টি ভেজা রাত। ছেঁড়া ছেঁড়া হালকা মেঘের আড়ালে মিষ্ঠি টাঁদের হাসি। স্থিক আলোয় উঙ্গাসিত রাস্তাঘাট, বসতবাড়ি আর ঝাড়জঙ্গল সবকিছু।

ভেতরগড় শেষ হওয়ার পর জেলা বোর্ডের রাস্তাটা ছেড়ে দেয়া হলো। মকতু মিয়ার নির্দেশিত গড়টার নিচ দিয়ে পায়ে-হাঁটা পথে নেমে পড়লাম আমরা। এই ঝোপঝাড় ঢাকা আবছা পায়ে-হাঁটা পথটা আমাদের নিয়ে যাবে তালমা নদীর পাড়ে।

তারপর সেই নদীর তীর যেমনে যেমনে আমরা পৌছে যাবো তালমা ব্রিজে। এখান থেকে তার দূরত্ব প্রায় সাত মাইল। ওখানেই পাকবাহিনীর শক্ত প্রতিরক্ষা ঘাটি। ব্রিজের ওপারে এক মাইলের দূরত্বে পঞ্চগড় শহর। সেখানে রয়েছে পাকবাহিনীর উন্তরাধিকারের সর্বশেষ শক্তিশালী গ্যারিসন।

আমাদের আগে আগে মকতু মিয়া। পেছনে আমরা বাংলাদেশের তিন গেরিলা যোদ্ধা। বুনো জন্মুর মতো বোপবাড় ঠেলে ঠেলে অনাগত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি। একমাত্র ভরসা মকতু মিয়া। আমাদের বুনু, গাইড। ওর হাতে নির্ভর করছে আমাদের জীবন। ওর সামান্য বিশ্বাসঘাতকতায় বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, মৃত্যু হতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে। আমাদের তিনজনেরই। মকতু মিয়া শেষ পর্যন্ত তার বিশ্বাস রাখতে পারবে কি? কিন্তু তাকে বিশ্বাস না করে আমাদের উপায়ই-বা কি? তালমা ব্রিজে অপারেশন যে আমাদের করতেই হবে।

এ মিশনের জন্য আমরা আগে থেকেই পরিকল্পনার একটা ছক করে নিয়েছিলাম। সেটা অনেকটা এ রকমের: তালমা ব্রিজের প্রায় ৩০০ গজের মধ্যে যে বাড়িটা রয়েছে, জেলা বোর্ডের রাস্তা সংলগ্ন সে বাড়ি একজন সাইকেল মেকারের। রংপুরের লোক সে। তার কাছে আশ্রয় চাইবো রাতের মতো। মকতু মিয়ার একজন দোষ্ট আছে তালমায়, তার কাছেও আশ্রয় চাইবো। অন্যের পেলে ভালোই, তা না হলে কোনো বোপবাড়ে রাতটা কাটাতে হবে। যেসব কথা, তালমা ব্রিজ রেকি আর অপারেশন প্ল্যান তৈরি না আর আমাদের ফেজে চলিবে না।

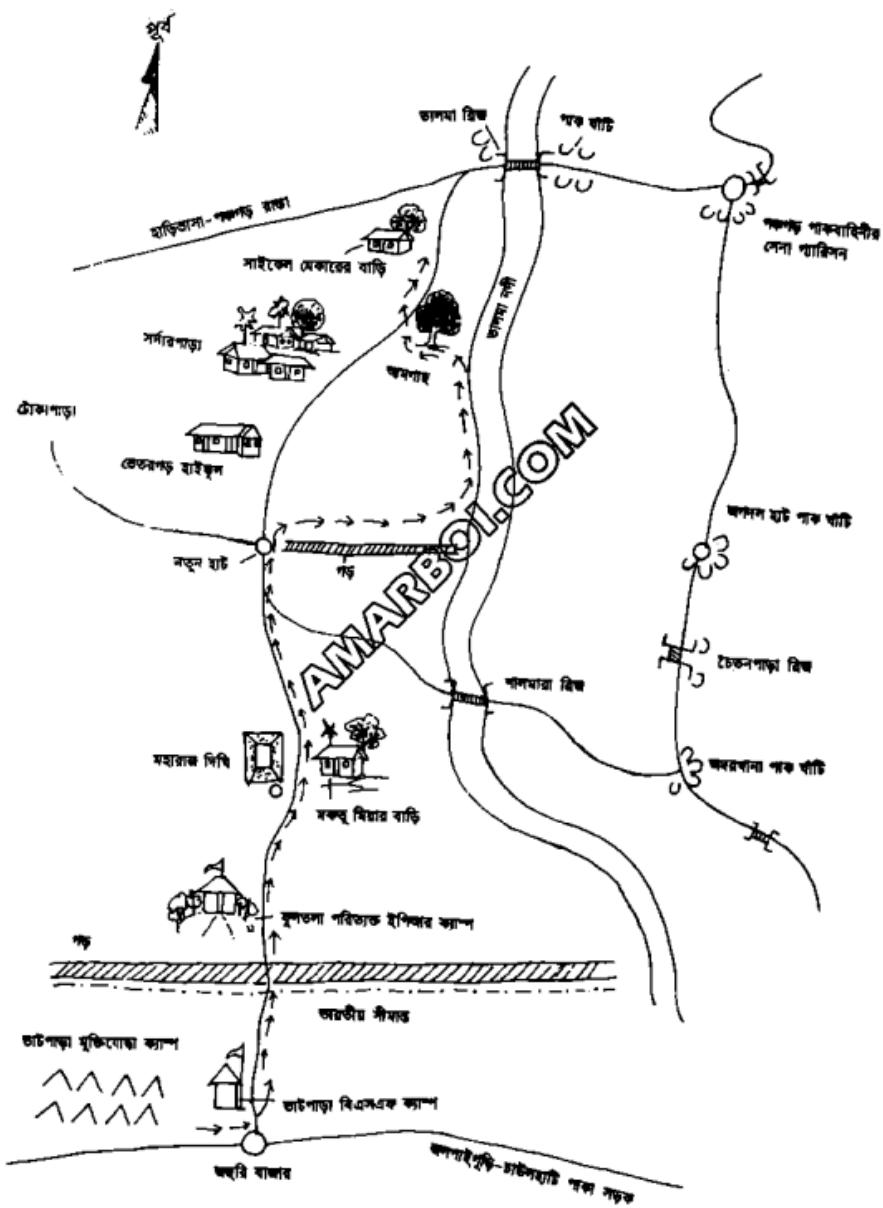
প্রায় আধা ঘণ্টা হাঁটবার পর তালমা জেলায় কিনারায় পৌছানো গেলো। ভরা বর্ধা তখন। নদীতে প্রবাহিত প্রবল সোনার ধারা। নদীর দুর্কুল ছাপানো পানি। নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দিক ঠিক করবার চেষ্টা করলাম। সামনের দিকে এগুতে গিয়ে মনে হলো এগুচ্ছি পুরু ধূঁধে কোণ বরাবর। আকাশে ঢাঁদ। ঢুক্ত ধাবমান তুলোট মেঘ ঝুঁড়ে সেই ঢাঁদ আলেক্ট প্লাবনে ভাসিয়ে দিছে সবকিছু। আবার কখনো মেঘের আড়ালে গিয়ে সৃষ্টি করছে আবছা আলোর জগৎ। সেই আলোর ছোয়ায় আশপাশের সবকিছু শ্পষ্ট হলেও বড় বিশ্ব। দিক ঠিক করে রওনা দেয়ার আগেভাগে, আবার ঝুশিয়ারি উচ্চারিত হয় আমার তরফ থেকেই, মকতু মিয়া পারবে তো!

— জি, হ্যাঁ পারযু।

কুমিল্লা জেলার লোক মকতু মিয়া। দেশ থেকে অভিব-অভিযোগে চলে এসেছে, পঞ্চগড়ের এই জঙ্গলাকীর্ণ ভেতরগড় এলাকায় বসতি স্থাপন করেছে। তার জেলার অনেক লোকজনই এসেছে এই অঞ্চলে। বন কেটে গড়েছে বসত। জীবনধারণের জন্য প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রাণপণে তাদের। এদেরই একজন মকতু মিয়া। বেঠেখাটো শক্ত গড়নের কালো কুচকুচে রঞ্জের মানুষ। অসম্ভব সাহস তার বুকে। রাতের ঘুরঘুটি অঙ্ককারেও চলাচল করে থাকে সে স্বাপদের আশ্র্য ক্ষিপ্তা নিয়ে। আজকের এই রাতেও সে আমাদের গাইড। আমাদের তিনজনের জীবনের জিম্মাদার।

পুরো অনিশ্চয়তার ভেতরে পা ফেলবার আগে আমাদের পরিকল্পনাটায় সবকিছু অনুপুর্ব ঝালিয়ে নেয়া গেলো আরেকবার। মকতু মিয়া সেই আগের মতো সামনে

କେତେ ଜାଗ— ୬



সামনে, তার পেছনে পেছনে আমরা। নদীর ধার ঘেঁষে এবড়োখেবড়ো অসমতল ভূমি। তার ওপর দিয়েই এগুতে হচ্ছে আমাদের। রাস্তা নেই, লোকালয় নেই, ডানে দ্রুত ধারমান নদী। বায়ে ঝোপবাঢ়ি। কাঁটাবন। জঙ্গল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর মকতু মিয়া হঠাতে করে সামনের একটা ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। গোলাম গড়সের ডাকে সাড়া দিলো সে নিচে থেকে, এই যে, আমি এহানে, পথ বিছড়াইয়া পাইতেছি না।

ঘন ঝোপ ঠেলে এক এক করে একসময় আমরা মকতু মিয়ার কাছে পৌছিলাম। ঠিক এই সময় হঠাতে করে আমাদের ডানপাশে জোরে শব্দ তুলে কী যেনো সর্বস্র করে উঠলো। সেই সাথে দুপ্রদাপ এবং কোনো কিছুর ছটোপুটির শব্দ। চমকে নিখর হয়ে দাঢ়িয়ে গোলাম সবাই। মতিয়ারের ভীতক্ষিত গলা থেকে বেরিয়ে এলো, কী গেলো, মাহবুব ভাই!

— বোধহয় শেয়াল, মতিয়ারকে সাত্ত্বনা দিতে গিয়ে যেনো নিজেকেই সাত্ত্বনা দিলাম। আর তখনি মকতু মিয়ার গলা শোনা গেলো, এদিক দিয়া যাওন যাইবো না। ঘন কালো অঙ্ককার আর কাঁটা ছাঁওয়া ঝোপবাড়ি প্রায় হারিয়ে যেতে যেতে এবার আমরা তিনজনই হেসে উঠলাম। এইরকম বিপদসঙ্কলতার ভেতরেও।

— যাওন যহন যাইবো না, তহন বের হই, অনা রাস্তা ধরা যাক, বলে মকতু মিয়াকে উঠে আসতে বলি।

একটা গর্তমতো জায়গা থেকে হাতরপাচর ক্ষমত করতে বেরিয়ে এলো মকতু মিয়া। আবার পিছিয়ে এলাম আমরা।

জঙ্গলটা পাশ কাটানো গেলো এক্ষুণ্ডয়। পাশ কাটাতে হলো উরু সমান। অপরিক্ষার এক জলাভূমি দিয়ে। আবার এক্ষুণ্ডয়ে আবার নদীর তীরে পৌছানো গেলো। দেরি হয়ে গেছে। এবার তাঁত স্বেচ্ছায়ে চলা। চর এলাকায় ছেট ছেট কাঁটাময় ঝোপ। আলো-আধারিতে স্বেচ্ছা কেমন রহস্যময় দেখাচ্ছিলো। এইরকম একটা ঝোপ কাটিয়ে যেতেই কিছুবুরে আরেকটা ঝোপ। সেটা পাশ কাটাতে গিয়ে আর একটা, এমনি করে এঁকেবেঁকে চলতে হচ্ছে। চলার গতি ব্যাহত হচ্ছে বারবার। কখনো কখনো সামনে পড়ছে বিরাট খাল, অনেক পানি তাতে, খাল পাশ কাটাতে গিয়ে আবার ঘুরতে হচ্ছে অনেকটা পথ। কখনও গলা সমান পানিতে নেমে পড়তে হচ্ছে।

এই রকমভাবে এগুতে এগুতে বিপদটা এলো হঠাতে করেই। একটা ঝোপ ঠেলে এগুবার সময় উফ্ করে আর্তনাদ করে উঠলো মতিয়ার এবং ঝোড়াতে ঝোড়াতে ঝোপের বাইরে এসে বালির ওপর বসে পড়লো। মতিয়ারের ডান পায়ের পাতায় গোড়লিং দিকে কাঁটা ফুটেছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর পা ধিরে আমরা ঝুঁকে বসলাম। প্রায় দেড় ইঞ্চি সাইজের তিনটা ময়না কাঁটা। একটা সম্পূর্ণ চুকে গেছে, অন্য দুটো বিধেছে সামান্য ব্যবধান রক্ষা করে। সামান্য চোঁয়া ও দুটো টেনে বের করা গেলো ও অন্যটা করা গেলো না কিছুতেই। ক্ষতস্থান বেয়ে বেরিয়ে এলো কেঁটা ফেঁটা রক্ত। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে আসছিল মতিয়ারের মুখ। প্রায় অচলই হয়ে পড়লো সে। এখন কী হবে, কী করা যায়? রাত প্রায় একটা তখন, মতিয়ারকে ঘিরে বসে আছি আমরা। একটা

বিষণ্ণতা এসে ভিড় করলো সবার চোখে-মুখে । এবার কি তাহলে এখান থেকেই ফিরতে হবে?

না : মতিয়ার উঠলো এবং ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে হাঁটবার চেষ্টা করতে লাগলো । এক অদম্য কষ্টসহিষ্ণুতা, মানসিক দৃঢ়তা আর সাঞ্চাতিক একটা একরোখা জেন নিয়ে মতিয়ার হাঁটছিলো । আবার শুরু হলো আমাদের চলা । তবে চলার পথি এবার অনেকটা শুরু । মতিয়ার ডান পায়ের পাতার ওপর ভর করে হাঁটছে ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে, আমরা ওর আগেপিছে । এবার আমাদের তাগাদার পালা, কি মকতু মিয়া সর্দার পাড়া কি পার হই নি?

আসলে সর্দার পাড়াকে পাশ কাটানোর জন্যই আমাদের তালমা নদীর এই বন্ধুর পথ ধরতে হয়েছে । সর্দার পাড়ার হালিম মাস্টার পাকবাহিনীর এজেন্ট, তার কাছে আগেয়ান্ত্র আছে । রাইফেল নিয়ে তার দলবল সারারাত ডিউটি দেয় । এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেছে এবং এজন্যই ওদের চোখে ধূলো দিয়ে নদীর কোল মেঘে আমাদের এই যাত্রা ।

বিপদ এলো আবার । যে বড় ছাতিয়ান গাছটা মকতু মিয়া রাস্তা পাওয়ার চিহ্ন হিসেবে ধরে আসছিল, সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না । কথাটা সে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেপে রাখার পর এবার প্রকাশ করেই ফেললো, রাস্তা স্বারিয়া ফ্যালাইছি, দিক ঠিক করতে পারতে আছি না, ভুলা লাগছে ।

সর্বনাশ এখন উপায়? প্রায় তিনি ঘট্টা চৰ্মীসের মকতু মিয়া এ কী বলে?

পথ পাওয়া না গেলে নদীর পার ধূর্জ এতাবে ঘূরতে ঘূরতে যে তোর হয়ে যাবে! দিনের আলোয় শক্ত এলাকার লোকজন যে আমাদের দেবে ফেলবে! আমরা ধরা পড়ে যাবো । না, এটা অসম্ভব । মকতু মিয়ার তখন প্রায় উন্দ্রান্ত হবার মতো অবস্থা । বিড়বিড় করে কী যেনো বলক্ষণ ওকে ধরলাম দু' কাঁধে ওর হাত রেবে প্রচণ্ড ঝাকুনি দিলাম, কি মিয়া, রাস্তা চেঞ্চে না তো আমাদের আনলে কেনো?

মকতু মিয়া হাসলো, উন্দ্রান্তের মতোই মুখে হাসি ঝুঁটিয়ে বললো, ভুলা লাগছে, বিশ্বাস করেন, ছাতিয়ান গাছটা পাইলে ঠিক রাস্তা বাইরে কইরতে পারতাম ।

— ছাতিয়ান কি ছেড়ে এসেছি?

— মনে হয় না ।

— ঠিক আছে, আগাও তাহলে ।

এবং এর ঠিক ১০ মিনিট পর মকতু মিয়ার উচ্ছ্বসিত শব শোনা গেলো, এই তো সেই ছাতিয়ান গাছ পাওয়া গেছে!

বিরাট এক ঝাকড়া ছাতিয়ান গাছ । পাশ দিয়েই ভেতরগড়-তালমার রাস্তা । ছাতিয়ান গাছের ঘন অঙ্ককারময় ছায়ার নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম এবং এরপর গিয়ে উঠলাম রাস্তায় । এখন থেকে মাত্র আধা মাইল দূরেই তালমা ব্রিজ । আমাদের পরিকল্পনা মতো টাগেটি । আমরা জনি, ওখানে রয়েছে পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি । ব্রিজ রক্ষার জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা । শক্ত পরিবেষ্টিত এলাকার ভেতরে এখন আমরা । তাই যে-কোনো সময় ওদের টাগেটি হয়ে পড়ার সমূহ সংজ্ঞাবনা । তাই যথেষ্ট

সতর্কতা নিয়ে এগুতে হচ্ছে। দু'পাশে ঘন বোপবাড়। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। বালু আর কাদার রাজতু সেখানে।

কোয়ার্টার মাইলখানেক রাস্তা পেরিয়ে এবার একটা তেমাথায় এসে থেমে পড়লো মকতু মিয়া। আমরা দেরি না করে পজিশনে চলে গেলাম। তারপর মুহূর্তক্ষয় ফিসফিসিয়ে পরামর্শ। মকতু এবার একাই চললো ওর দোষের বাড়ি। উদ্দেশ্য আমাদের রাতের অশ্রয়ের ব্যবস্থা করা।

আর এদিকে আমরা বসে রাইলাম রাস্তার পাশে। বোপবাড়ের আড়ালে। গোলাম গউসের ঘড়িতে তখন রাত তিনটা। অপেক্ষায় প্রহর গুনবার কষ্টের পাশাপাশি ঝাঁক ঝাঁক মশার কামড়ে আমাদের প্রাণাঞ্চকর অবস্থা। ছুটিয়ে রাত্ত থেয়ে যাচ্ছিলো তারা আমাদের। চাপড় দিয়েও মারবার উপায় নেই। কেমনা, শব্দ হলেই বিপদ। শক্রকবলিত এলাকা। সামান্য নিখাসের শব্দও ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনতে পারে। নিজেদের সামান্য নড়াচড়ার উসখুস শব্দ ছাড়া, চারদিকে সবকিছু নীরব নিষ্কুম। জীবনের সাড়া নেই আশপাশে কোথাও। হঠাৎ করেই মনটা কেমন করে ওঠে। কোথা থেকে কোথায় এসেছিঃ মুহূর্তে মনে পড়ে যায় ফেলে আসা বাড়িঘরের কথা, চোখের কোটোরে ভেসে ওঠে নিকটজনদের মুখগুলো। ওরা কেমন আছে সব? ফেরা হবে কি কোনোদিন ওদের কাছে? বুকের ভেতর উঠেক একটা ভারি নিখাস উঠে আসে গলা পর্যন্ত। না, আবেগকে প্রশ্ন দেয়ার অবসর কোথায়?

মকতু মিয়া ফিরে এলো প্রায় আধাঘণ্টা ধূঁধ।

— কী হলো মকতু মিয়া? ফিসফিসিয়ে জগ্যেস করি আমরা।

— হলো না।

— হলো না!

— না।

— কেনো?

— সাহস পায় না আমার দোষ, খানেরা প্রত্যেকদিন বাড়ি বাড়ি তালাশি নেয়, তাই।

— তুমি আমাদের পরিচয় দিয়েছো?

— জি। হৈ লেইগ্যাই সে হাত ধইরা মাপ চাইলো, কয় বিপদ হইবার পারে।

রাত সাড়ে তিনটা তখন। দ্রুত ফুরিয়ে আসছে রাত। একটা সিন্দাতে পৌছুতেই হবে। গা ঝাড়া দিয়ে উঠলাম এবার। ওদেরকেও উঠতে বললাম।

— ঠিক আছে, চলো রংপুরের সেই সাইকেল মেকারের কাছেই অশ্রয় চাইবো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মেকারের বাড়ি পাওয়া গেলো। মকতু মিয়া আঙুল তুলে দেখালো, এই যে তালমা ব্রিজ।

একজন বিশ্বাসঘাতক সাইকেল মেকার

চাঁদের আলোতে আবছা হলেও শ্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো প্রশংস্ত ব্রিজটার অবয়ব। এখান থেকে তিনশ' গজের মতো দূরত্ব। রাস্তার বাঁ পাশে ঘন বাঁশবাড়। আর তার লাগোয়া

উচু বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা মেকারের বাড়ি। সামনের দিকটা খোলা, ক্ষেতবাড়ি। মেকার রংপুরের লোক। আমার আর গোলাম গড়সের বাড়িও রংপুরে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই আশ্রয় চাইবো মেকারের কাছে। একত্তু আর মতিয়ার রাস্তার পাশে বাঁশবাড়ের গোড়ায় বসে রইলো, গোলাম গড়সমহ এগিয়ে গেলাম আমি। মেকারকে ডাক দিলাম গলা না উঠিয়ে আস্তে করে।

পাওয়া গেলো মেকারকে।

— কে এতো রাতে?

— আমরা, একটু বাইরে আসেন, বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

— না, বাইরোত যাওয়া চইল্বার নয়, ওটে থাকি কল্পনা।

দমে গেলাম মেকারের কথায়। বললাম, দেখেন, আমরা রংপুরের ৩/৪ জন মানুষ ভীষণ বিপদে পড়েছি। কেবল আজকের রাত আর কালকের দিনটার জন্য আশ্রয় চাই। কাল রাতেই আমরা চলে যাবো

— তা রংপুরের মানুষ কোন্দিক থাকি আইস্লেন?

— উত্তর দিক থেকে।

— উত্তর দিক থাকি ক্যান? রংপুরের মানুষ এদিক ক্যানে?

— এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি উত্তর। কেবল রাতের মতো আশ্রয় চাই।

— রংপুর টাউনেত বাড়ি?

— জি।

— রংপুর টাউনের কাক কাক হোমে?

জেরার উত্তর দিতে হচ্ছিলো।

— সবাইকে চিনি। নাম জললাম অনেকের।

— মনে হয়, রংপুর টাউনেত বাড়ি তোমার গুলার। কিন্তু সত্যি করি কল্পনা বাহে, তোমরা কায়? কি জইন্মে এ্যাতা রাইতোত্ত?

— সত্যি শুনবেন? মরিয়া হয়ে উঠেছি তখন।

— হয়।

— আমরা মুক্তিফৌজ, কেবল কালকের দিনটা আপনার বাড়িতে থাকবো।

— হ্বার নয়, জায়গা নাই মোর ঢাঁটে।

— আমরা ঘরের ভেতর চৌকির নিচে থাকবো।

— না বাবা, হ্বার নয়, জায়গা নাই।

ঠিক এই সময় ১০/১২ বছর বয়সী এক কিশোরের গলা শোনা গেলো, বাজান জায়গা তো হামার আছে, ওমরগুলকে দেন কেনে থাইকবার, ওমরা মুক্তিফৌজ বাজান।

— চোপ হারামজাদা— বলে মেকার তার কিশোর ছেলেকে থামিয়ে দেয়। না বাহে মোর বাড়িতে তোমার জায়গা হ্বার নয়, বিহান হইতেই ওমরা খানেরা এদিক আইসে, টের পাইলে একেবারে মারি ফেলাইবে।

— কিন্তু আমাদের যে থাকতেই হবে। আপনি জায়গা না দিলে আমরা এখানেই

থাকবো । আপনি কি চান আপনার দেশি মানুষ যারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে, তারা আপনার সামনে ধরা পড়ুক ?

— না না, মেকারের অস্ত্রির কঠি । তোমরা বাবা ওমরাগুলার সাথে পাইবান নন । ওমরা বড় বড় হাতিয়ার আইন্ছে, তোমার গুলার কি আছে ?

— তাহলে জায়গা দেবেন না ! আমরা কিন্তু তাহলে বোম দিয়ে উড়িয়ে দেবো আপনার বাড়ি ।

— ঠিক আছে, আটকেন তা হইলে । এরপর নিশ্চুপ হয়ে গেলো মেকার । আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম মেকারের বাড়ির সামনে । অধীর আমাদের সে অপেক্ষার প্রহর । মেকার এখনি তার বাড়ির দরজা খুলে দেবে আর আমরা আশ্রয় পাবো, এই ভেবে । তখনি মতিয়ার দৌড়ে এলো । প্রায় উভ্যেজিত কঠি বলে উঠলো, মাহবুব তাই, মেকার বাড়ির পেছন দিয়ে বের হয়ে ব্রিজের দিকে গেছে ।

— আরে ধূৎ হতেই পারে না, আমার বিশ্বাস হতে চায় না । ও ঠিক আশ্রয় দেবে আমাদের এমন একটা আঙ্গা আর বিশ্বাস আমার মনের মধ্যে তখন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছে । তাই আবার শব্দ করেই ডেকে উঠলাম মেকার সাহেব, মেকার সাহেব । কিন্তু মেকার সাড়া দিলো না । ওর ছেলেও না । তখন গোলাম গউস সন্দিক্ষণ গলায় বলে উঠলো, মাহবুব তাই, ও নিশ্চয়ই খানদের খবর দিতে চাহিল, আর তো থাকা চলে না ।

— আরে না । দেখি না আর একটু, আমার জবাব । কিন্তু মতিয়ার আবার ছাটফটিয়ে এলো, মাহবুব তাই, আর তো পার্শ্বে চলে না । ব্যাটা নিশ্চয়ই ব্রিজের কাছে গেছে ওদের খবর দিতে । সকাল হয়ে আসে তাই প্রায়, আমরা ধরা পড়বো, মাহবুব তাই !

— ঠিক আছে, তোরা যা, অব্যর্থেশন শেষ না করে আমি যাবো না । কেমন একটা একগুঁয়েমিতে তখন পেয়ে দিলেছে আমাকে ।

— না, না পাগলামে ক্ষুঁড়বেন না, এ দ্যাখেন, ওরা আসছে । ওদের বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে । অস্ত্রির হয়ে উঠেছে গোলাম গউস ।

ঠিক তাই, ব্রিজের দিক থেকে বুট পরা পায়ের দৌড়ে আসার খট্খট শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর সেই সাথে ফ্যাকাশে আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কঞ্জনের আবছা মৃত্তি । দৌড়ে আসছে দীর্ঘদেহী মানুষগুলো । গোলাম গউস আমার একহাতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বলে উঠলো, আপনার পায়ে পড়ি, দৌড়ান মাহবুব তাই, আসেন, দৌড়ান-গোলাম ।

আমরা তখন দৌড় শুরু করলাম । বুটের খট্খট শব্দ তখন আরো কাছে এসে গেছে । আমরা দৌড়াচ্ছি প্রাণপনে । ছুটে চলেছি সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য । ভাবনার কেনো অবসর নেই । শুরু করে আমার সচেতনতা এসেছিল, দৌড়াতে হবে । শুধু দৌড়াতে হবে উর্ধ্বশাসন । পালাতে হবে শক্রপুরী থেকে যত দ্রুত সম্ভব এবং তাহলেই আমরা বাঁচতে পারবো ।

মতিয়ার ঝুঁড়িয়ে ঝুঁড়িয়ে আপে আপে দৌড়ছিলো । তার পেছনে মকতু । গোলাম গউস আমার পাশে । বারবার সে জিগ্যেস করছিলো, আপনি দৌড়াতে পারছেন না মাহবুব তাই, দৌড়াতে পারছেন না ! আর একটু জোরে দৌড়ান ।

ভোরের আলো ফুটছে ধীরে ধীরে। অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছি আমরা। একটানা প্রায় পাঁচ মাইল দৌড়ে এসে থামা গেলো। যেখানে থামলাম, সেটা ভেতরগড় সুলের কাছাকাছি একটা জায়গা। তখন ভোর হয়ে গেছে। ভোরের সিঞ্চ মৃদু হাওয়া চোবেমুখে ভালো লাগার পরশ বুলিয়ে দিয়ে যেতে থাকলো। প্রাণভরে নিষ্ঠাস নিলাম আমরা। না, বেঁচে আছি।

৩. ৭.১৯৭৩

মকতু মিয়ার আশ্রয়, বিনষ্ট যোগাযোগ পথ এবং মাটিতে আঁকা ম্যাপ
মকতু মিয়ার আশ্রয়ে ফিরে এলাম আবার। চালভাজা, কাঁচা লঙ্ঘ আর লবণ দিয়ে
চমৎকার নাস্তা সেরে মকতু মিয়ার ঘরে তার তেল চিটচিটে বিছানায় শরীর এলিয়ে
দিয়ে গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। বাইরে তখন মুষলধারায় বৃষ্টি। মকতু মিয়া
দুপুরে ঘুম থেকে ভুলে মুরগীর মাংসের তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়ালো। ভীষণ ঝাল
তরকারি। মকতু গরিব মানুষ কিন্তু আতিথেয়তায় প্রচণ্ড আন্তরিক। তার সাধের
ভেতরে থেকে আমাদের জন্য সে সবকিছুই করার চেষ্টা করছে। একটা খেটে-খাওয়া
দিনমজুর সে। জানি না, কীসের আশ্রয় রাতের পর রাত থেটে চলেছে আমাদের
জন্য!

আমাদের আহারপর্ব শেষ হলে একটা গামজি মার্শায় জড়িয়ে মকতু মিয়া আবার
বের হয়ে গেলো। সে একাই যাবে এবার তার প্রেরিতে। দেখে আসবে শক্র অবস্থান
এবং বিজ ওড়ানোর সম্ভাব্য দিকগুলো। একে কেউ সন্দেহ করবে না। এ রকম
আস্থাই তার এই যাত্রার প্রেরণা।

মকতু চলে গেলো। আমরা মাইলাম তার ঘরের ভেতরে। বাইরে যাওয়ার উপায়
নেই। দিনের বেলা বেরলে অক্ষয়জ্ঞানীভাবে লোকজন আমাদের দেখে ফেলবে। শুরু
হবে নানারকম কানাঘুষা। তার সেই কানাঘুষা থেকে বড় ধরনের সর্বনাশ ঘটে যেতে
পারে। তাই এই সাবধানতা। এদিকে মতিয়ারের ডান পা ফুলে গেছে। অনেক চেষ্টা
করেও ওর কাঁটা বের করা যায় নি। প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলো সে। ছাটফট করছে,
ব্যথায় এপাশ-ওপাশ করছে। ওর কষ্ট দেখে যাওয়া ছাড়া এ মুহূর্তে অন্য আর কোনো
উপায় নেই। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের। অবশ্য আশা করছি, রাতে
কোনো না কোনো দল আসবে। রাতে দেখা হবে বন্ধুদের সঙ্গে। মতিয়ারের তখন
ক্যাপ্সে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

বিকেল। গভীর ঘুম নেমে আসছে চোখে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাই
নি। মকতু মিয়ার ডাকে ঘুম ভাঙলো।

বাইরে তখন ঘিনিয়ে আসা সন্ধ্যার আঁধার। মকতু মিয়ার হাতে কেরোসিনের
একটা ল্যাম্প। ল্যাম্পের আলোয় উদ্ভাসিত ওর চিকন কালো মুখমণ্ডল। দাঁতগুলো
অঙ্গুতভাবে চকচক করছে। কাজ সেরে ফিরে এসেছে সে। কী অঙ্গুত এই মানুষটি!
হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো মাটির মেঝের দিকে মুখ করে। উরু হয়ে সেই মেঝের ওপরে
একটা কাঠির আঁচড় দিয়ে দিয়ে তালমা বিজ আর শক্র অবস্থান একে বোঝাতে

লাগলো । সেই সাথে চললো তার বর্ণনা । নিখুঁত কাজ মকতু মিয়ার ; মাটিতে আকা
ক্ষেচম্যাপ আমরা কাগজে তুলে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে । হ্যা, এতেই চলবে ।

আহিদার এবং জব্বারুরা ১৫ জনের একটা দল এনেছে । ওদের আজকের টাঙ্ক,
পঞ্চগড় থেকে ভেতরগড়ে আসবার জেলা বোর্ডের যে হাইওয়েটা, তাকে বিছিন্ন বা
ধ্বংস করতে হবে দুটো জায়গায় । এর ফলে পঞ্চগড় থেকে পাক আর্মির কোনো গাড়ি
আসতে পারবে না সহজে । শুধু শক্রকে আঘাত করাই নয়, বিভিন্ন দিক থেকে তাকে
অসুবিধায় ফেলে পর্যন্ত করাও গেরিলা যুদ্ধের একটা ট্র্যাটোজি । সুতরাং রাস্তা বা
সড়ক বিছিন্ন কিংবা ধ্বংস করে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করতে হবে । মেজর শংকর
নির্দেশিত এটাই আমাদের আজকের রাতের করণীয় কাজ ।

মতিয়ারকে দু'জনের হেফাজতে রেখে গেলাম । গউসসহ আমরা দু'জনে ওদের
দলে শরিক হলাম ।

আবার সেই রাস্তা । ভেতরগড় পার হয়ে এসে সর্দারপাড়ার কাছে প্রথম স্পট
নির্ধারণ করা হলো । ৫/৭টা কোদাল সাথে সাথেই কাজে লেগে গেল । মকতু মিয়াদের
গ্রাম থেকেও কয়েকজন মেয়া হয়েছিলো সাথে । তারাও হাত লাগলো । মধ্যরাতের
নিষ্ঠকতা ভেঙে ছপ্টপ শব্দ তুলে কোদালের কোপের পর কোপ পড়তে লাগলো
মাটিতে । সেইসাথে মাটির চাকের পর চাক উঠে আসছে জলগুলো হাত থেকে হাতে ।

প্রথম গর্তা ছেড়ে আধা মাইল পিছিয়ে এসে আপর একটা গর্ত করার কাজ শুরু
হলো । গর্তটা করার পর দু'পাশের পানির পাশে একসাথে মেলানোর সাথে সাথে
পানির সেই মিলিত প্রবল বেগ তলানিচ্ছাটায়ে থাকা মাটির অবশিষ্ট চাঙ্গরটুকু মুহূর্তে
ভাসিয়ে নিয়ে গেলো । বেশ বড় ধরনের গর্তের সৃষ্টি হয়ে রাস্তাটাকে দু'ভাগ করে
ফেললো । ইত্রাহিম ছিল নিচে । সেই করেই ওর চিৎকার শোনা গেলো, বাহে চাজি,
ম্যালা মাছ বাহে । একখান ছান্দো আইন্লে ম্যালা মাছ ধরা গেল হয় ।

ইত্রাহিমের কথা শুনে হেসে উঠলো সবাই । কিন্তু বলতে হলো এখন এ মাছ
খাওয়ার কপাল আমাদের নাইরে । উঠে আয় ।

৪. ৭. ৭৩

অমরখানার বুধন মেষার এবং শক্রপক্ষের বাস্তার

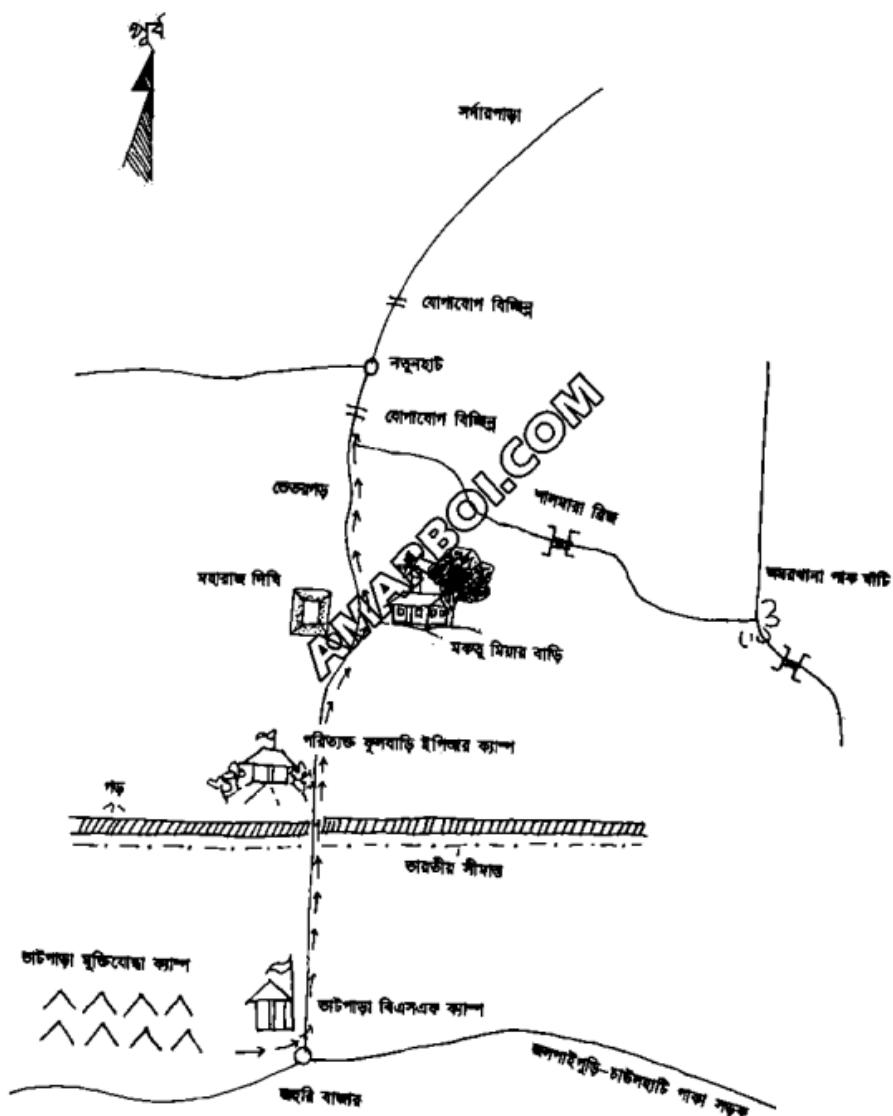
মেজর শংকর তালমা বিজের অপারেশন আপাতত স্থগিত রেখে নতুন দায়িত্ব
দিলেন । সেই দায়িত্ব অনুসারে অমরখানা বোর্ড অফিস রেকি করে শক্রপক্ষের
অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে আসতে হবে । সেই সাথে দেবে আসতে হবে বুধন
মেষারের বাড়িতে অবস্থানরত শক্রদের ঘাঁটি এবং তাদের লঙ্ঘনখনা । আপাতত
শক্রদের সঠিক অবস্থান এবং লঙ্ঘনখনা সম্পর্কেই কেবল সঠিক খবরাখবর নিয়ে
আসতে হবে । এই একটাই কাজ ।

মোট ন'জনকে নিয়ে আজকের দল । কমান্ডার আমি । বিশ্বস্ত গোলাম গউস
রয়েছে সাথে ।

আকাশে দশমীর চাঁদ । ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক-ফোকর দিয়ে চাঁদটা বের হয়ে

ক্ষেত্র শাল-৫
পঞ্জগড়-ডেরগড় যোগাযোগ পথ বিন্ট

(কেস ছাড়া)



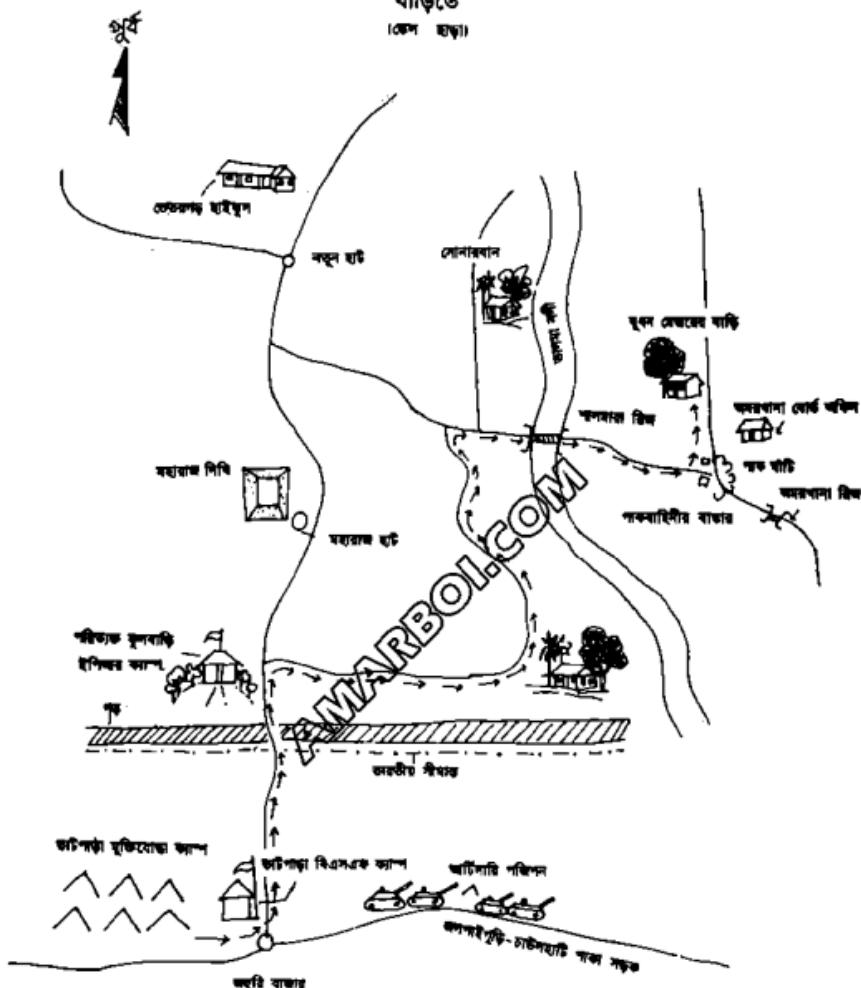
আসছে মাঝে মাঝেই। ধূসর আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ফলে অসুবিধে হচ্ছে আমাদের। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমাদের উপস্থিতি। প্রয়োজনীয় অঙ্ককারে নিজেদের লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

জোনাব আলী তৈরি ছিলো তার বাড়ির সামনে। তার ভগ্নিপতি ও মর আলীকেও সাথে নিলো সে। ওমর আলী ইদানীং অমরখানা-ভেতরগড় রাস্তায় ঘনঘন চলাচল করে থাকে। পথঘাট নথদর্পণে তার। এছাড়া সে ক'দিন বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসেবে অমরখানা-জগন্দলহাট পাক ঘাঁটিতে কাজ করেছে। সুতরাং আজকের মিশনে সে বেশ কাজে লাগবে, এই ধারণা থেকে জোনাব আলী তাকে সঙ্গী করেছে। তবে আজকের কাজ সহজ হলেও দারুণ বিপদসঙ্কল পথ মাড়াতে হবে আমাদের এবং যে-কোনো অভিবিত পরিস্থিতির সামনে পড়তে হতে পারে। যার ফলাফল হতে পারে অত্যন্ত মারাত্মক। সুতরাং পথ চেনে এবং পাকবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, এমন একজন মানুষ ওমর আলীকে পেয়ে ভালোই হলো।

পথিমধ্যে জোনাব আলী জানালো যে, সোনা মিয়া এ গ্রামেই রয়েছে। এসেছে তার দ্বিতীয় পক্ষের শুশ্রবাঢ়িতে। আমরা রাস্তায় দাঁড়ালাম। জোনাব আলী বাড়ির ভেতর থেকে সোনা মিয়াকে ডেকে আনলো। আমাদের দেখে ধৃশ্যবন্ত হয়ে পড়লো সোনা মিয়া। বাড়ির ভেতরের আঙিনায় নিয়ে গেলো। যদর প্রতিটী বসতে দিলো। সোনা মিয়ার জন্য একটা খবর ছিলো, সেটা দিলাম। তৃতীয় বর্জর সিকিউরিটি ফোর্সের ইন্টেলিজেন্স ব্রাউনও সোনা মিয়াকে ঝুঁজছে। কোনো সময় তাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং তাকে ঝুঁশিয়ার করে দিলাম। কোনো অবস্থাতেই সে যেনো বি.এস.এফ.-এর হাতে না পড়ে। তাহলে তারা আমাদের দেবে না। সোনা মিয়া রীতিমতো ভীত হয়ে পড়লো খবরটায়। আমার কাউন্টারে বললো, আমি তো এখন আর পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করছি না। কিন্তু তারা আমার ওপরে এতো ক্ষ্যাপা কেনো? বললাম, তাতো আমি বলতে পারছি নঁ। ওরা কিছু একটা কাজ দেখাতে চাইছে বোধহয়।

সোনা মিয়াকে এভাবে বলা ছাড়া উপায় ছিলো না। সেতো যুদ্ধের প্রথম থেকেই পাকবাহিনীর সহযোগী হিসেবে অপরপক্ষের টার্গেট হয়ে আছে। মুক্তিবাহিনীর কাছে তার সারেভারের ঘটনাতো মাত্র সেদিনকার। সে ব্যাপারটাকে সহজে বিএসএফরা মেনে নিতে পারে নি কোনোভাবেই। তাই সোনা মিয়া তাদের দীর্ঘদিনের টার্গেট। এতো সহজে তারা তাকে ছাড়বে? এছাড়া বিএসএফদের সোনা মিয়াকে হাতের নাগালে পাবার অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, যুদ্ধের আগে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছিলো, যার ফলে বি.এস.এফ.-এর ক্ষিণ হওয়ার কারণ ঘটেছে এবং যুদ্ধের পর শুরু হয়েছে সোনা মিয়ার পাকবাহিনীর সাথে দালালি। ফলে বি.এস.এফদের জন্য নতুন কারণ ও সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে। অথবা এমন কিছু ঘটেছে, যে সম্পর্কে হয়তো আমরা জানি না। ব্যাপারটা দেনাপোওনারও হতে পারে। আমরা তাও জানি না। কিন্তু যাই হোক না কেন, সোনা মিয়া বর্তমানে আমাদের মিত। জোনাব আলী এবং ওমর আলীকে আমাদের সাথে গাইড হিসেবে দিয়ে আজকের মিশন সে পরোক্ষভাবে সাহায্য করছে। এ অবস্থায় সোনা মিয়াকে তার

ক্ষেত্র মাপ-১
ডেকুমেন্টেশন-অমরখানা বুধন মেলারের
বাড়িতে
(কেস তাত্ত্বিক)



বিপদ সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন এবং তাকে রক্ষা করার নৈতিক তাগিদও রয়েছে। সেই তাগিদবোধের কথা তাকে বললাম। বললাম, আপনি সাবধানে থাকবেন। আমরা তো রয়েছি আপনার পাশে। ভয় পাবেন না, আমাদের উপস্থিতিতে আপনাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।

সোনা খিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চললাম আমাদের গন্তব্যস্থলের দিকে। চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলছে আকাশ জুড়ে। আমরা ওর আজকের উদ্ভাসিত হাসি দেখে বিরক্ত হচ্ছি। চাঁদের হাসি যে কখনও কখনও বিরক্তির কারণ হতে পারে, ব্যাপারটা আজকের অভিজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত ভালোভাবে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। প্রায় অর্ধেকটা উড়ে যাওয়া তালমা ব্রিজের নড়বড়ে কাঠামোটা সাবধানে অতিক্রম করে আমরা সেই বিপজ্জনক এবং বিশ্বাত রাস্তাটা ধরলাম। যে রাস্তা ধরে আমরা পৌছে যাবো আমাদের আজকের লক্ষ্যবস্তু উত্তরাখণ্ডের সর্বশেষ পাকবাহিনীর আস্তানায়, যেখানে একদল বর্বর অমানুষ তাদের ঘাঁটি আগলে রেখেছে সেই এগ্রিলের মাঝামাঝি থেকে। আর অত্যাচারের তাঁতবলী চালিয়ে যাচ্ছে আশপাশের এলাকাগুলোয়।

এ রাস্তায় এর আগে আসা হয় নি। তাই এপথ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর পদে মৃত্যুর ফাঁদ থাকবার সংশ্লেষণ যে-কোনো সময় সামনে থেকে ভেসে আসতে পারে এক বাঁক তঙ্গ বুলেট, স্মার্টবোল দিতে পারে আমাদের প্রাণস্পন্দন মুহূর্তের মধ্যে।

গায়ে অনুজ্জ্বল রঙের কাপড়-জামা। পরদেশী গুঁটিয়ে কোমরের কাছে গিঁটিয়ে বাঁধা। কোমরে গামছায় গুড়িয়ে বাধা দেওয়ে স্থগু পা। কাঁধে স্টেলগান। এগিয়ে চলেছি আমরা। সন্তর্পণে। সামনে মৃত্যু—এই প্রকম সংশ্লেষণকে বুকের গভীরে পুষে। গোলাম গউসসহ অন্যসব অনুগামীর দল পেছনে। সামনে দুজন গাইড—জোনাব আলী আর ওমর আলী। আজকের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী স্কট আর রেকিব দায়িত্ব পালন করছে ওরা।

বাস্তাটা মাইলখানেক পুরে এসে বাঁক নিয়েছে ডানদিকে। সেখান থেকে সামনে একটু এগিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিলেই কোয়ার্টারখানেক মাইলের মধ্যে অবরখানা বোর্ড অফিস। আর একটা রাতা পেছন দিক থেকে এসে মিশেছে এ জয়গাটায়। ফলে একটা তিন মাথার মোড়ের সৃষ্টি হয়েছে। মোড়টায় কোনৱেকম বিপদ ছাড়াই পৌছানো গেলো। পৌছুবার পর এদিক-ওদিক ছড়িয়েছিটিয়ে বিশ্রাম কিছুক্ষণ। বিশ্রামের ফাঁকে আলোচনা করে ঠিক হলো এ জয়গাটাই হবে আর.পি বা রিটার্ন পেস্ট। অর্থাৎ এখানে দলের অন্যরা প্রোটোকশন পার্টি হিসেবে অপেক্ষা করবে। ঠিক হলো আমি আর গোলাম গউস ওমর আলীকে নিয়ে অবরখানা বোর্ড অফিস পর্যন্ত রেকি করতে যাবো। আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করবে। কোনো বিপদ দেখলে ওরা আমাদের উদ্বার করতে যেনো এগিয়ে যায়। মধুসন্দেশের হাতে রইলো এ দলের নেতৃত্ব।

ওরা অপেক্ষায় থাকলো, আর আমরা রওনা দিলাম। ওমর আগে, আমি পেছনে। তারপর গোলাম গউস। আসবার মুহূর্তে স্টেলগান বদলে রাইফেল নিয়েছি। দূর থেকে এর কার্যকারিতা অব্যর্থ। আমাদের দুজনের হাতেই রাইফেল। দুটো করে ছেনেড কোমরে। প্রয়োজন না পড়লে গুলো ব্যবহার করা হবে না। ভারতীয় সীমান্ত

আমাদের ডান পাশে— প্রায় দু' মাইল দূরে। সামনেই পাকবাহিনীর অমরখানা ক্যাম্প। অত্যন্ত শক্তিশালী আর দুর্ভেদ্য। এর রয়েছে পর্বতপ্রমাণ খ্যাতি। ভয়াবহতা আর দুর্ধর্ষতার দিক দিয়ে এর নাম এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, অমরখানার কথা শুনলেই শরীর এমনিতেই শিউরে ওঠে। আর আমরা কি না এগুচ্ছি সেই ক্যাম্পের দিকেই। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে মেপে। আর কী অবাক ব্যাপার, আকাশের চাঁদ ঠিক এ সময়ই আমাদের ওপরে সদয় হয়ে যেনো চলে গেলো সে মেষের আড়ালে। সেও বৃংশি আজ আমাদের অপারেশনের সঙ্গী।

অমরখানা ঘাঁটি এতোক্ষণ চুপচাপই ছিলো। কী কারণে হঠাতে করেই যেনো সে জেগে উঠলো। একসাথে শুরু হলো মেশিনগান আর চাইনিজ রাইফেলের একটানা গুলিবর্ষণ। ভারতীয় দিক থেকে কটা শেল এসে পড়লো অমরখানার আশপাশে। শেল ফাটার বিকট শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠলো সমস্ত পরিবেশ। মাটিতে থেকে থেকে ভূমিকম্পের কাঁপন। কাঁপন বুকের নিচেও। সেই অবস্থায় আমরা রাস্তার ঢালুতে পজিশনে রাইলাম। বেশ কিছুক্ষণ চললো শেলের এই তাওবলীলা। এক সময় তা বন্ধ হলো। গুলিবর্ষণ চলতে লাগলো সমানভাবে।

এর মধ্যেই আমরা তিনজন এগুতে লাগলাম। মাঝুর ওপর দিয়ে ভয়ানক উজ্জেন্মনার বাড় বয়ে যাওয়ার পর শরীরের মধ্যে যেনে একটা হালকা ভাব এসেছে। দ্রুত এগুতে লাগলাম আমরা। অনেকটা বোধহীন অবস্থান্তার ভেতর দিয়ে। বলা যায়, নেশাগতের মতোই।

কয়েকটা বাড়িয়র, একটা একচুক্কা পিনের মসজিদ, এগুলো পার হতেই অমরখানা-পঞ্চগড় পাকা সড়কটা সমানে আবহাবাবে ভেসে উঠলো। আর সেটা শুব বেশি দূরে নয়। একেবারেই সময়ের প্রায় দেড়শ-দুশো গজের মধ্যে। দ্রুত রাস্তার পাশের একটা গর্তে, সম্ভৱত তলের আঘাতে সৃষ্টি তাতে গিয়ে পজিশন নিলাম। ওমরকে মসজিদের পাশে ঝুঁপেই ছেড়ে এসেছি। এরপর শুরু হলো কঠকর ত্রুলিং। মাটির সাথে বুক লাগিয়ে হাতের দুই কনুই আর দু'পায়ের হাঁটুর ওপর তর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আমি আগে, গোলাম গড়স পেছনে। এমনি করে আমরা এসে পৌছলাম পাকা সড়কের কিনারে। সড়কের ঢালু বেয়ে ওপরে উঠে এলাম। বোধহয় একটা উচু তিবিই সেটা। চাপ চাপ মাটি দিয়ে তৈরি। মাথা তুলে হাত দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতেই, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো। এটা তো বাঙ্কার! পাকবাহিনীর মজবুত মাটির বাঙ্কার। নিঃসাড় অবস্থায় পড়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। এই অবস্থায় নিজের বুকের মধ্যে ঢাকের বাড়ি শুনতে পাছিলাম। এমন সময় গোলাম গড়স আমার পায়ের গোড়লিতে চাপ দিলো। সঙ্গে ফিরে পেতেই মনে হলো, এখান থেকে গুরুণি পালাতে হবে। আর এই ভাবনা জাপিয়ে তুললো প্রতিটি তন্ত্রীকে। যতোটা সম্ভব শব্দহীনভাবে ফিরলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, বাঙ্কারের ছিদ্র দিয়ে প্রহরারত পাকসেনারা এই বৃংশি আমাদের দেখে ফেললো। এই বৃংশি ছুটে এলো একবাক জুলন্ত বুলেট। গোলাম গড়সের কানের কাছে মুখ নিয়ে দ্রুত এখান থেকে পালাবার কথা বললাম। সরীসৃপের মতো ক্ষিপ্রগতি নিয়ে দু'জন প্রায় ২৫ গজ পেছনে

একটা ছোট বাঁশ বাড়ের নিচে চলে এলাম : আর ঠিক তখনি শুনতে পেলাম, বাঙারের সামনে দু'জনের গলা । হ্যাঁ, পাক আমিই । বাঙার থেকে বের হয়ে টহল দিছে । এর মধ্যেই একজন শব্দ করে গ্যাস ছাড়লো, প্রাকৃতিক গ্যাস । গোলাম গউসের মুখ থেকে বের হয়ে এলো, শালা !

একবার মনে হলো, দু'জনকেই টাগেট করে ফেলি । লোভ সম্বরণ করতে হলে মেজের শংকরের বারবার উচ্চারিত সতর্কবাণী কালে বাজতেই । দেখো, কেউ যেনো টের না পায়, তাহলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে এবং পরে সেখানে আর পৌছুতেই পারবে না । তোমাদের সামনে রয়েছে বড় অপারেশন, বুধন মেধারের বাড়িতে স্থাপিত পাকবাহিনীর অমরখানা ডিফেন্সের লঙ্গরখানা । ওটাকে হামলা করে উড়িয়ে দিতে হবে । সূতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সারতে হবে তোমাদের কাজ ।

দেখতে পেলাম পাকসেনা দুটি হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে চলে গেলো । আরো ক'জনের গলা পাওয়া গেলো আমাদের ডান পাশের সমান্তরাল পাকা সড়কের ওপরে একটু সামনে থেকে । ওরা কি এ রাস্তায় নামবে না কি? তাহলেই তো বিপদ! আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা । বাঁশঝাড়ের নিচেই আমন ধানের বীজতলা । ধানের চারাগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে । দু'জনেই বীজতলার মধ্য দিয়ে বুধন মেধারের বাড়ির দিকে বুকে হেঁটে হেঁটে এগুতে লাগলাম । একসময় বাড়িটা স্পষ্ট কর্তৃত হতলো আমাদের চোখে ।

পাকা রাস্তা থেকে ১০০ গজের মধ্যে বুধন মেধারের বাড়ি । বাড়িটা বেশ বড় । চারটা দোচালা বড় বড় টিনের ঘর । ছনের দু'তিনটা । উচু বাঁশের বেড়া দিয়ে বাড়িটা যেরা । সামনের পাকা রাস্তার কিছুক্ষণ খোলা । বাইরের উঠোনটা বেশ বড় । একটা হাঁটাপথ বড় রাস্তার সাথে বুধন মেধারের বাড়িটার সংযোগ স্থাপন করেছে । চারদিকে আম-কঠালসহ অন্য কাঁকে গাছগাছালির সারি । বাঁশঝাড় । বাড়ির পেছনে পাটক্ষেত । মোটামুটি বুধন মেধারের বাড়ির অবস্থাগত চিত্র এই মুহূর্তে সবকিছু এঁকে নেয়া গেলো । ব্যাস, আমাদের কাজ শেষ ।

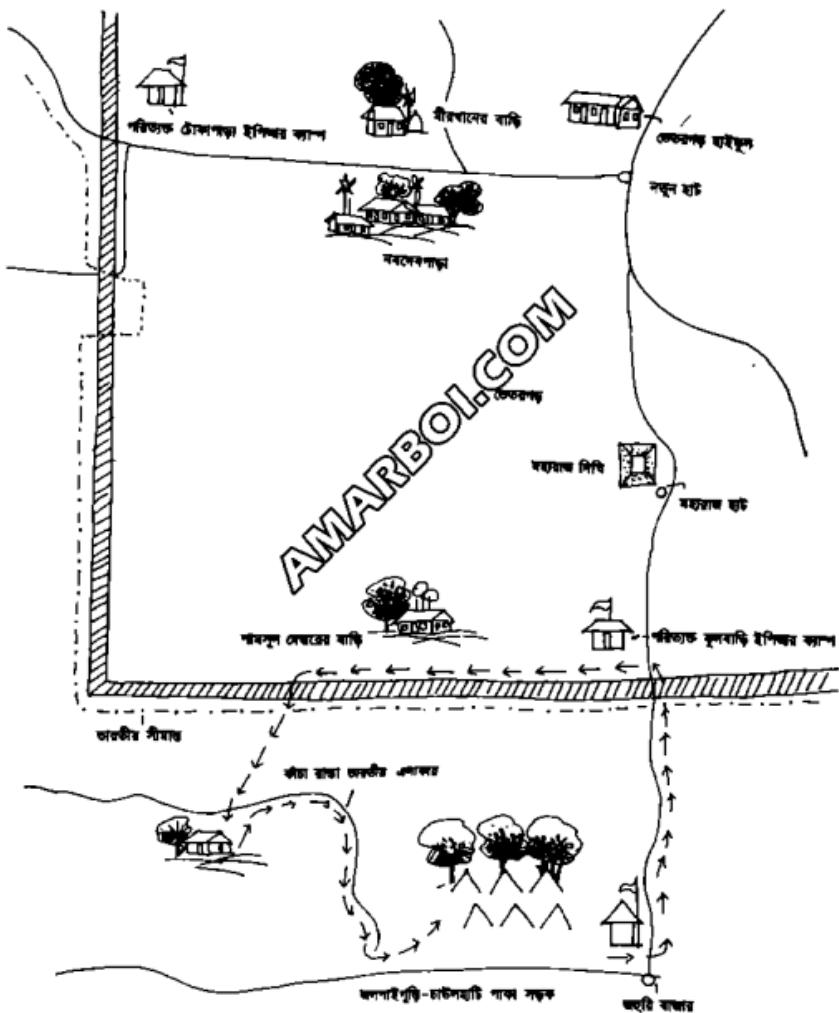
ফিরে চললাম । ফিরবার পথে বারবার মনে পড়ছিলো, অজ্ঞানে কোথায় গিয়ে পৌছেছিলাম । মাটির ঢিবি মনে করে কোথায় হাত দিয়েছিলাম আজ? জলজ্যান্ত পাকিস্তানি বাঙারে । সেতো এক বাঘের গুহা! বাঘের গুহায় হাত দিয়েও নিরিষ্টে ফিরছি, এরই নাম কপাল । আর.পি.তে ওরা বসেছিলো প্রচুর উদ্বিগ্নতা নিয়ে । আমরা আসাতে ওদের স্বত্ত্ব ফিরলো । চৱম ক্লান্তি আর শ্রান্ত দেহের অবসাদ নিয়ে আমরা ক'জন মুবক ফিরতে লাগলাম আমাদের আশ্রয়ে ভাটপাড়া ক্যাম্পে ।

৫.৭.৭১

মাঝপথে অভিযান পরিত্যক্ত— মিশন টোকাপাড়া

ই.পি.আর.দের ছেড়ে যাওয়া সীমান্ত ফাঁড়ি । যুদ্ধের শুরুতে বি.ও.পির সব বাঙালি সদস্য বিদ্রোহ করে । অবাঙালি কমান্ডার এবং সদস্যদের আস্তসমর্পণ করতে বাধা করার পর তাদের হত্যা করে । তারপর যোগ দেয় বন্দেশের মুক্তি আন্দোলনে । বি.ও.পির সমন্ত গোলাবারুদ আর অন্তর্সহ তারা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ ফ্রন্টে

কেন যান-৭
রেকি মিশন টোকাপাড়া
(কেন যাতা)



যুক্তে অংশগ্রহণ করে। ফলে বি.ও.পিগুলো পরিভাস্ক হয়ে যায়। আমাদের ভাটপাড়া ক্যাম্পের উটেটাদিকে পরিভ্যজ্ঞ ফুলবাড়ি বি.ও.পি। এর বাঁ পাশেরটা হচ্ছে টোকাপাড়া বি.ও.পি। ফুলবাড়ি থেকে টোকাপাড়ার দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। আজ রাতে আমাদের সেই টোকাপাড়া বি.ও.পি রেকি করতে হবে। মেজর শংকর বিকেলে এসে টাঙ্ক দিয়ে গেছেন, আজ তুমকো টোকাপাড়া বি.ও.পি রেকি কর্ণ হোগা। হামারা পাস ইফরমেশন হ্যায়, পাক আর্মি রেগুলারলি উস ক্যাম্পমে আতা হ্যায়। ইয়ে রোখ্মে হোগ। ইউ মাষ্ট স্টপ ইট। সো, পাহলে রেকি।

সুতরাং টোকাপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আমরা দশজন। রাত দশটার পর শুরু হলো যাত্রা। বড় ভাই নূরুল হক আজকের কমান্ডার। ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে ভেতরগড়ের সেই উচু গড়টার ওপর দিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। ভেতরগড়ের মধ্য দিয়ে রাস্তা ধরে গেলে অনেক ঘুরতে হবে এবং টোকাপাড়ার রাস্তায় বিপদের সম্ভাবনা আঁচ করে আমরা গড়ের ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

বড় ভাই নূরুল হক কমান্ডার হিসেবে মোটেই গ্রহণীয় নয় ছেলেদের কাছে। এমনিতেই তিনি একটু ভীতু প্রকৃতির, তাছাড়া তার বয়সও প্রায় চাল্লিশের ওপর। এবায়সে তিনি মুরতি ক্যাম্পের কষ্টকর ট্রেনিং শেষ করে সরাসরি মুক্তিযুক্তে যোগ দিয়েছেন, এটাই বড় কথা। ঠাণ্ডা মেজাজের, নিতান্ত প্রকৃজন ভদ্র মানুষ, যিনি যুক্তের আগে ঠাকুরগাঁও ওয়াপদার পরীক্ষামূলক খাবারে প্রক্রিয়ান্তরণ ওভারসিয়ার হিসেবে চাকরি করতেন। মোটকথা একজন সৎ চাকুরে, নিষ্ঠাজুল চরিত্রের ছা-পোষা মানুষ। যুক্তের ভাকে সাড়া দিয়ে তিনি তার পরিবার-পরিজনকে দেশের ভেতরে ফেলে রেখে চলে এসেছেন এপারে। এখন তিনি একজন মুক্তিজোড়। আজকের রাতের অপারেশনের দলনেতা বা কমান্ডার। সহয় সমন্বয়কে কোথা থেকে কোথায় যে নিয়ে আসে! যাই হোক, আমরা তার নেতৃত্বে একত্র লাগলাম গড়ের ওপর দিয়ে।

উচু-নিচু পিছিল পথে বড় বড় ধারালো ঘাসে ছাওয়া। হাঁট হোট কাঁটাময় বোপঝাড়। হাঁটতে কষ্ট হয়। ঘাসের লম্বা পাতার সাথে শরীরের ছোঁয়া লাগলেই চামড়া কেটে যায়। হাঁটতে গিয়ে আমাদের কখনও গড়ের পাদদেশে নামতে হচ্ছে, কখনও ওপরে উঠতে হচ্ছে। ভাবা হাঁটতে হাঁটতেই পথ ধরে আমরা শেষতক টোকাপাড়া ক্যাম্পে পৌছে যাবো। আকাশ এমনিতেই ঘন মেঘে ঢাকা। তার ওপর চারদিকে ঘূটঘূটে অঙ্ককার। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝাপিয়ে নামলো মুফলধারে বৃষ্টি। বড় বড় ফেঁটার বৃষ্টি আমাদের মাথা ভিজিয়ে দিলো মুহূর্তে। গায়ের জামাকাপড় ভেদ করে হানা দিতে লাগলো শরীরের প্রতিটি অণুরক্তে। এই তুমুল একরোখা বৃষ্টি আমাদের সমস্ত অন্তিকে টাস করে ঝাপসা করে দিলো চোখের দৃষ্টি। থামিয়ে দিতে চাইলো আমাদের এই অহ্যাত্মা।

প্রচণ্ড ঘনকালো অঙ্ককার। সামনে যে এগিয়ে যাচ্ছে একহাত দূর থেকে তাকেও ঠাহর করা যায় না। আর্মি ছিলাম সবার আগে। হাঁটতে গিয়ে হঠাতে করে কী হলো, আমি যেনো তলিয়ে যেতে লাগলাম একটা পাতালে। নিষ্ঠা অঙ্ককারে শুধু একটা শব্দ হলো, ধপ্। তারপর আমার অঙ্গিত্ব প্রায় লোপ পাওয়ার যোগাড়। মোসলেম

ছিলো ঠিক আমার পেছনে। সেই ব্যাপারটা টের পেয়ে চিন্কার করে উঠলো ভয়ার্ট গলায়, মাহবুব ভাই! তার চিন্কারে সবাই একসঙ্গে জড়ে হলো, মুহূর্তেই শোরগোল তুলেই শুরু হলো তাদের ডাকাডাকি। আমার সফিৎ ফিরলো তখন! ওপর দিকে মাথা তুলে বললাম, এই যে আমি নিচে।

আসলে পানি চলাচলের জন্য গড়টায় প্রায় তিন হাত পরিমাণ জায়গা কেটে একটা নালা তৈরি করা হয়েছে। অঙ্ককারে ঠাহর করতে না পেরে আমি সেই খাড়া নালায় পড়ে গেছি। প্রায় পাঁচ-ছ' হাত নিচে। ওপরে ওরা চেঁচামেচি শুরু করেছে। জববার আর নুরুল হকের হাঁকডাকের গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মোসলেম, দলের মধ্যে সব থেকে লহা-চওড়া, সে নালার পাশে উপুড় হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি নালার খাড়া কর্দমাঙ্গ দেয়াল যেষে হাচড়েপাচড়ে ক'বারের চেষ্টায় ওর বাড়ানো হাত ধরে ফেললাম। শক্ত হাতে টেনে তুললো আমাকে মোসলেম মিয়া, যুদ্ধের আগে যে ছিলো ঠাকুরগাঁও সিএন্ডবির রোড ডিভিশনের পিওন। ময়মনসিংহ জেলার ছেলে। নালা থেকে উঠে সেই বৃষ্টির মধ্যেই গড়টার ওপরে শুয়ে পড়লাম। ধাতস্ত হতে সময় লাগলো। বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচবার জন্য আমরা সবাই মাথা নিচু করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসেছি। অঙ্গের মুখগুলো নিচের দিকে, যেনো পানি না ঢুকতে পারে।

সামান্য বিষ্ট আর বিরতির পর আবার শুরু হলু উঠল। এবার এগুচ্ছি আমরা সামনের দিকটা তালোমতো ঠাহর করে অনেক সাবধানে পা ফেলে ফেলে। এদিকে, অপারেশন পালানো ছেলে, ফাঁকিবাজ ছোট জববার আজ অপারেশনে এসেছে। অপারেশন শুরু হওয়ার পর থেকে এই পাঁচটা সে কোনো দলের সাথেই যায় নি। অপারেশনে যাওয়ার জন্য দল ঠিক করার আগেভাগে প্রতিবারই নানা ছলচুতোয় ক্যাপ্সের কোনো না কোনো ক্ষণে সে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। হয়তো দেখা যেতো, লঙ্ঘরখানার জন্য রেশন মন্তব্য সরবরাহ করা ছাগলগুলোকে শুকনো ঘাসপাতা খাওয়াতে ব্যস্ত, কিংবা শাস্তি রঞ্জের গাধাটার পেছনে রয়েছে, নয়তো লঙ্ঘরখানার কমান্ডার মমতাজের সহকারী সেজে সবার রান্নার কাজে নিজেকে করে তুলেছে ব্যতিব্যস্ত। অপারেশনে যায় না, ফাঁকি দেয়, ভীতু বলে বন্ধুরা তাকে টিটকারি দেয়। তাই টিটকারির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই অনেকটা মরিয়া হয়ে সে আজকের রাতের অপারেশনে নিজে থেকে দলভুক্ত হয়েছে। সেই ছোট জববার রাত বাড়বার সাথে সাথে ভীত হয়ে উঠেছে। নালা থেকে উঠবার পর থেকেই সে আমার পেছনে পেছনে। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সে বলে উঠলো, মাহবুব ভাই চিনতা করেক, আর বুঝি যাওয়া ঠিক হবা নাহে। আমার কাছ থেকে কোনো রকম জববার না পেয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার ভীতি আর উদেগপূর্ণ গলায় বলে উঠলো, চিন্তা করেক মাহবুব ভাই, আর যাওয়া যাবে নাই, বিপদ হবা পাবুহে। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে দিয়েই জববার আওড়াতে থাকে সেই একই কথা, চিন্তা করেক, চিন্তা করেক মাহবুব ভাই।

ঠাকুরগাঁওয়ের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছোট জববার। ওর ছোট ভাই জয়নালসহ আজ সে মৃত্যুদে। যুদ্ধের পর সে তার নিজ বাড়িতে, নিজের পরিবার-পরিজনের

কাছে ফিরে যাবে, এ আশা প্রতিমুহূর্তে তাকে তাড়িয়ে ফেরে। তার ভাবনা, না সে গোপনও করে না, একদিন যুদ্ধ শেষ হবে। যুদ্ধ শেষে সে বেঁচে থাকবে আর ফিরে যাবে তার বাড়ি, ঠাকুরগাঁও শহরের উপকণ্ঠে সালান্দাৰ গ্রামে। ওৱ কাছে, যুদ্ধ মানেই মৃত্যু। কিন্তু তার মরা চলবে না, এজন্যই তার এতো ভয়। এজন্যই সে অপারেশনে যাওয়াৰ ব্যাপারটা এড়িয়ে চলে। আজই প্রথম জেদেৰ বনে এসেছে অপারেশনে। কিন্তু এসেও তার মনে শান্তি নেই। ফিরে ফিরেই তার মনে মৃত্যুৰ ভয় জেগে উঠছে। আৱ তাৱই বহিৰ্পূৰ্ক্ষ ঘটছে তার ভীতি মেশানো উৎকণ্ঠা ভৱা ভাষায়, মাহবুব ভাই চিন্তা কৰেক, চিন্তা কৰেক ...।

ততোক্ষণে ভিজে চুপসে গেছি সবাই। বড় বড় ফোটাৰ প্ৰচণ্ড ধাৰায় বৃষ্টি, সেই সাথে ঘুটঘূটে অঙ্ককার। জনপ্ৰণীৰ কোনো অতিতু নেই আশপাশে। শুধু একটানা বৃষ্টি ধাৰার ঝপঝপ্স সপ্সপ্স শব্দ। শৰীৰ কাঁপছে প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডায়।

সামনে হাঁটতে হঠাৎ পড়লো একটা বৌকড়া মতো উঁচু গাছ। গাছেৰ নিচে সবাই দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়া প্ৰয়োজন। এভাবে এগনো আৱ অসম্ভব। তাহাড়া প্ৰবল বৃষ্টি আৱ ঘন অঙ্ককাৰেৰ ভেতৱে আমৰা আমাদেৰ দিকও গুলিয়ে ফেলেছি। সেটা ঠিক কৱা প্ৰয়োজন। আমাদেৰ লক্ষ্য টোকাপাড়া ক্যাম্প। ঠিকানা অনুপাতে আমাদেৰ যাত্রাপথ ঠিক আছে কি না, প্ৰথমে সেটা ঠিকৰোৱা দৱকাৰ।

আজ আমাদেৰ সাথে কোনো গাইড নেই। ক্ষেত্ৰে অঙ্ককাৰে অপৰিচিত পথে অপারেশনে যাওয়া আসলেই কঠিন ব্যাপার।

আমাদেৰ সবাইকে হঠাৎ কৱে চুম্বক ভৰতে হলো। শুধু চমকানো নয় এবং বিহুলতাৰ মধ্যেও পড়তে হলো। ক্ষেত্ৰেৰ ঝলকানিৰ ভেতৱে স্পষ্ট দেখা গেলো, আমৰা সবাই দাঁড়িয়ে আছি একটা শুশানেৰ ওপৰ। বিকেল কিংবা সন্ধেৰ দিকেই সম্ভৱত মৃতদেহ পোড়ানো রয়েছে, তিতাৰ ওপৰ আধপোড়া একটা মৃতদেহ। হাড়গোড়, পোড়া শৰীৰ ইউনাদ সে এক বীড়ৎস দৃশ্য। এদিকওদিক ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে কিছু পোড়া-আধাপোড়া কাঠ, মাটিৰ কলসি, চাটাই, বাঁশ আৱ কাপড়েৰ পুটলিৰ মতো একটা কিছু। আমাদেৰ সবাই অনুভূতি তখন জমাট বাঁধবাৰ দশা। ভাবনাৰ খৈ হারাবাৰ যোগাড়। কোথায় যাওয়াৰ ছিলো আৱ কোথায় এসে পড়েছি। বাস্তব একটা শুশানে চলে এসেছি পথ ভুল কৱে। অদূৰে পানিতে নিভে যাওয়া চিতায় আধপোড়া একটা মৃতদেহ। শবদাহেৰ সমষ্ট চিহ্ন ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো চাৰদিকে। পায়েৰ নিচে ভেজা মাটি। তাতে শুশানেৰ ছাই মেশানো। কী কৱা যায় এই অবস্থায় এইসব ভাবছি, তখন আবাৰ ছোট জৰুৰাৰেৰ ভীতিমৰ্ত্তি গলা শোনা গেলো, বাগে, এটা তো শুশান ঘাট! এইটো আইজ মড়া পোড়াইয়াছে গে, এইটো থাকিল যাবেনি, হাঁটেন হাঁটেন, পালান। ছোট জৰুৰাৰই প্ৰায় জোৱ কৱেই শুশান এবং অৰ্ধদণ্ড চিতাৰ লাশেৰ পাশ থেকে আমাদেৰ সৱিয়ে নিয়ে এলো।

আবাৰ পথচলা। বৃষ্টি একবাৰ কমছে, আবাৰ বাঢ়ছে। কখনও উঁচুতে উঠে, কখনও নিচে নেমে হাঁটু বা কোমৰ সমান পানি ভেঙে হাঁটতে হচ্ছে। শৰীৰেৰ ভেতৱে তীব্ৰ হিম শীতলতাৰ অনুপ্ৰবেশ। অসাড় হয়ে আসছে সারাটা শৰীৰ। সকলেৰ

সহস্রীমা যেনো শেষ হয়ে আসছে।

ঠিক এইরকম অবস্থায় বাংলাদেশের দিক থেকে একটা শব্দের ধ্বনি কানে এলো। ক'টা লাইট জ্বলে উঠলো। মোটর সাইকেল মনে হচ্ছে। আমরা দ্রুত গড়ের অপর প্রান্তে ঢালুতে শিয়ে পজিশন নিলাম। অনেকক্ষণ ধরে এভাবে ভেজা মাটিতে বুক লাগিয়ে উগুড় হয়ে থাকলাম। ওপর থেকে প্রবল বৃষ্টির প্রপাত শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকলো। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, কানে বেজে ওঠা শব্দটা একসময় থেমে গেলো। তাই এবার গড়ের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে উঠে মাথা তুলে শব্দের উৎসের দিক দেখার চেষ্টা করতেই, পেছন থেকে বড় ভাইয়ের গলা ভেসে এলো, একরকম হিসহিসানো গলাতেই বললেন তিনি মাহবুব, তুমি আমাদের সবাইকে মারবে নাকি? আমার উপলক্ষ্মিতে আসছিল না, এখানে মোটর সাইকেল আসবে কোথা থেকে? তবে কি এটা শামসূল মেঘারের বাড়ির এলাকা? যেখানে ক'দিন আগে আমরা অপারেশন করে গেছি। গ্রেনেড চার্জ করে তার বাড়িঘরের ক্ষতি এবং ক'জন লোককে মারাঞ্চকভাবে আহত করে গেছি। কী জানি, হতেও পারে।

প্রবল বৃষ্টি, কালো কুচকুচে অঙ্ককার রাত আর শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়া অবস্থায় আমরা দিঘিদিক হারিয়ে ফেলেছি। এ পরিস্থিতিতে একটা সিন্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। দলের কমান্ডার আর সাহস পেলেন না এন্ট্রাইট। তিনি সিন্ধান্ত দিলেন, অপারেশন ড্রপড অর্থাৎ ‘পরিত্যক্ত’। সকলের শরীরের অবস্থা তখন এমন নাজুক যে, অপারেশন পরিত্যক্ত করার সংবাদে সবাই শিশু হাফ হেডে বাঁচলো। আজ রাতে আর টোকাপাড়া ক্যাম্প রেকি হলো না।

৬. ৭. ৭৩

ডাকাত! ডাকাত!!

টোকাপাড়া অপারেশন শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হলো। এবার ফেরার পালা। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। এখনো বৃষ্টির বিরাম নেই। এই থামছে, এই আকাশ ভেঙে ঝরছে। কখনও ঝিরঝিরিয়ে, কখনও মুষ্টি ধারে। আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের গা ছমছমানো শব্দ খেলা। মেঘে মেঘে সংঘর্ষের প্রচণ্ড গর্জন আর মাতামাতি। দিগন্ত কাঁপিয়ে কখনও বাজ পড়ার শব্দ, দূরে বা কাছে আলোর ঝলকানি তুলে। সেই আলোতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আশপাশের সবকিছু চকিতের জন্য। ফলে আমরা বুঝতে পারছি, আমরা এখন কোথায়, চলেছি কোনদিকে।

এখন এই মুহূর্তে আমরা গড়ের এপারের ঢালুতে শুয়ে। গড়ের ঢাল শেষ হয়েছে একটা খাড়ির মধ্যে শিয়ে। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি, সেদিক দিয়ে আর ফেরা যাবে না। আমাদের ফিরতে হলে গড়ের ঢালু বেয়ে নামতে হবে খাড়িতে। তারপর খাড়ি পার হয়ে ওপারের ডাঙ্ঘায় উঠতে হবে। সেখানে ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, ফসলের মাঠ। তাৰ ভেতৰ দিয়ে পিছিয়ে যেতে হবে। এলাকাটা ভারতের সীমান্য। সেখানে জনবসতি, বাড়িঘর থাকতে পারে। একটা কাঁচা রাস্তা পাওয়ারও সঞ্চাবনা রয়েছে। আর রাস্তাটা পেয়ে গেলেই আমরা হয়তো রাতের ভেতরেই আমাদের ভাটপাড়া

ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌছে যেতে পারবো। এবং সে চেষ্টাই করতে হবে আমাদের। কারণ, দিনের বেলা ভারতীয় এলাকায় চলাচল করা যাবে না। দিনের বেলায় মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় এলাকায় অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।

সিঙ্কড়ান্ত অনুযায়ী আমরা গড়ের ঢালুর প্রান্তের সাথে লাগোয়া খাড়ির গলা সমান পানিতে নেমে পড়লাম। হাতিয়ার, গোলাগুলি, ঘেনেড সরকিছু ভিজে গেলো। করার কিছু নেই। কিছুটা সাঁতরে, কিছুটা হেঁটে কচুরিপানা আর বুনো দাম ঠেলে ঠেলে একসময় খাড়িটা পার হওয়া গেলো। শরীরের কাপড়চোপড় ভিজে স্পস্সপে। গায়েমাথায় পানিতে তাসমান গুলুলতা আর কচুরিপানার অংশ ল্যাপ্টানো। কাদায়-পানিতে শরীরে মাঝামাঝি। খাড়ির পাড়ে কিছুটা ডাঙ। বৃষ্টি ধরে এসেছে তখন। ব্রাণ্ডি আর পরিশ্রমে সকলের হাঁফ ধরে গেছে। ডাঙার ভিজে ঘাসের ওপর সকলেই বসে পড়েছে। কিন্তু বড় ভাই নুরুল হক বসছেন না। তিনি কেবল তাগাদা দিয়ে চলেছেন থেকে থেকে ওঠো, চলো, তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এটা শক্তর এলাকা। এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে তখন। আমরা উঠলাম।

হাঁটু সমান পানিয়ার ধানক্ষেত মাড়িয়ে আমরা অনেকটা আন্দাজের ওপর ভর করে সোজা সন্ধুখপানে হাঁটছি এখন। সঙ্গবত সেটা উত্তরপ্রশ্নিম দিক। সামনে বিশ্রীণ ফসলের মাঠের ওপারে কালোমতো কিছু একটা দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় একটা গ্রাম। আমরা সেদিক মুখেই হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে একসময় ফসলের মাঠ শেষ হয়ে গেলো। আর কী অবাক ব্যাপার, আমরা একটী প্রস্তায় এসে পড়লাম।

কিন্তু রাস্তা পাওয়া গেলে কী হচ্ছে? আমরা যাবো কোন্দিকে? দিকচিহ্ন সব গুলিয়ে ফেলেছি আমরা।

রাত শেষ হয়ে আসছে। বৃষ্টি থেমে গেছে একেবারে। ফিকে হয়ে আসছে আকাশ। সূর্য উঠবার আগেই শ্বেত্যাপ্নো ফিরতে হবে। কমাণ্ডিং অফিসার মেজর শংকরের কড়া নির্দেশ। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতীয় এলাকাতেও মুক্তিযোদ্ধারা দিনের বেলায় অস্ত্রসহ চলতে পারবে না। বর্তমানে আমাদের ওপর আরোপিত এ এক কঠোর বিধান। যার হেরেফের করার কোনো রকম অবকাশ নেই।

রাস্তা ধরে একটু এগুত্তেই বাঁ দিকে একটা জনবসতি। মোটামুটি ছোট্ট একটা গ্রাম। রাস্তাটা থেকে একটা পায়ে হাঁটাপথ চলে গেছে থাম অবধি। আমরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম গ্রামটার দিকে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। ঠিক করলাম গ্রামবাসী কারো কাছ থেকে রাস্তার নিশানা জেনে নেবো। ভাবনা অনুযায়ী বেশ একটা বড় ধরনের বাড়ির সামনে গিয়ে জরুর ভাই হেঁকে উঠলেন, বাড়িতে কে আছেন, একটু উঠবেন? ছোট জব্বারও গলা মেলালো তাঁর সাথে, বাড়িত ক্যাহো আছেন নাকি বাহে? বাহে এক কেনা উঠিবেন?

বেশ ক'বাৰ ডাকাডাকি করা হলো, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। আমরা আবার হাঁকডাক করতে যাবো, ঠিক এমন সময় হাঁটাং করেই বাইরের দিককার বড় দোচালা টিনের ঘরটার একটা জানালা খুলে গেল খট্ করে। কিন্তু এ কী! একটা লোক জানালা দিয়ে মুখ বের করেই 'ডাকাত! ডাকাত!' বলে আর্ত চিৎকার শুরু করে

দিলো। তারপর তেমনি হঠাৎ করেই তার চিংকার ধ্বনি থেমে গেলো, যেমনি করে শুরু হয়েছিলো। বাড়ির ভেতর থেকে দুপ্দাপ্ত শব্দের সাথে সাথেই বাচ্চা শিশুর কান্না এবং কিছুটা শোরগোলের আভাস পাওয়া গেলো; তারপর সবকিছু চুপচাপ। কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে, আমরা দ্রুত পথ ধরলাম। আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা। ভারতের ম্যাটিতে ডাকাত হিসেবে চিহ্নিত হতে রাজি নই।

একস্বরূপ দৌড়ে সেই রাস্তাটায় ফিরে এলাম এবং অনুযানের ওপর ভর করে সবাইকে এগুতে বললাম দক্ষিণ দিকে। ওদিকেই আমাদের ক্যাম্প।

তখন চারদিক ফরসা হয়ে এসেছে। একে অপরকে দেখতে পাচ্ছি। সবারই বিধ্বণি ভেতে পড়া চেহারা। বড় ভাই অত্যন্ত ঝাউতাবে পা টেনে টেনে হাঁটছেন। জব্বার ভাই তাঁর দাড়িতে হাত বুলিয়ে চলছেন আপন মনে। ছোট জব্বার খূব খুশি। সে বেঁচে আছে এবং ফিরছে। এক সময় আমাদের পরিচিত আমগাছগুলোও দেখা গেলো। আমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা তাঁবুগুলো, আমাদের আশ্রয়স্থল যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। হঠাৎ ছোট জব্বার প্রায় গলা ছেড়ে বলে উঠলো, চিনতা করেক মাহবুব ভাই, মুই কহিছিনু না? হামরা তখন না ফিরিলে বিপদ হবার পারহিল হয়।

হয়তো ছোট জব্বারই ঠিক, কে জানে!

একটা নিঃসঙ্গ হেলিকপ্টার

একটা নিঃসঙ্গ হেলিকপ্টার উড়ছে আকাশে। অমরখানার ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে উড়ছে। চক্র দিচ্ছে। আবার কখনও আকাশের বুকে ছির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছে কোনো এক জায়গায়। অনেকক্ষণ ধরেই উড়ছে নিঃসঙ্গ হেলিকপ্টারটা। সম্ভবত উড়ন্ত হেলিকপ্টার থেকে নিচে পাকবাহিনীর পজিশনের ওপর রিকোনাইসেস বা গুঁপ্চরবৃত্তি করা হচ্ছে। অমরখানায় অবস্থার পাকবাহিনীর হাতে বোধহয় এ্যান্টি এয়ারড্রেন্ট গান নেই। তা না হলে উদ্দের মাথার ওপর দিয়ে এভাবে হেলিকপ্টারটা উড়তে পারতো বলে মনে হয় না।

জহুরী বাজারে পিটু আর জব্বার ভাইসহ আমরা তিনজন। সময় সকাল দশটার মতো। রাতের ঝাউতিকর অপারেশনের পর ক্যাম্পের তাঁবুতে শুয়ে-বসে থাকতে খুব বিরক্তি লাগছিলো। রুটিনবাধা একঘেয়ে জীবনে হাঁফ ধরে এসেছে। আমরা তিনজনই তাই হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি জহুরী বাজারে। বাজারের চায়ের দোকানের নড়বড়ে বেঞ্চাটায় বসে হেলিকপ্টারটার ঘুরে ঘুরে উড়বার দৃশ্য দেখছি। এ দোকানটায় চমৎকার ঝুরি পাওয়া যায়। মুড়মুড়ে ঝুরি ভাজা বুনিয়াসহ খেতে খুবই সুস্বাদু। এপারের মানুষজন হাটবাজার কি স্টেল বসে ঝুরি-বুনিয়া এক সাথে মিলিয়ে খুবই তৃপ্তির সাথে খেয়ে থাকে। এ চায়ের দোকানে ঝুরি-বুনিয়া আর চা এটা একটা অতি পরিচিত আইটেম। আমাদের দেশে এর প্রচলন নেই। বুনিয়া মিটির দোকানে পাওয়া যায়। কিন্তু ঝুরি-বুনিয়া নেই কোথাও। আমাদের লঙ্ঘরখানায় তৈরি আটার পুরি, চা আর রেশন থেকে পাওয়া রসদ দিয়ে তিনি বেলা যা রান্না হয়, তা এমন একঘেয়ে যে, জহুরী বাজারের এ চায়ের দোকানটার ঝুরি-বুনিয়া আর চা আমাদের একটা মুখ

বদলানোর মতো চমৎকার স্বাদের যোগান দেয়। ক্যাপ্স থেকে পালিয়ে এই জহুরী বাজারে আসবার পেছনে অন্যতম কারণ এই ঝুরি-বুন্দিয়া। পিন্টু দোকানে এসেই সেই প্রিয় খাদ্যের অর্ডার দিয়েছে। অর্ডার এসে গেলে আমরা থেতে থেতে হেলিকপ্টারটির নিঃসঙ্গ ওড়াউড়ি দেখছি।

এ ধারে অনেকগুলো মর্টার আর কামান বসানো হয়েছে। জহুরী বাজারের কাছাকাছি চাউলহাটিগামী পাকা রাস্তার বাঁ ধারে তিনটা মর্টার পোস্ট। মোটামুটি গাছগুলো দিয়ে ঢেকে ক্যামোফ্লেজ করার চেষ্টা করা হয়েছে। চাউলহাটির দিকে অন্য আর যেসব মর্টার আর আর্টিলারি পোস্ট, সবগুলো অমরখানার দিকে এ্যাক্সেল করে বসানো। শক্তর সঠিক পজিশন বায়নাকূলার দিয়ে চিহ্নিত বা জরিপ করছে আকাশে ওড়া হেলিকপ্টারে বসে থাকা কমান্ডার। শক্তর অবস্থান সঠিকভাবে চিহ্নিত করার পরপরই ওয়ারলেস মারফত সেটা তিনি তখন তখন জানিয়ে দিচ্ছেন নিচের আর্টিলারি কমান্ডারদের। আর সেই অনুযায়ী এ্যাক্সেল ঠিক করে মর্টার আর আর্টিলারি থেকে গোলা ছোড়া হচ্ছে। এপারের মর্টার-আর্টিলারিতে প্রথমে আন্তে শব্দ হয় বুম-বুম-বুম। প্রায় একই সাথে ৮/১০টা মর্টার আর্টিলারি এ ধরনের শব্দ করে ওঠে। ঠিক ৩০ সেকেন্ড পরপর সেগুলো উড়ে গিয়ে পড়ছে অমরখানার ওপর এবং দিগন্ত কাঁপিয়ে বিক্ষেপিত হচ্ছে। বিক্ষেপণের শব্দের ডেক্সেন্সায়িত হয়ে ভেসে আসছে, পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠছে থরথর করে। মুন্ডুর ওপর হেলিকপ্টার উড়ছে আর এভাবে গোলা ছুটে ছুটে যাচ্ছে। কখনও প্রিমে থেমে, কখনও অবিরাম, একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করে অমরখানার প্রস্তর এভাবে একটা পর একটা গোলা ছুটে যাচ্ছে, প্রচণ্ড বিক্ষেপণের শব্দ ভেঙে আসছে। আমরা জহুরী বাজারে ঝুরি-বুন্দিয়া আর চা থেতে থেতে তা দেখছি, শুনছি। হৃদয়ের তত্ত্ব জুড়ে অনুভবও করছি। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি শক্তি সম্পন্ন করা প্রয়োজন। অমিত শক্তিধর পাকবাহিনী। অসম্ভব দুর্ঘট বলেও সকলের বিস্ময়। আমাদের যুদ্ধ সেই তাদেরই সাথে। যুক্তে তাদের পরাজিত করতে না পারলে বাংলাদেশের জন্য হবে না। জয়বাংলা হবে না। আর এজন্যই আমাদের এপারে আসা। এজন্যই মিত্র বাহিনীর আর্টিলারি সাপোর্ট। আজকের প্রতিটা ছুটে যাওয়া গোলা মৃত্যুবাণের মতোই অমরখানা পাকসেনাদের বুকে গিয়ে বিধৃত। কিন্তু প্রতিটি গোলাই কি অব্যর্থ? কে জানে? যুদ্ধটা আমাদের। জয়বাংলা হলে সেটা হবে আমাদের। ভারতীয়রা আমাদের সাহায্য করছে। সবদিক দিয়েই। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে পারা যায় না।

রাখালদা

রাখালদা একজন চমৎকার মানুষ। ফর্সা একহারা চেহারা। মুখভর্তি কাঁচা দাঢ়ি-গৌফ। পরনে পাঞ্জাবি-লুঙ্গি। গলায় একটা ঝুন্দাক্ষমালা। সৌম্য দর্শন ত্যাগী মানুষের মতো চেহারা। মুখে সবসময়ই একটা আপন করে নেয়ার মতো হাসি লেপে থাকে।

আমাদের এই রাখালদা একজন বাঙাল। অর্থাৎ তিনিও আমাদের বাংলাদেশের মানুষ। ময়মনসিংহের তৈরবে পিতৃপুরুষের বাড়ি। সেখানেই তার জন্ম। ১৯৪৬-এর

দামা আর ১৯৪৭-এর পার্টিশনের সময় তার বাবা-জেঠার সাথে দেশ ত্যাগ করে এপার বাংলায় চলে এসেছেন। তখন তিনি মাত্র ১২ থেকে ১৪ বছরের এক কিশোর। এপারে এসে শরণার্থী হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন আর অনিষ্টিত ভবিষ্যৎয়ের অনেকগুলো বছর পার করে দিয়ে তারপর নানা ঘাটের পানি খেয়ে অবশ্যে জহুরী বাজারে এসে থিংু হয়ে বসেছেন। করতে পেরেছেন কিছু জায়গা-জমি। ছোট একটা ব্যবসাও রয়েছে তার। তার ওপরে নির্ভর করেই বর্তমানে মোটামুটি সচল দিনযাপন করতে পারছেন তিনি। স্থানীয় জনগণ তাকে মানে। ভক্তি করে। সকলের বিপদে-আপদে তিনি এগিয়ে যান। কৃষিকাজ, ব্যবসা আর অবসরে কোনো আখড়ায় গিয়ে দুষ্করের নামে জপটপ করেন। এই ইচ্ছে সংক্ষেপে জহুরী বাজারের রাখালদার পরিচয়।

সেই কবে, কোন্ কৈশোরে জন্মভূমি ছেড়ে আসলেও ভীষণভাবে মনে রেখেছেন তিনি তার ফেলে আসা শৈশব-কৈশোরের বাংলাদেশকে। মনে রেখেছেন তার জন্মস্থান ভৈরব বন্দর, উত্তুল মেঘনা নদী, নদীর ওপরকার সেই বিশাল ভৈরব ব্রিজ আর ব্রিজের ওপর দিয়ে গমগম শব্দে ধাবমান রেলগাড়ির শৃঙ্খল।

রাখালদার বাস এখন এপারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু তিনি মনেপ্রাণে এখনও বাংলাদেশের মানুষ। আর তার এই চেতনা থেকেই জুড়ে মুক্তির শুরু থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের জন্য প্রাণপাত করে থেটে যাচ্ছেন। তার পক্ষে যতোধানি করা সম্ভব তিনি তার সবকিছুই করে যাচ্ছেন। নিঃস্থার্থভাবেই। তাই তিনি সকলের জন্ম ‘রাখালদার’। তিনি আমাদের, ভাটপাড়া ক্যাম্পের সব মুক্তিযোদ্ধারও রাখালদার ক্যাম্পে তিনি কথনও যান নি। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে যাওয়া স্থানীয় মানুষদের জন্ম নিষিদ্ধ। তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এই চায়ের দোকানেই। সেদিনও অসমীয়া ঝুরি-বুন্দিয়া খেতে এসেছিলাম। পরে রাখালদার সাথে আমাদের অনেকবার কথা হয়েছে, তার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তার কাছ থেকে আমরা স্থানীয়ভাবে এই এলাকা এবং ভেতরগড়-পঞ্চগড় আর অমরখানা এলাকার অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। অপারেশন পরিকল্পনার সময়, যা আমাদের প্রভৃত সাহায্য করেছে।

এহেন রাখালদার আমাদের চায়ের দোকানে একদিন পাকড়াও করলেন। আমরা কামানযুদ্ধের ভেতরে বসে তখন অলস সময় কাটাচ্ছি। মুখে আন্তরিক সেই ভালো লাগা হাসি নিয়ে রাখালদা আমাদের তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আপনজনের মতো বসতে দিলেন ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে, বৌদি আর বাচ্চাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার স্ত্রী জলপাইগুড়ি এলাকার মেয়ে। তাকে শুনিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন, বুলে খোকার মা, জয়বাংলা হলো বলে, তারপর দেখো তোমাদের সকলকে নিয়ে আমি আমাদের ভৈরবে বেড়াতে যাবো। দেখবে কতো বড় বাড়ি ছিলো আমাদের। বাগান, জায়গা-জমি, মেঘনা নদী, কতো বিরাট, আর মাথার ওপর ব্রিজ দিয়ে ঝমাঝম গমগম ট্রেনের যাওয়া-আসা।

রাখালদার প্রত্যেক কথার শেষে তার জন্মস্থান ভৈরবে চলে আসে। রাজনীতি

মানুষকে স্থানচ্যুত করে, কিন্তু তার শিকড় উপরে ফেলতে পারে কি? পারে না।
রাখালদাই তার প্রমাণ।

বৌদ্ধ চা দিলেন, মুড়ি মাখিয়ে দিলেন, আমরা জমে উঠলাম রাখালদার সাথে
বাংলাদেশের গল্প নিয়ে। এমন সময় অনেকটা ইতস্ততভাব নিয়েই একজন ভদ্রলোক
এসে সামনে দাঁড়ান। রাখালদা পরিচয় করয়ে দেন, মুনির মোল্লা। আমার বাড়িতেই
থাকেন।

রাখালদার বাড়িতে আগ্রিত মুনির মোল্লা। সাথে আরো দুটি পরিবারও আশ্রয়
নিয়েছে। মুনির মোল্লার বাড়ি ঢাকা জেলায়। তিনি পঞ্চগড় চিনিকলের একজন
চাকুরে। পদবিতে মেকানিস্ট। যুক্তে পঞ্চগড়ের পতনের পর মুনির মোল্লা তার মুবতী
স্ত্রী আর ছেট ভাইটিকে নিয়ে প্রায় শূন্য হাতেই এপারে চলে এসেছেন শরণার্থী
হিসেবে। তার স্ত্রী সন্তানসংত্বা, অত্যন্ত দৃঢ়সময়ে রাখালদা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন।
রাখালদার প্রতি মুনির মোল্লার তাই কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমরা রাখালদার বাড়িতে জমে ওঠা আড়াটা এক সময়ে শেষ করে উঠে
দাঁড়াই। আসবার পথে মুনির মোল্লা আমাদের সাথে আসতে লাগলেন। তার স্ত্রী
মুবতী, তার ওপর সন্তানসংত্বা। তাই তার ভয়ের শেষ নেই। জানালেন মুক্তিযোদ্ধারা
এখানে ক্যাম্প করায় তিনি মনে মনে খুবই ভরসা পেছেছেন। দেখবেন ভাইয়েরা,
আমার যেনো কোনো বিপদ না হয়।

মুনির মোল্লাকে প্রচুর সাহস আর সাজানি দেই। এই মুনির মোল্লাই একদিন
ইত্রাহিমের অসুস্থতার সময় দ্রুত তাত্ত্বিকভাবে যাওয়ার জন্য তার সাইকেলটি দিয়ে
আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এখনও রাখালদারা রয়েছেন, মুনির মোল্লার মতো
অসহায় মানুষেরা রয়েছেন, আমরা নয়েছি। আমাদের সকলের সামনে লক্ষ্য একটাই,
জয় বাংলা, বাংলাদেশ।

ক্যাম্প ফিরছি। প্রায় দুপুর তখন। হেলিকপ্টারটা তখনও নিঃসঙ্গ একা একা
ঘুরে ঘুরে ওড়ে চলেছে। এপার থেকে একইভাবে বাতাসে শিস কেটে শেলের দল
ছুটে যাচ্ছে অমরবানাকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ঢাকা বিক্রমপুরের মুনির মোল্লা
তখনও আমাদের পেছনে পেছনে আসছেন। তার একটাই জিজ্ঞাসা, আমরা এভাবে
আর কতোদিন এখানে থাকবো? ভারত কি স্বীকৃতি দেবে না? কবে দেবে?

এর জবাব কি দেবো আমরা? আমাদের নিজেদের কাছেই তো এর জবাব নেই।
তবে ভারত যখন এতো করছে আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি না দিয়ে কি
পারবে? কে জানে?

বৃষ্টি! বৃষ্টি !!

সারাদিন বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। চারদিক পানিতে খৈখৈ। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠঘাট
সব পানিতে সয়লাব। তাঁবুর বাইরে পানির ধারা বয়ে চলেছে। জমিতেও পানি
উঠছে। তাঁবুর চারদিকে মাটি ঝুঁড়ে ড্রেমের মতো করা হয়েছে। মাটি উঁচু করে বাঁধ
তৈরি করা হয়েছে, যাতে করে পানির ঢল তাঁবুর ভেতরে চুক্তে না পারে। তাঁবুর

ওপৱে বৃষ্টির অবিৱাম আঘাত। ভেতৱেৰ পৱিবেশ স্যাতসেঁতে হয়ে উঠতে শুৰু কৱেছে। ছেলেৱা মাটিৱ বাঁধ মেৱামতে সদাৰ্বন্ত, যাতে কোনোভাবেই তাঁবুৱ ভেতৱে পানি চুইয়ে চুকতে না পাৱে। ভেতৱে পানি চুকলেই বিপদ। মাটিতে বিছানো বিছানাসহ সবকিছু তাহলে ভিজে যাবে। সবকিছু হয়ে যাবে কাদাপানিতে একাকাৱ। ছেলেদেৱ শোয়াৱ জায়গা, শুমুৰৱাব জায়গা সব নষ্ট হয়ে যাবে।

প্ৰতিটি তাঁবুৱ মেৱেতে ছেলেদেৱ বিছানা পাতা। নিচে খড় বিছিয়ে তাৱ ওপৱ শতৱজি পেতে বিছানা কৱা হয়েছে। প্ৰতিটি বিছানাৰ ওপৱ আৰাৰ সন্তা সিঙ্গেল চাদৰ। বালিশ নেই মাথায় দেয়াৰ মতো। প্ৰত্যেকেৰ নিজস্ব কাপড়েৰ ব্যাগ, ঝোলা কিংবা চামড়াৰ সন্তা ধৰনেৰ ব্যাগেৰ ভেতৱে নিজস্ব টুকিটাকি জিনিসপত্ৰ রাখা। বিছানায় শুয়ে থাকাৰ সময় সেই ব্যাগ বা পৌটলাই বালিশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্ৰত্যেকেৰ মাথার কাছে একটা শাদা রঙেৰ চিনেৰ থালা এবং একটা বড়ো শাদা হাতলালা মগ। থালায় কৱে নাস্তা এবং ভাত নিতে হয় লঙ্গুৰখানা থেকে। মগে নাস্তাৰ সময় দেয়া চা এবং আহাৱেৰ সময় দেয়া পানি। নিজেদেৱ থালা-মগ নিজেদেৱই ধূয়েমুছে সফত্বে রাখতে হয়। প্ৰতিটি তাঁবুৱ মাখ বৱাৰ দিয়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পৰ্যন্ত দড়ি টানানো। জামা-কাপড়-লুঙ্গি এসব কিছুই ওটৈৰ ওপৱে ঝুলিয়ে রাখা হয়। মুৱতি ক্যাষ্প থেকে লুঙ্গি-জামা-শতৱজি-গেঞ্জি-হাফ-প্রেস্ট-কাপড়েৰ জুতো-থালা-মগ ইত্যাদি জিনিসপত্ৰ ব্যক্তিগত ব্যবহাৱেৰ জন্য দিয়েকৈ দেয়া হয়েছে। সেই সাথে প্ৰত্যেকেৰ নামে ইস্যু কৱা হয়েছে অঙ্গ। প্ৰতিটি অঙ্গেৰ জন্য বৱাদ কৱা আছে গোলাবাৰুদণ্ড। দেয়া হয়েছে প্ৰচৰ প্ৰতিমণে মাইন আৱ এক্সপ্ৰেসিভ। এসবই ভাটপাড়া বি.এস.এফ ক্যাষ্পে নিৱাপত্তি ভৱিষ্যত ভেতৱে রাখা হয়েছে।

এই রকম অবোৱ বৃষ্টি বাবু দিলে বাইৱে যাওয়াৰ কোনো উপায় নেই। সারাদিন তাই তাঁবুৱ ভেতৱে শুয়ে রাখে অলস সময় কাটানো। ক্যাষ্পেৰ নিয়মানুযায়ী প্ৰতি দুঃঘটা পৱপৱ দিলে দুজন এবং রাতে চাৰজনকে সেন্ট্ৰি ডিউটি কৱতে হয়। উদ্দেশ্য, ক্যাষ্পেৰ নিৱাপত্তা বিধান। এছাড়া সক্কায়ৰ পৱ থাকে ক্যাষ্পেৰ চাৰদিকে এবং আশপাশে পেট্রল ডিউটি। পাঁচ-এক, অৰ্থাৎ ছয়জনেৰ একটি দল প্ৰতিৱাতে পেট্রল ডিউটিতে বেৱ হয়। ক্যাষ্পেৰ নিৱাপত্তাৰ খাতিৱে পেট্রল ডিউটি একটা অন্যতম প্ৰধান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশেৰ কাছাকাছি যেহেতু আমাদেৱ ক্যাষ্পেৰ অবস্থান, সেহেতু পাকবাহিনীৰ পক্ষে মুক্তিবাহিনীৰ এই ক্যাষ্পেৰ অন্তিত সম্পর্কে ইতোমধ্যে জেনে যাওয়া অস্বাভাৱিক কোনো ব্যাপার নয়। তাই তাৱা রাতেৰ অক্ষকাৱে সীমান্ত পেৱিয়ে এসে যে-কোনো সময় অতিৰিক্তে ক্যাষ্পেৰ ওপৱ কৰ্মান্বো হামলা চালাতে পাৱে। আৱ সে কাৱণেই রাতেৰ সেন্ট্ৰি এবং পেট্রল পাৰ্টিকে অত্যন্ত সতৰ্কতাৰ সাথে তাৱেৰ দায়িত্ব পালন কৱতে হয়।

এই রকম বৃষ্টিৰ মধ্যে চলাফেৱাৰ জন্য প্ৰত্যেকেৰ কাছে রায়েছে অবশ্য একটা কৱে পলিথিনেৰ টুকুৰো বা ফালি। সেই পলিথিনেৰ ফালিৰ একটা মাথা মুড়িয়ে বেঁধে সেটাকে বৰ্ষাতি বানিয়েছে ছেলেৱা। মোড়ানো দিকটা মাথায় গলিয়ে বাকিটুকু দিয়ে শৰীৰ আবৃত কৱে বৃষ্টিৰ মধ্যে তাৱেৰ চলাফেৱা কৱতে হয়। পলিথিন আবৃত অবস্থায়ই

হাতে একটা মোটা লাঠি বাইফেলের মতো করে ধরে সেন্ট্রি ডিটিও তাদের পালন করতে হয়। যেতে হয় রাতের অঙ্ককারে প্রেটলে। খালি পা আর লুঙ্গ হাঁটুর ওপর অবধি গুটিয়ে পাসওয়ার্ডের সঙ্গে জেনে নিয়ে প্রেটল পার্টি বেরিয়ে পড়ে। পাস ওয়ার্ড হচ্ছে সাঙ্কেতিক শব্দ। প্রতিদিন সঞ্চার আগে একটা নির্দিষ্ট শব্দ পাসওয়ার্ড হিসেবে নির্বাচিত করে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়। সঙ্গের পর যুদ্ধের মাঠে নিজের দলের সহযোগিদের জন্য পাসওয়ার্ড খুবই গুরুত্ব বহন করে। এটা জানা না থাকলে একজনকে ক্যাশ্পের মধ্যে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না। তাকে শক্ত বিবেচনা করে পাকড়াও করা হয় নতুনা তাকে মেরে ফেলা হয় গুলিবিদ্ধ করে। যেমন ধরা যাক, ক্যাশ্প কমান্ডার আজকের রাতের পাসওয়ার্ড রাখলেন 'লাল গোলাপ'। সামনে আগত কাউকে দেখতে পেলে সেন্ট্রি তাকে চ্যালেঞ্জ করবে এভাবে, হ ইজ দেয়ারঃ কে আসে? আগত ব্যক্তি নিজেদের দলভুক্ত হলে জবাব দেবে, 'ফ্রেন্ট, বস্তু'। সেন্ট্রি তখন জিগ্যেস করবে 'পাসওয়ার্ড?' তখন উত্তর ভেসে আসবে 'লাল গোলাপ'। এই সাঙ্কেতিক শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রি তাকে আসতে বলবে, কিন্তু আগত ব্যক্তির প্রতি তাক করা থাকবে হাতিয়ার। তাকে তখনও ঝুঁশিয়ার থাকতে হবে এ জন্য যে, পাসওয়ার্ড বলতে পারলেও সে মিত্র নাও হতে পারে, পাসওয়ার্ড শত্রুপক্ষ কোনোভাবে জেনেও ফেলতে পারে।

বৃষ্টির সময়টায় সব থেকে বেশি কষ্ট লঙ্ঘনশীল কমান্ডার যমতাজ আর কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজের। যে-কোনো পরিস্থিতিই হোক না কেনো, ক্যাশ্পের নববইজন ছেলের জন্য খাদ্য তাকে তৈরি কর্তৃতেই হবে। প্রবল বর্ষায় জুলানি কাঠ ভিজে থাকে। লঙ্ঘনখানার মাটির চুলেয়ে বৃষ্টির ছাঁট চুকে সব ভিজিয়ে দেয়। ভেজা লাকড়ির ধোয়ায় লঙ্ঘনখানার টিনের ছান্দোল ঘর একাকার হয়ে যায়। ধোয়ায় ধোয়ায় উপক্রম হয় নিশ্চাস বক হওয়ার প্রিল-ডাল-সবজি-আনাজ-মশলাপাতি সব মাখামাখি হয়ে যায়। তবু এর মধ্যেই ইনহাজ, যমতাজ, ইব্রাহিম আর রাউফ তাদের কাজ চালিয়ে যায়। তাঁবুতে তাঁবুতে পৌছে দেয় গরম ধোয়া ওঠা খিচড়ি। আর সেই খিচড়ির গক্ষে মুহূর্তে খিদে ছিগুন হয়ে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মুখে তুলে দিতেই তৃণিতে সবার মন ভরে যায়।

এমন দিনে বিকেল গড়িয়ে রাত আসে। আগে থেকে নির্ধারিত অপারেশনে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। কোমরে গায়ছায়ে পেঁচানো ঘেনেড আর কাঁধে অন্ত ঝুলিয়ে বৃষ্টি মাথায় করেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। বৃষ্টি বলে কোনো শব্দ নেই। বরং এমন দিনে অপারেশনে যাওয়ার ব্যাপারটা বাধ্যতামূলক। কারণ পাকসেনারা বৃষ্টির ভেতরে সাধারণত তাদের বাস্তা হেঢ়ে বের হয় না। তাই শক্রমুক্ত রাস্তা ধরে ঘুরঘুটি অক্কারের ভেতর দিয়ে চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই আমাদের সৈন্যিক লক্ষ্যে। রাতের প্রবল বর্ষণ আমাদের আড়াল করে শক্রের দৃষ্টি থেকে। তাদের আক্রমণ আর আক্রেশের হাত থেকে। আমরা এগিয়ে যাই সীমান্ত পেরিয়ে। শরীরের শত কষ্ট আমাদের সয়ে যায় বর্ষা-মঙ্গলের গান শুনে। যেতে যেতে একসময় ভাবি, এভাবে এ বর্ষা পার করতে পারলে, হয়তো আগামী বর্ষায় আমরা আমাদের দেশের সেই ফেলে আসা সুখী গৃহকোগের আশ্রয় পাবো। আরেক মনে দ্বিধা সত্যিই কি পাবো?

বাচ্চা মিয়ার ভূত দেখা

সেদিনও দিনমান প্রবল বৃষ্টি। তাঁরু থেকে বের হওয়ার উপায় নেই। তাঁরুর ভেতরে শুয়ে-বসে সকলেরই অলস সময় কাটছে। টুয়েনটি নাইনের আসর বসেছে বড় খলিলের তাঁবুতে। মতিয়ার, ওসমানের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা প্রামোফোনটায় চড়িয়েছে রেকর্ড। গানের আর্তনাদ ভেসে আসছে ওটা থেকে। পিন্টু আর জৰুর গঁজের আসর বসিয়েছে তাদের তাঁবুতে। বড় তাই নুরুল হক কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন। হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। ক্যাষ্পের অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে দুপুরের ভরপেট খাওয়ার পর।

ধীরে ধীরে দুপুর গড়িয়ে যায়। বৃষ্টিটাও ধরে এসেছে। কিন্তু আকাশের মুখ এখনো গোমড়া। যেনো খিম ধরে আছে। শাস্তি পরিবেশ ক্যাম্প জুড়ে। ঠিক এমন সময় বাচ্চা মিয়া ক্যাম্প জুড়ে একটা হুলস্তুল ফেলে দিলো—পাক আর্মি, পাক আর্মি বলে। কিন্তু কোথায় পাক আর্মি? কোন্দিকে? জিগ্যেস করতেই অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করলো বাচ্চা মিয়া। ক্যাষ্পের পেছনে ৩০০ গজের মতো দূরে বড় পুরুটার পাশে মানুষ সমান উঁচু পাট ক্ষেত্রটার দিকে আঙুল তুলে দেখালো। সর্বনাশ! এতো কাছে এসে গেছে পাক আর্মি? মুহূর্তে সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো গোটা ক্যাম্পটার মধ্যে। তাঁবুতে তাঁবুতে বসা জমজমাট আসর ভেঙে গেলো। একটু ছুটে গেলো সবার। একটা হতচকিত ভাব নিয়ে দৌড়াদৌড়ি হৈ-হুন্না আর স্বরে উত্তেজনায় দাপাদাপি শুরু হয়ে গেলো সবার মধ্যে। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হৈলৈকে কেনো, মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার। আর সবচেয়ে আগে দরকার হাতের নাগুজ হাতিয়ার। শক্ত যদি এসেই থাকে, তবে তাদের মোকাবিলা করার জন্য হাতিয়ার আর গোলাবারুদ দরকার সবার আগে। গোলাম গউসকে সাথে করে তাঁবুতে গেলাম বি.এস.এফ ক্যাষ্পে। কমান্ডারকে বললাম হাতিয়ার দিতে। এবং কুব.এস.এফ ক্যাষ্পে ও ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। ফলে তারা দ্রুত বি.ও.পি.র চাঁপাদককার বাঙ্কারগুলোয় চুকে গিয়ে পজিশন নিয়েছে। বি.এস.এফ কমান্ডার আমাদের হাতিয়ার দিলো না।

সুবেদার বললেন, হাতিয়ার দেয়া যাবে না। প্রচণ্ড উত্তেজনা তর্তীতে তর্তীতে। শরীর কাঁপছে। তাই জিগ্যেস করলাম, কেনো দেয়া যাবে না? আমাদের অন্ত আমরা নেবো। পাক আর্মি এসেছে। আর আপনি অন্ত দেবেন না? আমরা কি মারা পড়বো নাকি? কেনো দেবেন না?

তার তখনো জবাব, নেহি জি, হাতিয়ার আপনাদের দেয়া যাবে না, মেজের সাব কি মানা হ্যায়। মেজেরের অনুমতি ছাড়া আপনারা অন্ত পাবেন না।

— এই বিপদেও আমরা অন্ত পাবো না! মেজের সাহেবকে আমরা এখন কোথায় পাবো? আপনি আমাদের হাতিয়ার দিন।

— জি নেহি।

পোড়াবাওয়া সৈনিক বি.এস.এফ-এর কমান্ডার। তার জিম্মায় হাতিয়ার। মেজেরের অনুমতি ছাড়া তিনি অন্ত দিতে পারেন না। এই ডিসিপ্লিন তাকে রক্ষা করতেই হবে। এটা তার ওপরঅলার অর্ডার।

না, আমরা অন্ত পেলাম না ; একটা প্রচও ধাক্কা খেলাম এ ঘটনাটায়। কিন্তু কিছু করার নেই। দ্রুত ক্যাম্পে ফিরে এলাম আবার। খালি হাতেই। ছেলেরা ভয়মিশ্রিত চোখে পাটক্ষেত্তোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ ক্যাম্প ফেলে পেছনের রাস্তাটার ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেশ নিরাপদ ভোবেই এ জায়গাটা বেছে নিয়ে এই ক্যাম্প করা হয়েছে। তার এতো কাছাকাছি পাক আর্মি চলে আসবে, এটা ভাবাই যাচ্ছিলো না। আর যদি সত্যি সত্যি তারা এসেই থাকে, তাহলে, এখনই শুরু হবে তাদের চরম আক্রমণ। কিন্তু সকলেই নিরস। এ অবস্থায় তাদের মোকাবিলা আমরা করবো কীভাবে? এভোগুলো ছেলে আর ক্যাম্পের তাঁবুতে তাঁবুতে জিনিসপত্রের-বা কী হবে? বড় ভাই পাগলের মতো ছুটাছুটি করছেন। পিন্টু, আহিদার, জব্বর আর গউস এক জায়গার জড়ো হয়ে বিমৃত দৃষ্টি নিয়ে পাটক্ষেত্তের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওদের পাশে এসে দাঁড়ালাম। সকলের হাতেই লাঠি, চেলাকাঠ আর ইটের টুকরো, যে যা পেরেছে, তুলে নিয়েছে হাতে। রুদ্ধস্থাসে সকলের অপেক্ষা। আসছে, এই বৃক্ষ আসছে। পাটক্ষেত্ত থেকে এই বৃক্ষ বেরিয়ে এলো একদল দুর্বর্থ খুনি মানুষ।

না, এখনও আক্রমণ আসছে না। তবে যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। এই রকম অবস্থায় মেজের শংকরের কথা মনে হলো। তাকে খবর দেয়া উচিত। তার কাছে হাতিয়ার চাওয়া উচিত। এভাবে তো মরা যাবে আবার বিওপি-তে গেলাম জব্বর আর পিন্টুকে সঙ্গে করে। সুবেদার তার ক্ষেত্রলেস সেটে মেজরকে ধরলেন। মেজের খবরটা শুনেই ওয়ারলেসের মারফত জানালেন, তিনি আসছেন। আবার ক্যাম্পে ফিরে এলাম। চরম উত্তেজনা স্তরে সকলেই তখনো শক্তিভাবে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে। আধাঘন্টার ওপরে হায়ে গেছে। কিন্তু পাক আর্মির প্রত্যাশিত আক্রমণ তখনো হচ্ছে না।

হঠাতে কী মনে হতেই, বড়ুজাইয়ের নিষেধ সত্ত্বেও আমরা কঞ্জন এগুতে লাগলাম পাটক্ষেত্তোর দিকে। ধীরে ধীরে পাটক্ষেত্তোর ধার ঘেষে এগিয়ে নিয়ে উচু পুরুপাড়ে উঠলাম। এরপর সমস্ত পুরুর পাড়টার ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে পাটক্ষেত্তোর শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছলাম। কই না, কিছুই নেই। পাটক্ষেত্তের ভেতরে কেউ চলাচল করলে পাটগাছের মাথাগুলো নড়ে নড়ে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিচয়েই জানান দেবে কিন্তু পাটক্ষেত্তে তেমন কোনো কিছুর আভাসমাত্র নেই। দুর, বোগাস। শব্দটা মুখ ফসকে হঠাতে করে বেরিয়ে এলো। আমার কথায় হেসে উঠলো আহিদার, পিন্টু আর জব্বর ভাই। নিরাপদ বোধ করবার হাসি। স্বন্তি আর নিরাপত্তা পাওয়ার হাসি। পরপর সকলের মধ্যে সে হাসি সংক্রান্তি হলো। এ যে কতো বড়ো এক টেনশন ছিলো, সেটা বলে বোঝাবার নয়। সবার মনে স্বন্তি ফিরে এলো। তাই পিন্টুর ইত্তাবসূলত চটুল মন্তব্য শোনা গেলো, যাক বাবা, এ যাত্রা পিতৃদণ্ড প্রাণটা রক্ষা গেলো, কন্তো মাহবুব ভাই, চ্যালাকাঠ দিয়া কি পাকবাহিনীর এল. এম.জি. ঠেকানো যেতো?

— তারি চমৎকার ব্যাপার না, এল.এম.জি.-চাইনিজ রাইফেলের সামনে চ্যালাকাঠ আর ইটের টুকরো! সেইক্ষেত্রে উঠলো গোলাম গউস, এর নাম কি যুদ্ধ! আমরা কি গুলতি খেলা খেলতে এসেছি? যাক বাঁচা গেলো। পাকবাহিনীর কোনো

অস্তিত্ব নেই। ব্যাপারটা অমূলক। ভিত্তিহীন তাদের উপস্থিতির আশঙ্কা। কিন্তু সত্যিই যদি ওরা এসে পড়তো, আমরা তো সম্পূর্ণ অপ্রসূত ছিলাম। তাহলে নিশ্চিতই বড় ধরনের একটা ম্যাসাকার হয়ে যেতো। পাশের বি.এস.এফ ক্যাম্পও কিন্তুই করতে পারতো না। স্বচ্ছন্দমনে ক্যাম্পে ফিরলাম।

ক্যাম্পের সকলে তখন ঘিরে ধরেছে বাচ্চা মিয়াকে। বাচ্চা মিয়া আসলে বাচ্চা ছেলে। ১৫/১৬ বছরের এক কিশোর। রংপুরের হরিদেবপুরে বাড়ি। যুদ্ধের শুরুতে যখন রংপুর ক্যাট্টনমেটের কাছাকাছি তার ধামে পাকসেনারা ঢুকে পড়ে, তখন তরুণ-যুবক বয়সের সব ছেলেকেই পালাতে হয়। বাচ্চা মিয়াও পালায়। আর্মিতে ঢাকার করতো তার এক ভগ্নিপতি। ছুটি কাটাতে বাড়ি এসেছিলো। আর ছিলো পুলিশের চাকুরে নাদের হোসেন। ওদেরকেও পালাতে হয় দেশ ছেড়ে। কিশোর বাচ্চা মিয়াও তাদের সাথে সীমান্ত পেরিয়ে এসে সোজা মুক্তিযুদ্ধের টেনিংয়ে চলে যায়। মুরতি ক্যাম্পের টেনিং শেষে তার ভগ্নিপতি তোবারক হোসেন ইন্স্ট্রাকটর হিসেবে থেকে যায় ট্রেনিং ক্যাম্পেই। তাঁকে আসতে হয় আমাদের সাথে। নাদের পুলিশ এখানে তার আঘায়, গার্জিয়ান। তার তাঁবুতেই সে থাকে। এখনও দেশের বাড়ির কথা মনে হলৈই ঝরবার করে কেঁদে ফেলে। আমের প্রিজ্জা সরল কিছুটা বোকাটো ধরনের ছেলে বাচ্চা মিয়া। যুদ্ধের কঠিন বাস্তবতা সহ্য এখনও সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি।

পাটক্ষেত থেকে ফিরে এসে দেখি, ~~বেকি~~ বাচ্চাকে ঘিরে ধরেছে সকলে। তখন পড়স্ত বিকেল। বৃষ্টি থেমেছে, মেঘ ফুলে ঝোপ উঠেছে। বাচ্চাকে জিগ্যেস করা হচ্ছে, কী দেখিছিস তুই বাচ্চা, ঠিক করে বুজি। রংপুরের আঞ্চলিক টানে বাচ্চার কথা, মুই পায়খানা গেছিলু পাট বাড়ির আঞ্চলিক দেখিনু দুইজন মোচওয়ালা লোক মানুষ মোর দিকোত্ত তাকেয়া আছে। ওমার গায়োত্ত কালা কালা ড্রেস। মুই ভয়েতে দৌড়ি চলি আনু।

— দুস্ শালা তুই যে কি দেখছিস?

— না, খোদার কসম, মুই দেখনু দুইজন মোটা মোটা মানুষ...

— শালা, তুই ভূত দেখেছিস।

— নোয়ায়, খোদার কসম—।

রংপুরের ছেলে বাচ্চা মিয়া এরপর তোত্তাতে থাকে। আর একটা অসহায় মুখভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। বিপদ কেটে যাওয়ায় বাচ্চা মিয়া সকলের হাসি-তামাসার খোরাক হয়ে দাঁড়ায়। এমনি সময় মেজের শংকরের গাড়ি দেখা গেলো। তিনি এসে উপস্থিত হলেন।

— কেয়া হ্যারে নুরুল হক! বড় ভাইয়ের কাছে মেজের ঘটনা জানতে চাইলেন।

ঘটনা শুনে তিনি বাচ্চা মিয়াকে ডাকলেন। বাচ্চা তার সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি বলে উঠলেন, বাচ্চা মিয়া তুমি তো আসলেই বাচ্চা আছো, ঠিক হ্যায় বাচ্চা, তুম কেয়া দেখা হ্যায় বোলো।

বাচ্চার ঘোর তখনো পুরোপুরি কাটে নি। অনেকটা জড়িয়ে যাওয়া গলায় বলতে

লাগলো, স্যার আমি তো পায়খানা গেয়া পাট বাড়িমে, তো আমি দেখা কালা কালা দুই লোক মোর দিকে তাকাতে হ্যায়, বড় বড় চোখ, দেখিয়া মুই ভয় পানু আর সৌভ মারাকে পালায়া আয়া।

মেজর শংকর বাঢ়া মিয়ার চমৎকার হিন্দি বাংলা মিশ্রিত কথার বিবরণ শুনে হেসে ফেললেন। তারপর গভীর আর সন্দিক্ষ দৃষ্টিতে বাঢ়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাঢ়া তুমি ঠিক কি কিছু দেখেছো, না খুট বাত বলছো?

মেজরের চাউনির সামনে বাঢ়া তখন ভয়ে জবুথবু। কথা বলতে পারছে না। আমি তখন বললাম, এটা বোধহয় ওর দেখার ভুল, আমরা তন্মতম্ব করে পাটক্ষেতটা দেখেছি, আশ্লে কিছু না।

মেজর কিছুক্ষণ পাটক্ষেত এলাকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, এরপর অনেকটা ঝগতোক্তির মতো বললেন, বাঢ়া মিয়ার কথা কিংবা দেখার ব্যাপারটা আজ হয়তো ঠিক হয় নি, কিন্তু কাল হতে পারে। পাক আর্মির এখান পর্যন্ত আসাটা অসম্ভব কিছুই নয়, ওরা কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে তোমাদের ক্যাম্প ম্যাসাকার করে দিতে পারে! সুতরাং তোমাদের সাবধানে থাকতে হবে। রাতে সেন্ট্রি ডিউটি জোরদার করতে হবে। শক্তিশালী পেট্রল পার্টি লাগাও। তোমাদের পাশের বিএসএফ ক্যাম্পও তাদের ডিউটি জোরদার করবে।

মেজর শংকরের কথায় বাধা দিয়ে এবার অফিস বললাম, আজকের রাতের জন্য আমাদের কিছু হাতিয়ার দেয়া হোক স্যার। কিন্তু হলে খালি হাতে একেবারে থাকাটা নিরাপদ নয়।

মেজর শংকরের সোজাসাপট ঝুঁসব, নো, এর কোনো দরকার পড়বে না। তোমরা শুধু সজাগ থাকবে। কমপক্ষে চারদিকে আর সামনের পুরুরের উচু পাড়টারও চারদিকে তোমরা ট্রেক্স আর বালুর তৈরি করবে। আমি কাল বিকেলে এসে দেখতে চাই, সব কমপ্লিট হয়েছে। ঠিক হ্যায়?

— ইয়েস স্যার। পায়ের পাতার ডগার ওপর দাঁড়িয়ে, হাত দুটো পেছনে নিয়ে, টান টান হয়ে বুক সামনে নিয়ে উচু করে দাঁড়িয়ে এ্যাটেনশন অবস্থায় মেজরকে সম্মান জানালাম আমরা। আমাদের অফিসার কমান্ডিং মেজর বলবীর সিং শংকর সকলের মঙ্গল কামনা করে চলে গেলেন।

সন্ধ্যার দীর লয়ে মুছে যাওয়া আলোয় দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। মনের ভেতরে অবিশ্বাস আর বিদ্রোহ জমে ওঠে মুহূর্তে। এটা কি যুদ্ধ? প্রয়োজনের সময় আমরা হাতিয়ার পাবো না। কিন্তু কেনো?

— আসেন, চা নেন মাহবুব ভাই, মিনহাজের ডাকে সঙ্গি ফেরে। মিনহাজ আসলেও অত্যন্ত করিতকর্মী মানুষ। এতো গোলমাল আর হৈচৈ উভেজনার মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে লঙ্ঘনখনার কাজ চালিয়ে গেছে। চুলো জুলিয়েছে। তৈরি করেছে সকলের জন্য বিকেলের চা আর নাস্তা। মিনহাজের হাত থেকে চা নেয়ার পর বিমর্শ ভাবটা কেটে গেলো। মন বলে উঠলো, হবে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।

জয়বাংলার মানুষ

দিনগুলো কেমন যেনো একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সারারাত অপারেশন। ভোরবেলায় সেই অপারেশন শেষে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শরীরে তাঁবুতে ফেরা। গরম পুরি আর চা দিয়ে নাট্টা সেরে তাঁবুতে ঢুকে মাটিতে পাতা বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়া। বেঘোর ঘুমে অচেতন পড়ে থাকা কিংবা নিদ্রা দেবীর বিলাসিত আগমনে চেতন-অচেতনের একটা মাঝামাঝি অবস্থায় দশটা এগারোটা পর্যন্ত নিজীবভাবে শুয়ে থাকা। এরপর বিষ ধরা শরীর নিয়ে তাঁবুর বাইরে চলে আসা। আবার সেই জহুরী বাজারের সেই চায়ের দোকান। ঝুরি-বুন্দিয়া থেতে থেতে পাকা সড়কের ওপর দিয়ে ধারমান মানুষজন আর গাড়ি-ঘোড়ার যাওয়া-আসা দেখা। জয়বাংলার মানুষ অর্থাৎ শরণার্থীদের সাথে তাদের দুরবস্থা নিয়ে অনুযোগ শোনা। চায়ের দোকানে বসা স্থানীয় মানুষজনের নিষ্পত্তি চাহনি দেখা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এদের সমস্যা-সঙ্কুল জীবনে ঝড় তুলেছে। প্রতাৰ ফেলেছে তাদের সমাজজীবনে। চায়ের দোকানে অলসভাবে বসে থাকা মানুষজন আমাদের দেখালেই যেনো আলোচনামূখ্য হয়ে ওঠে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী বাংলাদেশ থেকে আসায় এ দেশে সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। কুল-কলেজ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শরণার্থীরা জায়গা নিয়েছে। সে কারণে সেগুলো বক্ষ। বাজারে জিনিস খুঁজে যায় না। গাড়িতে ভিড়। জয়বাংলার মানুষের জন্য গাড়িতে ঝঠা যায় না। হলচেলে-চায়ের দোকানে ঢোকা যায় না। ওরা আমাদের সবকিছু থেঁথে-দেয়ে সন্তুষ্ট করে দিছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুষতে হচ্ছে। গরিব দেশ ইতিয়া, একটু লাকের ভরণপোষণের সামর্থ্য কোথায় তার? ইতিয়ার লোকদের ভাগ থেকেছে তাঁচাট করে তার যোগান দিতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জয়বাংলার মানুষজন মানব ধরনের বিশ্বজ্ঞান আর ন্যক্তারজনক সব কাজ কারবার করছে শহরগুলোতে। তারা এদেশের সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে। তার ওপর আবার যুদ্ধ। যুদ্ধের ধক্কলও পোহাতে হচ্ছে তাদের। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দাও। তাদের গোলাবারুদ্ধ আর রেশন দাও। তাদের পেছন থেকে সাপোর্ট দাও। কি করছে তালে মুক্তিবাহিনী? রাতে বর্জারের ওপারে গিয়ে কয়েক রাউন্ড ফাইসফুটস। তারপর পালিয়ে আসা। এটা কি যুদ্ধ? এই করে ওরা কীভাবে জয়বাংলা করবে? কোথায় গেলো তাদের সাধের পাকিস্তান? খুব ফুর্তি করেই তো দেশ ভাগ করা হয়েছিলো। কি হলো এখন তার?

চায়ের দোকানে বসে এ ধরনের কথাই অধিকাংশ সময় শুনতে হয়। আমাদের কানে আসে। কিন্তু আমরা জবাব দিই না। লাভ নেই তাতে। কেবল মনে মনে বলি, দেশটা আমাদের নয়। আমরা এখানে শরণার্থী। তাই আমরা চায়ের দোকানে আসা একদিনের পুরনো বাসি খবরের কাগজে মনোনিবেশ করি। আনন্দ বাজার, অম্বত বাজার ইত্যাদি। জয়বাংলার বিভিন্ন রণাঙ্গনের খবর থাকে তাতে। আখড়াড়া, কসবা, ছাগলনাইয়া, শমসেরনগর, হেমকুমারী, ভুবনসামৰী, নাগেশ্বরী, হিলি, বেনাপোল এসব জায়গার লড়াইয়ের খবর। থাকে স্বাধীন বাংলা সরকারের বিশ্ববিবেকের প্রতি সাহায্য আর স্বীকৃতির আবেদন। প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীর মুক্তিযোদ্ধাদের

উদ্দেশে দেয়া বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আর অস্থায়ী বাস্ট্রপতির মুক্ত এলাকা সফর সেই সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থী শিবির পরিদর্শনের সময় তাঁর দেয়া সাহায্যের আশ্বাস সংবলিত খবর ইত্যাদি।

এক সময় রাখালদা আসেন। সব দিন তাকে পাওয়া যায় না। রাখালদা এলে, ধরে নিয়ে যান তাঁর বাসায়। মার্কিসবাদে দীক্ষিত রাখালদার সাথে কিছুক্ষণ রাজনীতির আলাপ হয়। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা তাঁবুতে ফেরা। এরপর পুরুরে গোসল। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজ। রেশনের কাঁকরযুক্ত গুড় চালের ডাল-ভাত। সাথে সবজির তরকারি, কিংবা হাড় জিরজিরে ছাগলের মাংস। খাওয়ার পর তাঁবুতে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেয়া। ঘুমোনোর চেষ্টা। এইভাবে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল হলেই শুরু হয় মেজের শুরু অপেক্ষার পালা। তিনি আসেন নতুন অপারেশনের টাঙ্ক নিয়ে, রাতের অপারেশনাল টাঙ্কের ত্রিফিং দেন। তারপর গুড় বাই বলে চলে যান।

তারপর নামে সঙ্ক্ষ্য। সেন্ট্রিরা কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী ডিউটিতে দাঢ়িয়ে যায়। মিনহাজ প্রত্যেকের রাতের খাবার পরিবেশন করে।

রাত বাড়তে থাকে। আর সেই সাথে শুরু হয় অপারেশনের প্রস্তুতি। অপারেশনের জন্য যারা নির্বাচিত হয়, তারা তৈরি হয়ে যায়। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে বেরিয়ে পড়ে। যেদিন কোনো অপারেশন থাকে না, তখন রাতেও বাংলাদেশের ভেতরে যেতে হয় রেকি প্রেটেল নিয়ে।

ভাটপাড়া ক্যাম্পের প্রাত্যহিক কৃটিজ এলাকানে এ রকমেরই হয়ে দাঢ়িয়েছে। এর ভেতরেই চলে ছেলেদের হৈচৈ, সামুদ্রিকাবণ নিয়ে রাগারাগি, চিৎকার, বচসা। এর ওর সাথে। জব্বার ভাই আর পিটুর কাজ হচ্ছে সেগুলো মেটানো। বিকেলের দিকে খলিল মতিয়ারদের হাতড়ু আসর বেশ জমে ওঠে। সঙ্গের পর মতিয়ারের সেই গ্রামোফোনের আর্টনাদ। চঞ্চে বড় ভাই নূরুল হকের গার্জিয়ানসুলভ কর্তৃতৃ। সব দিকে তার নজর রেখে ম্যানেজ করার চেষ্টা। অসম্ভব একঘেয়ে আর কুটিনবাধা ক্লান্তিকর জীবন আমাদের, তবুও ক্যাম্পের সকলে যেনো একটা পরম আত্মীয়তা আর সম্মতির বাঁধনে আটকা পড়ে গেছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে নিয়ে আসা প্রত্যেকের নিজস্ব আংশিকতা বোধ, কথাবার্তা আর সংস্কৃতি—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধর্মী-গরিব, শহরের গ্রামের খেটে-খাওয়া দিনমজুর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া দীপ্ত তরুণ-যুবক সবাই একাকার হয়ে গেছে এখানে। একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সকলের মধ্যে। ক্যাম্পের সবাই এখন এক পরিবারের সদস্য। সকলের একই উদ্দেশ্য। একই কাজ। যুদ্ধ যদি কোনো দিন শেষ হয়, দেশ যদি স্বাধীন হয় কোনোদিন, তা হলে আবার যে যার বাড়িতে, নিজস্ব জগতে ফিরতে পারবে। তখন আজকের এই পরিবেশ থাকবে না। হয়তো দেখাই হবে না অনেকের সাথে। বিন্দু জীবন বাঞ্জি রেখে টেনিং শেষে এই ক্যাম্পে যারা এসেছে এবং আজকের এই দুষ্টসহ দুর্দিনে নিজেদের মধ্যে গড়ে ওঠা যে আত্মীয়তা, তা কোনোদিন ভাঙবে কি? না ভাঙবে না। এ আমার বিশ্বাস।

মুরতি ক্যাম্পের টেনিং শেষে ভাটপাড়া ক্যাম্পে আসা, প্রতিদিন রাতে অপারেশন

অর্থাৎ যুদ্ধে যাওয়া, যুদ্ধের পরিকল্পনা করা এবং সেটা কার্যকর করা থেকে শুরু করে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও রেশন সরবরাহ করা, মাস শেষ হলে পঞ্চাশ টাকা করে নগদ ভাতা দেয়া, সেই সাথে ছেলেদের দৈনন্দিন ভালোমন্দের সবকিছুর তদারকি করা— এসবই করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। আমরা মেজর শংকরের অধীনে থেকে যুদ্ধ করছি। তিনি যেভাবে যা করতে বলছেন, আমরা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। ব্যাপারটা আমাদের ভেতরে ভেতরে পীড়া দিচ্ছিলো। এই রকম প্রশ্নের পর প্রশ্ন উথলে উঠছে মনের ভেতরে : আমাদের সাথে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ নেই কেনো? বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি আসে না কেনো আমাদের মধ্যে? তারা কি আমাদের খোজ রাখেন না? আমরা কি করছি। কীভাবে কাটছে আমাদের দিন আর রাত্রি?

অবশ্যে, এলেন একজন। এক বিকেলে সিরাজুল ইসলাম নামে একজন সংসদ সদস্য এলেন, দিনাজপুরের পঞ্চগড় এলাকার আওয়ামী লীগের নেতা তিনি। সাথে তার ক'জন অনুসারী। বেশ কিছুক্ষণ খোলামেলা আলাপ হলো এমপি সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে। তাঁর কাছে ছেলেদের অভিযোগের শেষ নেই। সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠলো এইভাবে: বাংলাদেশ সরকারের সাথে যোগাযোগ নেই কেনো মুক্তিযোদ্ধাদের? এমপি সিরাজুল বৈর্য ধরে শুনলেন সব। তারপর বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সুসংহত করার চেষ্টা চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে সবকিছু। ভরাট গলার লম্বা চওড়া মানুষ সিরাজুল ইসলাম। তার কথাবার্তার ভঙ্গি দারুণ চৌকস। বাংলাদেশ সরকারের কাছে ছাপা আমাদের খবর পৌছে দেবেন বলে জানালেন। নিজে এসেও মাঝে মাঝে কোর দিয়ে যাবেন বলেও কথা দিলেন। তারপর উঠলেন। যাওয়ার সময় এক ক্লাউডের একটা রেডিও তিনি ক্যাম্পের জন্য দিয়ে গেলেন। আর যাই হোক ক্লাউডের কী ঘটছে দৈনন্দিন খবরাখবর ইত্যাদির জন্য রেডিওটা আমাদের কাছে একটা বড়ো পাওয়া মনে হলো।

টার্গেট অমরখানা, পাকবাহিনীর লঙ্ঘরখানা, প্রমোদ দাঁটি
 ভাটপাড়া ক্যাম্পের দিনগুলো এমনিভাবেই কাটছিলো। এখানে ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে ১৯৭১-এর জুনের ২৩ তারিখে। অপারেশন শুরু হয়েছে ২৭ জুন তারিখ থেকে। অপারেশন শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের বড়ো ধরনের সাফল্য না এলেও, যা এসেছে, সেটা একেবারে তুচ্ছ নয়। দিনের পর দিন অধিকৃত এলাকার রাস্তাঘাট আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠছে। বেশ ক'জন বিশ্বস্ত লোক পাওয়া গেছে, যারা গাইড হিসেবে আমাদের প্রতিটি অপারেশনেরই অংশভাগী। ট্রেনিং সেটারের গক্ষ শরীর থেকে মুছে ফেলে ছেলেরা অভ্যন্ত হয়ে উঠছে যুদ্ধের সাথে। ওদের সাহস বাড়ছে। বাড়ছে ঝুঁকি নেয়ার প্রবণতা। করায়ন্ত হচ্ছে বাস্তব কলাকৌশল। আর সব থেকে যে ব্যাপারটা বড়ো, সেটা হচ্ছে, নিজেদের পাকবাহিনীর তুলনায় দুর্বল ভাবার ধারণা মন থেকে মুছে ফেলে আমরা তাদের আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জানতে শিখেছি। ছেটখাটো বেশ ক'টা অপারেশনে আমরা সফল হয়েছি। তার ফলে অর্জন

করেছি অফিসার কমান্ডিং মেজর শংকরের বিশ্বাস আর নির্ভরতা। খুশই মনে হয় তাঁকে আমাদের বিষ্ফলতা আর কার্যক্রমে। কিন্তু তিনি আরো কিছু চাইছেন আমাদের কাছ থেকে: আর সেটা হচ্ছে পাক আর্মির সাথে সরাসরি সংঘর্ষ। তাদের বড়ো ধরনের ক্যাজুয়েলটিজ বা ক্ষয়ক্ষতি। অবশ্য এখন পর্যন্ত আমরা পাক আর্মির সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিঙ্গ হই নি। সেটাই এখনো বাকি।

সেই সুযোগ এলো অবশ্যে। বুধন মেঘারের বাড়ি রেকি করবার তিনদিনের মাথায় এলো সে নির্দেশ। অমরখানায় বুধন মেঘারের বাড়ির এবং আশপাশের এলাকার রেকি বিবরণ বিস্তারিতভাবে শুনলেন মেজর শংকর মন দিয়ে। গোল হয়ে বসেছি আমরা ক'জন মাটিতে উৰু হয়ে। আমি মাটিতে দাগ কেটে কেচ একে বুঁধিয়ে দিচ্ছিলাম মেজর শংকরকে বুধনের বাড়ির অবস্থান। ধারণা দিচ্ছিলাম পাকবাহিনীর ডিফেন্স লাইনসহ তাদের বাস্কার, টেক্স, সরবরাহ লাইন আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে। বললাম, অমরখানা ঘাঁটির পাকসেনাদের লঙ্গরখানা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বুধনের বাড়ি। বুধন মেঘার পাকবাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করছে। তার কাজ হচ্ছে, দিনের বেলা পাকসেনাদের সাথে গ্রামে গিয়ে জয়বাংলার পক্ষের লোকদের ধরিয়ে দেয়া, মুক্তিবাহিনীর আস্তানার খৌজখন্দির নেয়া, মানুষজনকে ধরে এনে বাস্কার তৈরির কাজে লাগানো এবং রাতের বেলুচি-রাস্তা-ব্রিজ পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা। গ্রামের দিকে গেলেই তারা মানুষের স্বরূপ, ছাগল আর মুরগি ধরে নিয়ে আসে। জানালাম, নিজের যুবতী দ্বিতীয় শ্রীমতী সে খান সেনাদের সেবায় নিয়োজিত করেছে, সেই সাথে আরো ৮/১০ জন প্রচান্ড মেয়ে সে জোর করে ধরে সেখানে জড়ো করেছে। তার বাড়িতে হাপিতভূক্তবাহিনীর লঙ্গরখানায় তিনবেলা রান্না হয়। লঙ্গরখানার তদারকি এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের দায়িত্ব বুধনের। এজন সে যে-কোনো উপায় এহেঁ ক্রতৃত খিদ্ব করে না। তার অত্যাচারের কাহিনী তাকে ইতোমধ্যে অমরখানা সেটারে বিখ্যাত করে তুলেছে। স্থানীয় লোকজন তাকে প্রচণ্ডভাবে ভয় পায়। তাকে একভাবে যেমন চেনে মিত্রবাহিনী, তেমনি মুক্তিবাহিনীর সব সদস্যও। সীমান্তের এগারেও তার পরিচিতি ব্যাপক।

বুধনের বাড়িতে লঙ্গরখানা হওয়ায় পাকসেনাদের ১০/১৫ জনের একটি সক্রিয় দল সেখানে স্থায়ীভাবে থাকে। এছাড়াও রাতদিন রগাঙ্গমে মেশিনগান চালানো ক্রান্ত সৈনিকরা সেখানে আসে বিশ্রামের জন্য। টহলদার বাহিনীর জন্যও এটা একটা অস্থায়ী আস্তানা। এখানে খাদ্য আছে, পানীয় আছে আর আছে বিষ্ফল খাদেম, টুপি-দাঢ়ি পাঞ্জাবি মার্কায়ারা সাজে সজ্জিত পাকিস্তানের দৃঢ় রক্ষক বুধন মেঘার। ভীষণ পেয়ারের আদমি সে পাকসেনা আর তাদের কমান্ডারের কাছে। এই বুধন মেঘারের বাড়িতে গ্রেনেড চার্জ করতেই হবে। উড়িয়ে দিতে হবে পাকবাহিনীর লঙ্গরখানা আর তাদের প্রমোদ ঘাঁটি।

— তুম ডারতা হ্যায় মেহবুব? হঠাতে করে আমার দিকে চেয়ে শংকর প্রশ্ন করে বসেন।

— নেহি তো!

— সাচ?

— ইয়েস স্যার। ম্যায়তো খোদ পাকি আর্মির বাক্সার ছুকে, হাত লাগাকে এক জামিন করকে দেখা থা, ইয়ে কেয়া হ্যায়? উস্ টাইম মে যব হাম বাঁচ গিয়া তো ইয়ে অপারেশন মে তি সাকসেস জরুর মিলেগা, আর স্যার ইয়ে তো মিলনেই চাহিয়ে—।

— ইয়েস মাই ফ্রেন্ডস, তুম লোগ বছত পছন্দ মে আ গিয়া।

মেজের কথা থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাঁবুর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গলায় যথেষ্ট আবেগ এনে বলতে লাগলেন, কত তরঙ্গ আৱ কম বয়সী তোমোৱা, একেবাবে কাঁচা বয়সের মানুষ তোমোৱা বাঢ়িধৰ আৱ আঘীয়হারা, নিজেৰ দেশ থেকে বিভাড়িত। সামনে তোমাদেৱ যুক্ত। যুক্ত ছাড়া তোমাদেৱ দেশ মুক্ত হবে না। অথচ যুক্ত পৃথিবীকে কোনো কিছু দিতে পাৱে না একমাত্ৰ ধৰংস ছাড়া। তাই যুক্ত কখনোই একটা ভালো জিনিস নয়। রাজনীতি, ইট ইজ অনলি পলিটিকস। ইসকে লিয়ে টু-ডে উই আৱ এ্যাট ওয়াৱ।

মেজের হয়তো আৱো কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু শিখহাজ চা নিয়ে হাজিৱ।

সবাৱ হাতে ধৰা চায়েৱ এগ। গৱাম ধোয়া উভাব। আমোৱা ক'জন যুবক স্থিৱ তাকিয়ে আছি মাটিতে আঁকা বুধন মেৰাদেৱ ঝীড়সহ তাৱ আশপাশে চিহ্নিত শক্রবাহিনীৰ অবস্থানেৱ দিকে। মেজেৰ শৃঙ্খলাৰ তাৱ হাতে ধৰা এ এলাকায় বৰ্ধিত ফিল্ড ম্যাপটিৰ সাথে মাটিতে আমাৱ অস্তিৱ অমৱখানাৰ অবস্থান, রাস্তাঘাট আৱ শক্রৰ অবস্থানগুলো মিলিয়ে নিছেন। অন্ত গোলানো শেষ হলো একসময়। চা-ও শেষ হয়ে এসেছে সবাৱ। আৱ তখনি জিন উঠলেন। চোখেমুখে একটা দৃঢ় প্ৰত্যয় নিয়ে বললেন, এ অপারেশন কৰতেই হবে, এবং তা অবশ্যই হতে হবে সাকসেসফুল অপারেশন। নো রিট্ৰিট এন্ড ইট ইজ আ সুইসাইডাল মিশন। এটা তাৱ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমি, এ অপারেশনেৱ কমান্ডাৰ। তাৱপৰ তিনি গভীৱ আন্তৰিকতা নিয়ে হাত রাখলেন আমাৱ কাঁধে। বললেন, যেহুৰ হোপিং আই উইল মিট ইউ এ্যাগেইন আফটাৰ দিস অপারেশন। তাৱপৰ ছেলেদেৱ দিকে তাকিয়ে বললেন, আই মাষ্ট মিট ইউ অল গোয়িং এন্ড পাৱিটিসিপেটিং দিস অপারেশন। এৱপৰ উষ্ণ কৰমৰ্দন কৰে বিদায় নিলেন তিনি। তাৱ গমন পথেৱ দিকে আমোৱা তাকিয়ে আছি। কন্দয় আবেগে মথিত। মুখে কোনো কথা নেই। এই সময় হঠাৎ কৱে কে যেনো গেয়ে উঠলো, ‘আগুন জালো, আগুন জালো, ব্যৰ্থ প্রাণেৱ আৱৰ্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জালো’— সম্বিৎ ফিৰে পেতেই দেখলাম, পিন্টু ভৱাট গলায় গান ধৰেছে। তাৱ সেই গানেৱ সুরে মুহূৰ্তে সৱব কৱে তোলে পৰিবেশ। পিন্টুটা আসলেই ভালো গায়। এতো প্ৰাণবন্ত আৱ উচ্ছল। ওৱ গান শুনতে শুনতে আননন্দাবে পৌছে যাই জনুৱী বাজাৱে। বুকেৱ মধ্যে এখন কেবল একটা কথাই বাবুৰ বাজতে থাকে, আজ রাতে বুধন মেৰাবেৱ বাঢ়ি যেতে হবে। ফিৰতে পাৱবো কি না, কে জানে!

সফলতা ও স্বীকৃতি

আহত ও নিহত মিলে মোট ১৭ জন।

ওমর আলী চূড়ান্ত রিপোর্ট নিয়ে এলো সকালে। ৩ জন পাক অর্মি নিহত, ৯ জন আহত এবং অন্য আর যারা আহত হয়েছে, তারা স্থানীয় মানুষ, পাকবাহিনীর সঙ্গী-দোসর। ওমর আলীকে বারবার জিগ্যেস করতেই আমাদের সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলো। সে জানালো, বুধন মেঘার মারা যাই নি। তার কাছ থেকেই ওমর আলী এ খবর সংগ্রহ করেছে। এছাড়া দূর থেকে নিজের চোখেও দেখেছে মৃতদেহ আর আহতদের একটা লরিতে তুলতে। বুধন মেঘার নিজে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো আলতাফ কেরানির বাড়িতে। ওমর আলী ওরাতে সেখানেই ছিলো। অমরখানা গ্রামের রাস্তার প্রথম বাড়িটাই আলতাফ কেরানির। তালমা-ভেতরগড় রাস্তার পাশে। পাকবাহিনী রাতে সেখানে আসে নি।

আনন্দের সঙ্গে মেজের শংকরকে এই বিরাট সাফল্যের সংবাদ দেয়া হলো। অপারেশনে পরদিন তিনি যথারীতি সকাল দশটার দিকে এসে হাজির। অমরখানা ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে তখন প্রচও কামানযুদ্ধ চলছে। ভারতীয় বাহিনীর একটা হেলিকপ্টার আকাশে উড়ছে। গত রাতে পাকবাহিনীর দুপ্রথানায় প্রেনেড হামলা এবং তাদের প্রচুর ক্ষতির কারণেই সেখানে প্রচও যন্ত্র ঝুঁক হয়েছে, এটা আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম। পাকবাহিনী আজ ব্যাপক রিট্রিফোর্সমেন্ট করবে। গত রাতের হামলার প্রতিশোধ নিতে যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, এটা নিশ্চিত। এপারে ওদের মুখোমুখি ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা ভারতীয় বাহিনীও চূপ করে বসে নেই। সমান পাত্রায় প্রতিউত্তর দিয়ে যাচ্ছে তারা ও দুকাল থেকে তাই চলছে কামানযুদ্ধ। আকাশে উড়ছে তাদের হেলিকপ্টার। সীমান্তের দু'পারে অবস্থান নিয়ে দুই জাত শক্ত বাহিনী লিঙ্গ হয়েছে পরম্পর অঘোষিত এক মুক্তে।

মেজের শংকর বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার স্বত্বাবসূলভ ভঙ্গিতে নিজের পৌঁকে হাত বুলোতে বুলোতে আমার জবানিতে রিপোর্ট শুনলেন। তবে শক্তপক্ষের ক্যাজুয়েলটির পরিমাণ বা সংখ্যার ব্যাপারটা তিনি প্রথমে বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

— সেভেনটিন ক্যাজুয়েলটিজ?

— ইয়েস স্যার।

— ডিড ইউ কনফার্ম ইট?

— ইয়েস।

— হু ইজ দ্য ইন্ফৰ্মার?

— আওয়ার গাইড ওমর আলী।

— কল হিম।

ওমর আলী এলো। খোদ কুমিল্লার আঞ্চলিক টানে সে একই রিপোর্ট করলো। তাকে বারবার প্রশ্ন করলেন মেজের। ঝুটিনাটি বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন। তারপর খুললেন তাঁর নোট বই। তার নিজের ইউনিট ফার্স্ট গার্ডের ইটেলিজেন্স রিপোর্টের সাথে মেলাতে চাইলেন ওমর আলীর দেয়া বিবরণ। তারপর তিনি লিখলেন, জুলাই

সেভেন, সেভেলটি ওয়ান। লাস্ট নাইট এফ এফ্স অব ভাটপাড়া ক্যাম্প অ্যাটার্নি পাক আর্মিস লঙ্গরখানা কোয়ার্টার মাইল ব্যাক টু অমরখানা ডিফেন্স। দে ত্রোন আপ দ্য লঙ্গরখানা রেজালচেড কিলিং থ্রি পাক আর্মিস এন্ড সিরিয়াস ইনজুরি টু ফোরচিন আদার্স। রিপোর্টটি তিনি ফিরে গিয়ে তার রেজিমেন্টাল হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবেন। সেখান থেকে সোজা মুক্তিবাহিনীর সদর দফতরে।

তাঁবুর সকলকে ফল ইন করতে বললেন মেজর শংকর তাঁর রিপোর্ট লেখা শেষে। ছেলেরা ফল ইন-এ দাঁড়ালো। আমরা কমান্ডাররা তাদের সামনে। বড় ভাই নুরুল হক মেজর শংকরের পাশে। হঠাত শংকর আমাকে তাঁর পাশে ডেকে নিলেন। ছেলেদের উদ্দেশে তিনি কললেন, তোমরা খুবই ভালো কাজ দেখিয়েছে, আমি খুব খুশি হয়েছি। আজকের এ সফলতা আমাদের জন্যও একটা বড়ো গ্র্যাচিভমেন্ট। ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমাদের এ সফলতা ও বীরত্বে অভ্যন্তর গর্ব অনুভব করছি। এভাবেই তোমাদের শক্তি পাকবাহিনীকে খতম করতে হবে। ওদের মর্যাদালিটির ওপর আঘাত হানতে হবে। তোমাদের দেশ তোমাদেরকেই স্বাধীন করতে হবে। আমরা তোমাদের মিত্র হিসেবে সকল ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাবো। তোমাদের ঘরে ফিরতে হবে, আমার আশা এবং বিশ্বাস, একদিন তা পারবোই। জয়বাঞ্চা।

তার বক্তব্য শেষে তিনি আমার দিকে চাইলেন। আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর ছেলেদের উদ্দেশে আবার বলতে শুরু করলেন, আর এ ইয়ে খুশি কি বাড়মে ম্যায় মেহবুব কো প্রমোশন দেতাত এন্টিটু ডে হি ইজ প্রমোটেড টু দ্য র্যাঙ্ক অব সেকেন্ড উইং কমান্ডার অব চাউলহাটি ইনিটিটিউন্ট বেস।

আমি তাঁকে স্যালুট করলাম। একটা উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। তাঁর আলিঙ্গনের মধ্যে নিবিড় আলোকিতা আর বন্ধুত্বের ছোঁয়া।

— ইয়েস মাই ফ্রেন্ড ক্ষতি আর মাই প্রাউড, আই এম প্রাউড ফর অল অফ ইউ।

আমার চোখে হঠাত করে পানি এসে যায়। মেজর শংকর দুঃহাতে আমাকে সামলে ধরে বললেন, কেয়া মেহবুব তু রোতা হ্যায়!

শংকর চলে গেলেন। সকলে হল্লোড় করে ঘিরে ধরলো আমাকে। মুরতি ট্রেনিং ক্যাম্পে বিক্ষেপণ বিষয়ে ভালো করায়, আমাকে চাউলহাটিতে ডেমোলেশন কমান্ডার হিসেবে পাঠানো হয়েছে। পারদর্শী ছেলেদের নিয়ে একটা আলাদা ডেমোলেশন সেকশনের কমান্ডার আমি। আর সেই সেকশন কমান্ডার থেকে আমি হয়ে গেলাম ইউনিটের সেকেন্ড ইন কমান্ড অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি। বড় ভাই নুরুল হক ইউনিট কমান্ডার হিসেবে আগেই নিয়োজিত হয়েছেন। আমাকে তাঁর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে পেয়ে খুবই খুশি হলেন তিনি। আমার সেকশনের মতিয়ার ও খলিলসহ অন্যরা আমাকে তাদের মাথার ওপর তুলে নিলো। এক উচ্চল প্রাণবন্ত পরিবেশ ক্যাম্পকে আমলে মুখর করে তুললো।

ভিনদেশের মাটিতে, সামনে অনাগত অনিশ্চিত এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঞ্চলিকজনহারা সকলেই এ ক'দিনে কতো আপন হয়ে উঠেছি একে

অপরের কাছে। বড় ভাই নুরুল হক ব্যাপারটি সেলিব্রেট করলেন। স্পেশাল চা তৈরির অর্ডার দেয়া হলো মিনহাজকে। আহিদার, জব্বার আর গোলাম গড়স চললো জহুরী বাজার থেকে ঝুরি-বুদ্ধিয়া আনতে। পিন্টু আমার পাশেই রাইলো। আজকের এ আনন্দ তাকে যেনো একটু বেশি উদ্বেগিত করেছে।

জীবন তাহলে এই? সফলতা মানেই স্বীকৃতি, সফলতা মানেই আনন্দ আর স্বাধীনতা?

অপারেশন অমরখানা

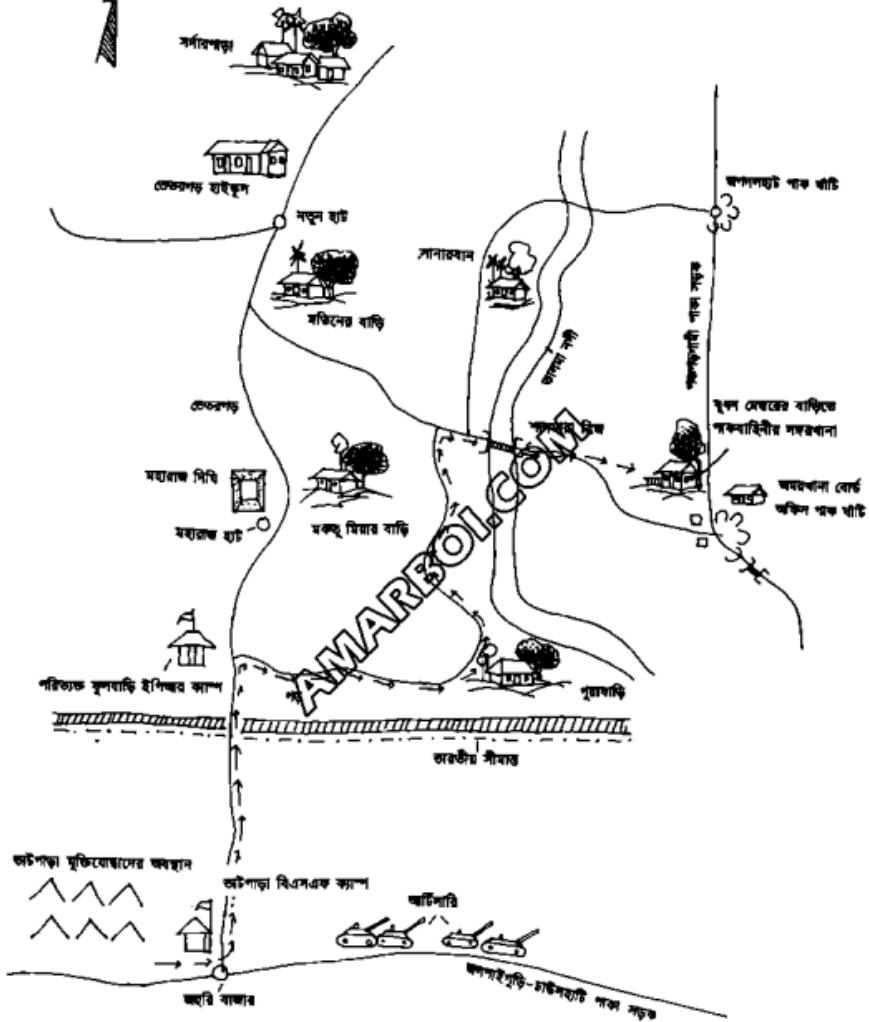
অমরখানা অপারেশনে সাফল্যের পেছনকার প্রস্তুতির কথা বলা হয় নি। সে রাতে এ ব্যাপারে আমরা কী করেছিলাম, সেটা এখন একটুখানি খতিয়ে দেখা যাক।

সক্ষ্য নামতেই মিনহাজ পরিবেশিত আমাদের আহারপর্ব শেষ। সেন্ট্রাল দাঁড়িয়ে গেছে তাদের চারপাশের ডিউচিতে। পরিবেশটা কেমন থমথমে। বৃষ্টিবিহীন অঙ্ককার রাত। যারা অপারেশনে যাবে, তারুণে শুয়ে-বসে তারা বিশ্রাম নিচ্ছে। তাঁবুর বাইরে দু'একটা ছেটখাটো জটলা। অনুচ্ছবের আলাপচারিতা। হাতের মুঠোয় সিগারেট রেখে ধূমপান করছে দু'একজন। এভাবে সিগারেট ধরে রাখার কারণ যাতে করে এর আগুন দূর থেকে শক্ত নজরে না। প্রচুর সেজন্যই এ সাবধানতা। যুদ্ধের মাঠে অসাবধানে রাতের বেলা সিগারেট টানা একেবারেই নিষিদ্ধ। সামনাসামনি যুদ্ধে খোলা টেক্সের পজিশনথেকে ধূমপায়ী সৈনিকরা তাদের রাইফেলের নলের ভেতরে জুলত সিগারেট রেখে টেনে থাকে। তা না হলে এই জুলত সিগারেটের আগুন দেখেই শক্ত তার অব্যর্থ নিশানা ঠিক করে থাকে। এ জাতীয় ঘটনার ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। ওস্তাদ জ্ঞান টেনিং সেন্টারে আমাদের বারবার করে এ ব্যাপারে স্বীকৃত করে দিয়েছেন। যুদ্ধের মাঠে সিগারেট খাওয়ার কায়দাও দিয়েছেন শিখিষ্টে। তাই জ্ঞান ওস্তাদের কথা ছেলেরা মনে রেখেছে। আশপাশে শক্ত অবস্থান নেই, তবুও তারা যুদ্ধের দর্শন মেনে চলছে কৌশলে এইভাবে ধূমপান করে।

যুদ্ধের আগে অবশ্য অনেকেই বিড়ি-সিগারেট খেতো না। কিন্তু যুক্তিযুক্তে নাম লেখানোর পর টেনিং সেন্টার থেকেই শুরু হয়েছে এই অভ্যাস। প্রত্যেকের সঙ্গাতে চার প্যাকেট বিনামূল্যের চার মিনার সিগারেট। খুবই কড়া তামাকের তৈরি। মুক্তে সিগারেট পেয়ে কয়েকজন ছাড়া সকলেই এখন সিগারেট টানায় অভ্যন্ত হয়ে গেছে। বোধহয় এর পেছনে এক ধরনের মানসিক উত্তেজনাও কাজ করছে।

বড় ভাইয়ের ছটফট করার ব্যাপারটা মাঝে মাঝে আমাকে বোকা বানিয়ে তোলে। বউ, বালবাচা তার দেশের ভেতরে যয়মনসিংহের বাড়িতে। তাদের ফেলে রেখে এসে লোকটা কীভাবে চালিয়ে নিছেন ক্যাম্পের ছেলেদের, তার দৈর্ঘ্য আর সহনশীলতা ইত্যাদি মাঝে মাঝে আমাকে অবাকও করে দেয়। কম বয়সী ছেলেদের জন্য তাঁর মতো একজন বয়ক্ষ গার্ডিয়ানের আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন ছিলো। তবু কখনো সখনো তাঁর অস্থিরতা এবং ছটফটে ভাব-ভাবনা তার প্রতি ভেতরে ভেতরে

କେତେ ବ୍ୟାପ - ୯
ଅପାରେଶ୍ନ ଅମରଖାନା
(ଫେଲ ହାତା)



বিরক্তিও ধরিয়ে দেয়। আজও তেমনি অস্থির তিনি। অহেতুক সেন্ট্রি পোষ্টে দাঁড়িয়ে থাকা মালেককে গাল দিয়ে উঠলেন। তাঁবুর সামনে গিয়ে উকি মেরে দেখলেন। বাইরে যারা গুজগুজ করছিলো তাদেরকেও ধমক দিয়ে তাঁবুর ভেতরে যেতে বললেন। অবশ্যে এলেন আমার তাঁবুর সামনে। উকি মারলেন। তাঁবুর মেঝেতে পাতা শতরঞ্জির বিছানার ওপরে আমরা ক'জন গোল হয়ে বসে সিগারেট টানছিলাম। আহিদার, পিন্টু, খলিল, মতিয়ার আর জবরার ভাইসহ আরো ক'জন তাঁবুর ভেতরে।

— আসেন বড় ভাই, ডাকলাম তাঁকে।

— তোমাদের সাথে একটু বসবো মাহবুব?

— আরে, আসেন না।

এলেন বড় ভাই। বসলেন। সিগারেট দিলাম। ধরাবার সময় দেখলাম, তার হাত কাঁপছে। তার মানে তিনি দারুণ অস্থিরতা আর উত্তেজনার মধ্যে রয়েছেন।

— চা খাবে, দিতে বলবো? আত্মিকতার সূরে তিনি জিগ্যেস করলেন।

— বলেন, পিন্টুর জবাব।

তখন তিনি তার পাতানো ছেলে মঞ্জুকে ডেকে মি দেয়ার কথা মিনহাজকে বলতে বললেন। দেশে তার দুইছেলের একজনের নাম মঞ্জু। এখানেও মঞ্জু নামে ১৫/১৬ বছরের একটি কিশোর ছেলে রয়েছে। মঞ্জুরগাও শহরের কাছে তার বাড়ি। বড় ভাই তাকে নিজের ছেলে বানিয়েছেন। মঞ্জুই তার এই পাতানো ছেলেকে নিয়ে মোটামুটি ভালোই আছেন। মঞ্জুরও দিন ঘুচেছে একই রকমভাবে ভালো। অবশ্য বড় ভাইয়ের পরিবারিক দিকটার কথা ভেঙ্গে যাপারটা সকলে মেনে নিয়েছে।

মঞ্জু চা নিয়ে এলো। পদ্মোদ্ধৃত করলো সবাইকে। চা নিলাম, সিগারেট ধরালাম। চা শেষ হলে অব্যবহৃতভাবে সিগারেট। মনে হলো বড় ভাই কিছু বলতে চান, কিন্তু সাহস পাচ্ছেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর শুধু বললেন, তোমরা ঠিক সময়মতো রেডি হয়ে নিও। বলেই তিনি বের হয়ে গেলেন। মানুষের জীবনে এমন সময়ও কখনো কখনো আসে, যখন অনেক কিছু বলতে চাইলেও, বলা হয়ে ওঠে না।

ঠিক রাত ন'টায় ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লাম। রওনা দেয়ার মুহূর্তে বড় ভাইয়ের সাথে উষ্ণ করমদ্দন করলাম শুধু। তখনও তিনি কিছু বলতে পারলেন না। বড় ভাই আজ সারারাত ঘুমোবেন না অনুমান করি, ছটফট করবেন একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে। বড় ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি আমাদের। আজকের অপারেশনের গুরুত্ব আর বিপদ তাকে অস্থির করে তুলেছে।

মোট ২১ জন নিয়ে আজকের রাতের অপারেশন। কমান্ডার আমি। কাঁধে স্টেনগান ঝুলিয়ে সবার পুরোভাগে। বিওপি পার হওয়ার সময় ডিউটিরিত সেন্ট্রি তার বাঙ্কার থেকে আমাদের জন্য 'গুড লাক' কামনা করলো। আমরা ভেতরগড়ের সেই পরিচিত রাস্তা ধরলাম। সিঙ্গেল ফাইলিং অর্থাৎ এক সারিতে চলেছি। আমার পেছনে আহিদার। তারপর গোলাম গউস ও মতিয়ার—এমনভাবে এক এক করে ২১ জন।

আজ রাতের অপারেশনের গুরুত্ব বিবেচনা করে মেজর শংকর হাতিয়ারের সংখ্যা এবং গোলাবারুদ্দের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপরও সকলের হাতে হাতে অন্ত দেয়া যায় নি। ৪টা স্টেনগান, ১০টা রাইফেল, ১২টা প্রেনেড আর দুটো কুড়োল। প্রতিটা স্টেনগানের জন্য দু' ম্যাগাজিনে ৬০টা করে ১২০ রাউন্ড বুলেট। প্রতিটা রাইফেলের জন্য বুলেট ২০টা করে। ব্যাস, এই আমাদের অন্ত শক্তি। এ নিয়েই আমাদের চুক্তে হবে শক্তির ব্যাহের ভেতরে।

গড়ের এপারে ভারতীয় অংশে ছোট লোহার পুলটার ওপর এসে সবাইকে থামার নির্দেশ দিলাম।

— স্টপ। বলার সঙ্গে সঙ্গেই থামলো সবাই।

— বসো। বসলো সবাই গোল হয়ে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আহিদার আর গোলাম গউস। এবার ফাইনাল ত্রিফিং-এর পালা। নিয়মানুযায়ী কমান্ডারুর অফিসার কমান্ডিং-এর কাছে থেকে শুধু প্ল্যানটা জানতে পারবেন। পুরো অপারেশনগামী দলকে সেটা জানানো হবে ক্যাম্প ছাড়াবার আগে অথবা ক্যাম্প থেকে বের হয়ে এসে রাস্তায়। আজকের অপারেশনটার গুরুত্ব খুব বেশি। তাই এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়েছে ভীষণভাবে। যুদ্ধের মাঠে একটা অপারেশনের খবর বের হয়ে যাওয়ার মানে হলো পুরো দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার সুযোগ দাতে দেয়া। চূড়ান্ত ত্রিফিং দিতে থাকলাম। আজকের অপারেশনের প্রতিটা খুঁটিমুঁটি-বিষয়, প্রত্যেকের দায়িত্ব, সেই সাথে বিপদের সংজ্ঞাবনা এবং ঝুকির ব্যাপারটা স্তুপের বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। আমি বলে গেলাম, ওরা শুনলো।

আকাশে মেঘ ঝুঁড়ে চাঁদ উঠেছে ঝুঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়ালে একবার সেই চাঁদ হারিয়ে যায়, আবার বেরিয়ে আসে। এই মুহূর্তে চাঁদটা মেঘের বাইরে। তাই তার ধূসর কোমল আলোতে অমৃতের জন্য যুবক প্রতীক্ষমাণ চাঁদটা কখন মেঘের আড়ালে যাবে, আঁধার ঘনিয়ে আসবে আর সেই আঁধারের চাদর গায়ে জড়িয়ে আমরা পা দেবো আমাদের অধিকৃত দেশের মাটিতে। ছেলেরা চূড়ান্ত ত্রিফিং পাওয়ার পর, মনে হলো, কিছুটা অস্ত্র। ওদের অস্ত্রিতা লক্ষ্য করে আবার আমি মুখ খুললাম। গুহিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার কোনোকালেই ছিলো না, কিন্তু একজন বলিষ্ঠ বজা হিসেবে, একজন সাহসী যুবক হিসেবে আমাকে নতুন করে জন্ম দিয়েছে। মানুষ কিসের থেকে কী হয়ে যায়, সেটা ভেবে বের করা বড়ো কঠিন। পরিস্থিতির তারতম্যই একজন মানুষকে নরম, ভীতু কিংবা মানুষকে সাহসী করে তোলে। কখনো একজন তুখোড় সাহসী মানুষকেও পরিণত করে ভীতু কাপুরুষে।

রাত ১১টার দিকে আমরা চুকলাম বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে। আমাদের পক্ষ নিয়ে চাঁদটা তখন আবার বড় একখণ্ড কালো মেঘের ভেতরে গিয়ে চুকেছে। তার মানে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার। আর আমাদের জন্য অন্ধকার মানেই নিশ্চয়তা। বর্ণনাতীত একটা সময় পার করছি আমরা! নিজের দেশের সীমার ভেতরেই আমরা আজ যেনো পলাতক আসামি। কেউ যেনো না দেখে ফেলে আমাদের। দেখলেই সমৃহ বিপদ। একেই বলে বুঝি পরাধীনতা।

গড়টা পেরিয়ে এসে আমরা গুয়াবাড়ির বাস্তা ধরলাম। আমাদের গাইড জোনাব আলীদের গ্রামের নাম গুয়াবাড়ি। সেখানেই জোনাব আলীর বাড়িতে ওমর আলী আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। অমরখানা, বোর্ড অফিস আর বুধন মেম্বারের বাড়ির ঘাঁটিতে পাক বাহিনীর চলাচল আর অবস্থানের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওমর আলীর আজ রাতে জোনাব আলীর বাড়িতে থাকার কথা। তার সঠিক আর চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণের ওপর আমাদের অপারেশনের সফলতা অনেকটা নির্ভরশীল। সেই সাথে তার বিশ্বস্ততার ওপর তো বটেই। গ্রামের রাস্তাটা কিছুদূর পর্যন্ত কর্দমাক্ত। একে রাস্তা না বলে আলপথ বলাই ভালো। হাঁটু পরিমাণ কাদাপানি। তারপর আবার সরু পথ। এরকম পথ পেরিয়ে অবশ্যে পৌছানো গেলো জোনাব আলীদের বাড়ি। সবার পরনে লুঙ্গি। হাঁটুর ওপর উঠিয়ে চলার সুবিধার জন্য কোমরের সাথে বেড় দিয়ে বাঁধা। কোমরে গামছায় জড়নো হ্রেনেড। কাঁধে হতিয়ার। যতদূর সম্ভব শব্দহীন পা ফেলে এগুচ্ছ। চারদিকে নিচ্ছন্দ নীরবতা। পরিত্যক্ত জনমানবহীন বসতির মতো ওদের ঘর কটা দাঁড়িয়ে আছে। জোনাব আলী এবং তার পরিবারের কেউ এখন এখানে থাকে না। পাকবাহিনীর ভয় ওদের নেই, কিন্তু রয়েছে সীমান্তের ওপার থেকে নানা ধরনের হুমকির ভয়। এর ভেতরে অন্যতম হচ্ছে বি.এস.এফ.-এর হুমকি। তাদের কাছে জোনাব আলী একজন পাক স্পাই। সেনানী মিয়া এবং জোনাব আলীকে ধরার জন্য তাদের খৌজাখুজির অন্ত হচ্ছে। অথচ এখন জোনাব আলী আমাদের পক্ষে একজন নিবেদিত এবং নিচিক্ষেত্রে গাইড। যুদ্ধের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত জোনাব আলী তার বিশ্বস্ততার প্রকাশ দিয়ে গেছে। কিন্তু তাই বলে তাকে ধরবার জন্য বি.এস.এফ.-এর খৌজাখুজি বন্ধ হয় নি। জোনাব আলী এজন্য যুদ্ধের সারাটা সময় আমাদের বিশেষ করে আমার কাছ ছাড়া হয় নি।

ওমর আলী অপেক্ষা করতেলো। আমরা পৌছুতেই সে তার রিপোর্ট পেশ করে। বললো, পাক আর্মির মুভমেন্ট নর্মাল অর্থাৎ স্বাভাবিক। সক্ষের খানিকটা আগেভাগে পাক আর্মির একটা বড়োসড়ো দল বুধন মেম্বারের বাড়িতে এসেছে। মনে হয় রাতটা সেখানে থাকবে। অমরখানা ঘাঁটিতে রাতদিন যুদ্ধ চালাতে গিয়ে এখন বিশ্বস্ত তারা। সামনে দুটো বাক্সার, সেখানেও তারা থাকতে পারে।

— কিন্তু বাড়ির পেছনে?

— হেড়ো কওন যাইবো না।

— তাহলে?

বাইরে সেন্ট্রি মোতায়েন রেখে আমরা গোল হয়ে বসেছি জোনাব আলীর বাড়ির আঙিনায়। ব্যাপারটা পুরোপুরি পর্যালোচনা করে দেখতে হচ্ছে। পাক আর্মির বড়ো একটা দল এসেছে অমরখানা মূল ফ্রন্ট থেকে। তার মানে, আজ তারা বুধন মেম্বারের বাড়িতে বিশ্রাম করবে, সেই সাথে চলবে খাওয়া-দাওয়া আর ফুর্তিফার্তা। বাড়ির সামনে সেন্ট্রি থাকে। পেছনে থাকতে পারে, নাও পারে। তাদের মুভমেন্ট নর্মাল থাকা মানে, সদেহজনক কোনো কিছু আঁচ করতে না পারা। ভবলাম, যেদিক দিয়ে আমি আর গোলাম গটস ক'রাত আগে যেখানে রেকি করে এসেছিলাম, সে পথে যাওয়া

যাবে না। ও পথে গেলে সরাসরি শক্র-সোন্ত্রির মুখোমুখি পড়ে যেতে হবে। তাহলে? এক্ষেত্রে একমাত্র সভাব্য রাস্তা হচ্ছে পেছন দিক দিয়ে বুধনের বাড়িতে উঠবার চেষ্টা করা। ওর বাড়ির প্রায় ১০০ গজ পেছনে একটা পাটক্ষেত। সেখানে পর্যন্ত পৌছানো যাবে হয়তো নির্বিজ্ঞ। তারপর? সবাই নিঃশব্দ। চুপচাপ। জানি, শুধুহীন এই শুরুতা দিয়েই তারা সবাই এ প্রশ্নের জবাব চাইছে। আর এর জবাব দিতে হবে আমাকেই। আমি আজ রাতে এদের কমাভার। সুতরাং চূড়ান্ত সিঙ্কান্স দেয়ার দায়িত্ব এখন আমারই।

হঠাতে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সিঙ্কান্স নিয়ে ফেলেছি, যাবো। পাটক্ষেত পর্যন্ত পৌছুতে পারলে বাকি ১০০ গজের ব্যবস্থা করে নেয়া যাবে। ওঠো সবাই। লেট আস মুভ।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়লো নীরবে। আমার পাশে ওমর আলী। ভালো করে দেখলাম তাকে।

এ মানুষটার ওপর নির্ভর করছে আমাদের সকলের আজকের রাতের ভবিষ্যৎ।

— পারবে ওমর আলী পাটক্ষেতটা পর্যন্ত আমাদের নিয়ে যেতে? গভীর গলায় জিগ্যেস করলাম তাকে।

— জি।

— রাস্তা চিনতে পারবেতো?

— জি।

— বিপদ নেইতো কোনো?

— জে না।

প্রয়োজনের সময় লোকটি প্রত্যোগী কর কথা বলে! রাগ করবার উপায় নেই। আজ রাতে ওকে আমাদের প্রয়োজন।

বর্ধার আকাশে চাঁদ ঝুকাচুরি খেলছে যেনো। তার আলো-আধারিতে এগিয়ে চলছি আমরা। ক'দিন আগে উড়িয়ে দেয়া নড়বড়ে তালমা নদীর শালমাড়া ব্রিজ পার হয়ে একসময় সন্তর্পণে শক্র এলাকায় প্রবেশ করলাম। এখান থেকে অমরখানা পাকবাহিনীর ঘাঁটি এক মাইলের মতো। রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠেছে অমরখানা বোর্ড অফিসের সামনে। ভাবলাম, শক্রপক্ষের প্রেটেল পার্টি থাকতে পারে রাস্তায়। যে-কোনো মুহূর্তে ওদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভব সভাবনাও রয়েছে। আমাদের দল দু'সারিতে এগুচ্ছে। সামনে আমার সাথে ওমর আলী থালি হতে। ফিতেয় বাঁধা স্টেনগান কাঁধে ঝুলছে আমার। ডান পাঁজরের সাথে শক্ত করে ঠিসে ধরা। ট্রিগারে আঙুল, বুক বরাবর সামনে নল। একদম সদপ্রসূত অবস্থা। সামনে সন্দেহজনক কিছু নজরে এলেই আঙুল সোজা দেবে যাবে ট্রিগারে। পেছনের ওরাও একইরকম চূড়ান্ত সতর্ক অবস্থায় পথ হাঁটছে। যতোটা নিঃশব্দ আর দ্রুততার সাথে এগুনো যায়, আমরা সেভাবেই গ্রুচি। এতেক্ষণ সোজা পথ ধরে আসছিলাম, অমরখানা যাওয়ার রাস্তার বাঁকের কাছে এসে ওমর আলী আমাদের রাস্তা থেকে নামিয়ে একটা আলপথে নিয়ে এলো। কিছুদূর এগুবার পর একটুকরো ফাঁকা মতো উঁচু জায়গা দেখা গেলো। বর্ধার

পানি চারদিকে। আমরা বসলাম সেখানে। ঠিক হলো, এ জায়গাটা হবে আমাদের আর পি বা রিটার্ন পোস্ট। অপারেশন শেষে যে যেখানেই থাক, এখানে এসে সমবেত হবে।

ওমর আলী হাত ইশারা করে সামনের দিকে আবছা কালো মতো পাটক্ষেতটা দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, এ পাটক্ষেতটা ধরে এগুলে আমরা বুধন মেঘারের বাড়ির পেছনের পাটক্ষেতটা পর্যন্ত যেতে পারবো। এর মধ্যে আর কোনোরকম ফাঁকা জায়গা নেই। সুতরাং কেউই টের পাবে না। ও.কে, আমরা এ পাটক্ষেতের ভেতর দিয়েই এগুবো।

রাত বাড়ছে। তাই চূড়ান্ত সিন্ধান্ত নিতে হলো। সিন্ধান্ত শেষে ঠিক হলো, বুধনের বাড়িতে পাকবাহিনীর লঙ্ঘনখানায় ছেনেড ছুঁড়বে মতিয়ার আর খলিল। ওদের সাথে থাকবো আমি। জব্বাৰ ভাই, আহিদার আর গোলাম মোস্তফার কাছে থাকবে স্টেণগান। আমাদের পেছন থেকে কভার দেবে ওৱা। ওদের একটু পেছনেই ডানে-বাঁয়ে বড় খলিল আর গোলাম গড়িসের লেভেল থাকবে ৮ জন রাইফেলম্যান দুজন কুড়োলধারী আৰ শুধু ছেনেড হাতে থাকবে দুজনও। তাৰা থাকবে সেকেন্ডম্যান, হিসেবে। কেউ গুলি খেয়ে পড়ে গেলে, তাৰ হাতিয়াৰ ব্যবহাৰ কৰবে এৱা।

ইশারা দেৱা মাত্ৰ উঠে দাঁড়ালো সবাই। সবারই শৰীৰে-মনে প্রচণ্ড অস্ত্রীয়তা ভৱ কৰছে। বাঘের গুহার অভিযুক্ত এবারের যাত্রা। স্টেণগান এই অস্ত্রীয়তা স্বাভাবিক। তবুও নির্বিকার সবাই। অনেকটা অনুভূতি আৰ ভাৰেলেশশূন্য। প্রত্যেকেই তাদের ঝঞ্জু বলিষ্ঠ শৰীৰ নিয়ে আবছা আলো-আঁকড়িতে মৃত্যুমান ছায়াৰ মতো নির্দেশিত পজিশনে দাঁড়িয়ে গেলো। বললাম, এ্যাকুয়াচন। এবারের অভিযানে প্রতি পদে রয়েছে বিপদ। হয়তো রয়েছে মৃত্যুৰ ফাঁদৰ পাতা কোথাও। কিংবা শক্রৰ মাইন ফিল। মাইনের ওপৰ পা পড়া মানে প্রচণ্ড প্রক্ষেপ কৈলতে হবে অত্যন্ত সতর্কতাৰ সাথে চোখ-কান অর্থাৎ সমস্ত ইন্ত্রিয় সজাগ রেখে। যে-কোনো পৰিস্থিতিৰ জন্য নিজেকে তৈরি কৰে এগুতে হবে শক্রবৃহেৰ দিকে।

পাটক্ষেতটা পাওয়া গেলো। হাঁটু সমান পানি ক্ষেত্ৰে মধ্যে। পা ফেললেই খলাত্ খলাত্ শব্দ ওঠে। অবশ্য পায়েৰ পাতাৰ সমূখ ভাগ কায়দা কৰে পানিৰ ভেতৰ দিলে শব্দ হয় না। তবে এক ধৰনেৰ শপু শপু তুৰ-তুৰ শব্দ রোধ কৰা যায় না। মাথাৰ ওপৰ প্রায় এক হাত দেড় হাত উচু পাটগাছেৰ ডগা। একহাতে হাতিয়াৰ ধৰে অন্য হাতে পাটগাছ সৰাতে হচ্ছে। চোখে-মুখে-শৰীৰে পাটগাছেৰ বাধা। সেই সাথে কায়দা কৰে হাঁটুপানিতে পা ফেলা। নিচে ভুসভুসে কাদা। পা ফেলতেই দেবে যায়। আবাৰ তুলতেও হয় টেনে। একসাথে এতেগুলো ছেলে, পাটক্ষেতেৰ ভেতৰ দিয়ে হাঁটুপানি আৰ কাদা ভেঙে সোজাসুজি এগুতে এগুতে মনে হচ্ছিলো, আমাদেৱ এ গোপন অভিযানেৰ ব্যাপৰটা শেষ পৰ্যন্ত ফাঁস হয়ে যাবে। যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও পানি ভাঙ্গাৰ শব্দেৰ সাথে সাথে, পাটগাছ সৱিয়ে এগুবাৰ সময় বেশ শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওঁ পেতে থাকা পাকবাহিনী এই বুৰু টেৰ পেয়ে গেলো আমাদেৱ গতিবিধিৰ হদিস সম্পর্কে। ভয়, সন্দেহ, রোমাঞ্চ, আবাৰ সাহসেৰ ওপৰ নিৰ্ভৰতা, এই রকম

পরিস্থিতিতে মনে মনে কেবল নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলাম, দেখা যাক, আস্তাহ
ভরসা।

অনেকক্ষণ ধরে বুঝি এভাবে হাটছি। যখন এ কষ্টকর যাত্রায় ক্রান্তির প্রায় শেষ
সীমায় পৌছে গেছি, তখন আমার সামনে হেঁটে চলা ওমর আলী হঠাতে করেই থমকে
দাঢ়ালো। সেই সাথে দলেরও সবাই।

— এসে গেছি, ফিসফিসিয়ে উঠলো ওমর আলী। চোখে পড়লো বুধন মেঘারের
বাড়ির পেছনকার সেই পাটক্ষেত।

— কত দূর ওর বাড়ি?

— ক্ষেতটা পার হলেই।

আগ থেকে ছক করা পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট গ্রন্থে ভাগ হয়ে গেলো দলটি।
এখন যার যার দায়িত্ব একশো ভাগ পালন করার উপরই নির্ভর করছে দলের সার্বিক
ভাগ্য কিংবা সাফল্য। কথা বলার সময় নেই। একহাতু কাদাপানির মধ্যে
ছাড়িয়েছিটিয়ে থাকা ছেলেদের নতুন করে কিছু বলবার বা নির্দেশ দেয়ারও উপায়
নেই। এখন ভরসা শুধু তাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দেয়া আমার বিফিং।

নির্দিষ্ট পাটক্ষেতটায় চুকে পড়লাম। সামনে আমি আর ওমর আলী। খানিকটা
ব্যবধানে মতিয়ার আর খলিল। তাদের পেছনে স্বাক্ষরীর, মোস্তকা আর জববার
ভাই। আর তাদের সামান্য পেছনে গোলাম গুড়মুড়ে তত্ত্বে রাইফেল বাহিনী।

আমাদের জীবনের এ এক চরম অন্ধকারের সময়। অসংবিধ দৃঢ়তা আর
সাবধান-সতর্কতার সাথে ফেলতে হচ্ছে অস্তিত্ব পদক্ষেপ। এই এখন তিনি পরিমাণ
শব্দও কানে বড়ো করে বাজছে। আন্ত মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বুঝি পাকবাহিনী
আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেলেন। এই বুঝি এক ঝাঁক উৎপন্ন বুলেট ছুটে এলো
আমাদের বুক লক্ষ্য করে, এভাবে কতোক্ষণ হেঁটেছি মনে নেই। মনে হয়
অনেকক্ষণ। একসময় হাতাত করেই যেনো পাটক্ষেতটা শেষ হয়ে গেলো। আমরা
এবার পাটক্ষেতের বাইরে একটা ধূ-ধূ খোলামতো জায়গায় এসে নিজেদের অবস্থান
নিলাম। আর ঠিক তখনি অবচেতন মনে উঁকিবুকি দিতে লাগলো তুচ্ছতুচ্ছ
নানারকম বিপদের কথা। আর তেমনটা হতেই আমি পানি-কাদার ভেতরেই হাঁটু
ঠিকিয়ে বসে পড়লাম। আমার দেখাদেখি পেছনের সকলেও একইরকম প্রতিক্রিয়ার
আশ্রয় নিলো। আর সেই অবস্থায় অঙ্গু চাঁদের আলোয় দৃষ্টি প্রসারিত করে
আমাদের সামনে দাঢ়িয়ে বুধন মেঘারের বাড়ির টিনের ছাদগুলো দেখলাম। এখান
থেকে আনন্দমিক পদ্ধতি গজ তফাতে। আমাদের সামনে আধা আধি সাইজের মূলি
বাঁশের বেড়া। তারপর কিছুটা পানি। পানি শেষ হয়েছে ঘন কলাগাছের ঝোপের
কিনারায় গিয়ে। তারপরই বাড়ির পেছনকার ভিটে। মোট চারটা বড়ো আকারের
দোচালা চারচালা টিনের ঘর।

এখন মূলির বেড়া ডিয়ে চুকতে হবে সীমানায়। একবার চুকলে ফিরে আসা
যাবে কি না, কে জানে? হঠাতে বাড়ির ভেতর থেকে কথাবার্তার শব্দ কানে এলো। হ্যা,
কিছু লোকের অসংগ্রহ আলাপ ভেসে আসছে। আছে তারা। কেউ একজন চিৎকার

করে কাউকে ডেকে উঠলো । একটা অটহাসির শব্দও ভেসে এলো । তানে অমরখানার দিক থেকে মেশিনগানের আর্টনাদ ভেসে আসছে । সেই সাথে বিস্কিন্ডভাবে বর্ষিত চাইনিজ রাইফেলের পরিচিত শব্দও । এই তো সময় । মোক্ষম সময় । বুধন মেষারের বাড়ির ওপর গোলাবর্ষণ করার কাঞ্চিত সেই সময় । মেজার শংকরের ওয়াদা মতো, এ সময়ই অমরখানা, জগদলহাট এবং বুধন মেষারের বাড়িতে পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর । কামানের গোলাবর্ষণ করে আমাদের কভারেজ দেয়ার কথা । কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই গোলাবর্ষণের ছিটেফোটা শেলও এখানে এই বুধন মেষারের বাড়ির গা স্পর্শ করতে পারলো না । দূরে দূরেই পড়তে লাগলো । কিন্তু না, আর দেরি করা ঠিক নয় ।

উঠলাম । প্রথমে খলিল । ফাঁক হয়ে থাকা মুলি বেড়ার ওপর দিয়ে থপাস্ করে গড়িয়ে পড়ে গেলো খলিল । এই বুঝি টের পেয়ে গেলো । না, পায় নি । এরপর মতিয়ার । মতিয়ারের পর আমি । এপাড়ের পচা পানি আর কাদার মধ্যে তুসভুস করে পা ডুবে গেলো । বসে পড়লাম ও-অবস্থাতেই । মতিয়ার-খলিল উঠে দাঁড়িয়েছে । আমিও । ওদের দুজনের হাতে দুটো দুটো করে মোট চারটা ঘ্রেনেড । আমার বাঁ হাতে একটা, ডান বাঁধে ষ্টেনগান । বুকের পাঁজরের সাথে আড়াআড়িভাবে ডান হাতের আঙুল ট্রিগারের ওপর বসানো ।

মতিয়ার ও খলিলকে এবার এগুবার ইশারা করেন ওরা এগুতে চেষ্টা করতেই পচা পানি-কাদায় পাটখড়ি ভাঙার পটপট ধৰনি উঠলো । বসে পড়লো ওরা । না ঠিক বসা নয় । উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো । সারা শরীরে কাদা-পানিতে ডুবে গেলো । মাথা ওপরে রেখে দুহাতের ঘ্রেনেড দুটো কেন্দ্রস্থিতে পানির ওপর রেখে কনুইয়ে ভর দিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিছে ওরা সমস্তের মতো । এদিকে পচা পানির তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে আসবার যোগাড় । তবু আমির সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করে ভয় আর মৃত্যুর অনুভূতি পুরোপুরি উপেক্ষা করে সামান্য কোমর বাঁকিয়ে ওদের সাথে এগুতে লাগলাম । আসলে ভয়-ভীতি-আবেগ-অনুভূতিশূন্যতা মিলিয়ে আমাদের সকলেরই বোধহয় তখন এক বর্ণনাতীত অবস্থা । মনের মধ্যে এখন গভীরভাবে তাড়া দিয়ে যাচ্ছে কেবল একটা তাগিদ, তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে ।

এ অবস্থায় যতোটা দ্রুত সম্ভব পানিটা পার হয়ে এলাম । দাঁড়ালাম এসে কলাগাছের বোপে ছাওয়া উচু ভাঙামতো একটা জায়গায় । আবার উঠে পড়লাম । কিন্তু এ কী! হাঁটু পর্যন্ত ডেবে যাচ্ছে কেনো আমাদের? এতো নরম লাগছে কেনো জায়গাটা? আসলে এটা পচা গোবরের একটা চিবি । তার ডানপাশেই যে চিবি সেটা পাটখড়ির । না, তাড়াতাড়ি কাজ করতে হবে । তাই গোবরের চিবির বাঁ-ধারে কলাগাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে পা ফেলে অবশেষে পৌছুলাম বুধন মেষারের বাড়ির ভিটিতে । এভাবে এগুতে শিয়ে শব্দ হলো । কিন্তু করার কিছু ছিলো না তখন । বুধন মেষারের বাড়ির পেছনের ভিটিতে আবছা অঙ্ককারে আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে ভূতের ছায়ার মতো । কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় কোথায়? তাই এগিয়ে গেলাম বিরাট চৌচালা টিনের ঘরটার একেবারে পেছনে । ঠিক এই সময় কে যেনো চেঁচিয়ে কাউকে কিছু বলে উঠলো । সময় নেই । রেডি । ফিসফিসিয়ে অর্ডার দিলাম, চার্জ!

খলিল-মতিয়ার এক সঙ্গে দুটো ছুঁড়লো। সাথে সাথে আরো দুটো। আমার হাতেরটাও উড়ে গেলো সেই সাথে। ধমাধম টিনের ছাদের ওপরে গিয়ে পড়লো ফ্রেনেড পাঁচটা। থারটি সিঙ্গ হ্যান্ড ফ্রেনেড খুবই শক্তিশালী। খুবই খ্রংস করার ক্ষমতা তার। ছোঁড়ার পরপরই শব্দ করে করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো সেগুলো আঙিনার মধ্যে। ফ্রেনেডগুলো টিনের সাথে বাঢ়ি থেয়ে গড়িয়ে পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে কাদা-পানি ভেঙে একেবারে অবিশ্বাস্য গতিতে একছুটে তখন মূলি বেড়ার কাছে পৌছে গেছি আমরা। সেখান থেকে পেছন ফিরতেই তীব্র আলো বিচ্ছুরণসহ প্রথম ফ্রেনেডটাকে ফাটতে দেখলাম। এর প্রায় একই সাথে চারটা ফ্রেনেড। তীব্র আলোর ছুট আর প্রচও বিস্ফোরণের শব্দের ধাক্কায় মূলি বেড়ার এপারে যেনো কোনু মন্তব্যলেই চলে এলাম। বাড়ির ভেতরে তখন হৈচৈ। গোলমাল তারঘরে চিঁৎকার, মরগিয়া, জলদি আও, গোলি চালাও ইত্যাদি শব্দের সাথে সাথে শুরু হয়ে গেলো চাইনিজ রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ। আমাদের তরফ থেকে সাহসী গোলাম গউসের নেতৃত্বে রাইফেল বাহিনীও পার্টা গুলিবর্ষণ শুরু করলো। আহিদার তার হাতে ধরা স্টেনগানটা থেকে এক ম্যাগাজিন গুলি একটানা ত্রাশ করে বসলো। এসব কিছুই ঘটলো মাত্র অল্প সময়ের ব্যবধানে। সকলেই তখন পালনোর তাড়নায় পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে ছুটছি। কেননা, প্রথম দিকে হতচকিত-জ্বরশ্পৰ্শ পাকবাহিনীর সেন্ট্রি আর প্রেটল পার্টি আমাদের আসবার পথের সন্ধানই পূর্ণ শায় নি, আমরা এখন কোথায়, কোনুখানে আছি, সেই অবস্থানেরও হাদিস কর্তৃত ফেলেছে। তাই ওরা আমাদের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ছে অবিরাম।

মাথার ওপর দিকে এখন বাঁচান্তো বুলেট শিস বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে। পাটগাছের মাথার ডগা বারে প্রতিছু মাথা তুলে দোড়োনো যাচ্ছে না। ছুটে আসা তঙ্গ বুলেট যে কোনো সম্ভব আর্থা গুড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু গোলাম গউসের রাইফেল বাহিনী এ অবস্থাতেই দৌড়তে দৌড়তে পেছন ফিরে ফিরেই শক্রপক্ষের দিকে তাক করে মাঝে মাঝে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক। চিঁৎকার করে গউসকে এভাবে গুলিবর্ষণ বন্ধ করতে বললাম। আমরা পাটক্ষেতের ভেতরে, এটা এখন ওদের জানা হয়ে গেছে। তাই পাটক্ষেতটাকে লক্ষ্য করে পেছনের তিন দিক থেকে গুলি ছুটে আসছে। ওদিকে জগদলহাট আর অমরখানা ঘাঁটি ও অসঙ্গ সরব হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, বুধনের বাড়িতে খোলা তাদের লঙ্ঘনখানা এতোক্ষণে আক্রান্ত হয়েছে। ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে সংজ্ঞবত পাকবাহিনী ডিফেন্স ছেড়ে উঠে আসছে। বুধনের বাড়ির দিকেই গুলি চালাতে চালাতে। এই বকম এক মরণোন্নুষ্ঠ অবস্থায় কোমর বাঁকিয়ে, মাথা নিচু করে চারপেয়ে জন্মুর মতো দোড়াতে হচ্ছে এবং দ্রুত। প্রাণগণে। কতো তাড়াতাড়ি এ মৃত্যু গহুর থেকে পালানো যায়, তারই প্রতিযোগিতা এখন আমাদের মধ্যে। কেননা, পেছন থেকে ধেয়ে আসছে ওরা, আমাদের মৃত্যুদৃত পাকসেনারা তাদের সব ধরনের ফায়ার পাওয়ার সহ। প্রচও দৌড়ছে। মনে হচ্ছে, আর বুঝি পারা গেলো না।

এমন সময় শুরু হলো শেলিং। বোৰা গেলো, মেজের শংকরের নির্দেশেই এটা

হচ্ছে। তিনি তাহলে তাঁর কথা রেখেছেন। অনেকক্ষণ পর এবার মনে হলো, আমরা নিরাপদে আমাদের আর, পিতে পৌছুতে পারবো।

মাথার ওপর দিয়ে শিস বাজিয়ে বুলেটের ছুটে যাওয়া আর দিগন্ত কাঁপানো একটার পর একটা শোলের বিক্ষেপণ। পেছনে জুলছে বুধন মেষারের বাড়ি। আর সেই বাড়িকে কেন্দ্র করে অমরখানা বোর্ড অফিসের আশপাশে সৃষ্টি হয়েছে এক নারকীয় অবস্থার। আমরা নিরাপদে আর, পিতে ফিরে এলাম। আর, পি অর্থাৎ সেই উচু মাঠের মতো জমিটার ভেজা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে আমরা দেশ ছাড়া ক'জন যুবক অনেকক্ষণ পর বুক ভরে বাতাস নিলাম। স্বাভাবিক হতে বানিকটা সময় লাগলো। আমাদের সবাই ফিরেছে। কেবল একজন ছাড়া। ফেরে নি গোলাম মোস্তফা। প্লাটুন কমান্ডার। হাতে ছিলো ওর টেনগান। গোলাম মোস্তফা কি তাহলে ধরা পড়েছে? ও কি গুলি খেয়ে পড়ে আছে পাট ক্ষেত্রে ভেতর? মারা গেছে কি ও?

আর কিছুক্ষণের ভেতরেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। না এখানে আর অপেক্ষা নয়। তাহলে সকালের আলোতেই ধরা পড়ে যাবো আমরা পাকবাহিনীর হাতে। ছেলেরাও ছটফট করছে। আর দেরি নয়। আর অপেক্ষা নয়। সুতরাং উঠতে হলো। এবার ফিরতি পথ।

আজকের বিজয়ের, সফলতার সমস্ত আনন্দ অঙ্ক কাঁচুস দমিয়ে রাখতে হলো। আর সেটা করতে হলো গোলাম মোস্তফাকে হারাল্লো বেদনা আর প্লানিতে। ওকে উদ্ধার করতে যাওয়ার মতো শক্তি কি উদয় আমাদের আর কারুর মধ্যেই অবশিষ্ট নেই। তাই সেই চাপা দুঃখ আর প্লান প্রয়োজন আজকের রাতের সফল অপারেশনের জনাকয়েক নায়ক আমরা ফিরলাম।

তালমা নদীর শালমারা ত্রিজ পুর হওয়ার পর আকাশ ফরসা হয়ে এলো। ত্রিজের এপারে বটগাছের গুড়িতে হেঁসে বেলাম আমরা। ভোরে শান্ত সমাহিত পরিবেশে খোদাড়ক মানুষ জোনাব অস্তিকে দোয়া করতে বললাম। আমরাও হাত তুললাম ওর সাথে। আমাদের সবার একটাই প্রার্থনা; খোদা, গোলাম মোস্তফাকে ফিরিয়ে দাও।

তারপর ক্যাম্পে ফিরে আসা ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে। তাঁবুতে চুকে সে অবস্থাতেই বিছানায় গড়িয়ে পড়া। পড়তেই গভীর গহন ঘুমের রাজ্য চলে যাওয়া। কিন্তু সকাল নটার দিকে হঠাৎ বড়ো ভাইয়ের সশব্দ ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো, চোখ কচলে দেখলাম, তাঁবুর বাইরে গোলাম মোস্তফা। হ্যাঁ, গোলাম মোস্তফাই। দাঁড়িয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে। লাফ দিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। ফিরে এসেছে, মোস্তফা ফিরে এসেছে! উঁও! অলিঙ্গনে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জিগোস করলাম, তুই কোথায় ছিলি঱ে? একটা প্রচণ্ড উথলে ওঠা আবেগের চেউ গলার কাছে আটকে থাকে। চোখের পাতা ভিজে আসে মুহূর্তেই।

— পথ ভুলে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, দিনের আলোয় পথ চিনে ফিরেছি। ধরা গলায় জবাব দেয় মোস্তফা।

৮.৭.৭৩

ভাটপাড়া ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়া হলো

ক'দিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলছে, বৃষ্টি আৰ বৃষ্টি। তাঁবুৱ বাইৱে পানি জমে উঠেছে, মাটি দিয়ে উঁচু কৰে আল বেঁধে পানি ঠেকাতে হচ্ছে, নইলে তাঁবুৱ ভেতৱে পানি ঢুকে যাবে। সারাদিন তাঁবুৱ ভেতৱে ঠাই বসে থাকা অলস জীৱন। তাঁবুৱ ভেতৱে কেউ কেউ তাসেৱ আসৱ বসিয়েছে, টুয়েন্টি নাইন। কোথাও চলছে সঙ্গীতেৱ আসৱ। মতিয়াৱ সেই ভাঙা প্রামোফোনটা ঘেঁষ্টে ঘেঁষ্টে বাজানোৱ চেষ্টা কৰছে। ক'জন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সেখানে। বড় ভাই তাৰ পাতানো ছেলে মঞ্জুকে তাৰ ময়মনসিংহেৱ দেশেৱ বাড়িতে ফেলে আসা নিজেৱ ছেলে মঞ্জুৱ গল্প শোনাচ্ছেন।

এৱেকম দিনে মন খাৰাপ হয়ে আসে এমনিতেই! বুকেৰ মধ্যে জমে থাকা দুঃখ বোধগুলো জেগে ওঠে। তাঁবুৱ মেৰিবেতে পাতানো বিছানায় হাতেৱ চেটোতে মাথা রেখে একটা বিষাদ মাথানো দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকি তাঁবুৱ ছাদেৱ দিকে, মানা ধৰনেৱ ভাবনা আসে। এ কেমন ধৰনেৱ সময় কাটছে এখানে আমাদেৱ! কৰে শেষ হবে এৱ! দেশে ফেলে আসা আপনজনদেৱ কথা খুব বেশি মনে পড়ে। মনে পড়ে পরিচিত এৱ-ওৱ কথা। সেইসব মুখ ভেসে ওঠে দু'চোখেৱ পাতায়। আবাৰ হারিয়ে যায়। এৱই মধ্যে প্ৰবল বৃষ্টিপাতেৱ শব্দ ছাপিয়ে কৰনে আসে দিগন্ত কাপানো কামানেৱ গৰ্জন। প্ৰচণ্ড বিক্ৰোগেৱ পৰ বিক্ৰোগ সংক্ৰান্তিকাপিয়ে জানান দিয়ে যায়, যুদ্ধেৱ বাস্তবতাৰ কথা। রাতে অপাৱেশনে যাওয়াৰ কথা। হ্যাঁ, রাতেৱ অপাৱেশন। গেৱিলা যুদ্ধ। ইংৰেজিতে যাকে বলা হয় তিনি এণ্ড রান, অৰ্থাৎ আঘাত কৰো এবং দৌড়ে পালাও। রাতে অপাৱেশনেৱ প্ৰক্ৰিয়া পৰিকল্পনা এবং শক্তিৰ ওপৰ কীভাৱে আঘাত হানা যায়, তাৰ ব্ৰিফিং। আলিপো। গায়ে জামা। হাঁটুৱ ওপৰ লুঙ্গ গুটিয়ে কোমৰেৱ সাথে শিট দিয়ে বাঁশু। কাধে বোলানো স্টেন-ৱাইফেল। কোমৰে গৌজা ম্যাগজিন। গুলিৰ বিদি বুকেৰ ভাড়াআড়ি কৰে রাখা। কোমৰ পেঁচিয়ে বাঁধা গামছায় জড়ানো ঘৈনেড়। মাথায় আলিথিনেৱ ছাউনি। অজানা শক্তিৰ উদ্দেশ্যে সারারাত পদচাৰণা। বৃষ্টি মানেই সারাদিন তাঁবুতে অলস জীৱন। বৃষ্টি মানেই যুদ্ধে যাওয়া। এই হচ্ছে আমাদেৱ এখনকাৰ দিনানুদৈনিকতা।

টেনিং শেষ কৰে নতুন একটা ব্যাচ এসেছে মূৰতি ক্যাম্প থেকে। জহুৰী বাজাৱেৰ পেছনে পুকুৱেৱ লাগোয়া মাঠটিতে ওদেৱ নামানো হয়েছে। টেনিং সেন্টাৱ থেকে সৱাসিৱ চলে আসায় ওদেৱ মধ্যে রয়েছে একটা উদ্বায় ভাৱ। টেনিং ক্যাম্পেৱ বাধ্যবাধকতা এখানে নেই। তাই আনন্দ-হুঝুড়ে মেতে রয়েছে ওৱা। স্বাধীনভাৱে এদিক-ওদিক চলাক্ষেত্ৰা কৰতে চাইছে। চাউলহাটি ইউনিট বেসেৱ নতুন অভিযোগ ওৱা। ওদেৱ আগমনে আমাদেৱ দল বৃক্ষি কৰবো।

বুধন মেৰাবেৱ বাড়িতে সফল অপাৱেশনেৱ পৰ মেজৰ শংকৰ খুবই আশাৰাদী হয়ে উঠেছেন। তাই আমাদেৱ নিয়ে তিনি এখন একটা নতুন পৰিকল্পনাৰ কথা ভাৱছেন। অবশ্য এই পৰিকল্পনাৰ কথা তিনি ক'দিন ধৰেই বলছিলেন। এবাৰ সেন্টাৱ কাৰ্য্যকৰ কৰাৰ জন্য তৎপৰ হলেন। তাৰ কথামতো টোকাপাড়া বিওপি একদিন রেকি

করে সেখানকার রুটগুলো জেনে আসা হয়েছে। সবধরনের রিপোর্ট নেয়ার পর মেজের শংকরের সিদ্ধান্ত, টোকাপাড়া বিওপিতে তোমাদের ক্যাম্প করতে হবে। ক্যাম্পের চারদিকে মাটির বাউভারি দেয়ালগুলো মজবুত করতে হবে, বাক্সার-ট্রেঞ্চ ইত্যাদি খুড়তে হবে। দুটো সেকশন সেখানে যাবে, সঙ্গে যাবে রেশন এক সপ্তাহের। হাতিয়ার থাকবে ১১টা রাইফেল, ২টা টেনগান, ১টা হালকা এল.এম.জি বা অটো রাইফেল। প্রয়োজনমাফিক হেনেড-এক্সপ্লোসিভস্মও। প্রতিটা রাইফেলের জন্য একটা ম্যাগাজিন অর্থাৎ ১১ রাউণ্ড, টেনগানের জন্য দু' ম্যাগাজিন অর্থাৎ ৩০টা করে ৬০ রাউণ্ড, অটো রাইফেলের জন্য দু' ম্যাগাজিন অর্থাৎ ৬০ রাউণ্ড এবং অতিরিক্ত আরো ৬০ রাউণ্ড গুলি। পিন্টু, আহিনীর আর জব্বাবকে কমান্ডার নির্বাচন করা হলো। তবে তিনজনের মধ্যে আহিনীর থাকবে সর্বাঙ্গীণ দায়িত্বে।

ওদের টাক দেয়া হলো, ওরা টোকাপাড়া বিওপিতে মজবুত করে ঘাঁটি গড়ে তুলবে। আর ওখান থেকেই ভেতরগড় তালমা এলাকায় অপারেশন চালাবে। লক্ষ্য রাখবে শক্রুর গতিবিধির ওপর। সেইসাথে মানুষজনকে স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জীবিত করবে। সপ্তাহে দু'দিন রিপোর্ট করবে চাউলহাটিতে এসে। ওরা ২৫ জন বৃষ্টিভেজা সক্ষ্যায় রওনা হয়ে গেলো টোকাপাড়ার উদ্দেশে। কাঁধে-পিঠে-মাথায় ওদের প্রচুর লটবহর। জুলাইয়ের সেদিন ৯ তারিখ।

পরদিন ভাটপাড়া ক্যাম্প গুটিয়ে নিতে হলো। এর চাউলহাটি। পাকা রাস্তার প্রায় ২০০ গজ পশ্চিমে একটা বিরাট দিঘি। দিঘির ভেতরের দিককার ঢালু অংশ আর পানির ধার ঘেঁষে চারদিকে প্রায় ১৫/২০ মিটার সমতল জায়গা। সেখানে সার সার তাঁবু দাঁড় করানো হলো। পুকুরের পাড় ঘেঁষে উচু থাকায় বাইরে থেকে তাঁবুগুলো দেখা যায় না। নতুন আসা ছেলেরাও যেখানে দিলো আমাদের সাথে। তাদের তাঁবুগুলোও উঠে দাঁড়ালো পাশাপাশি। গুছিয়ে মেঝে হলো সবকিছু। শুরু হলো এবার নতুন এক অধ্যায়।
৯. ৭. ৭১

চাউলহাটি ইউনিট বেস

দাঁড়িয়ে গেলো পুকুরের উচু পাড়ের আড়ালে আমাদের ক্যাম্প। এলাকাটার নাম চাউলহাটি। তাই ক্যাম্পের নাম রাখা হলো চাউলহাটি ইউনিট বেস। সার সার তাঁবু পুকুরের পাড়ে ইংরেজি 'এল' আকারে। পুবদিকের তাঁবুর সারির সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ছেলেদের ফল-ইন করার জন্য জায়গাটা নির্ধারিত। পুকুরে চুকবার মুখটা অনেকটা সুবঙ্গের মতো। বী পাশের উচু পাড়ে একটা কঠাল গাছ। ডালপাতা ডেমন নেই বলে অনেকটা ন্যাড়া ধরনের। ডান পাশের উচু পাড়ের ঢালুতে আরো দুটো তাঁবু দাঁড়িয়ে। একটা কমাণ্ডিং অফিসারের। আর একটা তার ড্রাইভার ও স্টাফের। পুকুরে গভীর কালো পানি। পদ্ম আর শাপলার ঝাঁক পুকুরের মাঝ বরাবর দিয়ে পশ্চিম পর্যন্ত প্রসারিত। শুবই নিবিড় আর সজীব পরিবেশ। সবাই ভালো লেগেছে জায়গাটা।

এখানে এসে সেন্ট্রির ডিউটি পালন করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই আপাতত।

প্রতিটি তাঁবুর সামনে পালা করে ছেলেরা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতিয়ারপত্র, গোলাবারুদ, বিক্ষেপক সবকিছু নিরাপত্তাজনিত কারণে জমা দেয়া হয়েছে চাউলহাটি বি.এস.এফ বি.ও.পিতে। ছেলেদের সেন্ট্রি ডিউটি চলছে তাই লাঠি হাতে হাতে। তাঁবুর শেষ মাথায় লঙ্ঘরখানা। টিনের ছাউনি দিয়ে মজবুত করে দাঁড় করিয়েছে লঙ্ঘরখানার কমাভার মমতাজ আর কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজ। ছেলেদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মমতাজ আর মিনহাজের চাপ বেড়েছে বেশ। তাই কয়েকজনকে সহকারী করে সদা তৎপর এবং ব্যস্ত ওরা। সকালের নাস্তা আটা দিয়ে বানানো পুরি এবং চা। দুপুরে ভাত। রাতেও ভাত। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মাথাপিছু প্রত্যেকের জন্য বরাদ ৬০০ খাম রেশন দিয়ে যায়। তাতে থাকে চাল-ভাল-আটা-ময়দা-ভালভা-সবজি আর শুকনো কাঠ-লাকড়ি পর্যন্ত। সাথে থাকে মাসের উৎস হিসেবে প্রায় হাড় জিরজিরে ১৫/২০টা ছাগল আর ভেড়া। মাসে হাত খরচ পাওয়া যায় নগদ পঞ্চাশ ভারতীয় টাকা। টেনিং সেন্টার থেকেই আমরা এটা পেয়ে আসছি। পুরুরের পেছনের দিকে চাউলহাটি গ্রাম। সামনে পাকা রাস্তা। ওপারে বি.এস.এফ কোম্পানি হেডকোয়ার্টার। বি.এস.এফ ক্যাম্পের সামনে দিয়ে পাকা সড়ক জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলে গেছে। ক্যাম্পের ডান পাশ দিয়ে একটা কাঁচা বড় রাস্তা সোজাসুজি চলে গেছে অমরখানা ফ্রন্টের দিকে। রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে বা-ধারে জলপাইগুড়ি ঝাড়ের আড়ালে বসানো হয়েছে সারি সারি কামান আর মর্টার। মাথার প্রশংসন মোটা সবুজ দড়ির জাল আর জঙ্গলের ডাল লতাপাতা দিয়ে সেগুলো কম্বলিমুক্ত করা হয়েছে। সামান্য বিরতি দিয়ে দিয়ে গর্জে ওঠে সেগুলো। উড়ে যাওয়া গোলার পর গোলা তাদের পেটের মধ্যে বিক্ষেপক নিয়ে। প্রচণ্ড শব্দে দিগন্ত ছুপায়ে ফাটতে থাকে সেগুলো শক্ত মাথার ওপর। আমাদের পুরুরের উচ্চ প্রচণ্ড দাড়ালে সোজাসুজি সামনে দেড় মাইল দূরের অমরখানা শক্রঘাটি নজরে পড়ে। শাদা দলান, ওপরে টিনের ছাউনি। পাকবাহিনীর শেষ অগ্রবর্তী ঘাটি-অমরখানা। প্রতিদিন শত শত গোলাবর্ষণের আঘাত সয়েও কীভাবে যে দালানটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই বিশ্বয়ের ব্যাপার। অমরখানা তখন সকলের কাছে এক ভীতিকর এবং বিভীষিকাময় জগৎ। চাউলহাটি ক্যাম্পের পাশে কাঁচা রাস্তার ধার দিয়ে পাকা রাস্তার মোড় পর্যন্ত বেশ কয়েকটা দোকান। চায়ের স্টেল। একটা ছোট বাজার মতো। সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত লোকজনের বেশ ভিড় সেখানে। সিডিল পোশাকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য, আঞ্চলিক প্রজননের খুজেছে বিছিন্ন হয়ে পড়া এমন শরণার্থী মানুষজন, গ্রামের সাধারণ মানুষের কিছু কেনাকাটা, চায়ের স্টেলের অলস মন্ত্র আড়ডা, গল্পগুজব আর যুক্তের কথাবার্তা এসব নিয়ে জাহাঙ্গুটা সবসময়ই জমজমাট।

মেজর শংকর তখন তার নিজের ফার্স্ট গার্ড ইউনিট নিয়ে খুবই ব্যস্ত। ভাটপাড়া থেকে চলে আসবাব দিন তার সাথে আর এক অফিসার এলেন, মেজর দরজি। জাতিতে গুরু। শংকর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, ইনি তোমাদের পরবর্তী কমান্ডিং অফিসার। আই এ্যাম গোয়িং টু জয়েন মাই ওন ইউনিট।

চাউলহাটির ইউনিট বেসে ভাটপাড়া ক্যাম্প সরিয়ে আনবার পর মেজর শংকর

চলে গেলেন। কথা রহলো, একদিন এসে তিনি সবার সাথে দেখা করে যাবেন। নতুন সিও দরজিও তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত। তিনি তাঁবু ফেলেছেন পুকুরের ডান পাশের সমতল তটচিটে। তাঁর তাঁবুর পাশের তাঁবুতেই জায়গা করা হয়েছে তার ড্রাইভার আর ব্যটম্যানের। তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেজরের একটিনি আর্মি ভ্যান। সেই ভ্যান নিয়ে মেজর ছুটেছেন তার ইউনিটে। রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারে। যাওয়ার আগে বড় ভাইকে ডেকে ছেলেদের সম্পর্কে খোজখবর নেন।

আমাদের মোটামুটি কমহীন দিন কাটছে তখন। সারাদিন তাঁবুতে শুয়ে বসে গঁজের পর গঁজ। বিকেলে চায়ের ষ্টলে গিয়ে চা-পানের ফাঁকে ফাঁকে স্থানীয় মানুষজনের মুখ থেকে যুদ্ধ এবং শরণার্থী সংক্রান্ত আলোচনা শোনা। সক্যার আগে ফিরে এসে ফল-ইন। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া। সেন্ট্রি বটন। এরপর রাতের ঘনায়মান অঙ্ককারে পুকুরের উচু পাড়ে বসে অমরখানার দিকে তাকিয়ে থাকা। নিরাপদ দূরত্বে বসে সরাসরি শক্রঘাটি দেখবার ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর। বড় ভাই নুরুল হক, এখানে এসেও ক্যাম্পের হাল ধরেছেন শক্ত হাতে। কিছু কিছু মানুষ আছেন যারা কাজপাগল, কাজ ছাড়া থাকতে পারেন না এবং যা কিছুই করেন, প্রগাঢ় আন্তরিকতা নিয়েই করেন। বড় ভাই হচ্ছেন এ ধাঁচেরই মনুষ। নতুন জায়গায় ক্যাম্প স্থাপনের হাজারটা ঝামেলা। সেই ঝামেলা ঘাড়ে তাঁবু ছাঁয়েই তিনি সামলে চলেছেন সবকিছু সন্তুষ্টিতে। কাজ শেষে তিনি পুকুরের উচু পাড়ে এসে বসেন চুপচাপ। অন্য আর সবার সাথে অঙ্ককারে দৃষ্টি প্রসরিত করে অমরখানা শক্রঘাটির দিকে তাকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘস্থায়ের প্রাণে সঙ্গে তাঁর ব্রগতোক্তি ও কানে আসে। অমরখানার কি পতন হবে না? তাঁবু জৰায়ের কোনো উত্তর দেয়া যায় না। সেটা কারুরই জানা নেই। হয়তো একদিন অমরখানার পতন হবে। তবে কবে, কতোদিন পরে, কে সেটা জানে?

টোকাপাড়া ক্যাম্প

জব্বার টোকাপাড়া ক্যাম্পে যাবে না বলে আপত্তি তুলেছিলো। দেখিয়েছিলো অসুস্থ্রতার কারণ। আসলে টোকাপাড়ার অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে যেতে জব্বার ভয় পাচ্ছিলো। তবে তার না যাওয়ার এই অভিপ্রায়ের কথাটা সে সাহস করে মেজর শংকরের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু যুক্তের মাঠে নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা কাজ করে না। সেখানে কমান্ডারের ইচ্ছা এবং আদেশটাই বড়ো। আর সেই আদেশ পালন করতে হয় অঙ্করে অঙ্করে। নিতে হতে পারে এজন্য জীবনের চরমতম ঝুঁকি। জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু করার কিছু নেই।

জব্বার আমাদের অত্যন্ত আপনজন হয়ে গেছে। কথাবার্তা এবং তার ব্যবহার আন্তরিকতায় ভরা। মুখভর্তি দড়ি-গৌফের আড়ালে সদা হাস্য একজোড়া ভরাট চোখ। গালগঞ্জ আর রসিকতা দিয়ে সকলকে মাতিয়ে রাখবার একটা সচেতন প্রয়াস তার মধ্যে সবসময় কাজ করে। এই আসর জমানো মানুষ জব্বার ভাই টোকাপাড়ার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। এতে করে ক্যাম্পের অবশিষ্ট ছেলেদের মন খারাপ হয়ে

গেছে। পিন্টু চলে গেলে গান আর রস দুটোই চলে যায়। জব্বার গেলে আর কিছুই থাকে না। বড় ভাইয়ের ইচ্ছে ছিলো না, তিনি যান। আমারও মনে একই রকম ইচ্ছে কাজ করছিলো; তারপরও তাকে যেতে হলো টোকাপাড়ায়। যাওয়ার সময় আমাদের দুজনের কাছে তার অনুরোধ ছিলো মেজ র শংকরকে বলে যেনো তাকে ফিরিয়ে আনা হয়। শংকর এতে রাজি হয়েছেন। জব্বার ফিরে আসবে, তার জায়গায় যাবে গোলাম গউস।

গোলাম গউসকে নিয়ে আমি টোকাপাড়ার উদ্দেশে রওনা হলাম। টোকাপাড়া ক্যাম্প স্থাপনের পর দুদিন পার হয়ে গেছে। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের ভেতরে স্থাপিত টোকাপাড়া ক্যাম্প নিয়ে আমাদের দারণ উৎকর্ষ ছিলো। ইউনিট বেস থেকে অনেক দূরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থাপিত এই ক্যাম্প। সম্পূর্ণ একক শক্তির ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে হবে ওদের। শক্ত কাজই বটে এটা। অন্ত-গোলাবারুদ অসম্ভব সীমিত। প্রয়োজনে চট করে অন্ত-গোলাবারুদ যোগাড় করবারও কোনো উপায় নেই। এতোদিন সীমান্তের এপারের ক্যাম্প থেকে সবগুলো অপারেশন চালানো হয়েছে। সীমান্তের এপার থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে রাতের অঙ্ককারে ফিরে এলেই নিরাপদ এবং নিশ্চিত। এপারে অর্ধাং ভারতীয় এলাকায় পাক আর্মির আসবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু টোকাপাড়া স্মার্ট এন্ডও টোকাপাড়ার অবস্থান অনেক ভেতরে, ঠিক ভারতীয় সীমান্তের কাছ থেকে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কিন্তু তা দুর্লভ্যও নয়। এ ব্যাপারে স্মিন্টস্টা তো ছিলোই, সেই সাথে একক নেতৃত্বে ওদের টিকে থাকবার ব্যাপারেও আমি ছিলাম সন্দিহান। ওরা কখনোই এরকম কোনো শক্ত কাজ করে নি।

গোলাম গউস টোকাপাড়া থেকে কোনো আপত্তি করে নি। জব্বারের জায়গায় তাকে যেতে হবে টোকাপাড়া এবং জব্বার চাউলহাটি ফিরে আসবে, এ প্রস্তাবটা দেয়ার আগে মনে হচ্ছিলো গোলাম গউস হয়তো আপত্তি করবে। কিন্তু প্রস্তাবটা দিতেই সে রাজি হয়ে গেলো। শক্ত ধাতের ছেলে গোলাম গউস। রংপুর শহর থেকে ৮/১০ মাইল দূরে রানীপুরুর গ্রামে বাড়ি ওদের। কারমাইকেল কলেজের বি.এস.সি ক্লাসের ছাত্র। অস্থির টগবগে যুবক গোলাম গউস ক্যাম্পের বাঁধাধরা জীবনে হয়তো হাঁফিয়ে উঠেছিলো। বেশ কটা শক্ত আর ঝুকিপূর্ণ অপারেশনে সে আমার পাশে ছিলো বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে। দুর্দান্ত সাহসী আর ঝুকি নেয়ার মনোভাবের অধিকারী গোলাম গউস যেনো সবসময় যুক্তের জন্য তৈরি হয়েই আছে। তাই সে রাজি হয়ে গেলো জব্বারের জায়গায় যেতে। আমার ওপর দায়িত্ব পড়লো তাকে পৌছে দেয়ার এবং সেই সাথে টোকাপাড়া ক্যাম্প ভালোভাবে পুষিয়ে দিয়ে আসার। ১১ জুলাই তারিখের সকালে আমরা দুই যুবক রওনা হলাম টোকাপাড়া অভিযুক্তে।

জব্বারের বদলে গোলাম গউস

ভাটপাড়ায় রাখালদার বাড়ির কাছে বেশ একটা জটলা। একটা রিক্ষা নিয়ে টানাটানি চলছে। জটলার ভেতর থেকে একটা লোক এমনভাবে গলা চড়িয়ে কথা বলছে,

যেনো ভীষণ অন্যায় করা হচ্ছে তার ওপর। লোকটা বলছে, কেনহে তুমরা মোর রিকশা নিবেন, মুই জয়বাংলার মান্যি, পচাগড় থাকি পালহে আসিনু এপারোত, তোমহারা কেনহে মোর রিকশা নিবার চাহেছেন? আমি জটলার কাছে এগিয়ে যেতেই লোকগুলো আমাদের চিনতে পেরে পথ ছেড়ে দিলো। রিকশাওয়ালা দু'জনের সাথে কথা বলে জানা গেলো, ওরা অধিকৃত পঞ্চগড় এলাকা ছেড়ে চলে এসেছে জয়বাংলা এলাকায়। চলে আসবার সময় ওদের রিকশা দুটো নিয়ে এসেছে অনেক ঝুঁকি নিয়ে। এপারেও তারা রিকশা চালিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করবে বলে। স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরবে না। কেননা, সেখানকার অবস্থা ভালো নয়। মিলিটারিয়া ধরে ধরে মানুষ মারছে। আমি এবার রিকশাওয়ালা দু'জনের কাছে এগিয়ে গেলাম, মুহূর্তে ঠিক করলাম বাংলাদেশ থেকে এপারে আগত নবীন দু'জন শরণার্থীকে এভাবে রেখে যাওয়া যায় না। এখানে এভাবে থাকলে ওরা ওদের রিকশা দুটো হারাবে। সুতরাং নিয়ে চললাম ওদের ভেতরগড়। ওরা আমাদের পেয়ে যেনো নিষ্ঠিত হলো। রিকশায় তুলে নিলো আমাদের।

সামনের রিকশায় আমি। পেছনেরটায় গোলাম গড়স। এবড়োথেবড়ো রাস্তা ধরে চলছি আমরা ভেতরগড়ের দিকে। এ রাস্তা আমাদের অতি পরিচিত। প্রায় প্রতিরাতেই এর বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আসল ভেতরগড়ে অনুপ্রবেশ করেছি বিভিন্ন অপারেশনাল টাঙ্ক নিয়ে। আমাদের নিয়ে রিকশা দুটো এগিয়ে চলেছে সেই পরিচিত পথটা ধরেই।

ভাটোড়া ক্যাশ্পের পাশ দিয়ে দুর্ঘটনা ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার আমাদের অভিবাদন জানিয়ে চা খেতে ভাবছেন। বেশ ক'দিন ছিলাম এদের পাশাপাশি। তাই বঙ্গুত্তের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। সুবেদার লোকটাও ভালো। অবাঙালি ইউপির অধিবাসী। রিকশার ক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন তিনি, আইয়ে ভাইয়া চা পিকার যাইয়ে। আন্তরিক আর আন্তর্জনের আবেদন তার গলায়। কিন্তু হাতে সময় কম। একথাটা জানিয়ে কেবল কুশল বিনিয়য় সেরে আমরা ভেতরগড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভেতরগড় মহারাজ দিঘির পাড়ের বঙ্গুরা আমাদের দেখে উল্লিখিত হয়ে উঠলো।

মতিন ও মকতু মিয়াসহ চার পাঁচজন আমাদের নিয়ে চললো টোকাপাড়ার দিকে। রিকশা ছেড়ে হাঁটতে লাগলাম ওদের সাথে। এই প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে ভেতরগড় নতুন হাঁটের ওপর দিয়ে আমাদের চলাচল। মতিনের উৎসাহের শেষ নেই। টোকাপাড়ায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প হওয়ার ফলে ওদের সাহস অনেক গুণ বেড়ে গেছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে উৎসাহ-উদ্বীপনা। মনে হচ্ছিলো, বাংলাদেশের এ অংশটা সত্যিই স্বাধীন হয়েই গেছে।

ভেতরগড় নতুন হাট থেকে সোজাসুজি আধায়াইলটাক রাস্তা উঁচুগড়ের পেট বরাবর এসে থেমে দু'ভাগ হয়ে গেছে। বাঁ দিকের রাস্তাটা গড়ের ঢালু দিয়ে কিছুটা এগিয়ে সেটা ডিঙিয়ে ভারতীয় সীমানায় ঢুকে সোজা চলে গেছে গড়ালবাড়ি বিওপির সম্মুখবর্তী পাকা রাস্তায়। ডান দিকের রাস্তাটা সামান্য এগিয়ে একটা সুরক্ষ মতো পথে

গড়টাকে দু'ভাগে করে চলে গেছে। নালাগঞ্জ মধুপাড়া হাড়িভাসার দিকে। সুরঙ্গ মতো জায়গাটা থেকে এ-পাড়ের সমতল প্রান্ত ধরে তিনশ' গজের মতো এগুলেই টোকাপাড়া ক্যাম্প। ক্যাম্পের রাস্তাটা কাশের বোপ, লেবুঘাস আৱ চোৱাকঁটার বোপে আচ্ছাদিত। গড়ের ওপৰে ক্যাম্পের অবস্থান। টিলার মতো উঁচু গড়। মাটি কেটে ক্যাম্পটা যেনে গড়ের ওপৰ বসিয়ে দেয়া হয়েছে। গাছগাছালি দিয়ে ঘেৱা গড়ের মাথায় ক্যাম্পটার অবস্থান ঠিক ছবিৰ মতো। একটা আদৰ্শ বৰ্জাৰ আউট পোট। গড়ের ওপৰেই ইন্ডিয়া। এপাৰে বাংলাদেশ। উঁচু থেকে সমস্ত এলাকাটাৰ ওপৰ চমৎকাৰ নজৰ রাখা যায়।

দুপুৰের দিকে ক্যাম্পে পৌছনো গেলো। পিন্টু দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধৰলো প্ৰথমেই। ক্যাম্পে মেটামুটি একটা শোৱগোল পড়ে গেলো আমাদেৱ উপস্থিতিতে। উষ্ণ অভ্যৰ্থনা জানালো জৰুৱাৰ, আহিদাৰসহ অন্যৱা। বোৰা গেলো, আমাদেৱ পেয়ে সবাই শুশিৰ হয়েছে। আনন্দ উপছে পড়ছে ওদেৱ চোখ-মুখ থেকে। ভালো লাগলো ওদেৱ মধ্যে এসে। দেশে যুক্ত চলছে। সমস্ত দেশটাই হানাদারদেৱ দখলে। দেশে ফেলে এসেছি আমাদেৱ বাড়িঘৰ, আঞ্চীয়-পৱিজন। দেশ স্বাধীন হবে কি না, হলেও সেটা কতো দিনে, কে জানে! দেশেৰ বাড়িতে আঞ্চীয়-পৱিজনদেৱ সাথে কোনোদিন দেখা হবে কি না, কে জানে। সামনে যুক্ত। যুক্তেৰ সম্মুক্তি আমাদেৱ সকলেৰ বসবাস এখন। তাই প্ৰত্যেকেৰ সঙে প্ৰত্যেকেৰ একটা আঞ্চীয়তাৰ বক্ষন গড়ে উঠেছে। এখানে সকলেই সকলেৰ কতো আপন। এতে আমৰা এখানে এসেছি, মনে হচ্ছে, একেবাৰে আপনজনেৰ মধ্যে চলে এলাকা সময় আৱ পৱিস্থিতি মানুষকে কতো কাছাকাছি নিয়ে আসে!

পিন্টু, আহিদাৰসহ ক্যাম্পটা ধৰে যুৱে দেখলাম। পৱিষ্ঠা করে দেখলাম, ওদেৱ নিৱাপত্তা ব্যবস্থা, যে ব্যাপকভাৱে দেখবাৰ জন্য আমাকে এখানে পাঠালো হয়েছে। ক্যাম্পটা বেশ ক' মাস পৰ্যন্ত্যক ছিলো। যুদ্ধেৰ শুৱুত্তেই এটাকে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। ক্যাম্পেৰ ই.পি.আৱৰা, বাংলাদেশেৰ প্ৰতি তাদেৱ সমৰ্থন ঘোষণাৰ পৱিপৰহ এখানে রক্ষিত সমস্ত অন্তৰ্শক্ত, গোলাবাৰুদসহ অন্যান্য জিনিসপত্ৰ তুলে দিয়েছিলো মুক্তিবাহীৰ হাতে। যাওয়াৰ সময় তাৱা ক্যাম্পটি পুড়িয়ে দিয়ে যায়। ব্যবহাৰ কৰিবাৰ মতো এখানে কেবল একটা ছেটঘৰ অবশিষ্ট ছিলো।

দুদিনেৰ ভেতৱেই এৱা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। তাৰু খাটিয়েছে দুটা। টিনেৰ ছাদ দেয়া দালানঘৰেৰ সেই ব্যবহাৰোপযোগী কামৰাটাকেই তাৱা অস্তুগাৰ হিসেবে গড়ে তুলেছে। মাথার ওপৰ একটা চালা তুলে বানিয়েছে লঙ্গৰখানা। ক্যাম্পেৰ চারপাশেৰ মাটিৰ দেয়ালগুলো ঠিকঠাক মতোই ছিলো। সামনেৰ দিককাৰ বাঙ্কাৰ দুটো সংকৰণ কৰা হয়েছে। একমাত্ৰ ভাৱি অস্ত দু'পাতলা অটো রাইফেল কাম এলএমজিটা বসানো হয়েছে সেখানে। কঠোৰ সেন্ট্রি ডিউটি লাগানো হয়েছে। বাঙ্কাৱেৰ ভেতৱ থেকে সমূৰ্খবৰ্তী সমস্ত কিছু কিছু নজৰে আসে।

আহিদাৰ রিপোৰ্ট কৰলো, সব ঠিকঠাক আছে। নিয়মিত ডিউটি দেয়া হচ্ছে। রাতে প্ৰেল ডিউটি চলছে। মানুষজন খুব শুশি। তাৱা বেছ্যায় ক্যাম্পেৰ বিভিন্ন কাজ

করে দেয়। বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসে। দুটো মোটর সাইকেল দেখিয়ে লাজুক হেসে আহিদার জানায় এই ফিফটি হোভা দুটো যোগাড় করা হয়েছে, একটা মকবুল মেষারের আর একটা ...।

— জোর করে এনেছে না কি? ওকে থামিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করি।

— না না জোর করবো কেনো? ওরা নিজে দিয়ে গেছে। না চাইতেই দিয়ে গেছে।

কথাটা বিশ্বাস হলো না। যাই হোক বোৰা গেলো আহিদার এগুলো যেভাবেই হোক ম্যানেজ করেছে। পাটগ্রামের জোতদার ঘরের ছেলে আহিদার। দেশে নিজেদের মোটর সাইকেল দাবড়ে বেড়িয়েছে স্বাধীনভাবে। পর্যাপ্ত সজ্জল জীবনের ভেতর থেকে এসেছে সে। স্বাভাবিকভাবেই শৌখিনতা তার পিছ ছাড়ে নি। পিন্টু সাবধানী ছেলে। সে হাতিয়ার আর গোলাবারুদের কথা ভাবছে। যাত্র এগারোটা রাইফেল, দুটো টেলগান, একটা অটো রাইফেল, প্রত্যেকটা হাতিয়ারের জন্য যাত্র এক ম্যাগাজিন করে গুলি। কী হবে এ দিয়ে? তার গলায় অনুযোগের সূর। আপনারা মেজর শংকরকে বলে আরো অন্ত আর গোলাবারুদ পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। ওকে কথা দিলাম এই বলে, শংকরকে বলে-কয়ে অবশিষ্ট আয়ো কিছু অন্ত আর গোলাগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা এখান থেকে ফিরে গিয়েই করা হবে।

তবে একটা ব্যাপার ভালো লাগলো না। আর সেটা হলো, ক্যাম্পের ভেতর প্রচুর বহিরাগত মানুষের আনাগোনা। সকলেই স্বাক্ষর হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিলেও অনেককেই চিনতে পারা গেলো না। অনেকেই নয়, ওরা সকলেই আমাদের দেখতে আসে। খোঝখবর নিতে আসে। ওদের কাছ থেকে এলাকার খবরাখবর জানা যায়। এই অচেনা লোকজনদের সম্পর্কে জিগ্যেস করতেই পিন্টু উত্তরে আমাকে সোজাসাপটা জানায়। অম্যু তার উত্তরে বলি, সবার সামনে নিজেদের এভাবে এক্সপোজ করা ঠিক না। এতে সিকিউরিটি ফাঁস হয়ে যায়। তুমি ভিড় করাও। পিন্টু বলে ঠিক আছে, ব্যাপারটা কন্ট্রোল করে ফেলবো। তারপর স্বত্ত্বাবসূলত হালকা গলায় বলে, শালারা দেইখ্বার আইসে তাম্সা। তাম্সা খুলি ধরছি হামরা ...।

একসাথে দুপুরের খাওয়া হলো। তারপর সকলকে নিয়ে ব্রিফিং। হাতে যা অনুশৰ্ণ আছে, তাই নিয়ে যতদূর সম্ভব শক্ত ডিফেন্স গড়ার পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে করতেই বিকেল গড়িয়ে গেলো। এবার ফেরার পালা। জব্বার এরি মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। ছেলেদের কাছ থেকে বিদ্যায় নিতে গিয়ে আর এক বিপত্তি। সবার চোখে পানি। কাঁদছে ওরা।

ওদের কাছ থেকে বিদ্যায় নিয়ে ভেতরগড়ের পথ ধরলাম। পিন্টু-আহিদার আর গউস কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। বিশ্বগ্র তিন মুবককে পেছনে রেখে আমরা ফিরতে লাগলাম। এবার আমি আর জব্বার। গোলাম গউসকে রেখে এলাম পেছনে।

আক্রান্ত টোকাপাড়া ক্যাম্প

পরদিন বেলা ১টার দিকে ভেতরগড়ের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে এলো। তবে অস্পষ্ট সেই শব্দ। অমরখনা ঘাঁটির ওপর সবসময়ই গোলাগুলি বর্ষণ চলছে। ভয়াবহ শব্দের তরঙ্গ তুলে দিগন্ত কাপিয়ে। কিন্তু এটাকে সে ধরনের রুটিনমাফিক শব্দ মনে হচ্ছিলো না। মাঝে মাঝে মর্টারের শেল ফাটার শব্দ, থেমে থেমে স্বয়ংক্রিয় কোনো অন্ত্রের ত্রাশ ফায়ার এবং রাইফেলের সিঙ্গল শট। শব্দের এই সমাহার শুনে মনে হচ্ছিলো এর উৎসস্থল হচ্ছে ভেতরগড়। মনের ভেতরে হঠাত করে প্রশ্ন জেগে উঠলো তবে কি টোকাপাড়া ক্যাম্প পাকবাহিনী আক্রমণ করেছে? সেটাই-বা এতো তাড়াতাড়ি কী করে সম্ভব? কথা ছিলো, অমরখনা থেকে পাকবাহিনী যদি টোকাপাড়ার দিকে এ্যাডভাস করে, তাহলে চাউলহাটি থেকে গোলাবর্ষণ করে তাদের বাধা দেয়া হবে। থামিয়ে দেয়া হবে তাদের অগ্রযাত্রা। মেজর শংকর টোকাপাড়ায় ক্যাম্প করার সময় বারবার এই প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন।

ভেতরগড়ের দিকে একটানা গোলাগুলি বর্ষণ আমাদের উদ্ধিগ্নি করে তুললো। পাকবাহিনী কি টোকাপাড়ার দিকে এগুচ্ছে চাউলহাটি থেকে এদের সাপোর্ট কই? এরা কি ব্যাপারটা টের পেয়েছে? টোকাপাড়া ক্যাম্পে একেবারে যোগাযোগবিহীন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে ওরা। হঠাত করে আক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সামলাতে পারবে কি? আসলে কি ঘটছে, সেটা জানা দরকার। ব্যাপ্তিমত আঁচ করার জন্য বি.এস.এফ ক্যাম্পে গেলাম জৰুৱার ভাইসহ। কিন্তু ক্যাম্পে পৌছে সুবেদারের অলস ছুটি কাটানোর ভঙ্গি, খাকি হাফপ্যান্ট আর স্যার্টেল গেঞ্জ গায়ে দিয়ে ক্যাম্পের আঙ্গিনায় খাটিয়ার ওপর তার বসে থাকার ব্যবস্থা দেখে মনে হলো, আমাদের আশঙ্কামতো তেমন কিছুই ঘটে নি। ঘটলে ক্যাম্প সুবেদারের এইরকম নিরুদ্ধে, নিশ্চিন্ত, নির্বিকার হাল কেনো? আমাদের দেবেই সাদৰে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আরে ইয়ার আইয়ে, বইঠিয়ে। সুবেদারের গলায় বক্সুত্তের অন্তরঙ্গতা। আমরা বসলাম। ভেতরগড়ের দিককার গোলাগুলির ব্যাপারটা সহকে তাদের কোনো ধারণা নেই বলে আলাপ-সালাপে সুবেদার আমাদের জানালেন। না, যে জন্য আসা, সেটা হলো না। এরা কিছু বলতে পারছে না। কোনো খবর নেই। হতাশা আর প্রচণ্ড এক অস্ত্রিণতা নিয়ে আমরা দুঃজন আমাদের পুকুরের ক্যাম্পে ফিরলাম। মনে মনে প্রোৰ্ধ দেই, না: কিছু হয় নি, কিছু হবে না।

আহিদার এলো দুটোর দিকে তার ডান পায়ের তালুতে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। একটা চাকা পাংচার হয়ে যাওয়া পুরনো সাইকেল ঠেলে ঠেলে সে দৌড়ে এসেছে। উদ্ভ্রান্ত পাগলের মতো চেহারা। হাঁ-হয়ে যাওয়া মুখ দিয়ে নিষে বড়ো বড়ো করে শ্বাস। চোখের মণি দুটো বড়ো বড়ো। লাল যেনো ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

— আহিদার তুই! কি হয়েছে বল? তোর এ অবস্থা কেনো?

— এ্যাটাক করেছে খানেরা ... ওরা সংখ্যায় হবে এক হাজার ... আর্টিলেরি মর্টার এইসব নিয়ে এসেছে ...।

— টোকাপাড়া ক্যাম্প এ্যাটাক করেছে?

— এতোক্ষণে বোধ হয় করে ফেলেছে ।

— তুই দেখেছিস?

— আমি দূর থেকে দেখেই সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছি । গড়ালবাড়ি বিওপি থেকে মেজর শংকরকে ধরার চেষ্টা করেছি ওয়ারলেসে । পাই নি ... তাই নিজেই ... এতোদূর... । হাঁপাছিলো সে, তাড়াতাড়ি সাপোর্ট দরকার মাহবুব ভাই । নইলে ওরা সব মরে যাবে ... আমাকে জড়িয়ে ধরে আহিদার কেঁদে ফেলে ।

টোকাপাড়া আক্রান্ত হয়েছে! আমরা তাহলে আক্রান্ত হলাম! কিন্তু এটা এমন এক মুহূর্ত, যখন মাথা ঠাণ্ডা রাখা দরকার ; দ্রুত সিদ্ধান্ত দরকার । আহিদারের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঘাসের ওপর বসতে বলি । বড় ভাই অস্থির পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করেছেন । একরামুলকে ডেকে ছেলেদের ফল-ইন করে প্রস্তুত হতে বলি । ছেলেরা ইতিমধ্যে তাঁবু থেকে বের হয়ে এসেছে । একটা চাপা শঙ্কা আর অস্থিরতা সকলের মধ্যে । আহিদারকে সাথে নিয়ে বড় ভাই, জব্বার আর আমি উর্ধ্বর্গসে দৌড়ে হাজির হই বি.এস.এফ ক্যাম্পে ।

ওয়ারলেস এবং ফিল্ড টেলিফোনে চেষ্টা করেও ধরা যাচ্ছে না মেজর শংকরকে । দরজি কোথায় আছে তাও জানা যাচ্ছে না । কমান্ডারের বিদেশ না পেলে এদের ধাঁচি থেকে একটা গোলাও ছোঁড়া যাবে না এফ.এফ.ডব্লিউ.সাপোর্ট ফায়ার হিসেবে । আমাদের প্রচও অনুরোধের চাপে বি.এস.এফ.ডব্লিউ.সাপোর্ট কেবল অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, কেয়া কারেগা, আফঙ্গানিস্তক বাত ।

— হামারা হাতিয়ার দিজিয়ে ।

— নেহি সাব, পারমিশান নেহি ।

একটা অসহায় রাগ আমাদের চারজনকে গ্রাস করে ফেলে । কী করা যাবে? অফিসার ইন-চার্জ এফ.এফ.ডব্লিউ.নিট বেসের অনুমতি ছাড়া আমাদের হাতিয়ার পাওয়া যাবে না, এটা আমরা জানি । আমাদের নামে ইস্যুকৃত সব হাতিয়ার আর গোলাবারুদ বি.এস.এফ ক্যাম্পে রক্ষিত । মেজর স্লিপ দিলে তবেই তারা হাতিয়ার তুলে দেবে আমাদের হাতে । কিন্তু কোথায় মেজর শংকর? ততোক্ষণে কি ওরা মারা পড়বে? আহিদারের কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে পাকবাহিনী নিশ্চয়ই প্রস্তুতি নিয়ে তুকেছে আর তার মোকাবিলায় পিটুরা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারবে না । কি হবে এখন? আমরা তখন হতাশ, আশাহীন আর সেই সাথে মনের দিক দিয়ে ভয়ালকভাবে বিশ্বস্ত ।

ঠিক এইরকম অবস্থায় চেষ্টা করতে করতে ফিল্ড টেলিফোনে অবশ্যে মেজর শংকরকে ধরা গেলো । এর মধ্যে প্রায় ১ ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে । শংকর দূরে কোথাও তার নিজের ইউনিটের ডিফেন্স নিয়ে ব্যস্ত ।

— কেয়া হুয়ারে মেহবুব, কোই প্রোবলেম? শংকর উৎকঠিতভাবে জানতে চান ।

— পাক আর্মি টোকাপাড়া ক্যাম্প এ্যাটাক কিয়া ... । — ইয়েস এ্যাটাক কিয়া উইথ হেভি আর্মামেন্টস... ।

— এক হাজার নাম্বার হোগা, কমসে ... । আহিদার খবর লেকে আয়া ... ।

জলদি জলদি সাপোর্ট ফায়ার নিডেড ... টোকাপাড়া ক্যাম্প বহুত খতরেমে হ্যায় ...
স্যার টেক ইট সিরিয়াসলি ... প্রিজ স্যার ... সাপোর্ট ফায়ার প্রিজ ... ইনফোর্সমেন্ট
প্রিজ ... ।

একনাগাড়ে হৃড়মুড়িয়ে কথাগুলো বলে থামলাম। শংকর শুনলেন। অনুধাবন
করার চেষ্টা করলেন ব্যাপারটার গুরুত্ব। শেষে বললেন, ওকে ইট উইল বি অল
রাইট, ঘাবড়াও মাত, হাম আতা হ্যায়।

বি.এস.এফ ক্যাম্প থেকে বের হয়ে আমরা পিচালা রাস্তার ওপর এসে
দাঁড়ালাম। শুধু অপেক্ষা প্রতি মুহূর্তের। এই বুঝি শুরু হলো সাপোর্ট ফায়ার। এই
বুঝি এলেন মেজর শংকর। না। সব প্রতীক্ষার যেমন শেষ আছে, তেমনি আমাদের
প্রতীক্ষারও শেষ হলো এক সময়। প্রায় বিশ-পঞ্চিশ মিনিট পর শংকরের গাড়ি দেখা
গেলো। গাড়ি এসে থামলো আমাদের সামনে। আমরা এগিয়ে গেলাম গাড়িটার
কাছে। না, মেজর শংকর নয়, এসেছেন মেজর দরজি। তিনি ত্রৈন্তে গাড়ি থেকে
নেমে এলেন। ‘কেয়া হ্যায়?’ বলে তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি
বললাম, বড় ভাই বললো, সেই সাথে আহিদারও। সবিস্তারে পরিস্থিতির বর্ণনা করা
গেলো। আহিদার তখনো কাঁপছে উদ্দেজনায়। গলায় কথা আটকে আসছে তার।
দরজি সবকিছু শুনলেন। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ তাঁকে চিন্তিত আর গঁটোর
দেখালো। তারপর আমাদের সঙ্গে নিয়ে পুরুষ প্রমদের ক্যাম্পে এলেন। আমাকে
ক'জন হেলেসহ তৈরি হতে বলে তিনি তাঁর ক্ষেত্রে গিয়ে চুকলেন। একরামুলসহ
সাতজনের একটা দল বট্টপ্ট তৈরি করে দেলো। তারপর দরজি তাঁর থেকে বের
হয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ছাঁচে গেলেন গাড়ির কাছে। গাড়িতে করে তিনি
বি.এস.এফ ক্যাম্পে গেলেন টেলিফোনে কথা বলতে তার কমান্ডারের সাথে। এর
কিছুক্ষণ পর দরজির ওয়ান টেলি আর্মি ভ্যানের পেছনে বসে আমরা রওনা দিলাম
গড়ালবাড়ি বিওপির উদ্দেশ্টে। ক্লান্ত বিধ্বনি আহিদার বসে থাকলো আমাদের পাশে
চূপচাপ।

তখন বিকেল। গড়ালবাড়ি বিওপির সব বিএসএফ সদস্যকে পজিশনে থাকা
অবস্থায় পাওয়া গেলো। দরজি রিপোর্ট নিলেন নেপালি সুবেদারের কাছ থেকে। হ্যাঁ,
পাকবাহিনী টোকাপাড়া ক্যাম্প পর্যন্ত এসে গেছে দুপুরের ভেতরেই। ক্যাম্প দখল
করেছে বলে মনে হচ্ছে। ক্রিডম ফাইটারদের কোনো খবর নেই। বর্জার বেল্টের
লোকজন সব এদিকে পালিয়ে এসেছে। তারা তাদের পজিশনে মজবুত হয়ে বসে
আছে। প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়েছে। পাকবাহিনী বর্জার পর্যন্ত এসে গেছে।

— হোয়াটস এবাউট এফ. এফ'স?

— কো-ই খবর নেই সাব।

— পাক আর্মি বর্জার ক্রস কিয়া?

— নেই জান্তা সাব।

আহিদার আর আমি পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনলাম। মেজর দরজি কোমর থেকে
পিস্তল বের করে হাতে নিলেন। বললেন, আও মেরা সাথ। শক্ত হাতে টেনগান ধরে

আমরা চললাম তাঁর সাথে। সুবেদার রাইলেন গাইড হিসেবে।

টোকাপাড়া ক্যাম্পের আমাদের পঁচিশজন সহযোগীর জন্য আমরা উৎকৃষ্ট। দ্রুত যেতে চাই ওদের কাছে। মেজরকে পেছনে ফেলে আমাদের এগুবার ব্যাপারটা দেখে মেজর ধমকে উঠলেন। একজন পেশাদার সৈনিক তিনি। ট্রেইনিং থেকেই জেনে এসেছেন, তাদের চিরশক্ত পাকিস্তান আর্মি অসম্ভব দুর্বৰ্ষ। তারা টোকাপাড়া ক্যাম্প পর্যন্ত এসে গেছে। দখলও করেছে সেটা। হয়তো এখনও আছে তারা সেখানে। মেজর দরজি সেদিকটাকে এসকর্ট এবং যথেষ্ট ফোর্স না নিয়ে যেতে চাইবেন না, কিংবা গেলেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা তো পিন্টুদের জন্য পাগল হয়ে উঠেছি। ওরা কি সবাই মারা পড়েছে, কিংবা ধরা পড়েছে? কে জানে, কী হয়েছে এই এতোক্ষণে ওদের!

শহিদ গোলাম গটুস

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা উৎকৃষ্ট লোকজন। পাকবাহিনীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাদের অনেকেই পালিয়ে এসেছে সীমান্তের এপারে। তাদের দৃষ্টি প্রসারিত টোকাপাড়ার দিকে। মেজর জিগ্যেস করছেন আর ঘুঁজেছেন। কিছুদূর এইভাবে এগুবার পর লোকজনের কাছ থেকে জানা গেলো পাকিস্তানীরা সম্ভবত চলে গেছে। তবে তাদের কথাবার্তা থেকে তারা যে চলে গেছে এ ব্যাপারে খুব বেশি একটা নিশ্চিত হওয়া গেলো না।

এদিকে বেলা পড়ে আসছে দ্রুত পিন্টুদের ভেতরে ভয়ানক অস্ত্রিতা, দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছানো দরকার। মেজরের দরজিকে দেখলাম, তিনিও অস্ত্র হয়ে উঠেছেন। এই রুকম অস্ত্রিতা আর অস্থিতিকর অবস্থার ভেতরেই বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি অবশেষে পৌছেন গেলো। এখান থেকে টোকাপাড়ার দূরত্ব কোয়ার্টার মাইলের মতো।

— একজন মুক্তিফৌজ মারা গেছে, সামনে থেকে ধাবমান একজন মানুষ উত্তোজিতভাবে চিৎকার করে ওঠে হঠাৎ।

— মুক্তিফৌজ মারা গেছে? কে মারা গেছে? কী নাম তার?

— জানি না।

আমাদের ভেতরে অস্ত্রিতা তখন চরম। একটা ভাব বিহুল অবস্থা চূড়ান্তভাবে দখল করে বসলো। তবু মাথা ঠিক রাখতে হবে। একটা বাঁশের সাঁকো সামনে। যার ওপারেই বাংলাদেশ। মেজরকে ফেলে রেখে আমি আর আহিনীর উর্ধ্বরুসাসে বাঁশের সাঁকো পার হয়ে দৌড়ে ছুটলাম। বুকের ভেতরে হাতুড়ির অস্ত্র পিটুনি, একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে! কে সে? পিন্টু কি? মোটাসোটা ভারি শরীরের ছেলে পিন্টু। ওতো দৌড়তে পারে না খুব একটা। নিহত একজন কি ও-ই?

হ্যা, পাওয়া গেলো। আকাশের দিকে মুখ করে অন্ড, স্থির শুয়ে আছে। একটা গামছা দিয়ে মুখ আর শরীরটা ঢাকা। কাছে ঝুকে এক বটকায় গামছাটা সরিয়ে ফেললাম। গোলাম গটুস। সারা বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুলেটের আঘাতে আঘাতে।

পেটের মধ্যে চার্জ করা হয়েছে বেয়ানেট। বাঁ হাতের দুটো আঙুল নেই। রক্ত আর রক্ত। ওর সারাটা শরীর রক্ত, ঘাস আর বালিতে একাকার। এই কিছু আগেকার গোলাম গড়স এখন মরে পড়ে আছে। ওর সৃষ্ঠাম সৃষ্ঠী দেহ রক্তে মাখামাখি, নিষ্পন্দ আর বিকৃত। বিশ্বাস হতে চায় না এই সেই আমাদের গোলাম গড়স। ক'জন মানুষ ওর লাশটা ঘিরে বসে আছে। দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ। সবাই মাথা অবনত। চূপচাপ, মুখে কথা নেই কারো। হঠাতে আমার ঘেনো কী হলো! সবকিছু মুহূর্তে গুলিয়ে গেলো। মাথার মধ্যে শুরু হয়ে গেলো একটা ওলোট- পালোট ব্যাপার। অনেকটা সহিং হারানো অবস্থায় নিখের গড়সের মাথার কাছে বসে পড়লাম। ওর রক্তভেজা মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর কেবে উঠলাম দুকরে। সারাদিনের উৎকষ্টায়, আক্রান্ত ছেলেদের সাহায্য করতে না পারার ব্যর্থতা, প্রিয় সহযোগী গড়সের এই নৃৎস্য মৃত্যু সবকিছু মিলিয়ে একটা দমিত কান্নার দমক ফুঁসে উঠে আমাকে ভাসিয়ে নিতে থাকলো। আমার পাশে আহিদার। সেও কাঁদছে অবোরে। গড়সের মৃত্যু মুখ, ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বৃক্খানা আমি কোলে তুলে নিয়ে পাগলের মতো কেবল বলে চলেছি, তুই মরে গেলি গড়স, চলে গেলি এভাবে, আমিই তোকে দিয়ে গিয়েছিলাম এখানে, মরার জন্য আমিই দায়ী। হঠাতে কী হলো। চারপাশে দাঁড়ানো লোকজনের জটলা দেখে অস্বীকৃত মাথায় চড়ে গেলো। টেনগান বাগিয়ে ধরলাম ওদের দিকে, আর উন্মুক্ত মুখে বলে চললাম, ইউ বাটার্ড, ইউ আর দ্য কিলার, ইউ ইনভাইটেড এন্ড ব্রিফেড পাক আর্মিজ আপ টু হেয়ার, আই স্যাল স্যাট ইউ, এভরিবডি ... আছিমন্তে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। আমার গলায় তখনো একই কথা, এদের জন্যই গোলাম গড়স মরেছে, এরাই ডেকে এনেছে ওদের।

মেজর দরজি একজন সুবেদারকে পাঠিয়ে ওপার থেকে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাঁশের সাঁকেট এপারে বাংলাদেশ। তিনি সীমান্ত পার হন নি। হবেন না। আমি চিকিৎসা করে তখন তার উদ্দেশে বলে চলেছি, মেজর সাহেব আপলোগ ইধার আতে নেই কিউ? ডরতে হ্যায়? আপ সাপোর্ট নেই দিয়া। বোলা থা আপলোগ সব কুছ সাপোর্ট দেগা, আপ হামারা পাস রাহেগো। মাগার আপ কুস নেই দিয়া . . . অঙ্ককারের ঘনায়মান ছায়ায় আমার সেই প্রায় সহিং হারানো চিকিৎসা শুনেও মেজর দরজি দাঁড়িয়ে থাকলেন। কাছে এলেন না, বললেনও না কিছু। আমার অবস্থা দেখে সুবেদারও আর কিছু বললো না। হ্যাঁ, এটাই বাস্তব, গড়স মারা গেছে! কিন্তু পিন্টু কই? মোতালেব, খলিল, একরামুল, অন্যরা? ওদের অবস্থাও কি হয়েছে গোলাম গড়সের মতো?

টোকাপাড়া ক্যাম্পের কমান্ডার পিন্টু এলো কিছুক্ষণের মধ্যে। জামাকাপড় ভেজা, কাদামাটিতে মাখামাখি। বিধ্বস্ত তার অবস্থা। টলতে টলতে এলো ক্যাম্পের পেছনের যে ডোবা তার এলো পানিতে সমস্ত শরীর ডুবিয়ে রেখে সে কোনোমতে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ওদের মৃত্যু থাবা থেকে বাঁচতে পেরেছে। তার সামনে দিয়ে মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে ঘোরাঘুরি করেছে শক্রু। তবু পিন্টুর অঙ্গিতু টের পায় নি।

বেঁচে গেছে ও। টলতে টলতেই ছুটে এসে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো পিট্ট। শব্দ করে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেঁচে থাকা অন্য সদস্যরাও এসে গেলো। সঙ্কের মধ্যেই হিসেব মেলানো গেলো। একজন মৃত। একজন মিসিং। পঁচিশ জনের মধ্যে অলৌকিকভাবে তেইশজন বেঁচে আছে। সমস্ত ক্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। হাতিয়ারপত্রের অধিকাংশই খোয়া গেছে।

— আমরা গউসকে চাউলহাটি নিয়ে যাবো।

— নো, নেই।

— কিউ? হামলোগ জরুর লেগা।

— নো, দিস ইজ মাই অর্ডাৰ। ইউ বারি হিম হেয়াৰ।

হ্যাঁ, এটা যুদ্ধের সময়। আমরা সকলেই দেশের জন্য যুদ্ধ করছি। কিছুক্ষণ আগেই একজন মারা গেছে আমাদের। এটাই এখনকার বাস্তবতা। মেজের দরজি আমাদের দেশের অফিসার নন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার তিনি। যুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করছে। ভারতীয় বাহিনীর তরফ থেকে তিনি এসেছেন আমাদের পরিচালনার জন্য। আমরা তার অধীনে, তাদের দেশে তাদের সাহায্য এবং দয়ার ওপর রয়েছি। তিনি এখন আমাদের কম্বিং অফিসার, তার কমান্ড আমাদের মানতেই হবে। সুতৰাং এখনেই গউসকে কুর্স দিতে হবে। ওকে আমরা ভেতরে ভারতীয় এলাকায় আমাদের চাউলহাটি ইউনিট বেস হেডকোয়ার্টারে নিতে পারবো না।

রাতের ঘন কালো অক্কারে আমরা জ্বালাতেক ছায়ার অবয়ব নিয়ে সকলেই বসে আছি। বাকহীন চুপচাপ এক একটাইটিরাট শোকের পাথর যেনো প্রত্যেকের বুকের ওপর চেপে বসে আছে। মকতু শিখ কোদাল চালাচ্ছে। মাটির চাপ তোলার ছপ্ছপ্ শব্দ উঠছে তার কোদালের প্রাণটি কোপের সঙ্গে। আমাদের কারুর মুখে কোনো কথা নেই। কেমন একটা ভূতির ভাব এসে যেনো সমস্ত পরিবেশটা ঢেকে দিতে চাইছে। উচু গড়টার এপারে ভারতীয় অংশে ঠিক গড়ের নিচে পরিখাটার ধারে খোড়া হচ্ছে শহিদ গউসের কবর। গড়ের ওপরে বসানো রয়েছে পাহারা। পাকবাহিনী ফিরে গেছে, কিন্তু একেবারে চলে গেছে কি না, জানা যায় নি। যদি আবার ফিরে আসে? এমন একটা আশঙ্কার ভেতরেই ভুতুড়ে অক্কারে গোলাম গউসের কবর খুঁড়ছে মকতু মিয়া। মেজের দরজি উপস্থিতি। তিনিও কোনো কথা বলছেন না। মাথা নিচু করে অক্কারের ছায়ার তিনিও বসে আছেন আমাদের পাশাপাশি ঘাসের ওপর। ধীরে ধীরে গাঢ় অক্কার ঘিরে ধরছে আমাদের। গউসের লাশ সামনে নিয়ে আমরা বসে আছি। ছপ্ছপ্ শব্দ তুলে মকতু মিয়া তখনো কবর খুঁড়ে চলেছে একগু মিঠায়। আমাদের কানে এখন শুধু সেই শব্দই ধ্রনিত।

গোসল হলো না, কাফন হলো না, জানাজা হলো না, ধূপধূনো জুললো না, গোলাপ জল ছিটোনো হলো না, বিউগল বাজলো না, গান স্যাল্ট হলো না, আমরা কেবল একটা সাড়ে তিন হাত গর্তে তাকে শুইয়ে দিলাম। ঢেকে দিলাম তারই রক্তজেজা গামছাটা দিয়ে শহিদ গোলাম গউসের মরদেহ। তারপর হাত তুলে শুধু

মোনাজাত করলাম। মেজর দরজি আমার পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁকেও দেখলাম হাত তুলতে।

রাতের অক্ষকার আরো ঘনীভূত হলো। আমরা ফিরে চললাম। চাউলহাটি ইউনিট বেসের প্রথম ক্যাজুয়েলটি, শহিদ গোলাম গড়স। রংপুরের রানীপুরুরের ভরাট সংসারের সাত ভাইয়ের এক ভাই। অসম্ভব সাহসী আর উদ্বাম যুবক গড়সকে এভাবে শুইয়ে রেখে আমরা ফিরে এলাম। ফিরবার সময় বারবার মনের অজানেই বুকের ভেতরে একটা শপথ বাক্য অনুরাগিত হতে থাকলো, গড়স তোকে আমরা ভুলবো না। আমরা এর প্রতিশোধ নেবোই। দেশ স্বাধীন হলে আমরা বারবার ফিরে আসবো তোর কাছে। এখানে আমরা তোর জন্য অনুপম একটা স্মৃতিসৌধ গড়ে তুলবো। কতো মানুষ এখানে আসবে। ইতিহাসে তোর বীরত্বগাথা লেখা থাকবে। দেশ তোকে মনে রাখবে। জাতি তোকে মনে রাখবে। আগামী প্রজন্ম স্বরণ করবে তোকে গর্বের সঙ্গে।

চাউলহাটি বিওপিতে খবর পৌছে গেছে ততোক্ষণে। খবর পেয়ে সেন্টর কমান্ডারসহ ছেটোবড়ো ১৫/২০ জন ভারতীয় সেনা অফিসারও এসে উপস্থিত। দরজিসহ সকলে মিলে ফিরে এলাম চাউলহাটিতে। রাত নটার মতো তখন। এসে দেখলাম কর্নেল সাহেব তাঁবুর মধ্যে মিটিং-এ বাসেছেন আর্থার অগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের। তাঁবুর ভেতরে টিমাটিমে অবস্থার কর্নেল কথা বলছেন বড় ভাই আর অন্যদের সঙ্গে। মেজর শংকর এক ক্রেতেজাথা নিচু করে বসে আছেন। কর্নেল সাহেব জানতে চাইলেন ঘটনা। বড় ভুঁচি ভুল হক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে এলোমেলো করে ফেলতে লাগলেন হাতেকছু। কর্নেল তাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বলো, ইউ টেল অপিস্ট্য ডিটেল্স। আমি বললাম আদ্যোপাত্ত সমষ্ট ঘটনা। প্রচণ্ড একটা রাগ তুম্বও আমার মন পুরোপুরি বিষয়ে রেখেছিলো। শেষের দিকে তার বহির্ব্রকাশ ঘটেছে, স্যার, ইউ সেন্ট আস দেয়ার ফর কিলিং, ইউ প্রমিস্ড আস ফর গিভিং সাপোর্ট, বাট ইউ ডিড নট কিপ ইউর কমিন্টমেন্ট। ইফ ইউ উড প্রভাইড আস সাপোর্ট, দেন উই কুড নট গেট সাচ ম্যাসাকার, গোলাম গড়স উড নট গেট কিলড। কর্নেল সাহেব হাসলেন আমার উন্তেজনা দেখে। সৈনিক জীবনে এ ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা তার হয়তো নতুন নয়। দীর্ঘ সৈনিক জীবনে এ ধরনের ঘটনা তিনি অনেক দেখেছেন। তাই এগিয়ে এসে তিনি কাঁধে হাত রাখলেন আমার। বললেন, মাই বয়, ডোন্ট ওরি। সাম হ্যার দেয়ার ওয়াজ এ গ্যাপ। সাম মিসটেক হো গেয়া, হাউ এভার, ইন ফিউচার ইট উইল নেভার রিপিট এগেন। রিয়েলি উই আর সরি। উই আর সরি ফর ইউর লন্ট ফ্রেন্ড। ডোন্ট ওরি মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, সব ঠিক হো যায়গা, হাম লোগ তুমহারা সাথ হ্যায়, ইউ স্যাল মাট্ট টেক রিভেঞ্জ ওভার দেম।

এরপর ইউনিটের সব ছেলেকে ফল-ইন করানো হলো। কর্নেল সকলের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন হিন্দিতে। বড়ো ভাই সেটা বাংলায় তরজমা করতে লাগলেন। তোমরা যুক্ত করছো। পাকিস্তানি বাহিনী তোমাদের ভুখও জবরদস্ত করে রেখেছে। দেশের মধ্যে তারা ধ্রংস্যজ্ঞ চালাচ্ছে। তোমরা

স্বাধীনচেতা ছেলে। মাতৃভূমির ডাকে তোমরা যুদ্ধ করার জন্য এদেশে চলে এসেছো। এখানে আমরা তোমাদের টেনিং দিয়েছি। অন্ত দিয়েছি, গোলাবারুদ দিয়েছি, রেশন দিয়েছি, অশ্রয় দিয়েছি। তোমরা যুদ্ধ করছো তোমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য। আমরা তোমাদের সাহায্য করবাই। একটা জাতিকে কেউই দাবিয়ে রাখতে পারে না। দখল করে রাখতে পারে না, সে যতো শক্তিশালীই হোক না কেনো। আজ তোমাদের এক বদ্ধ মারা গেছে। আর একজন মিসিং। রক্ত, ত্যগ আর শাহাদতের বিনিয়োগেই তো একটা জাতির স্বাধীনতা আসে। তোমরাও আজাদি পাবে। দেখো, তোমাদের দেশ একদিন স্বাধীন হবেই। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও। একজনের মৃত্যুর জন্য তোমরা ঘাবড়ে যেও না, থেমে থেকো না, আমরা সব ধরনের সাহায্য দিয়ে তোমাদের সাথে আছি। জয়বাংলা।

কর্নের সাহেব তার দলবল নিয়ে চলে গেলেন। দরজি রইলেন। তাঁরুতে ফিরলাম বিষ্ণুস্ত আর নিঃশেষিত শক্তি নিয়ে টলতে টলতে। গড়িয়ে পড়লাম ঘাসের ওপর পাতা প্রিয় ভূমিশয়্যায়। পাশের তাঁরুতে তখন রেডিওতে আকাশবাণীর খবর হচ্ছে। দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় নিউজ পড়ছেন। আজ ভেতরগড়ের টোকাপাড়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকবাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের নিজেদের ভুল বোঝাবুঝির জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে।

আকাশবাণীর নিউজ মুক্তিযোদ্ধাদের ভুলের জন্য আজকের এই ম্যাসাকার হয়েছে। কোথায় পেলো তারা এই তথ্য? হার্মানস্টুক আর যুদ্ধের খবরের এই বিকৃত পরিবেশনা!

টোকাপাড়ার যুদ্ধ

আসলে সেদিন টোকাপাড়া ক্যাম্পে কি ঘটেছিলো তার নেপথ্য ঘটনার বিবরণ এবার দেয়া যাক।

টোকাপাড়ায় ক্যাম্প স্থাপনের চতুর্থ দিন। বাইরে রৌদ্রকরোজ্বল ঝকমকে আকাশ। বেশ ভালোভাবে শুরু হয়েছে দিনটি। সকালের মাস্তাশেষে সেদিনকার পরিকল্পনা নিয়ে বসেছে পিটু, গাউস আর আহিদার। রাতের পেট্রল খবর নিয়ে এসেছে। না, আশপাশের অবস্থা ভালো। শক্তর আনাগোনার কোনো সংবাদ নেই। কিন্তু আহিদার ছটফট করছে। পরিকল্পন বৈঠক শেষ হলেই সে মোটর সাইকেল নিয়ে বের হবে। উদ্বাম গতি নিয়ে মোটর সাইকেল চালানোর ভেতর দিয়ে ও পেয়ে থাকে এক রোমাঞ্চকর আনন্দ। সেদিনও ভেতরগড়, সর্দারপাড়া এবং আশপাশের এলাকা থেকে প্রতিদিনকার মতো কিছু লোকজন এসেছে। প্রত্যোকেই কিছু না কিছু নালিশ, অভাব-অভিযোগ আর সহস্যার কথা শুনতে হচ্ছে। বর্তমানে দেশে প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকার ব্যবস্থা নেই। হানীয়ভাবে সরকারি প্রশাসন নেই। নেই হানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের অঙ্গত্ব। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান-মেষ্টার, যাদের কাছে মানুষ তাদের বিচার-সালিশ ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত হাজির হতো, তারাও ছিটকে পড়েছে এদিকে-সেদিকে। কেউ চলে গেছে পঞ্চগড় এলাকায় পাকিস্তানের

পক্ষে তাদের বিশ্বস্ততা ঘোষণা করে : পাক আর্মির নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই এখন তাদের বসবাস। আর যাদের গায়ে আওয়ামী লীগ কিংবা জয়বাংলার গদ্দ, তারা প্রাণ ভয়ে চলে এসেছে সীমান্তের এপারে। এখন তারা শরণার্থী শিবিরের অধিবাসী, অথবা দূর সম্পর্কের কোনো আঞ্চলিক বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী, দীর্ঘদিনের ব্যবধানে যাদের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক ছিলো না।

—ভেতরগড় এলাকাটা মোটামুটি মুক্তাঙ্গল হিসেবেই গড়ে উঠেছে আমরা আসবার পর থেকে। পাকিস্তান সরকারের কোনো প্রশাসন ব্যবস্থাই এখনে কার্যকর নয়। এখন এ অঞ্চলের প্রশাসন চলে এসেছে অলিখিতভাবে আমাদের হাতেই। টোকাপাড়ায় ক্যাম্প স্থাপনের পর স্থানীয় মানুষজন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতের কাছে পেয়ে বলা যায় কিছুটা স্বত্ত্ব ফিরে পেয়েছে। তাই প্রতিদিনই কিছু না কিছু মানুষ আসছে পিন্টু-আহিদারের কাছে তাদের নানাবিধ সমস্যা আর অভাব-অভিযোগ নিয়ে। পিন্টুদের এগুলো শুনতে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমাধানও দিতে হচ্ছে। এটা ওদের জন্য অতিরিক্ত একটা ফালতু কাজই। যুক্তের মাঠে যোদ্ধাদের জন্য স্থানীয় সমস্যা, বিচার-আচার, সালিশ ইত্যাদির সাথে জড়িত হওয়া একেবারেই বারণ। তাতে করে যুক্তের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হওয়ার সঙ্গাবনা থাকে। সচিত্তয়ে থাকে নানাবিধ সমস্যা, যুক্তের মাঠে বা একটা সৈন্যদলের জন্য এটা একেবারেই অনভিপ্রেত ব্যাপার। কিন্তু পিন্টু-আহিদারারা এ জাতীয় ব্যাপারগুলোকে তেমন জেয়াকাই করে নি।

সেদিনও পালা করে ওরা ক্যাম্পে অবস্থিত মানুষদের নালিশ ইত্যাদি আর অভাব-অভিযোগ শুনছিলো। মোতালেব প্রজেন্টেনকার মতো তার এল.এম.জি নিয়ে ব্যস্ত। কয়েকজনকে সঙ্গে করে যে ওদের হাতিয়ারগুলো পরিষ্কার করছে। তেল দিচ্ছে। পুল ফ্রি মারছে হাতিয়ারের লঙ্গুলো পরিষ্কার চক্চকে রাখার জন্য। ওদিকে লঙ্গরখানার কমান্ডার দুপুরের আহারের জন্য রান্নাবন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। একটা ঢিলেচালা দিন। অলস নিষ্কাশনে পরিবেশ ওদের সকলের জন্য। এরি মধ্যে একটা খবর এসেছিলো কিন্তু ওরা সেটা গায়ে মাথে নি। খবরটার প্রতি সামান্য গুরুত্ব দিলে হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারতো পুরো ব্যাপারটা। কমান্ডার হিসেবে আহিদার-পিন্টু এখানেই ভুল করেছিলো। যুক্তের মাঠে প্রতিটি সংবাদই গুরুত্ব দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। অনেক উভো খবর আসতে পারে। গুজবের সৃষ্টি হতে পারে। সেসব কিছুর সত্যতা নাও থাকতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সৈনিক-কমান্ডারদের কোনো কিছুই উভিয়ে দিতে নেই। দিলে বিপদের সমূহ সঙ্গাবনা থাকে। বেসামাল অবস্থায় পড়তে হয় গোটা দলকে।

ভাটপাড়া থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে নেয়ার আগের দিন মালেককে পাঠিয়েছিলাম আমি পঞ্চগড় শহরে। উদ্দেশ্য, তালমা ত্রিজ থেকে শুরু করে পুরো পঞ্চগড় শহর এলাকায় পাক বাহিনীর বিভিন্ন অবস্থানের নিখুঁত একটা চির নিয়ে আসবে সে ভালোভাবে রেকি করে। ১৫/১৬ বছর বয়সী ছোটখাটো ছেলে মালেক। কিন্তু দুর্দান্ত সাহস ধরে বুকে। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতেও জানে। আমাদের তুলনায় নিভাস্ত বাস্তাই বলতে হবে মালেককে। এমনিতে কেউ তাকে দেখলে ভাবতেই পারবে না ও একজন এফ.এফ। সেই

মালেককে পঞ্চগড় পাঠানোর প্রস্তাৱ দিতেই সে সানন্দে রাজি হয়েছিলো। তাৱ সঙ্গী হিসেবে দেয়া হয়েছিলো রাখালদাৰ বাড়িতে আশ্রয় নেয়া পঞ্চগড় সুগাৱ মিলেৱ চাকুৱে মনিৱ মো঳াৱ ছোটো ভাই পারভেজকে। তাদেৱ আঞ্চলিক পঞ্চগড়ে থাকায় এইৱেকম অবস্থায় পারভেজ মাৰো-মধ্যেই পঞ্চগড় চলে যেতো। সিদ্ধান্ত হলো, মালেক যাবে পারভেজেৱ সাথে। ধৰা পড়লে পারভেজ তাকে আঞ্চলিক বলে ম্যানেজ কৰবে। প্ৰয়োজনে পারভেজেৱ আঞ্চলিক বাড়িতে মালেক দু'চাৰদিন থাকবেও।

সময় এবং সুযোগ মতো মালেক একদিন তালমা ব্ৰিজ পাৱ হয়ে সবকিছু দেখতে দেখতে পঞ্চগড় শহৱে গিয়ে পৌছুল। পারভেজেৱ আঞ্চলিক বাসায় থেকে সবকিছু ঘুৱে ফিৰে দেখে, পাকবাহিনীৱ সমৰ শক্তি আৱ অবস্থানগুলোৱ একটা ছবি মনেৱ মানচিত্ৰে ঢঁকে নিয়ে চারদিনেৱ মাথায় দিবিয় ফিৰে এলো। সৱাসিৱ চাউলহাটি না এসে সে হাজিৱ হলো টোকাপাড়ায়। জৰুৱি যে খৰৱটা সে শুনে এসেছে পঞ্চগড় থেকে, সেটা পিন্টু আৱ আহিদাৱকে জানানোৱ প্ৰবল তাগিদেই দ্রুত পা ফেলে চলে এসেছে টোকাপাড়া পৰ্যন্ত। পিন্টু, আহিদাৱ আৱ গড়সকে একপাশে ডেকে নিয়ে সে তখন তখন শোনালো সেই খৰৱটা। পঞ্চগড়ে থাকতে সে শুনেছে, পাকবাহিনী শিগ্গিৰই টোকাপাড়া আক্ৰমণ কৰবে। পঞ্চগড়ে পাকবাহিনীৱ অবস্থানগুলোৱ বৰ্ণনা দেয় সে মাটিতে দাগ কেটে কেটে। তাৱপৰ বলুন পিন্টু ভাই, আহিদাৱ ভাই শোনহকে কেলে, মুই আসিবাৱ সময় শুনিনু প্ৰাহাৰা কহছে, খানেৱা টোকাপাড়া আক্ৰমণ কৰহিবে, তোমহারা রেডি থাকেন এন্ডুকো যখন তখন আসিবাৱ পাৱে।

পিন্টু আৱ আহিদাৱ কথাটা সহজে বিশ্বাস কৰতে চায় না। পাকবাহিনী এতো ভেতৱে আসবে, একেবাৱে ভাৰতীয় স্বামাত্ৰেৱ ওপৰ, পঞ্চগড় থেকে অমৱালা, সেখান থেকে টোকাপাড়া—এ স্বতন্ত্ৰনীয় ব্যাপার। তা ছাড়া, এতো ভেতৱে এলৈ পেছন থেকে তাদেৱ কাট্টুন্তুকৰে দিয়ে একেবাৱে বিছিন্ন কৰে ফেলা যাবে। অমৱালা এবং চাউলহাটি থেকে দ্রুত সাপোৰ্ট এসে তাদেৱ পেছন থেকে কাট কৰে দিয়ে একেবাৱে দেৱাওয়েৱ মধ্যেও ফেলা যাবে। এতো বড়ো রিঙ্ক পাক আৰ্মি কি নেবে? পিন্টু-আহিদাৱেৱ ধৰণা, এটা স্বেচ্ছ একটা গুজৰ। তাৱ তাদেৱ স্বাভাৱিক কাজকৰ্ম চলে যায়। মালেক থেকে যায় টোকাপাড়ায় তাৱ বস্তুদেৱ সাথে রাত কাটাৰে বলে। পারভেজকেও থাকতে হয় সেই সাথে।

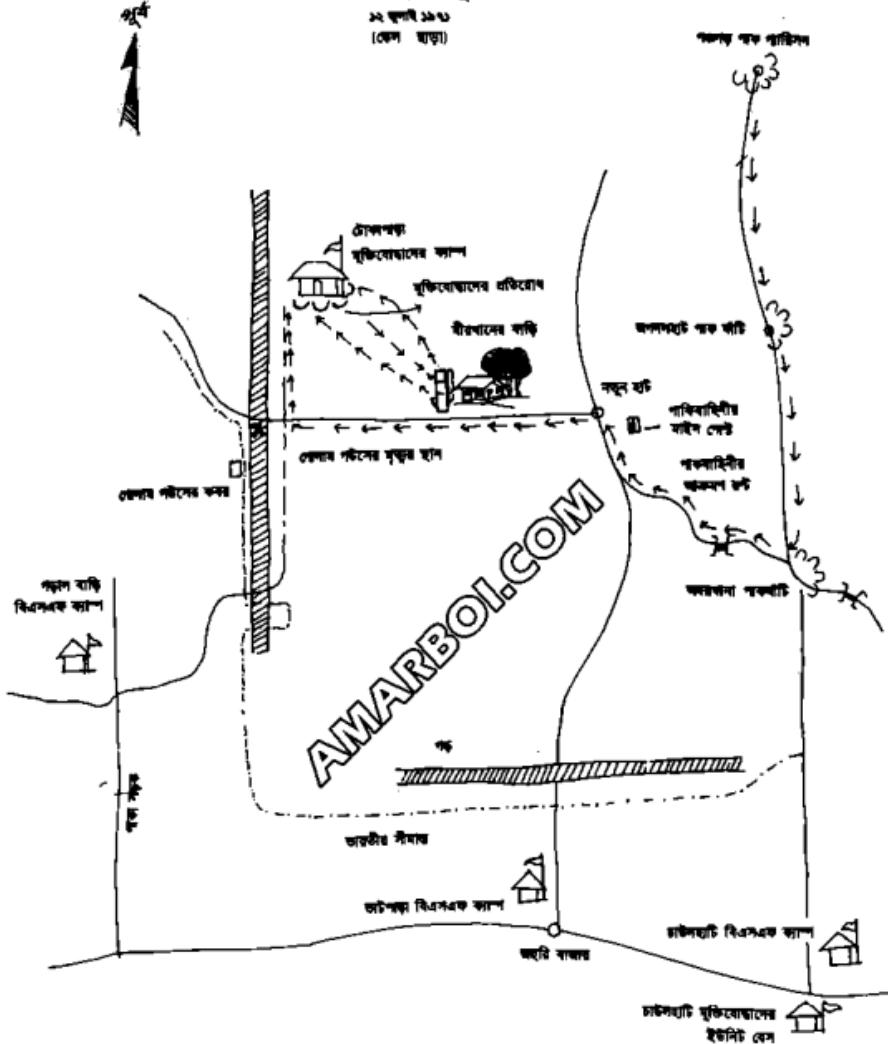
বেলা একটাৱ দিকে হঠাৎ কৰে ভেতৱগড় এলাকা থেকে শোৱগোল ভেসে আসে। ক্যাম্পেৱ ছেলেদেৱ জন্য তখন মধ্যাহ্ন ভোজেৱ আয়োজন চলছে। আহাৱেৱ থালাবাটি নিয়ে বসা হলো না আৱ ওদেৱ। ভেতৱগড় এলাকা থেকে লোকজনদেৱ উদ্ভাৱেৱ মতো দৌড় দিয়ে আসতে দেখলো ওৱা। পিন্টু-আহিদাৱ-গড়স দৌড়ে এলো ক্যাম্পেৱ বাইৱে। মকতু মিয়া আৱ মতিন দৌড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে পৌছে গেলো ক্যাম্পেৱ সামনে।

— কী হয়েছে?

— পিন্টু ভাই খান সেনা ... এক হাজাৱ ... আসতে আছে ...।

— কোন্দিকে আসছে? আহিদাৱেৱ হতচকিত প্ৰশ্ন।

ক্ষেত্র নং-১
টোকাগাঁড়ার যুক্ত
২৫ মিটার ১১৩
(কেল রাজ্য)



— এনিকেই, টোকাপাড়ার দিকেই।
— কতোজন ওরা? কী কী হাতিয়ার আছে?
— অনেক অনেক ... হাজার হবে ... কামান-মেশিনগান-চাকাওয়ালা গাড়িতে
আরো কি কি আছে!
— দেখেছিস তুই?

— হ্যাঁ দেখেছি, আমাদের বাড়ির কাছে এসে গেছে। বলেই মতিন হাঁফাতে
থাকে।

ততোক্ষণে বহু নারী-পুরুষ উর্ধ্বাসে গড়ের দিকে দৌড়তে দৌড়তে আসছে।
চারদিক থেকে ভেসে আসছে প্রচও শোরগোল, চিৎকার, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকির
উচ্চনাদী শব্দ। ক্যাম্পের ভেতরেও তখন লেগে গেছে দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি,
হটোপুটি। মুহূর্তে ছাড়িয়ে পড়লো ভীতি, ক্যাম্প আক্রান্ত হতে যাচ্ছে, শুরু আসছে
প্রচও শক্তি নিয়ে। কিছুক্ষণ আগেও যা ছিলো ভাবনার অভীত, এখন তা কঠিন
বাস্তব। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতচকিত, বিশ্বচ, হতভস্ব। অবশ্য সেটা মাঝ
কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত। উদ্যুক্ত শক্তিকে মোকাবিলা করার মরণপণ তাগিদে ভয়-
বিহ্বলতা কাটিয়ে সবাই সামনে যা পেলো, তাই নিয়ে ত্রৈরি হয়ে পড়লো। শক্তিকে
কোনোমতই ক্যাম্পে আসতে দেয়া হবে না। ওদের প্রত্যেকেই করতে হবে যে করেই
হোক। মাঝ সামান্য ক'টা অস্ত্র। ছেলেরা মেঝেভাই হাতে তুলে নিলো। দ্রুত
সলাপরামর্শের কাজও সম্পন্ন করে ফেলেনোঁ ওরা দাঢ়িয়ে দাঢ়িয়েই। আবতার,
একরামুলসহ ৪ জন যাবে সোজাসুজি প্রাইকেতের ভিতর দিয়ে, ওরা এগিয়ে গিয়ে
যাইরখানের বাড়ির সামনে দিয়ে অস্ত্র-শক্তিদের অগ্রাভিয়ান রোধ করবে। গোলাম
গড়স টেনগানটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে দুটো গ্রেনেড কোমরে গুঁজতে গুঁজতে নিজের
সিদ্ধান্ত নিজেই নেয় এই বৃক্ষে আমি পারভেজকে নিয়ে এগুচ্ছ। আমরা ভেতরগড়-
টোকাপাড়া রাস্তার বাঁকে ঝামবুশ করবো। ওখান থেকেই বাধা দেবো খানদের।
মোতালেব এল.এম.জি নিয়ে সামনের বাকারে থাকবে। যাদের হাতিয়ার নেই, তাদের
কাছে থাকবে গ্রেনেড। যতোগুলো সম্ভব গ্রেনেড তারা সাথে রাখবে। কথা হলো,
যতোক্ষণ জীবন থাকবে, ততোক্ষণ হাতিয়ার সচল থাকবে। যতোক্ষণ গুলি থাকবে,
ততোক্ষণ খান সেনাদের দখল করতে দেয়া হবে না ক্যাম্প।

চাউলহাটি ইউনিট বেস হেডকোয়ার্টারে খবর পৌছানো দরকার। শংকরকে
জরুরি মেসেজ পাঠানো দরকার। দ্রুত সাহায্য দরকার। পাক বাহিনীর ওপর এখনুনি
পেছন থেকে কভারিং ফায়ার দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে আটকানো যাবে না
তাদের। টিকিয়ে রাখা যাবে না ক্যাম্প। আহিদার একটা সাইকেল নিয়ে তাই দ্রুত
বের হয়ে গেলো। পিন্টুর ওপরই তখন এককভাবে ক্যাম্পের যাবতীয় দায়িত্ব এসে
পড়লো। দ্রুততার সঙ্গে সব সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। কোনো কিছু তলিয়ে দেখার সময়
নেই। ঠিক এই অবস্থায় ক্যাম্পের সামনে দুটো গোলা এসে পড়লো। অর্থাৎ পাক
বাহিনী ক্যাম্পের আওতার মধ্যে পৌছে গেছে।

একরামুল, আবতার দ্রুত পাটক্ষেতের দিকে ছুটে গেলো। গড়স পারভেজের

হাতে একটা গ্রেনেড ধরিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে তার নির্ধারিত অবস্থানে চলে গেলো। মোতালেব তখন বাস্কারে তার এল. এম.জি নিয়ে প্রস্তুত। পিন্টু স্টেনগান হাতে তার পাশে। সকলের স্বামূর ওপরই প্রচও চাপ। দিনের আলোতে শক্র আসছে তাদের অমিত শক্তি নিয়ে। এখন তাদের জন্য অপেক্ষার পালা। মেজের শংকর কি ব্যাপারটা টের পান নি? চাউলহাটি ইউনিট বেসের ওরা কী করছে? পাক আর্মি ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে অমরখানা হয়ে ভেতরগড় দিয়ে একেবারে প্রত্যন্ত এলাকার টোকাপাড়া ক্যাপ্সের দিকে ধেয়ে আসছে, ব্যাপারটা কি অমরখানা ও চাউলহাটিতে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা ভারতীয় বাহিনী জানতে পারে নি? ওরা বসে আছে কেনো চৃপচাপ? কেনো কভারিং ফায়ার আসে না? কেনো আর্টিলারি মর্টারগুলো গর্জে উঠছে না দ্রুত আগুয়ান পাকবাহিনীর উদ্দেশ্যে? মোতালেবদের পাশে দাঁড়িয়ে পিন্টু অস্থির হয়ে ওঠে। মাথার মধ্যে চলতে থাকে তার নানা এলোমেলো ভাবনার প্রচও ঝড়োচ্ছস।

শুরু হলো অবশ্যে। ক্যাপ্সের একেবারে সামনেই দুটো মর্টারের শেল সশঙ্কে বিস্ফোরিত হলো। সেই সাথে বর্ষিত হতে থাকলো আর্টিলারির সিঙ্গ পাউভারের গোলা। একটার পর একটা সেগুলো বিস্ফোরিত হচ্ছে। পড়ছে ক্যাপ্সের সামনে, আশপাশে এসে। প্রচও শব্দ তুলে। একসাথে সব রকমের হাতিয়ার থেকে ফায়ার ওপেন করেছে ওরা। ক্যাপ্সের ওপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে যেতে লাগলো বুলেটবৃষ্টি। দুটো শেল পড়লো ক্যাপ্সের মধ্যে। একটা তাঁবুতে ধরে গেলো আগুন। ধোয়া, বালি আর বারুদের গঁকে আজ্ঞন হয়ে পিঙ্গো ক্যাপ্সের ভেতরকার পরিবেশ।

আখতার-একরামুলের ফ্রাপ্টা পাটক্ষেতে পার হয়ে একটা জুতসইমতো জায়গায় তাদের অবস্থান নিয়েছে তখন হাতের পাকবাহিনীর প্রচও গোলাগুলি চলছে বিরামহীনভাবে। তাদের মাথার ওপর দিয়ে ভীতিকর শব্দ তুলে তুলে শেলের ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে টোকাপাড়ার দিকে। ওরা পজিশনে গিয়েই আগুয়ান পাকবাহিনীর দিকে তাদের রাইফেল তাক করে গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয়। কিন্তু কয়েক রাউণ্ড গুলি ছোঁড়ার পরপরই ওরা নিশ্চিত টাগেট হয়ে যায় শক্র বাহিনী। তখন শত সহস্র গুলির ঝাঁক আসতে থাকে তাদের পজিশন লক্ষ্য করে। সেই গুলির তোড়ে ভেসে যাওয়ার মতো অবস্থায় ওরা পাটক্ষেতের মধ্যে পিছু হটে আসে। এবার চোখের সামনে ওরা দেখতে পায় পাকবাহিনীর প্রচও শক্তি নিয়ে এগিয়ে আসবার ব্যাপারটা। ফলে ওদের মনোবল, শক্তি আর সাহস সব হারিয়ে যায়। কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়বার পর তারা আর সাহস পায় না ছিটীয় দফা গুলি ছোঁড়ার। পাটক্ষেতের মাঝখানে মাটিতে বুক মিশিয়ে মড়ার মতো পড়ে থাকে ওরা শুধু ভাবতে থেকে ক্যাপ্সের পরিণতির কথা। পাকবাহিনী মোট তিন সারিতে এগুচ্ছে। অগ্রসরমান শক্রের অস্তিত্ব ওদের কাছে আরো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই এখন দু'চারটে গুলিসহ বা গুলিবিহীন থ্রি নট স্ট্রি রাইফেলগুলোকে ওদের কাছে স্রেফ লাঠির মতোই মনে হয়। পাক আর্মির হাতে হাতে আধুনিক চাইনিজ অক্সিজেন আর সেই সাথে প্রচও ফায়ার পাওয়ার।

গোলাম গড়স অপেক্ষা করছিলো। তারও কাছে ধরা পড়ে পাকবাহিনীর প্রচও শক্তি নিয়ে অহসর হওয়ার ব্যাপারটা। কিন্তু অবধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা জেদে

পেয়ে বসে ওকে । যে করেই হোক, একার শক্তিতেই সে এখানে পাকবাহিনীর গতিরোধ করবে । ধীরে ধীরে সে তার কোমরে গুঁজে রাখা হৈনেড় দুটো বের করে হাতের কাছে রাখে । টেনগানটা উচু মাটির ঢালে রেখে লক্ষ্য স্থির করে বুকের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকে । পাকবাহিনী ততোক্ষণে ফায়ার ওপেন করে দিয়েছে । অবিরাম শেল পড়েছে টোকাপাড়ার আশপাশে । বুলেটবুটি হচ্ছে সমানে । গউসের অবস্থান তখনও নিরাপদ । কিন্তু আসছে ওরা । সম্মুখের রাস্তা দিয়েই আসছে শক্র মূল কলাম । স্থির, নিক্ষেপ মনে গউস তার টেনগানের টিপারে আঙুল রেখে প্রতীক্ষারত । তার টেনগানে গুলি রয়েছে এক ম্যাগাজিন অর্ধাং মাত্র তিরিশটি । একটা পুরো ব্রাশেই তা শেষ হয়ে যাবে । হৈনেড় রয়েছে তিনটা । দুটো তার কাছে । একটা পারভেজের কাছে । শক্রের তরফ থেকে ফায়ার ওপেন হওয়ার পর থেকেই পারভেজ তাগিদ দিচ্ছিলো পালানোর জন্য । চলেন গউস ভাই পালাই । ওদের সাথে পারা যাবে না । চলেন পালাই, দোহাই আপনার ।

... ‘ইউ বাটার্ড’ বলে গোলাম গউস তাকে ধমক লাগিয়ে বলেছিলো, তুমি যাও, তুমি তো সিভিলিয়ান, ফাইটার নও, তুমি ভাগো, পালাও । আমি আজ ওই শালাদের না মেরে যাচ্ছি না ... যাও ... ভাগো ... ।

পারভেজ পেছনে ঝোপের ভেতর দিয়ে একটা পার্মিন্টি খালে নেমে পড়লো । গোলাম গউস তখন তার টেনগান আর দুটো হৈনেড় লিয়ে একা । অবশেষে এলো ওরা । গোলাম গউস দেখল ওদের । টেনগানের টুম্বরে চাপ দিল । দু'বারের ব্রাশেই ম্যাগাজিন শূন্য । একেবারে সামনে থেকে একটি স্লোচমকা গুলি আসায় হতচকিত হয়ে পড়লো আগুয়ান শক্রবাহিনী । তাঙ্কশিপ্পিজুরে মাটিতে বুক লাগিয়ে পজিশনে গিয়ে মাথার হেলমেটকে ঢাল হিসেবে রেখে ওরা বুকে হেঁটে ক্রিং করে এগুতে লাগলো । ওদের একজন ধরাশায়ী হয়েছে চলে গোলাম গউসের অবস্থানের দিকে ঝাঁক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করতে করতে এগতে লাগলো ওরা । গউস মাথা তুলতে পারছিলো না । কিন্তু সেই অবস্থাতেই দাঁত দিয়ে একটা হৈনেড়ের পিন খুলে নিয়ে সেটা সে সম্মুখের শক্রদের সারির মধ্যে ছাঁড়ে মারলো । এবার ধরাশায়ী হলো দুজন । কিন্তু দ্বিতীয় হৈনেড়টা ছেঁড়ার আগেই গুলি খেলো । ডান বাহুতে সোজা ঘাড়ের কাছে গুলিবিন্দি হলো তার । হাত তুলতে পারলো না সে, হৈনেড়টা গড়িয়ে পড়লো হাত থেকে । প্রচণ্ড ব্যথায় সারা শরীর কুকড়ে উঠলো । এর মধ্যেই দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো সে । কিন্তু এক ঝাঁক গুলি এসে তখন ঝাঁঝড়া করে দিয়েছে তার বুক । পড়ে গেলো গোলাম গউস । দ্রুততার সাথে য্যাসোল্ট ভঙ্গিতে ওর কাছে চলে এসেছে ওরা । ওদের মধ্য থেকে একজন ওকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করলো । আর অন্য একজন সে অবস্থাতেই তার পেটে বেয়নেট চার্জ করলো কয়েকবার । তারপর শালে ঘর গিয়া’ বলে ছেড়ে দিলো ওকে ।

ততোক্ষণে মোতালেবের চোখে তার ক্যাপ্সের বাক্সার থেকে পাকবাহিনীর আগুয়ান হওয়ার দৃশ্য পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । হেলমেট পরা মাথা সামনে রেখে একঙ্গে বুনো শুয়োরের মতো এগিয়ে আসছে ওরা । আর দেরি নয় । ফায়ার ওপেন করলো মোতালেব । একজনকে গড়িয়ে পড়তে দেখলো সে । তবু ওদের দমবার নামগন্ধ নেই । এগিয়ে আসছে । বাঁ দিকের তিন নম্বর কলামটাও তখন প্রায় ক্যাপ্সের

একশ' গজের মধ্যে পৌছে গেছে। শেলের বিক্ষেপণের প্রচঙ্গতা, গুলির আর্তনাদ, ধোয়া, বালি, সেই সাথে পোড়া বারুদের গৰ্জ সবকিছু মিলিয়ে এক নারকীয় পরিস্থিতি তখন ক্যাম্পের মধ্যে।

পিন্টু সিন্দান্ত নিয়ে ফেলেছে, বিট্টিট করবে। ক্যাম্পের সবাইকে সে পেছন দিককার পথ ধরে ঝোপঝাড়, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে খালে নেমে ওপারে যেতে নির্দেশ দিলো। মোতালেব চৰম দৈৰ্ঘ্য আৰ অদয় সাহস নিয়ে তখনও একটাৰ পৱ একটা শক্ত টার্ণেট কৰাৰ চেষ্টা কৰছে। কৃষি অবস্থা খারাপ হয়ে উঠতে লাগলো। ওদেৱ অবস্থান থেকে আৰ মাত্ৰ পক্ষঞ্চ গজেৰ মধ্যে ওৱা। শেষে গুলি কটা এক ত্রাশে শেষ কৰে মোতালেব তাৰ প্ৰিয় এলএমজি হাতে বাক্সাৰ ত্যাগ কৰলো। পিন্টু ওকে নিয়ে ক্যাম্পেৰ পেছন দিককাৰ খালেৰ আড়া পাড়েৰ কাঁটা ঝোপঝাড়েৰ মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো। বীভাবে যেনো তাৰা পৌছুলো খালেৰ পানিতে গিয়ে। খালেৰ সেই পচা এণ্ডো পানিতে শৱীৱ-মাথা ভূবিয়ে শুধু শ্বাস-প্ৰশ্বাস নেয়াৰ জন্য ওৱা নাক ভাসিয়ে রাখলো। ততোক্ষণে শক্রবাহিনী ক্যাম্পে পৌছে গেছে। ক্যাম্প চলে গেছে ওদেৱ পুৱো দখলে। একটা বিজাতীয় উল্লাসেৰ ভেতৰ দিয়ে ওৱা প্ৰতিটা বাক্সাৰ চাৰ্জ কৰলো। কাহ্যা মুক্তি... কিধাৰ হ্যায় শালে লোগ... ভাগ... সিয়া... কিউ মাদার ...। ঝোপেৰ আড়ালে ঠিক ক্যাম্পেৰ ঢালেৰ সেই ডোবাৰ পানিৰ মধ্যে নিজেদেৱ নিশ্চল নিশ্চাড় কৰে রেখে পিন্টু কৰুন মোতালেব শুনতে লাগলো বিজয়ী শক্ত বাহিনীৰ উল্লাস আৰ মাতামাতিৰ ছেলেবড়। আৰ এভাৱেই শেষ হলো চোকাপাড়া ক্যাম্পেৰ চার দিনেৰ স্বাধীনতা। পিঙ্গোট ছিলো ১৯৭১-এৰ ১২ জুলাই। গোলাবাকুন্দসহ সব কিছু চলে গেলো শক্রবাহিনীৰ দখলে। ছেলেদেৱ জিনিসপত্ৰ, টাকা-পয়সা সুটোৱ মাল হিসেবে সঙ্গেই নিলো। এৰপৱ ক্যাম্পেৰ তাঁবুসহ সবকিছুতে ধৰিয়ে দিলো আগুন। তন্মতন্ম কৰে বাঁজলৈ মুক্তিদেৱ। প্ৰায় দুটাৰানেক ধৰে এই অভিযান চলাৰ পৱ তাৰা কিৱে চলে গৈলো? তখন বিকেল গড়িয়ে এসেছে। দূৰ থেকে মানুষজন তাদেৱ ফিরে যাওয়া দেখলো। দেখলো শক্ত বাহিনীৰ সদস্যৱাৰা তাদেৱ তিনজন আহত কিংবা নিহত সহযোড়কে বহন কৰে নিয়ে চলেছে।

১২. ৭. ৭১

ৱজ্রকুটদেৱ নিয়ে আবাৱ অভিযান— টার্ণেট হবি মেষ্টাৱ
চোকাপাড়া ম্যাসাকাৱেৰ পৱ ছেলেৱা সাংঘাতিকভাৱে মুৰড়ে পড়েছিলো। তাই তাদেৱ দেয়া হলো ক'নিনেৰ বিশ্বাম। কাজেৰ মধ্যে ছিলো শুধু রাতেৰ বেলা সেন্ট্ৰি আৰ প্ৰেটেল ডিউটি। টেনিশশে আগত নতুন ছেলেৱা আমাদেৱ ইউনিট বেসেৰ সঙ্গে এক হয়ে গেলো। সংখ্যায় হয়ে গেলাম আমৱা বিগুণ এখন। অনেক নতুন মুখেৰ সমাহৰ আমাদেৱ বেসে। কেবল একজন নেই। আমাদেৱ দৃঢ়-কষ্টেৱ একাঙ্গ সাথি সেই গোলাম গউস। হারিয়ে গেছে চিৰদিনেৰ জন্য।

ক'নিনেৰ মধ্যেই ছেলেৱা চাষা হয়ে উঠলো আবাৱ। সময়েৱই কাজ এটা। সময় দ্রুত আবাৱ মানুষকে স্ব-জ্ঞায়গায় ফিরিয়ে আনে। আমাদেৱ প্ৰিয় সহযোড়া গোলাম গউস আমাদেৱ ছেড়ে চলে গেলেও তাৰ জন্য থেমে থাকলো না কিছুই। সবকিছু

আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো। পিন্টুর দরাজ গলার রবীন্দ্র আর গণসঙ্গীত আবার তাঁবুর ছেলেদের আনন্দলিত করতে শুরু করলো। একদিন মধুসূনকে মেয়ে সেজে নাচতে দেখা গেলো। মতিয়ার তার ভাঙা গ্রামোফোনটায় রেকর্ডের পর রেকর্ড চাপিয়ে বসাতে লাগলো গানের আসর। 'গাধা কমাভার' রেকর্ড সারাদিন তার শাদা গাধাটাকে নিয়ে পুরুরপাড় ঘাস খাওয়ানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। 'বকরি কমাভার' হানী একপাল হাতিসার বকরির ঝত্ন-আস্তির কাজ করতে লাগলো গ্রাণপাত। আর ওদিকে অমরখানার দিক থেকে দিনে কি রাতে চলতে থাকলো গোলা বর্ষণ আগের মতোই। পুকুরের উচু পাড়ে অমরখানা শক্ত ঘাঁটির সেই শাদা দালানটি দাঁড়িয়ে আছে তেমনি। এরি মধ্যে আমাদের আবার ডাক পড়লো অপারেশনে যাওয়ার।

এবার নতুন ছেলেরা অপারেশনে যাবে। আমাকেই যেতে হবে ওদের সঙ্গে। টেনিং শেষ করে এসেছে ওরা সদ্য। প্র্যাকটিক্যাল অপারেশন বা যুদ্ধের কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। তাই ওদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা ছাড়া যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ করতে করতে একজন সৈনিক যেমন যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পোড়খাওয়া মানুষ হয়ে ওঠে, যুদ্ধ কী যেমন বুঝতে পারে, সদ্য টেনিংপ্রাণ্ট একজন তরুণ তা পারে না। যুদ্ধের মাঠে অনেক কিছুই রয়েছে, যা অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখতে হয়, বুঝতে হয়। টেনিং সেটারে তা জানা যায় না। স্বেক্ষকের টেম্পারামেন্ট যুদ্ধের ভেতর থেকেই আসে। এটা ছাড়া যুদ্ধ করা মুশকিল। যুদ্ধের ভেতর থেকেই একজন সৈনিক যুদ্ধ করতে শেখে। যুদ্ধের তাওবলীয়ে জোবনমৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার যে অভিজ্ঞতা হয়, একজন নবীন যোদ্ধার তা থাকে না। এজন্য নবীন রিক্রিউটদের যুদ্ধের মাঠে অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের সহিত যোগ হয়। আর সেটা করা হয় যুদ্ধ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞ করে তুলবার জন্য। মেজর দরজি সঞ্চাবত ইউনিট বেসে আগত নতুন ছেলেদের এ উদ্দেশ্যেই অঙ্গ অপারেশনে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন। আর তাদের কমান্ড করার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। মেজরের বিশ্বাস, এতোদিনে আমরা ভ্যাটার্ন হয়ে উঠেছি।

বাবু, আবু বকর, বদিউজ্জামান, মোস্তফা ও ইয়াকুবসহ আজ রাতে দল সাজানো হয়েছে পনেরজনের। যথায়ীতি সঙ্ক্ষয়ের পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, বিশ্বাস থেকে হাতিয়ার সংগ্রহ করে ভাট্টপাড়ার উদ্দেশে আমরা রওনা দিলাম। নতুন ছেলেদের নিয়ে অপারেশন। যুদ্ধের মাঠে যাওয়ার একটা অভিজ্ঞতা দেয়া প্রয়োজন। এ জন্য আজকের রাতের অপারেশনটা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা অনেকটা রেকি কাম প্রোটেকটিভ পেট্রল ধরনের কাজ।

বেশ ক'দিন পর আমরা ভেতরগড় এলাকায় যাবো। টোকাপাড়া ঘটনার পর ভেতরগড়ের লোকজন সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। সন্দেহ নেই, স্থানীয় কিছু দালাল পাকবাহিনীকে খবরাখবর যোগান দিয়ে সেই সাথে তাদের পথ দেখিয়ে টোকাপাড়া পর্যন্ত নিয়ে গেছে। স্থানীয় গাইড ছাড়া পাকবাহিনীর পক্ষে টোকাপাড়া পর্যন্ত যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই অসম্ভব ছিলো। এদের মধ্যে ফরমান আলী চেয়ারম্যান এবং তার ভাই হবি মেধ্বার অন্যতম। ফরমান আলীকে সেদিন

পাকবাহিনীর সাথে টোকাপাড়ায় যেতে দেখা গেছে। আমাদের আজকের রাতের অপারেশনের টার্ণেট তারাই।

নতুন ছেলেদের জন্য এটাই প্রথম যাত্রা। ট্রেনিং এবং বাস্তব যুক্তির মধ্যে অনেক ফারাক। তাই স্বাভাবিক কারণেই ওরা উত্তেজিত এবং কিছুটা শক্তিতে হয়ে উঠছিলো। ভাটপাড়া থেকে বাংলাদেশ অভিযুক্তি রাস্তাটায় উঠে দু' লাইনে অগ্রসর হওয়ার প্রাথমিক অবস্থাতেই ইয়াকুব একটা ভুল করে ফেললো। তার হাতের চেনগানটি 'কাক' (যায়গাজিনে গুলি টানা) করতে গিয়ে একটি গুলি বেরিয়ে গেল আচমকা। গুলির শব্দে রাতের অক্ষকারের স্তুতি হঠাতে করে ভেঙে গেলো। ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়ি ভাটপাড়া ক্যাম্প পেরিয়েই এই বিপত্তি। এমনিতেই বি.এস.এফদের জানান দিয়ে আসা হয় নি। মনে হতে লাগলো, এই বুঝি বিএসএফ সদস্যরা গোলাগুলি শুরু করলো। এ ধারণা থেকে সবাইকে দ্রুত শোয়া পজিশনে যেতে বললাম। একটা খারাপ গাল বের হয়ে এলো পিন্টুর মুখ থেকে। নতুন ছেলেরাও দেখলাম কেউ কেউ রেংগে গেছে। আমার পাশেই শুয়ে ছিলো ইয়াকুব। অক্ষকারেও সে কাঁপছে বোৰা গেলো। একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। মিস ফায়ারের গুলি আঘাত করতে পারতো কাউকে। এর ফলে হতে পারতো মারাত্মক একটা কিছু। কেউ হতে পারতো আহত কিংবা নিহতও। কপালপ্রস্থতা হলো না। দ্রুত ওর হাত থেকে চেনগানটা নিয়ে নিলাম। হাত রাখলাম ওর পিঠে। দারুণ চৌকস আর অহংবোধের অধিকারী ইয়াকুব ঘটনার আক্ষয়ক্ষেত্রে হতচকিত ও দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। অক্ষকারে ওকে ঢোক মুছলে দেখলাম। কেন্দে ফেলেছে ও।

অক্ষকারের সাথে একাকার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পুরো দল নিয়ে হাজির হয়েছি ফরমান আলী আর হবি মেহেরের বাড়ির সামনে। সিন্ধান্ত ছিলো নতুন ছেলেরা করবে আজকের রাতের পুরাণ অপারেশন। ওদের সবটা বুঝিয়ে দিয়ে পিন্টুসহ আমরা পুরনো ক'জন পিছিয়ে এসে যাওয়ার তিন মাথায় পজিশনে রাইলাম। আজকের কাজের ধরনটা ভালো নয় বলে আমরা নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করতে চাই না।

হবি মেহার এ অঞ্চলে শক্তিশালী পাকিস্তানি এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে। তার নিয়মিত পঞ্জগড় যাওয়া-আসা রয়েছে। ফরমান মিয়া শান্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে পঞ্জগড়ে পাক আর্মির ছত্রচায়ায় বাস করছে। হবি মেহার এখানে থেকে তার সাথে যোগাযোগ রেখেছে। পাকবাহিনীর কাছে সে এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধির খবর সরবরাহ করে থাকে। তার একটা দোনলা বন্দুক রয়েছে। হবি যাতে পঞ্জগড় আর না যায়, সেটা দেখতে হবে এবং যে বন্দুকটা এখন সে তালমা ব্রিজের পাহারার কাজে ব্যবহার করে থাকে, সেটা সিজ করতে হবে। এই হচ্ছে আজকের রাতের টাঙ্ক।

ফরমান আলীকে পাওয়া গেলো না। তবে হবি মেহারকে ওরা বাড়িতেই পেলো। ওকে ঘর থেকে বাইরে পুরুর ঘাটের কাছে নিয়ে এসে চালানো হলো গণধোলাই। একটা বিষধর সাপকে অকেজো করে দিতে হলে তার বিষদাত যেমন তুলে দিতে হয়, তেমনি একজন বিষাসঘাতককে কমহীন করতে হলে তার চলার শক্তি রাহিত করা প্রয়োজন হয়। ইয়াকুব-বাবলু-মতিয়াররা সে কাজটা ভালোভাবেই সম্পন্ন করলো।

ইতিমধ্যে ওরা বাড়ির ভেতর থেকে হবির দোনলা বন্দুকটা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে বাড়ির মেয়েলোকসহ অন্যরা প্রথমে শোরগোল এবং কান্নাকাটি শুরু করেছিলো। ওরা সেটা খামিয়ে দিয়েছে। ফেরার সময় অর্ধমৃত হবি মেঘারকে পুরু পাড়ে ফেলে রেখে ওরা তার বন্দুক আর একটা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলে এলো। এরপর ফেরার পালা। ভোরের আলো দেখা দিল সীমান্ত পার হওয়ার পর।

সামনে উত্তুঙ্গ হিমালয় তার মহিমময় অস্তিত্ব নিয়ে জেগে উঠেছে। ঝিরঝিরে নরম কোমল বাতাস নেমে আসছে হিমালয়ের শরীর ছুঁয়ে। আমরা ক্লান্ত পদচারণায় ফিরছি চাউলহাটির পাকা সড়ক ধরে। এ অপারেশনে উৎফুল্ল করে তুললো নতুন ছেলেদের। মেজর দরজি খুব খুশি হলেন একটা দোনলা বন্দুক পেয়ে।

১৮. ৭. ৭১

হারিয়ে গেল সোনামিয়া

জোনাব আলী এসেছে। অভ্যন্তর বিষণ্ণ মুখ আর ভাঙ্গচোরা চেহারা। বেলা ১১টার মতো সময় তখন। কি হয়েছে, জিগ্যেস করতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো সে। পুকুরের ধারে বসে তখন আমরা মাছের খেলা করছি। লঙ্গরখানার পরিয়ক্ত খাবারের প্রায় সবটাই এবং ছেলেদের আহারাদিগুলির তাদের খালাবাসনের অবশিষ্ট ভাত-তরকারি খোবার সময় পুকুরের পানিতে জেসে যায়। ফলে পুকুরটার মাছেদের হয়েছে পোয়াবারো। পাছে প্রচুর আহার পাই পুকুর জুড়ে সেই আহার নিয়ে তাদের কাড়াকাড়ি আর তৎপরতার অন্ত নেই।

উন্নত দিকের খোলামুখ দিয়ে ফসলের মাঠ-ঘাট-বিল থেকে বর্ষার উপচে পড়া পানিতে প্রচুর মাছ চুক্কেছে। খাবারের সকান পেয়ে এই পুকুরে। মুক্তিযোদ্ধার অধিকাংশই গাঁওগ্রামের ছেলে। তার বর্ষাকালে মাছ ধরতে অভ্যন্ত তারা সবাই। পুকুরের পানিতে টগবগ করে ছেট মাছের দল ভাসে আর ভোবে। বড় বড় মাছের দল ঘাই মেরে যায়। মাছের ঘাইয়ের শব্দ শুনে ছেলেরা বলে দেয়, ওটা শোল মাছ, ওটা বোয়াল মাছ, আর ওটা কুই বা কাতলা। কাকচক্ষুর মতো টলটলে পানি। পরিষ্কার দেখা যায় মাছের দলের লেজ আর কানকো নাড়িয়ে পরমানন্দে ভেসে বেড়ানোর অপূর্ব দৃশ্য। এইসব দেখে ছেলের দল শেষতক স্থির থাকতে পারে না। মতিয়ার-খলিল তাই সোংসাহে মাছ ধরার আয়োজন করে। অন্যরাও যোগ দেয় তাতে। গত রাতে তারা বড়ো বড়ো বড়শি এমে পুটিমাছ গেঁথে গাড়া বড়শির ফাঁদ পেতেছিলো পুকুরের খোলা মুখে সামনের ফসলের ক্ষেতে এবং পুকুরের ধারেও। হঠাতে করেই, যারা ঘুমিয়ে ছিলো সেন্ট্রির চিক্কারে তাদের ঘুম ভেঙে যায়। কী হয়েছে? না, বড়শির ফাঁদে মাছ আটকেছে। খলিল-মতিয়ারের দল ঘুম ভাঙ্গ চোখে দৌড়ে যায়। ফিরে আসে ৫/৭টা নধর কান্তি শোল আর দুটো বোয়াল মাছ নিয়ে। সেই থেকে উৎসাহের অন্ত নেই ওদের। পুকুরের মুখে খোলা জায়গায় জাল পেতে কীভাবে জিঞ্জু মাছ ধরা যায়, এই নিয়ে মতে আছে ওরা।

পুকুরের পাশে বসে মাছের খেলা দেখছি। দেখছি ওদের উৎসাহ আর মাতামাতি। পুকুরের অপর পাড়ে গাধা কমান্ডার রউফ মিয়া দার্শনিকের চেহারা নিয়ে ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে নিবিষ্ট মনে। তার পেছনে একপাল বক্রি আর ভেড়া নিয়ে বকরি কমান্ডার হাদী, তার সাথে আরো দু'জন। আইয়ুব আলী আর ওফিজুল দরজি বাইরে গেছেন সকালে, সঙ্গত তার ভজনপুরের ইউনিটে। কিছুক্ষণ আগে প্রতিদিনের মতো বেশ কিছু কামানের গোলা উড়ে গেছে অমরখানার জগদলের দিকে। দিগন্ত কাঁপানো শব্দ নিয়ে বিক্ষেপিত হয়েছে ওগুলো শত্রুর ঘাঁটি এলাকার ওপর। ওপার থেকেও জবাব এসেছে। তবে তা খুবই সীমিত। চাউলহাটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে প্রায় অমরখানার কাছাকাছি বিক্ষেপিত হয়েছে সেগুলো। এখন সব চৃপচাপ। শান্ত আর নীরব হয়ে গেছে দু' পক্ষই। মাঝে মাঝে মনে হয়, এরা দু' পক্ষই এক ধরনের খেলায় মেতেছে। গোলা ছোঁড়াছুঁড়ির খেলায়। মনে হয় সবটাই বুবি সাজানো ব্যাপার। উভয় পক্ষের মধ্যেই এ ব্যাপারে যেনে পারস্পরিক একটা সমরোতা রয়েছে। ব্যাপারটা যেনে এরকম, আমরা গোলা ছুঁড়বো, তোমরা ছুঁড়বে। আমরা বক করলে করবে তোমরাও। তবে এ ছোঁড়াছুঁড়ির হবে নিরাপদ দূরত্ব থেকে। কারো যেনে ক্ষতি না হয় এতে।

এইসব সাতপাঁচ যখন ভাবছি, তখনি জোনাব জন্মস্থানে আর তার বাঁকাচোরা চিমসে শরীর নিয়ে। এসেই বলে ত দিন আগে বিএস.এফ.-এর নাম করে কে বা কারা সোনা মিয়াকে ডেকে নিয়ে আসে। তারপর প্রেরিতোর আর কোনো খবর নেই।

বলো কি? বলেই উঠে দাঁড়াই। কথাটাকে এনেছে, কারা এবং কীভাবে জিগ্যেস করি তাকে। জোনাব আলী জানায়, বিএস.এফ.-এর এক চর গিয়ে খবর দেয় তাকে ক্যাটেন সাহেব ডেকেছেন। কী মনে জরুরি খবর আছে, যেতেই হবে— এই বলে। সোনা মিয়া তখন সাইকেল ছাড়ি চলে আসে বর্ডার পার হয়ে। তারপর থেকে তার আর খৌজ নেই। কেনো প্রে আসতে গেলো? তাকে না আমরা নিষেধ করেছিলাম, কারো ডাক পেলে না যেতে। আর যদি যেতেই হয় তবে যেনে আমাদের জিগ্যেস করে যায়। অনেকটা বৌঝালো গলায় জোনাব আলীকে কথাগুলো বলি।

জোনাব আলী জানায়, সোনা মিয়া বাড়িতে বলে এসেছে, সে আগে আপনাদের সাথে দেখা করবে। তারপর যাবে ক্যাপ্টেন সাহেবের কাছে।

আর দেখা করেছে! মনে মনে বলি। যারা তাকে এতোদিন ধরে ধরবার চেষ্টা করেছিলো, তারা এই সুযোগে ঠিকই তাকে ধরে ফেলেছে। এটা যে ছিলো একটা ফাঁদ, সোনা মিয়া তা বুঝতে পারে নি। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মিলিয়ে সে ভেবেছিলো, সব বুবি চুকেবুকে গেছে, এ জন্য তার গতিবিধি ও সহজ করে এনেছিলো। কিন্তু পুরনো শক্ত যারা, তারা হাল ছাড়ে নি। এতোদিন পারে নি ভাটপাড়ায় আমাদের অবস্থানের জন্য এবং ভেতরগড় এলাকায় আমাদের নিয়মিত তৎপরতার জন্য। চাউলহাটি চলে আসবার পর ওদিকটা ফাঁকা পেয়ে সোনা মিয়ার শক্তরা তাকে ঠিকই ফাঁদ পেতে ধরেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে তার শক্ত কারা হতে পারে? বি.এস.এফ? এপার-ওপারের সংঘবন্ধ চোরাকারবারি কিংবা ডাকাত দল? স্থির করে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু সেই

সাথে বিদ্যুৎ চমকের মতো আর একটা সঞ্চাবনা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় মুহূর্তে। পিন্টু-আহিদারকে একপাশে ডেকে নিয়ে এসে তাদেরকে সেই সঞ্চাবনার কথাটা বলি, পাকবাহিনীর অনুচরেরা বি.এস.এফ.-এর নাম করে সোনা মিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে হাত মেলানোর ফলে তাকে খতম করে দেয় নি তো? কথাটা ওদের মনে দোলা দেয়। পিন্টু বলে, হতে পারে। আহিদারের মতও তাই। তবে ব্যাপারটা একবার ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিৎ-এর সাথে কথা বললে হয় না? আহিদার প্রস্তাব করে।

— ঠিক আছে চলেন, তার সাথে দেখা করেই আসি।

বড় ভাইকে ঘটনাটা জানিয়ে আমরা তিনজন রওনা দিই ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিৎ-এর আন্তর্নার দিকে। এ এলাকার বি.এস.এফ কমান্ডার ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিৎ-এর সাথে আমাদের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়েছে আগেই। আমাদের দিয়ে করাবেন বলে তিনি কিছু অপারেশনের প্রস্তাবও দিয়ে রেখেছেন।

ক্যাপ্টেনকে পাওয়া গেলো তার আন্তর্নাতেই। বেটেখাটো শিখ ক্যাপ্টেন নারায়ণ সিৎ আমাদের তিনজনকে পেয়ে হৈ-চৈ করে উঠলেন, ইয়ার লোগ তোম আয়া হ্যায়, আইয়ে, বইঠিয়ে, হাম বহুত খুশ হয়া তোম আনেছে।

সমাদুর করে তিনি তার তাঁবুতে আমাদের বস্তেলেন। দিলেন চা-নাস্তার ফরমায়েশ। তারপর শুরু করলেন গল্প। তার সেইভাবে শিখস্তানি উচ্চারণে হিন্দি ভাষায়। আমরা তার কিছু বুঝি, কিছু বুঝতে পারিনন। গোলাম গউসের জন্য তিনি দৃঢ় করে বললেন, তোমরা জয়বাংলা কামুকেরার জন্য যুদ্ধে এসেছো, এটা তো ভলান্তিয়ার সার্ভিসের মতো। তোমাদের সেশনের কতো ছেলে এদিক-ওদিক ঘূরছে। বসে আছে অলসভাবে আর আমাদের অভিযন্তের রেশন ধ্রংস করছে। সকলেরই যুদ্ধে আসা উচিত। দেখো, কেবার আমার বাড়ি পাঞ্জাব, সেই কতো দূরে, অথচ আমি তোমাদের যুদ্ধে মদন কৃষ্ণে যাচ্ছি। আমার ছেলেরা দিন-রাত বর্জনের যুদ্ধ করছে। অমরখানা থেকে শুরু আর্মি প্রায়ই তো এগিয়ে আসে। বর্জন করতে চায়, তখন তাদের আটকাতে হয় আমাদের। ব্যাপারটা কতো বড় সাংঘাতিক ধরনের কাজ, তোমাই বলো! এর মধ্যে আমাদের বেশ কিছু লোক হতাহত হয়েছে। আমার বি.এস.এফ কোম্পানিরই তারা। কিন্তু করার কি আছে বলো? তোমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য আমরা তো আমাদের মাটি খোয়াতে পারি না।

কথার চমৎকার তুবড়ি তুলে আমাদের যেনো প্রায় মোহিত করে ফেললেন ক্যাপ্টেন। তার সাথে ঘৰোয়া পরিবেশে কথা বললে মনে হয়, লোকটা খুবই চালাক এবং ধূরঙ্গ। মন বলে ওঠে, এর কাছ থেকে সাবধানে থাকতে হবে ভবিষ্যতে। তবে পিন্টুর সাথে তার খাতিরটা একটু বেশি হয়ে যায়। তাই কথাটা সেই-ই পারে, সোনা মিয়া কো, আব ডাকাথা? ইউ কল্ড সোনা মিয়া টু মিট ইউ?

— নো, নেহি তো ক্যাপ্টেন বলে ওঠেন, কোন সোনা মিয়া, সোনারবানকা, যো পাক বাহিনীকা দলাল থা। আভিতো মুক্তিফৌজ বন গিয়া, দলালি নেহি করতা। কুছ দিন ছে সোনা মিয়া হামরা ইনফরমার কা কাম করতা থা হোয়ার ইজ হি? জানতে চান তিনি।

— হি ইজ মিসিং স্যার ফর লাস্ট থ্রি ডেজ। সাম বডি কলড় হিম আফটাৰ ইয়োৱ নেম। এও আলটিমেটলি হি ভেনিশ্বড়।

আমাৰ কথা শুনে ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ কৰে থাকেন। তাৰ গালে আবদ্ধ মুখ ভৰ্তি দাঢ়িতে হাত বুলোতে থাকেন। তাৰ মুখে অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোৰা যায় না। আমাৰ তাই উঠে পড়ি। ক্যাপ্টেন আসবাৰ সময় বললেন, ‘হি ওয়াজ ইয়োৱ রাইট হ্যাণ্ড ইন ভেতৰগড় এৰিয়া। ম্যায় পাতা লাগুয়াংগা হাউ হি ক্যান বি ভেনিশ্বড়?’

ক্যাপ্টেন কি সত্যিই কিছু জানেন না? হতেও তো পাৰে। যদি এৰ পেছনে বি.এস.এফ.-এৰ হাত না থাকে, তবে আমাদেৱ ৩ নম্বৰ সন্দেহটাই হয়তো তাৰ হারিয়ে যাওয়াৰ কাৰণ। মুসলিম লীগৰ পাক অনুচৰ পৰবৰ্তীকালে বিশ্বাসঘাতকতা কৰায়, বিশেষত অমৱখানা অপাৱেশনেৰ পৰ পাকবাহিনী হয়তো তাকেই টার্ণেটি কৰে ধৰে নিয়েছে। তাৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ সাজা দেয়াৰ জন্য। এ সংজ্ঞাবনা যদি সত্য বলে ধৰে নেয়া হয়, তাহলে সোনাৱাবানে আৱো কেউ আছে, যে বা যারা পাকবাহিনীৰ হয়ে এখনও এ কাজটা কৰে যাচ্ছে। কে হতে পাৰে সেই লোক?

সাৱটা রাত্তা ভেতৰগড় এলাকাৰ পৰিচিত-অপৰিচিত মানুষদেৱ নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদেৱ ক্যাপ্সেৰ কাছাকাছি আসতেই যেনো প্ৰশ়্নাৰ উত্তৰটা পাওয়া গেলো। পুৰুৱেৰ কাছাকাছি দাঢ়িয়ে পড়ে তখন পিন্টু-আহিদৱকে বৈল, সংজ্ঞাবনাৰ কথাটা।

ওৱা নিজেৰাও এ সংজ্ঞাবনাৰ কথা ভাবছিলো, যুৰশেষে তিনজন মিলে এই যৌথ সিদ্ধান্তে পৌছে যাই যে, সোনাৱাবান দাখেলী মদ্রাসার সুপারিনেটেন্ডেন্ট মণ্ডলানা মনসুৰ সেই ব্যক্তি। তিনি এখনও মদ্রাসাৰ প্ৰশ়্নাৰ রেখেছেন। তাৰ ছাত্ৰদেৱ পাকিস্তানি মন্ত্ৰে দীক্ষিত কৰেছেন। তাৰদেৱ রাজাৰ্জি-আলবদৰ হওয়াৰ জন্য উজ্জীবিত কৰেছেন। তিনিই এখন ওই এলাকাৰ একমাত্ৰ পাকবাহিনীৰ অনুচৰ বা এজেন্ট। সোনা মিয়াকে হারিয়ে দেয়া মণ্ডলানাৰ পক্ষে কৰিব।

মিশন সোনাৱাবান — টাৰ্ণেট মদ্রাসা সুপার

দুপুৱেৰ খাওয়া-দাওয়াৰ পৰ মেজৱেৰ কাছে কথাটা উপস্থাপন কৰি। মনোযোগ দিয়ে শোনেন আমাদেৱ কথা মেজৱ দৱজি। ফিল্ড ম্যাপ বেৰ কৰে সোনাৱাবানেৰ অবস্থান দেখেন। তাৰপৰ বলেন, ওকে বয়েজ, ইউ গো টু নাইট, এন্ড কিল দ্যাট মণ্ডলানা স্পাই। ইয়ে মণ্ডলানা লোক বহুত খ্যাত খ্যাত হোতা হ্যায়। অনলি দোজ টাইপস অৰ পিপল অৰ ইয়োৱ কান্ট্ৰি আৱ সাপোর্টিং পাকিস্তান। দে আৱ ফাইটিং ফৰ সিকিউরিং ইন্টিগ্ৰেটি অৰ পাকিস্তান। ইয়েস, হি সৃজ বি নিউট্ৰিলাইজড। মেজৱ আমাৰ দিকে তাকিয়ে বলেন, ইউ আৱ কমান্ডিং টু নাইট। সিলেষ্ট বয়েজ একৰডিং টু ইয়োৱ চয়েজ, ও. কে?

— ইয়েস স্যার বলে বেৰ হয়ে আসি মেজৱেৰ তাৰু থেকে। আজ রাতে আবাৰ অপাৱেশন। পিন্টু-আহিদৱকে বলি ভালো ছেলেদেৱ নিৰ্বাচন কৰতে। ওৱা দুজন তো থাকবেই আমাৰ সাথে।

চাউলহাটি থেকে পাকা সড়ক ধৰে জহুৱী-ভাটপাড়া ক্যাপ্সেৰ পুৱনো জায়গাটা

বায়ে রেখে বিওপি কম্বারের সাথে কথাবার্তা বলে ভেতরগড়গামী সেই চেনা রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। ঘনকালো অঙ্ককার চারদিকে। সামনে মতিয়ার-খলিল জুটি। তাদের পেছনে আমি। পাশে পিন্টু-আহিদার। আজকের দলে নবাগত ছেলেরাও আছে। বেশ ক'জন। তবে আজ ইয়াকুবকে নেয়া হয় নি। আগেকার অপারেশনে তার একটা মারাঞ্চক ঝুলের জন্য বড় মাসুল দিতে হচ্ছিলো পুরো দলটাকে। জোনাব আলী হাঁটছে সামনে নীরবে। ওকে কিছুই বলা হয় নি। কায়দা করে আটকে রাখা হয়েছিলো চাউলহাটি ক্যাম্পে। শুধুর এমন দিনে সহজে বিশ্বাস করা যায় না কাউকেই। জোনাব আলী জানে, আজ রাতে সে আমাদের গাইড। কিন্তু কোথায় গত্তব্য বা টার্গেটই-বা কি, কিছুই তাকে জানানো হয় নি।

ঘৃটঘৃটে অঙ্ককার আর পিছিল ভাঙা পথ ধরে রাত ১১টার মধ্যে আমরা পৌছে যাই। সোনারবান থামে। জোনাব আলী একেবারে সোনা মিয়ার বাড়ির দহলিজে এনে হাজির করে আমাদের। সোনারবান এবং সোনা মিয়ার বাড়ি যাবো শুনে সে খুবই খুশি। সঙ্গৰত ধারণা ছিলো, আমাদের মিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সোনা মিয়ার হারানোর ব্যাপারটা তদন্ত করা এবং যে করেই হোক তাকে উদ্ধার করা।

সোনা মিয়ার বাড়ির দহলিজ ঘরে মদ্রাসার সুপার মওলানার আস্তানা। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানে ডেরা বেঁধে রয়েছেন। মদ্রাসাটা তার স্মৃতিই তৈরি। দেশে এতোবড় যুদ্ধ আর হানাহানি চলছে, তবু তিনি মদ্রাসা বন্ধ করে তার নিজের দেশ বা পরিবারের কাছে চলে যান নি। জমাট বাঁধা অঙ্ককারের ভেতর দিয়ে আমরা যখন তার ঘরের দরোজার কাছে পৌছুই, মওলানা সাতেক তখন নামাজ পড়ছিলেন। ঘরের ভেতর একটা অনুজ্জ্বল হারিকেন জুলছে। জেন্টে আলোয় দেখা যায় মওলানা জাফরনামাজের ওপর একাগ্রচিত্তে নামাজে দাঁড়িয়ে। আমরা বাইরে অপেক্ষা করতে থাকি। দলের সবার মনেই কিছুটা আশ্চর্য থায় হোক, মওলানাকে পাওয়া গেছে! টার্গেট হাতের কাছে, সুতৰাং আর তর সইচ্ছ না তাদের। আমরা মাওলানার নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ঘরের চারদিকে কড়া পাহারা লাগিয়ে রাখি। বেশ সময় নিয়ে নামাজ পড়েন তিনি। নামাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোনাব আলী তাকে বাইরে ডেকে আনে।

মওলানা বাইরে আসেন হারিকেন হাতে নিয়ে। আমাদের দেখতে পান তিনি। কিন্তু চমকে ওঠেন না। তার চেহারায়-মুখে কোনো ভীতির লক্ষণ নেই। বরঞ্চ চকচকে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার চোখ দুটা। মুখে বলেন, আপনারা তাহলে এলেন বাবাজীরা? এগিয়ে এসে উঁকি আলিসনে জড়িয়ে ধরেন তিনি। এক এক করে সবাইকে। আসেন ভেতরে আসেন, বলে তিনি আমাদের সবাইকে তার ঘরের মধ্যে যাওয়ার আহ্বান জানান। বাইরে চারজন সশস্ত্র সেন্ট্রি দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা তার সাথে ভেতরে ঢুকি। তিনি বসার জায়গা করে দেন। আমরা বসি। তখন তিনি তার কেরোসিন কুকার জুলান। চায়ের কেতলি তাতে চাপিয়ে দিয়ে সামনাসামনি বসেন। বলেন, আমি অনেকদিন থেকে আপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য। আপনারা এলেন যখন তখন আর ভয় নেই। সোনা মিয়াকে ওরা ধরে নিয়ে গেলো, কে জানে বাঁচিয়ে রেখেছে, না মেরে ফেলেছে এতোদিনে। জালিমরা দেশটা ছারখার করে দিলো। এটা

আল্লাহ সইবে না, গজুর পড়বে ওদের ওপর।

এটাসেটা কথা বলতে বলতেই নিজের হাতে চা-বিস্কুট পরিবেশন করেন তিনি। তারপর বলতে থাকেন খান বাবারা, আপনারা আসছেন, আমার খুব আনন্দ লাগতেছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য খুব কষ্ট করতেছেন, চা খান বাবারা। আমি নিজের হাতে বানাইলাম।

তখন প্রায় মধ্যরাত। অমরখানা-জগদলহাট থেকে ভেসে আসছে একটানা মেশিনগানের শব্দ। দিগন্ত কাঁপয়ে শেল ফাটছে। এই অবস্থায় মণ্ডলানা কিছুক্ষণ উন্মানা হয়ে থেকে তারপর একসময় গভীর বিশ্বাসের সাথে বলেন, দেশের মানুষদের বাঁচাতে হবে। জালিম ইবলিশদের তাড়াতে হবে এদেশ থেকে। আপনারা এসে গেছেন। আমি অপেক্ষায় ছিলাম, কবে আসবে আমাদের ছেলেরা। এবার আর ওরা জয়বাংলাকে আটকাতে পারবে না।

এসেছিলাম দালাল, শান্তিবাহিনীর নেতা পাকবাহিনীর অনুচরকে ধরতে, তাকে হত্যা করতে, কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেলো। হজুর তো আমাদেরই লোক। তখন জামাত, মুসলিম লীগ এবং মৌলবাদী দলগুলো সমর্থন দিয়েছে পাকবাহিনীকে। তাদের দলের ছাত্রফ্রন্টের ছেলেরা যোগ দিয়েছে রাজাকার, আলবদর-আলশায়স্ বাহিনীতে। তখন একজন মণ্ডলানা গোছের ব্যক্তি হলেই মনে করা হতো, তিনি শান্তিবাহিনীর সদস্য, পাকবাহিনীর দালাল। এমনি একটা সাধারণ ধারণা আমাদের সকলের মনের মধ্যেই সৃষ্টি করতো। কিন্তু মণ্ডলানা মনসুর সোনারবান মাদ্দাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং প্রতিক্রিয়া তার আন্তরিক সমর্থনের ব্যাপারটি। ভালো লাগলো স্বাধীনতার প্রতি, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তার আন্তরিক সমর্থনের ব্যাপারটি। ভালো লাগলো তাঁর নিজের হাতে পরিবেশিত চা-নাস্তা।

ফিরে আসবার সময় তিনি ঘৰলেন, বাবারা আমার তো বয়স নেই, খুব ইচ্ছে করে আপনাদের সাথে যেতে। এই জালিমদের বিরুদ্ধে অস্ত হাতে যুদ্ধ করতে। দোয়া করি বাবারা, আপনারা কামিয়াব হবেন। মণ্ডলানা মনসুর আমাদের লোক, তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইছেন, এটা একটা বিরাট পাওয়া আমাদের জন্য। মন বলে ওঠে, হবে, জয়বাংলা হবে, অবশ্যই হবে একদিন।

২০. ৭. ১১

এবার ভেতরে যেতে হবে

এবার তোমাদের ভেতরে যেতে হবে, মেজর দরজি তার তাঁবুতে বসে কথা বলছিলেন। তার সামনাসামনি বসে বড় ভাই মুক্ত হক, পিন্টু, জব্বার, আহিদার, ইয়াকুব আর মতিয়ারসহ আমরা ক'জন।

— ভেতরে তো যাতা হ্যায়, উই আর গোয়িং ...। বড় ভাই তার স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে মেজরের কথার পিঠে কথা পাঢ়লেন।

— নেহি ইয়ার, ইয়ে তো ইনফিল্ট্রেশন, তুমলোগ হামারা ল্যান্ড মে ক্যাম্প কিয়া, আওর রাতমে অপারেশন কারণে লিয়ে যাতা হ্যায় বর্ডারকা উপপার। আব্সে

ইয়ে নেহি চলেগা, প্রবেলি ইউ আর গোয়িং টু হাইড আউট ইন ইয়োর কান্দি।
মেজের বড় ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে জবাব দিলেন। দরজি জাতিতে গুরুী, ভাঙা
ভাঙা হিন্দি বলেন। তবে অবশ্যই তা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো আর প্রাঞ্জল।

— কবছে যানে হোগা, হোয়াট্স উইল বি দ্য ফেইট অব দিস চাউলহাটি ক্যাম্প?

— তেরি সুন, বললেন মেজে। তোমরা ডিটেইল্স্ জানতে পারবে কালকের
মধ্যে। কাল ব্রিগেডিয়ার যোশী আসছেন এই ক্যাম্প। তিনি তোমাদের বিশ্বারিত
জানাবেন। তোমরা ব্রিগেডিয়ার সাহেবের জন্য তৈরি থেকো। ক্যাম্প ফিটফাট
থাকবে, ছেলেরা তৈরি থাকবে। ও, কে?

— ইয়েস স্যার, বলে আমরা দরজির তাঁবু থেকে বের হয়ে আসি। তাহলে
যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের যেতে হবে ভেতরে। শক্র-অধিকৃত
বাংলাদেশে!

বড় ভাই তাঁবুতে ফিরে এসে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন। কাল ব্রিগেডিয়ার আসবেন,
অনেক কাজ। পিন্টু-জৰুৱা-আহিদারসহ আমরা কেটে পড়ি ক্যাম্প থেকে চাউলহাটির
মোড়ে চায়ের দোকানের উদ্দেশে। নানান ধরনের মানুষ সেখানে। আর রয়েছে কাচের
গ্লাস সুবাদু দুধের চায়ের সাথে জনুরী বাজারে অবিস্কৃত সেই বিখ্যাত ঝুরি-বুন্দিয়া।

সকাল দশটার দিকে ব্রিগেডিয়ার যোশী এলেন। একজুল অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে।
তিনি ঘুরে ঘুরে পুরোটা ক্যাম্প দেখলেন। তাঁবু ভেতরে ছেলেদের থাকার ব্যবস্থা
দেখলেন। আলাপ করলেন তাদের সাথে। স্বিম্মি-অসুবিধার ব্যাপারেও খোজখবর
নিলেন। বড় ভাই সারাক্ষণ তাঁর সাথে বস্তুজাত, তার সেই বিখ্যাত বিনাত ভঙ্গি নিয়ে।
আর ব্রিগেডিয়ারের প্রতিটি কথার জবাবের বলতে লাগলেন ইয়েস-নো করতা হ্যায়,
যাতা হ্যায়, লেতা হ্যায়, খাতা হ্যায় ইত্যাদি। এরপর ব্রিগেডিয়ার বসলেন দরজির
তাঁবুতে। আলোচনা বৈঠকের পূর্বসূর্য হয়েছে সেখানে।

সামনে টেবিলের ওপর সীমান্ত এলাকার এনলার্জেড ম্যাপের ওপর কিছুক্ষণ লাল-
নীল পেনিলের আঁক করতে করতে ব্রিগেডিয়ার তাঁর কথা বলা শুরু করলেন।
পঞ্চাশোর্ষ বয়সের সুষ্ঠামদেহী ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিনিয়র অফিসার যোশী। তিনি
উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টার সমন্বয় করছেন। অত্যন্ত ভরাট কিন্তু আন্তরিক তাঁর
কথা বলার ভঙ্গি। তিনি দরজির কাছে চাউলহাটি ইউনিট বেসের ছেলেদের সংখ্যা,
তাদের অন্ত আর শোলাবাকদের অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য জেনে নিলেন। টেবিলের
এপারে সামনাসামনি বসেছি আমরা সিনিয়র কমান্ডাররা। মেজের দরজি যোশীর পাশে।
অন্য অফিসাররা তার পেছনে। যোশী এবার তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা পাঢ়লেন,
তোমাদের এখন থেকে বাংলাদেশের ভেতরে গিয়ে হাইড আউটে থাকতে হবে।
আমাদের ভারতীয় অংশ থেকে তোমাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হচ্ছে। প্রথমত, এর
আগে তোমরা যে ধরনের অপারেশন চালিয়েছো, সেটা দিয়ে যেমনটি আশা করা
গিয়েছিলো, তেমন সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। শক্র অঞ্চলের গভীরে গিয়ে তোমরা
তাদের আঘাত হানতে পারছো না। শক্র অঞ্চলের গভীরে সঞ্চয় করে প্রয়োজন।
শক্রের পেছন দিক থেকে বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজের

ভেতর দিয়ে তাদের ব্যতিবাস্তু আর নাজেহাল করা প্রয়োজন, যাতে করে ওরা সুস্থির হতে না পারে। কোথাও স্থায়ী ঘাটি গেড়ে বসতে না পারে। নিজেদের নিরাপদ ভাবতে না পারে। তাদের মরায়াল নষ্ট করার জন্য তাদের ওপর ঘন ঘন ইফেক্টিভ আঘাত করতে হবে। আর এটা করতে গেলে এপারের ক্যাম্প থেকে কেবল রাতের বেলায় সীমিত অনুপ্রবেশের ঘটনা দিয়ে কিছু হবে না। যতদূর সম্ভব তোমাদের ভেতরে যেতে হবে এবং সেখানে ক্যাম্প গড়ে তুলে শক্ত এলাকায় অপারেট করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আর একটা বিষয়ের জন্য তোমাদের বাংলাদেশে ঢোকা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক প্রেসার। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট বহির্বিষ্ণে জোর প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে এই বলে যে, বাংলাদেশে কোনো গোলমাল নেই। কোনো অশান্তি নেই। বাঙালিরা শান্ত হয়ে গেছে। তারা পাকিস্তান ভাঙতে চায় না। ভারত তাদের কিছু অনুচর দিয়ে সীমান্ত এলাকায় নাশকতামূলক কাজ চালাচ্ছে আর এইভাবে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। আসলে আমরা তোমাদের আশ্য-ট্রেনিং-অন্তর্শন্ত্র সরবরাহসহ সব ধরনের সাহায্য যে করছি প্রকাশ্যে সেটাতো স্থীকার করা যাচ্ছে না। আমাদের সরকারের ওপর বাইরের দুনিয়া থেকে চাপ আসছে। তাই সীমান্ত থেকে সরিয়ে তোমাদের ভেতরে পাঠানো হচ্ছে। ইউনিট বেছের হেডকোয়ার্টার এখানেই থাকবে একটা ক্ষেপিটন ফোর্সসহ। আমাদের অধিকারী এখানে থাকবেন, তিনি তোমাদের হেডকোয়ার্টার্স ফোর্সের সাহায্যে তোমাদের ভেতরের অপারেশনাল দিকটি কো-অর্ডিনেট করবেন। একটু থেমে যোশী উন্নিপুঁজি বলেন, তু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? আমি কি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি?

— ইয়েস স্যার, বলি আমরা।

— ওকে দেন, বলে তিনি উচ্চ দাঁড়ান এবং মেজের দরজিকে দেখিয়ে বলেন, তোমাদের ওসি মেজের দরজি বাইলেন, তিনি তোমাদের বিস্তারিত পরিকল্পনা দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেঙ্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। এন্ড হি উইল বি হেয়ার এ্যাজ ইউর ওসি টিল হি ইজ নট উইথড্রন।

ঠিক এসময় অমরখানার সাথে চাউলহাটির কামান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফটটে থাকে উভয় পক্ষের গোলাগুলি সমানে। চরাচর কাঁপিয়ে। ভাবু থেকে বের হয়ে যোশী সপারিষদ পুরুরের উচু পাড়ে উঠে অমরখানা রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তার মুখ থেকে অস্ফুট বের হয়ে আসে, হাউ দোজ বাটার্ডস আর ডিলিং ইন দেয়ার...?

এরপর তাঁকে তাঁর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই আমরা সবাই। আমাদের উদ্দেশ্যে শুভ কামনা করে তিনি বিদায় নেন। গাড়ি ছাড়াবার মুখে তিনি আমাদের দিকে শিখ হাস্যে তাকিয়ে বলেন, জয়বাংলা। আমরা তাঁর প্রতিউন্নত জানাই, জয়বাংলা। তারপর তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কিছুক্ষণ। সামনে তখনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। শেলের বিক্ষেপণে যাচি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

চাউলহাটি ছেড়ে চলে যেতে হবে, এ ভাবনাটা সাংঘাতিকভাবে পেয়ে বসে। দাক্ষণ এক মন খারাপ করা ভাব নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসি। ক্যাম্পের সামনের উচু

পুরুর পাড় থেকে গাধা কমান্ডার রউফ তার সর্বক্ষণের সাথি শাদা গাধাটাকে সাথে করে নিয়ে পুরুরের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। মুখে তার নির্ণিষ্ঠ সুবী মানুষের ছাপ। যেন গ্রামের কোনো গৃহস্থ মানুষ পরম সুখের সঙ্গে তার গৃহপালিত পশুকে ঘাস খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে।

— দেখেছো পিন্টু, পিন্টুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি আমি। এক গাধা আর এক গাধার সাথে কী সুন্দর হেঁটে যাচ্ছে। পিন্টুর গাঞ্জীর্য কেটে যায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রভাবসূলভ চপলতা ফিরে আসে ওর মধ্যে। রউফের দিকে তাকিয়ে দাও বলে, এই গাধা শোন, কোটে যাইস্?

— মোক কল্প? এগিয়ে এসে রউফ বলে।

— তোক শালা নয়তো এ গাধাক? কেনে যাইস্?

— ঘাস খিলাবার, বিয়ান থাকি কিছু প্যাটোত পড়ে নাই উয়্যার।

— শুনছিস, হামাক যে ভেতরেও পাঠাওছে, এ্যাটে থাকা আর চইল্বার নয়।

— শুনছো কিন্তু ইয়াবে কিন্তু হইবে? কাঁয় দেইখবে ইয়াক, কাঁয় খিলাইবে?

— ওরে শা... ফাঁকিরাঙ্গ? গাধাকে ঘাস খাওয়ানোর জন্য তুমি যুক্তে এসেছো? ওসব চালাকি রাখি দেন বাপধন, ভেতরত যাওয়ার জন্য রেডি হন, গাধার জন্য ম্যালা মানুষ আছে।

রউফ কিছু বলতে পারে না। গাধাটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে শুধু। গাধাটা নিয়ে আসবার পর থেকে রউফ এটার দেখাশোনা করছে। একটা গভীর যমতা গড়ে উঠেছে ওর পশুটার ওপর। এতোদিন গাধার দোহাই দিয়ে সে অপারেশনের হাত থেকে পার পেয়েছে। এবার সত্যিই তাকে যেতে হবে। বিষপ্ত হয়ে ওঠে রউফ যিয়া।

পরিশিষ্ট
সেটর ৬, সাবসেটর ৬-এ
চাউলহাটি ইউনিট বেসের মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা (অসমৰ্ণ)

ক্রমিক নম্বর	নাম	নিজ জেলা	বর্তমান পেশা	মন্তব্য
১.	মোঃ নূরল হক	ময়মনসিংহ	চাকুরে	
২.	এ. কে. এম. মাহবুব উল আলম	রংপুর	চাকুরে	
৩.	পানোয়ার রহমান ভুইয়া পিন্টু	রংপুর	চাকুরে	
৪.	আহিদার রহমান প্রধান	লালমনিরহাট	বিদেশ প্রবাসী	
৫.	গোলাম মোস্তফা	নীলফামারী	-	
৬.	গোলাম গডস	রংপুর	-	শহিদ
৭.	আবদুল জব্বার-১	নীলফামারী	ব্যবসা/রাজনীতি	
৮.	খলিলুর রহমান-১	রংপুর	-	
৯.	আব্দতার হোসেন	রংপুর	-	
১০.	মতিয়ার রহমান-১	শাঙ্গাড়	ব্যবসা/কৃষি	
১১.	খলিলুর রহমান-২	ঠাকুরগাঁও	চাকুরে	
১২.	মিনহাজউদ্দিন	ঠাকুরগাঁও	কৃষি	
১৩.	মমতাজ হোসেন	রংপুর	-	
১৪.	মোহাম্মদ ইব্রাহিম	রংপুর	-	
১৫.	গোলাম মোস্তফা-২	রংপুর	-	
১৬.	বাচ্চা মিয়া	রংপুর	চাকুরে	
১৭.	আবদুল গনি	ঠাকুরগাঁও	-	
১৮.	মোসলেম আলী	ময়মনসিংহ	চাকুরে	
১৯.	মোতালেব হোসেন	ঠাকুরগাঁও	ব্যবসা/কৃষি	
২০.	আকুল মালেক	ঠাকুরগাঁও	কৃষি	
২১.	মনজুর রহমান	ঠাকুরগাঁও	চাকুরে	
২২.	মোঃ হানিফ	ঠাকুরগাঁও	-	
২৩.	নাদের হোসেন	রংপুর	চাকুরে	
২৪.	ইকবারুল হক	নীলফামারী	চাকুরে	

২৫.	মধুসূদন বর্মন	ঠাকুরগাঁও	কৃষি
২৬.	আবদুর রাউফ	রংপুর	চাকুরে
২৭.	মোঃ হাসান	রংপুর	চাকুরে
২৮.	আইয়ুব আলী	পঞ্জগড়	-
২৯.	আবদুল মজিদ	ঠাকুরগাঁও	বেকার
৩০.	তাইয়াবুর রহমান	পঞ্জগড়	-
৩১.	আক্ষাস আলী	লালমনিরহাট	-
৩২.	একাবর আলী	রংপুর	শ্রমিক
৩৩.	মজিবর রহমান	রংপুর	-
৩৪.	আবদুল হাসী	রংপুর	বেকার
৩৫.	চৌধুরী সামসুল হক	রাজশাহী	-
৩৬.	আবদুল জব্বার-২	ঠাকুরগাঁও	ব্যবসা
৩৭.	চান্দ মিয়া	পঞ্জগড়	বেকার
৩৮.	শহীদুল ইসলাম বাবলু	কুড়িয়াম	রাজনীতি/ব্যবসা
৩৯.	মোঃ মুসা	কুড়িয়াম	ব্যবসা
৪০.	নজরুল ইসলাম	কুড়িয়াম	-
৪১.	আনোয়ার হোসেন	কুড়িয়াম	-
৪২.	মামুন অর রশীদ	গাইবান্ধা	চাকুরে
৪৩.	তরতচন্ত	ঠাকুরগাঁও	-
৪৪.	সম্মাখ	ঠাকুরগাঁও	বেকার
৪৫.	প্রবীর কুমার	কুড়িয়াম	-
৪৬.	শামসুল	কুড়িয়াম	চাকুরে
৪৭.	জয়নাল আবেদ্দিন-১	ঠাকুরগাঁও	ব্যবসা
৪৮.	গোলাম হাফেজ	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
৪৯.	মতিয়ার রহমান-২	পঞ্জগড়	-
৫০.	আবদুল মতিন	পঞ্জগড়	কৃষি
৫১.	তবীবুর রহমান	কুড়িয়াম	-
৫২.	মোঃ শাহজাহান	কুড়িয়াম	-
৫৩.	বসারত হোসেন	কুড়িয়াম	চাকুরে
৫৪.	আবু বকর	কুড়িয়াম	চাকুরে
৫৫.	পহর আলী	পঞ্জগড়	চাকুরে
৫৬.	সফির উদ্দিন	পঞ্জগড়	শ্রমিক
৫৭.	আফছার আলী	কুড়িয়াম	-
৫৮.	জহিরুল হক	কুড়িয়াম	-
৫৯.	ওফিজুল ইসলাম	পঞ্জগড়	-
৬০.	হাবিবুর রহমান	কুড়িয়াম	-

৬১.	দীনেশচন্দ্র	ঠাকুরগাঁও	-
৬২.	মোজাফ্ফেল হোসেন	পঞ্চগড়	-
৬৩.	সোলায়মান	পঞ্চগড়	চাকুরে
৬৪.	সবিজুল ইসলাম	পঞ্চগড়	-
৬৫.	জাকারিয়া হোসেন	কুড়িয়াম	-
৬৬.	সফিকুর রহমান	কুড়িয়াম	-
৬৭.	অমিতী কুমার	ঠাকুরগাঁও	কৃষি
৬৮.	সফিজ উদ্দিন	পঞ্চগড়	কৃষি
৬৯.	মোঃ নূরউদ্দিন	কুড়িয়াম	চাকুরে
৭০.	মোঃ শাহজাদা	কুড়িয়াম	-
৭১.	মোসারদ হোসেন	কুড়িয়াম	দিনমজুর
৭২.	আবদুল খালেক	পঞ্চগড়	-
৭৩.	জয়নাল-২	ঢাকা	চাকুরে
৭৪.	আবুল হোসেন	কুড়িয়াম	-
৭৫.	জহিরুল ইসলাম	পঞ্চগড়	ব্যবসা
৭৬.	গির্যাস উদ্দিন	পঞ্চগড়	-
৭৭.	কবির হোসেন	ঠাকুরগাঁও	-
৭৮.	সজিমদিন	পঞ্চগড়	কৃষি
৭৯.	নিয়ামুল হক	পঞ্চগড়	-
৮০.	আজিজুল হক	কুড়িয়াম	-
৮১.	ইয়াসিন আলী	ঠাকুরগাঁও	-
৮২.	আনোয়ারুল হক	কুড়িয়াম	-
৮৩.	মতিয়ার রহমান-৩	নীলকামারী	চাকুরে
৮৪.	সামসুল হক-২	নীলকামারী	চাকুরে
৮৫.	ইয়াকুব আলী	পঞ্চগড়	চাকুরে
৮৬.	হাবিবুর রহমান-২	পঞ্চগড়	ব্যবসা/কৃষি
৮৭.	বদিউজ্জামান	কুড়িয়াম	চাকুরে
৮৮.	খায়রুল ইসলাম	পঞ্চগড়	কৃষি
৮৯.	তরিকুল ইসলাম	পঞ্চগড়	কৃষি
৯০.	নজরুল ইসলাম-১	পঞ্চগড়	কৃষি
৯১.	নজরুল ইসলাম	পঞ্চগড়	কৃষি
৯২.	ইয়াছিন আলী	পঞ্চগড়	চাকুরে
৯৩.	মনছুর আলী	রংপুর	চাকুরে
৯৪.	এ.এফ.এম সফিউল আলম	রংপুর	চাকুরে
৯৫.	মো. আবদুল হাকিম	রংপুর	চাকুরে
৯৬.	মো. আজিজুল ইসলাম	রংপুর	বেকার

১৭. মো. আনসার আলী	রংপুর	কৃষি
১৮. মো. কাওছুর আলী	পঞ্জগড়	সাংবাদিকতা
১৯. মাও: মো. রবিউল ইসলাম	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১০০. মো. খতিবর রহমান (শহীদ)	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১০১. মো. খিজমত আলী (শহীদ)	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১০২. মো. আঃ গফুর	পঞ্জগড়	বেকার
১০৩. মো. আঃ গণি	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১০৪. মো. সিদ্দিক হোসেন	পঞ্জগড়	দিনমজুর
১০৫. মো. আঃ হাকিম	পঞ্জগড়	কৃষি
১০৬. মো. জহিল্ল ইসলাম (১)	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১০৭. মো. কিসমত আলী (শহীদ)	পঞ্জগড়	বেকার
১০৮. মো. জহিল্ল ইসলাম (২)	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১০৯. মোহাম্মদ সফি	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১১০. মো. ইসমাইল হোসেন	পঞ্জগড়	দিনমজুর
১১১. মো. আব্দুল মজিদ	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১১২. মো. তবিবৰ রহমান	পঞ্জগড়	বেকার
১১৩. মো. মফিজুল ইসলাম (১)	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১১৪. মো. আজিজুল ইসলাম	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১১৫. মো. আঃ কানের	পঞ্জগড়	কৃষি
১১৬. মো. রফিক উদ্দীন	পঞ্জগড়	ব্যবসা/কৃষি
১১৭. মো. আঃ গফুর	পঞ্জগড়	বেকার
১১৮. মো. নাজিম উদ্দীন	পঞ্জগড়	বেকার
১১৯. মো. শুভুর আলী	পঞ্জগড়	কৃষি
১২০. মো. আবুল কাশেম	পঞ্জগড়	কৃষি
১২১. মো. লাল মিশ্রা	পঞ্জগড়	বেকার
১২২. মো. মফিজুল ইসলাম (১)	পঞ্জগড়	বেকার

হাইড অ্যাটে (এক)
AMARBOI.COM

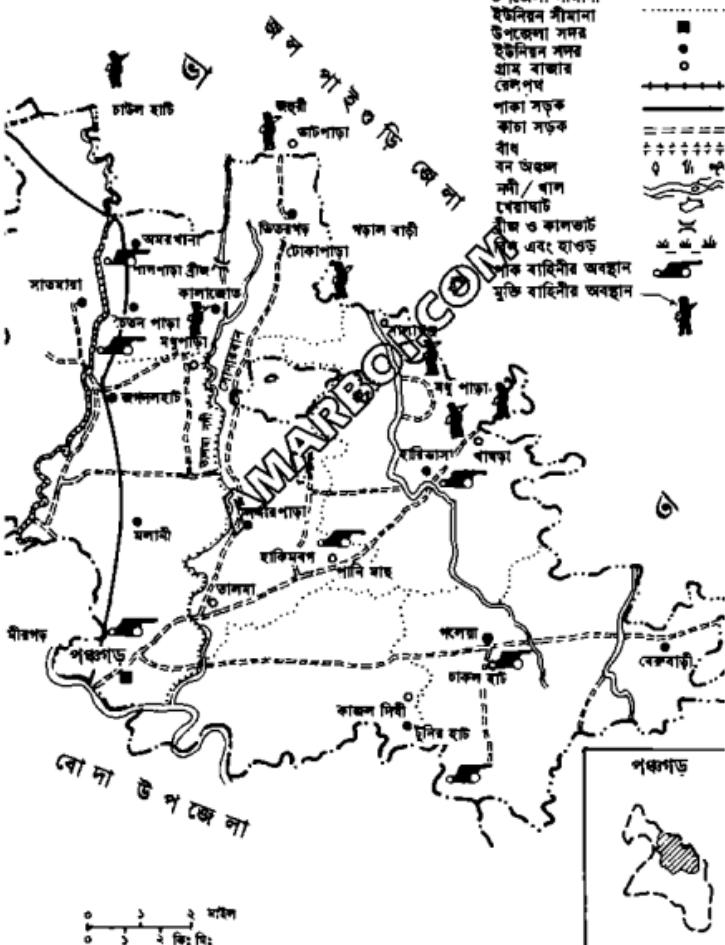
পঞ্চগড় জেলা

ପଞ୍ଚଗାଡ଼



३८५

- ଅନୁର୍ଧିତ ଶୀମାନ
 ଲେଖନ ଶୀମାନ
 ଉପଲେଖନ ଶୀମାନ
 ଉପଲେଖନ ସମ୍ପଦ
 ଆମ ବାଜାର
 ରେଳ ପଥ
 ଲାକ ସତ୍କ
 କାଟା ସତ୍କ
 ଶୀଘ୍ର
 ନନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ
 ନୀତି / ବାଲ
 ହରାଚାର
 ଶୈଳ ଓ କାଳାଚାର
 ଏହା ହାତକ
 ଲାକ ବାଲିନୀର ଅବଧାନ
 ମୁକ୍ତ ବାହିନୀର ଅବଧାନ



REPORT "

25.7.71

- ① First hide out at Bakupara $\frac{7}{8}$ miles from Tokapara Garapara bsp and 1 mile from Northern side of town satisfactorily prudent. Recce the whole area. Scouting party
- ② The area favourable to us
- ③ A bridge about 15 ft long called Bishnupur bridge. For crossing and about $\frac{10}{15}$ min for big Guard if rifle or civil -

25.7.71

Explosives taken

0	PIC	24 1/2
1/2	Cordite	50 mtr
1/2	Detonator	15
1/2	powder	20
1/2	safety fuse	10 mtr
1/2	safety match	2

ভায়েরি পৃষ্ঠা

26.8.71

11

EXPENDITURE OF AGRICULTURE

Reported 1st @ 6:30 AM
lock has smashed on
5th of 4th. All persons
now scattered about town

Secting mission to the
civilized part to determine
the right outfit on the
Avalokitesha - JAGDAL HAT AT ①

Agent of the
Gurdwara Board
in London
is kindly asked
not from BACKED OFFICE : effect
of the letter from
the Agent of the
Gurdwara Board.

Imped.	$3 + 2$	$+ 5$ bank.
Q. Hand	10	
IMPL PLOSIVE		
P.E.K.	$30 + 24$	≈ 54 lbs
Dettinator	≈ 15	
Primes	≈ 15	
Safety fire	$: 13$ ft.	
order K		$= 260$ ft.
Safety switch		$\rightarrow 4$

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইড আউট

হাইড আউট কথাটার অর্থ হচ্ছে লুকনোর জায়গা। গেরিলা যুদ্ধে হাইড আউটের ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। শক্রকবলিত এলাকায় অনুপ্রবেশের পর নিজেদের লুকিয়ে রাখার জন্য একটা গোপন ও নিরাপদ আস্তানার প্রয়োজন হয়। আর সেই আস্তানা থেকে করা হয় গোপনে শক্র ওপর নজরদারি, শক্র বিরুদ্ধে আক্রমণের পরিকল্পনা। সেই সাথে শক্র ওপর অতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করার পর তাকে পরাভূত কিংবা তার প্রভৃত ক্ষতির কারণ ঘটিয়ে নিরাপদে সেই আস্তানায় ফিরে আসার জন্যই প্রয়োজন হয় এ জাতীয় আস্তানার। স্বল্প সময়ের মৌটিশে আবার সেই আস্তানা পুটিয়ে পিছিয়ে আসতে হয় কিংবা অন্য কোনো নিরাপদ আস্তানায় গিয়ে নিতে হয় আশ্রয়। একেই বলে গেরিলা যুদ্ধের ভাষায় 'ক্লিফ আউট'।

এর আগে এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে অনুপ্রবেশের কাহিনী বলা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়ে উঠলোঁ প্রাক্তনযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো থেকে ফ্রন্টে আসছিলো তখন ভারতীয় সীমান্ত ঘৰ্ষণে স্থাপিত ক্যাম্প থেকে রাতের অন্ধকারে অধিকৃত বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ প্রবং নির্দিষ্ট অপারেশনের টাঙ্ক পালনের পর আবার সীমান্ত পেরিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়াতে হতো। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে অসম্ভব কড়াকড়ি শৃঙ্খলা অব্যুক্তিমূলকভাবে মধ্যে কাটাতে হতো আমাদের সেই সময়কার ক্যাম্পের দৈনন্দিন জীবন — সারাদিন ক্যাম্পের তাঁবুর ভেতরে অলস মস্তুর সময় কাটানো, বিকেলের দিকে অফিসারের কাছ থেকে অপারেশনাল টাঙ্ক বুকে নেয়া, ব্রিফিং ও হাতিয়ারপত্র গ্রহণ, সন্ধ্যায় আহারপর্বের পর রাতের অন্ধকারে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ, অপারেশনাল টাঙ্ক শেষ করে আবার ভোরের দিকে ক্যাম্পে ফেরা। পরদিন সকালে অফিসারের কাছে অপারেশনের সফলতা কিংবা বিফলতা সম্পর্কে রিপোর্ট করা, অলস দুপুরে তাঁবুর ভেতর বেয়োর ঘুমে কাটিয়ে দেয়া, বিকেল হওয়ার পর থেকেই আবার অপেক্ষা। অফিসার আসবেন, নতুন অপারেশনের টাঙ্ক দেবেন, রাতের অন্ধকারে আবার অধিকৃত বাংলাদেশে যেতে হবে। রুটিনমাফিক ছিলো সেই জীবনের ধারা।

সেই সময়টায় পাকবাহিনী প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলেও দিনাজপুরের তেতুলিয়া, রংপুরের পাট্টাম, ফুলবাড়ি আর বৌমারি থানা চারটি ছিলো তাদের অধিকারের বাইরে । তবে তাদের পক্ষে বর্জন সিল করা সম্ভব হয় নি । বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের ওপার থেকে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা অর্ধাং এফ. এফ বা ফ্রিডম ফাইটারদের নিয়মিত অনুপ্রবেশ ঘটতো । পাকবাহিনীর ওপর পেছন থেকে ঝটিকা আঘাত করে সাথে সাথে মিলিয়ে যাওয়া, তাদের যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন বিনষ্ট করা, ব্রিজ-কালভার্টগুলো উড়িয়ে দেয়া, তাদের চলাচল পথে মাইন স্থাপন করা, রেললাইন-টেলিফোন লাইন ধ্বংস করা এবং সেই সাথে শক্র গতিবিধি, তাদের আচার-আচরণ ও পরিচিতি, তাদের সংখ্যা ও অন্তর্শক্তি এবং অন্তর্শক্তির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিসহ তাদের ইউনিট পরিচিতি ইত্যাদি সম্পর্কে রেকি বা স্রোজখবর নেয়া । অনুপ্রবেশ করার সময় আর যে কাজ করতে হতো, সেটা হচ্ছে পাকবাহিনীর অনুচর, দালাল ও শান্তিবাহিনীর সদস্য-কর্তাদের চিহ্নিত এবং তাদের সম্মূলে বিনাশ বা তাদের সম্পর্কে পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

আগেই বলা হয়েছে, অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা ঘটতো ভারতীয় এলাকা থেকে । ভারতীয় সীমান্ত ঘেষে তখন বিভিন্ন ট্র্যাটোজিক পয়েন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিলো । সেই সব ক্যাম্প থেকে অধিকৃত বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় এফ.এফদের বহু ঘটনার মোকাবিলা করতে হয়েছে । হতে হয়েছে নানা অবাস্তু ঘটনার শিকারও । তবুও অনুপ্রবেশের ব্যাপকটি ছিলো অনেকটা নিরাপদ । কারণ রাতের অক্ষরে অপারেশন শেষে সীমান্তে ওপারে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারলেই আর শক্র ভয় ছিলো না । মাত্র দু'একটি বাতিক্রম ছাড়া, পাকবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের পিছু ধাওয়া করে কখনোই ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করেনি । সুতরাং সীমান্তের ওপারে স্থাপিত ক্যাম্প থেকে পরিচালিত অপারেশন অনেকটা নিরাপদ ছিলো । আমাদের চাউলহাটি ইউনিট বেসের ভাটপাড়া ক্যাম্প থেকে পরিচালিত সেই সব অপারেশনের কাহিনী যুক্ত্যাত্তা পর্বে বলা হয়েছে । ভাটপাড়া থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়ে চাউলহাটিতে আমাদের মূল ক্যাম্প স্থাপিত হওয়ার পর অর্ধাং মধ্য জুলাই থেকে গেরিলা যুদ্ধের ধারা বদলে যায় । ভারতীয় সীমান্ত থেকে আর অধিকৃত বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ নয়, এবার এফ. এফদের সীমান্ত পেরিয়ে তাদের নিজেদের দেশ শক্রকবলিত বাংলাদেশের ভেতরে ঘাটি গড়তে হবে । আর সেখানে অবস্থান করেই তাদের যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রন্থয়ন আর পরিচালনা করতে হবে গেরিলা যুদ্ধ ।

সুতরাং ভারতের নিরাপদ এলাকা ছেড়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের চুক্তে হলো অধিকৃত বাংলাদেশে । খুঁজে নিতে হলো গোপন আন্তর্না অর্ধাং হাইড আউট ।

নতুন পরিকল্পনা : যুদ্ধের গতিধারার পরিবর্তন

নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী চাউলহাটি ইউনিট বেসের এফ.এফদের চারটা কমান্ড ভাগ করা হলো । তিরিশজন এফ.এফ নিয়ে এক একটা কমান্ড বা দল । প্রথমটির কমান্ডার

আমি নিজে। দ্বিতীয়টির কমান্ডার পানোয়ার রহমান ভুইয়া পিন্টু। তৃতীয়টির কমান্ডার বদিউজ্জামান মাস্টার আর চতুর্থ কমান্ডের দায়িত্ব আহিদার রহমানের ওপর। মেজর দরজি তার তাঁবুর ভেতরে বসা অধিবেশনে কমান্ডের দায়িত্ব ও নতুন পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। এবার আর কোনো অপারেশন ভারতীয় অংশ থেকে নয়। প্রতিটি কমান্ড বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ জায়গা বেছে নিয়ে তাদের হাইড আউট স্থাপন করবে। তারা তাদের নিজেদের অপারেশনাল প্ল্যান ঠিক করবে নিজেরাই। এরপর তিনি তার টেবিলে পেতে রাখা এনলার্জড ফিল্ড ম্যাপটির ওপর লাল রঙের পেপ্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে করে প্রতিটি কমান্ডের সংজ্ঞ্য হাইড আউট স্থাপনের এলাকা সম্পর্কে ধারণা দিলেন।

মেজর দরজির এনলার্জড ফিল্ড ম্যাপে উল্লিখিত জায়গাগুলোতে হাইড আউট করার মতো যথেষ্ট নিরাপদ আর সুবিধামতো জঙ্গল-বোপাড় দেখানো হয়েছে। তবে ব্রিটিশদের তৈরি বহু পুরাতন এই সিএস ম্যাপে প্রদর্শিত জঙ্গল-বোপাড়ের নিরাপদ অঞ্চলগুলো এতোদিনের ব্যবধানে আছে কি না, কে জানে! কথাটা জিগ্যেস করতেই গুরু মেজর হঠাত করেই থেকিয়ে উঠলেন, তুমলোগ পাহলে যাইয়েতো, গো ফার্স্ট। রেকি করো, উধার হাইড আউট প্লেস জরুর মিলেগা। মেজর যেনো তেতে আছেন নতুন পরিকল্পনার বুটিনাটি নিয়ে। তাঙ্কে আর ঘাঁটানোর সাহস হয় না। দেখা যাক, কতোদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় সময় এবং পরিস্থিতি বলে দেবে সবকিছু। ম্যাপে চিহ্নিত এলাকাগুলো অসমীয়া কার্মরই পরিচিত নয়। ওদিকে যেতে হয় নি কোনো অপারেশনের টার্ক প্রক্রিয়া। তবে ম্যাপের অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে, এলাকাগুলো সব পঞ্চগড় জুরুর থেকে ১০/১৫ মাইলের মধ্যে উত্তর-পূর্ব দিকে, অর্থাৎ তারতীয় সীমান্ত ছান্ট গড়ালবাড়ি-বেরুবাড়ি ও সাকাতির উল্টো দিকে। উত্তরের ভেতরগড় পাঠক পুর দিকের মারেয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকতে হবে আমাদের।

প্রত্যেক কমান্ডের জন্য হাতিয়ার ইস্যু করা হলো। দেয়া হলো গোলাগুলি, প্রেনেড, এক্সপ্লেসিভ, ফার্স্ট এইডের সরঞ্জাম, প্রাথমিক চিকিৎসার শুধুপত্র আর ৭ দিনের রেশন। সিদ্ধান্ত হলো মেজর দরজি চাউলহাটি ইউনিট বেস হেডকোয়ার্টারে থেকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে থাকা হাইড আউটের ৪টি ফ্রন্টের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ আর সময়ের রক্ষা করবেন। পরিচালনা করবেন তাদের অপারেশনাল প্ল্যান এবং অন্যান্য দিক। তাঁর সহকারী হিসেবে বড় ভাই নুরুল হক অবশিষ্ট ছেলেদের নিয়ে থেকে গেলেন হেড কোয়ার্টারে। স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে হেড কোয়ার্টারে অবস্থানরত ছেলেদের নিয়ে দ্রুত দল তৈরি করে কাজ করার জন্য নুরুল হকের অধীনে থেকে গেলেন কমান্ডার জব্বার ও মতিয়ার। সবকঁটি কমান্ডের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, রেশন, অন্ত ও গোলাবারুণ ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে যে-কোনো কমান্ডের আপদকালে দ্রুত ইনফোর্মেশনের দায়িত্ব রাইলো তাদের ওপর। এছাড়াও হেড কোয়ার্টার স্ট্রাইকিং ফোর্সকে অমরখানায় ঘাঁটি পেতে বসা পাকবাহিনীর ডিফেন্স রেকি, সেই সাথে অমরখানার উল্টো দিকে ভারতীয় সীমানায় অবস্থিত দুটি

উচু আমগাছের ওপর থেকে টেলিক্ষোপের সাহায্যে পাকবাহনীর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্য অবজারভেশন পোর্টের দায়িত্ব দেয়া হলো।

২৩. ৭. ৭১

সারণি-১

প্রতিটি কমান্ডের জন্য ইস্যুকৃত অন্ত গোলাবারুদ বিক্ষেরক ও অন্যান্য উপকরণ

অঙ্গ	সংখ্যা
১. রাইফেল .৩০৩	১১
২. এস.এম.জি ৯ এম.এম	৪
৩. রাইফেল ৭.৬২	১
৪. হ্যান্ড গ্রেনেড	২৪
৫. ২ ইঞ্জিং মার্টার	১
৬. বেয়ানেট	১০
৭. ২ ইঞ্জিং মার্টার	১

গোলাবারুদ

১. গুলি .৩০৩	১৫০
২. গুলি ৭.৬২	২৫০
৩. গুলি ৯ এম.এম	৫৯২
৪. শেল ২ ইঞ্জিং মার্টার	৮

বিক্ষেরক ও অন্যান্য উপকরণ

১. কারটেক্স	১৫০ মিটার
২. সুইচ ৪/৬	৪
৩. ডেটোনেটর	৩০
৪. সেফ্টি ফিউজ	৩০ মিটার
৫. ইগনেটর ট্রিপ	৩
৬. প্রাইমার জিসি	৬০
৭. ম্যাচ ফিউজ	৮
৮. পি.ই. কে	৫০ পাউন্ড

[সূত্র : ভায়েরি]

টাক্স : মিশন বাংলাদেশ

সিদ্ধান্ত হলো, বাংলাদেশে হাইড আউট স্থাপনের পর প্রতি তিন দিন শেষে চতুর্থ দিন সকালে পূর্ব নির্ধারিত ভারতীয় সীমান্ত ফাঁড়িতে এসে প্রত্যেক ক্ষেত্রে কমান্ডারকে তাদের তিনদিনের কার্যাবলির রিপোর্ট পেশ করতে হবে মেজর দরজির কাছে। তিনি তাদের কার্যাবলি রিভিউ করবেন। অপারেশনাল প্ল্যান দেবেন এবং যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে নতুন সিদ্ধান্ত জানাবেন। প্রয়োজনে তিনি হাইড আউট স্থাপনের জন্য নতুনভাবে পরামর্শও দেবেন। কোনো একটা হাইড আউটে দু দিনের বেশি থাকা যাবে না, স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে মেশা যাবে না। নিজেদের উপস্থিতির কথা কাউকে

জানানো যাবে না। অপারেশন মূলত রাতে করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা নিজদের বাঁচানো ছাড়া পাক আর্মির সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়া যাবে না। ক্ষোয়াড় কমান্ডারদের প্রতি মেজর দরজির এটাই ছিলো চূড়ান্ত ক্ষেপিং।

অবশেষে এলো সেই বিষণ্ণ সন্ধ্যা। আমরা চাউলহাটির নিরাপত্তা থেকে আমাদের প্রিয় তাঁবুগুলো ছেড়ে রওনা দিলাম নতুন অজানা এক গন্তব্যের দিকে। নতুন ধারার এক জীবনযাপন অভিযুক্ত, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপই অনিচ্ছিত এক মৃত্যু ফাঁদ পেতে রেখেছে যেখানে-সেখানে।

সারণি-২

অমরখানা থেকে মারেয়া—বাংলাদেশের সীমান্ত বেষ্টনীর এই এলাকার মধ্যে ৪টি কমান্ডকে এভাবে ভাগ করা হলো :

১ নম্বর ক্ষোয়াড় ভারতীয় গড়ালবাড়ি এলাকা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং ভেতরগড়-নালাগঞ্জ এলাকা থেকে পঞ্চগড়কে কেন্দ্র করে অপারেশন করবে। তারা প্রথম হাইড আউট করবে সীমান্ত থেকে প্রায় আট মাইল ভেতরে হৃদাপাড়ায়।

২ নম্বর ক্ষোয়াড় ভারতীয় বেরুবাড়ি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং হাড়িভাসা এলাকা দিয়ে পঞ্চগড় পর্যন্ত অপারেশন চালাবে। তাদের প্রথম হাইড আউট হবে মোহনপাড়া।

৩ নম্বর ক্ষোয়াড় ভারতীয় সাকাতি এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে চুকবে এবং গলেয়া এলাকা থেকে পঞ্চগড়-বোদা থানা পর্যন্ত অপারেশন চালাবে। তাদের প্রথম হাইড আউট হবে ভান্ডাউড়া গ্রাম।

৪ নম্বর ক্ষোয়াড় ভারতীয় হুন্দিবাড়ি-মানিকগঞ্জ এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে চুকবে এবং চাকলারহাট, মারেয়া ও কুমারদাপি এলাকা দিয়ে বোদা থানা এলাকায় অপারেশন চালাবে। তাদের প্রথম হাইড আউট হবে কাজলদিঘিতে।

অফিসার কমান্ডিং মেজর দরজির কাছে প্রতি তিনিদিন পরপর প্রতিটি ক্ষোয়াড় কমান্ডারকে ভারতীয় বি.এস.এফ ক্যাম্পে এসে রিপোর্ট করতে হবে। ৪টি কমান্ড যথাক্রমে রিপোর্ট করবে গড়ালবাড়ি, বেরুবাড়ি, সাকাতি ও মানিকগঞ্জ বিভিন্নতে।

(সূত্র : ডায়েরি)

পরিকল্পনা মাফিক আমরা যাত্রা শুরু করলাম। রাতের অঙ্ককারে স্বাধীন কমান্ড নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে থাকবার জন্য সীমান্ত পার হলাম। রওনা দিলাম নির্দেশিত হাইড আউট অভিযুক্ত। সেদিন ছিলো ১৯৭১ সালের ২৪ জুলাই।

প্রথম হাইড আউট

দুটি মিলিটারি লরি পিন্টু আর আমার দলকে গড়ালবাড়ি বিওপির সামনে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেলো। সন্ধ্যা তখন তার ধূসরতা নিয়ে ঘনিয়ে এসেছে। বিওপির নেপালি

সুবেদার আমাদের সাথে কথা বললেন। আমরা তার কাছ থেকে জানতে চাইলাম সম্মুখবর্তী বাংলাদেশ এলাকার খবরাখবর। টোকাপাড়া ম্যাসাকারের পর এদিকে আর আসা হয়েনি। শক্র বাহিনীর লোকজনদের বর্তমান গতিবিধির সঠিক ও সর্বশেষ তথ্য আমাদের জানা নেই। টোকাপাড়া এলাকায় আবারো শক্রবাহিনী এসে ঘাঁটি গেড়েছে কি না, জানাটা আমাদের একান্ত দরকার। এছাড়া শক্র আক্রান্ত আমাদের ভঙ্গীভূত টোকাপাড়া ক্যাম্প সম্পর্কে মনের ভেতরে রয়েছে একটা ভীতিকর অস্পতি। গোলাম গউস মারা গেছে ও খানেই। গড়ের নিচে তাঁকে কবর দিয়েছি আমরা। বাংলাদেশে চুক্তে গেলে আমাদের অবশ্যই টোকাপাড়ার কাছ দিয়েই যেতে হবে। গউসের কবর পড়বে পথে। ওর মৃত্যুর ঘটনা তখন পর্যন্তও আমাদের মনের ভেতরে একটা হাহাকার জাপিয়ে রয়েছে। সেই সাথে সহযোগীর করুণ শূন্যতাও যেনো এখন পর্যন্ত আমাদের সার্বিক্ষণিক সঙ্গী। ওকে ভুলতে পারা অসম্ভব। তার কবরের কাছাকাছি দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমাদের জন্য খুব কঠিন কাজ। সবাই চাইছে যেনো আমাদের গউসের কবর যেমনে টোকাপাড়ার ওপর দিয়ে যেতে না হয়।

নেপালি সুবেদার খুবই ভালোমানুষ। আর্মিতে রিটায়ারমেন্ট নিয়ে বি.এস.এফ-এ যোগ দিয়েছেন। কথাবার্তায় তার পিতৃসূলভ আচরণ। তিনি বললেন, সাব ইয়ে আছ্য নেই হতো হ্যায়, আপলোগ ভেতর যে জায়গা, আগের উত্থার ক্যাম্প কারেগা। ইয়ে বছত বড়া রিস্ক হ্যায় বাবুজি। আপলোগ তে বছত হ্যায়। কিধার হ্যায় দুশ্মন, কাহাসে আয়েগা, কব আয়েগা, আব নেতৃ কীভুতে। আওর আপলোগকো প্রেজেন্স ভেতরকা রাখনেওয়ালা পাবলিক জান যাবেগ। সব লোগ তো ফ্রেন্ড নেই হ্যায় বাবুজি! কোন্ জানতে কোন্ মিতি হ্যাকেজডের কোন্ দুশ্মন হ্যায়?

আমি বলি, মগার ওস্তাদ হামে তো জানে চাহিয়ে, বাংলাদেশ-মে চুকনাই পাড়েগা। ইয়েহ তো অর্ডার হ্যায়, আওর ইয়েহ অর্ডার হামে মাননেই পাড়েগা।

— ইয়েহ বাত্? সুবেদার তখন বলেন, জব অর্ডার কিয়া মেজের তব তো জানেই পাড়েগা। ইয়েহ তো কৌজি কা ধরম হ্যায়। ঠিক হ্যায়, তব কেয়ারফুল রাহিয়েগা। এনেমি বছত খাতরানাক হ্যায়। কিসিকো বিসোয়াস নেই কর না চাহিয়ে।

— এনেমি কি কোই হৱকত ইধার হ্যায় ওস্তাদ?

— নেই জি। টোকাপাড়া ফাইট হোনেকি বাদ কোই পাক আর্ম ইধার নেই আয়া।

— আব সিউর হ্যায়?

— হ্যাঁ জি, মেরা পাস পুরা ইনফ্রামেশন হ্যায়।

সক্ষ্য গাঢ় হতে থাকে। চারদিকে অঙ্ককার জাঁকিয়ে নেমে আসে। আকাশে মেঘের আবরণ ভেদ করে কিছু কিছু তারার উকিউকি। রাতে বৃষ্টি নামার সজ্জাবনা কম। বৃষ্টি এলে সবকিছু পও হয়ে যাবে।

পিন্টু আমার সাথেই ভেতরে চুকবে। সীমান্ত পেরুবার পর আমরা আলাদা হয়ে যাবো। চলে যাবো যার যার নিনিট হাইড আউট অভিযুক্তে। গাট্টি-পেট্রা আর হাতিয়ারপত্র রাস্তার পাশে স্কুপ করে রেখে ছেলেরা ছড়িয়েছিটিয়ে শুয়ে-বসে রয়েছে। এখন আর চাউলহাটি ফিরবার কোনো উপায় নেই। সকলের সামনে এখন একটাই

বাস্তবতা— সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকতে হবে ভেতরে। লুকোবার আন্তর্বান হাইড আউট খুঁজে নিতে হবে। রাতের অঙ্ককার থাকতে থাকতেই এ কাজ শেষ করতে হবে। সাথে কোনো গাইড নেই। যে হাইড আউটের জায়গার কথা বলা হয়েছে, সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, সেখান পর্যন্ত আদৌ পৌছানো যাবে কি না, এমন ব্যাপারে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো আমাদের সামনে ঝুলে রয়েছে। তবে উপায় একটা কিছু যে হবেই এবং একটা কোথাও পৌছানো যাবে এবং পৌছুতে হবেই সুতরাং গুরুত্বকার। রওনা হওয়া দরকার। রাতের খাবার প্রত্যেকের জন্য দুটো করে রুটি এবং তার সাথে চিনি চাউলহাটি থেকে সাথে দিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব রাতের খাবারটার জন্য আমাদের ভাবনা নেই। পথে যেতে যেতে রুটির সাথে চিনি মিশিয়ে খেয়ে নিলেই চলবে। পিটুকে বললাম তৈরি হয়ে নিতে। দু'চারজন ছাড়া মূরতি ক্যাম্প থেকে আমাদের সঙ্গে আসা পুরনো ছেলেদের নিয়েই আমাদের দল দুটো তৈরি করা হয়েছে। মোটামুটি সকলেই এ ক'নিনে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। পুরনো ছেলেরা দলে থাকায় দলের লিডারশিপে এবং শৃঙ্খলা রক্ষায় কোনো অসুবিধে নেই। কার কী কাজ এর মধ্যেই সেটা ব্রিফিং করা হয়েছে। দলের মালসামান থচুর। অন্তর্গোলাবাকুদ ও বিস্ফোরকসহ অন্যান্য উপকরণ। সেই সাথে এক সংগ্রহের পুরো রেশন। আর আছে হাঁড়িপাতিল অর্থাৎ রান্নার সঁজামসহ ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিসপত্র। দেশের ভেতরে আন্তর্বান গেড়ে থাকত হলে যা-যা প্রয়োজন সবকিছুই দেয়া হয়েছে, এবং সেগুলো সঙ্গে নিতেই হিঁকে। বইতে হবে নিজেদের লটবহর নিজেদেরই। সাহায্য নেয়ার কোনো উপযুক্তি নেই। সাহায্য করারও কেউ নেই। চাল ও আটার বস্তা এবং ডালের বস্তাসহ অন্যান্য ভারি মালামাল কয়েকজনের কাঁধে-পিঠে-মাথায় তুলে দেয়া হলো। তারা নিউজুর এগিয়ে গিয়েই সেই সব ভার বোঝা অন্যদের কাছে রিপ্লেস করবে। অবশিষ্ট আমাদের কাঁধে উঠলো হাতিয়ার-গুলিগোলাসহ অন্যান্য মালসামান। একসময় সংস্কৃত মালসামান তুলে, ভালোভাবে হিসেবনিকেশ করে, চূড়ান্ত চেকিং শেষে ছেলেদের নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, মুভ!

বিদায়ের সময় সুবেদার বললেন, খোদা তোমাদের মঙ্গল করুক। প্রবীণ সৈনিক তিনি। আমাদের গমন পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজনের পেছনে একজন করে অঙ্ককারের ভেতরে হারিয়ে যেতে লাগলো। পিতৃত্বে এক বৃক্ষের সন্মেহ আশীর্বাণী যেনে আমাদের অগন্ত্য যাত্রার পথে পাথেয় হয়ে রইলো।

পিটু আমি পাশাপাশি হাঁটছি। সামনে রয়েছে সজিমউদ্দিন। প্রাক্তন মুজাহিদ সদস্য সজিমউদ্দিনের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও আমার হাইড আউটের জায়গা নির্ধারিত হয়েছে। জায়গাটার নাম হুদাপাড়া। সে-ই হয়তো নিয়ে যেতে পারবে আমাদের সেখানে। তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে সেটাই মনে হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই সে আমাদের আজকের রাতের গাইড। তার ওপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে পুরোপুরি। এছাড়া এ মুহূর্তে আমাদের আর কোনো গতাত্ত্ব নেই।

সীমান্ত পার হওয়া গেলো ঘট্টাখানেকের মধ্যেই। গড়ের ঢালুতে ভিজে ঘাসের ওপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। বেশি ওজনের ভারবাহী ছেলের দল এবার রিলিফ পাবে।

সকলকেই প্রায় ১৫ থেকে ২০ সের ওজনের ভার বইতে হচ্ছে। এটুকু রাস্তা পার হতে গিয়ে তাই সকলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বায়ে টোকাপাড়া। সামান্য এগিয়ে গিয়ে গড়ের পেছনে গড়স শুয়ে আছে। চারদিকে ঘনকালো অঙ্ককার। এর মধ্যে একদল মানুষের ভৃত্যে ছায়া নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে গড়ের ঢালুতে সামান্যক্ষণের জন্য বিশ্রাম। ফিসফাস কথাবার্তা। মনের শক্তি তাড়ানোর জন্য মুখে চার মিনার সিগারেট এবং ঘন ঘন ধূম উৎপরিণ। চারদিক সুনসান। নিঃশাড় নিস্তর। অমরখানায় যুদ্ধ শুরু হয় নি এখনও। অদূরে কোথা থেকে ভেসে আসে যিনি পোকাদের একঘেয়ে ডাক। জোনাকি পোকাদের যিকিমিকি আলোর মিছিল। এই রকম অবস্থায় মনের মধ্যে অস্ত্র কেউ যেনো হঠাতে কথা বলে ওঠে, এই যে চুকছি, বের হতে পারবো তো কোনোদিন? হঠাতে কানের ওপর একটা ভারি দীর্ঘস্থাসের উচ্চপ স্পর্শ। পিন্টুর। আমার পাশে চিত হয়ে শুয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে। হঠাতে সে ডেকে ওঠে, মাহবুব ভাই! আমি 'উ' বলে সাড়া দিই।

— একটা কথা বলবো?

— কি?

— আমি আলাদা থাকতে পারবো না।

— কী বললে?

— আমি আলাদা থাকতে পারবো না।

— কেনো?

— আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। আমার পক্ষে একা থাকা সম্ভব নয়।

— কী বলছো তুমি! তোমার জেআলাদা হাইড আউট।

— তা হোক। আমার ওপরে আপনি না থাকলে আমি কিছুই করতে পারবো না। সব লঙ্ঘণ হয়ে যাবে মেরুদণ্ডার মতো। আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না।

— এখন এসব কী বলছো? আগে বলো নি কেনো?

— আগে জানতে চাই নি। মরি-বাঁচি আমরা এক সাথে থাকবো মাহবুব ভাই।

— কিসু দরজি!

— দরজি জানবে কী করে? আমরা থাকবো একসাথে, অপারেশন করবো একসাথে। কিসু দরজিকে রিপোর্ট করবো আলাদা আলাদাভাবে। ওকে আমরা জানবো আমরা আলাদা আলাদা হাইড আউটে থাকি।

— ব্যাটা যদি জানতে পারে?

— জানবে কেমন করে? ও ভেতরে আসবে নাকি চেক করতে?

পিন্টু আমার সাথে থাকলে, দু'জনের সংখ্যা নিয়ে একটা ভালো শক্তি দাঁড়াবে এবং উভয়ের অন্ত গোলাবারুদ একসাথে হলে আমাদের শক্তি ও অনেক বাড়বে। তবে দু'দলের এক সাথে থাকতে গেলে হাইড আউটের ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে। এতেগুলো লোকের একসাথে কোথাও দুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা গোপন রাখা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। সুবিধেমতো হাইড আউটের আস্তানা প্রাণ্তিও সমস্যা দেখা দেবে। তবুও সিদ্ধান্ত নিলাম এক সাথে থাকবো। পিন্টু আমাকে ছাড়তে চায় না, আমিও

তাকে মনের থেকে রাখতে চাই আমার সাথে। আসলে পিন্টুর মতো ছেলেদের ছেড়ে থাকা শুবই কষ্টকর ব্যাপার।

আবার যাত্রা শুরু হয়। টোকাপাড়া ছেড়ে ভেতরগড়ের রাস্তা ধরে শিরখানের পোড়ো ভিটে থেকে সামান এগিয়ে গিয়ে দলটা বামের রাস্তা ধরে চলতে থাকে।

সজিমউদ্দিনকে সাথে নিয়ে পিন্টু আমি সামনে। পেছনে রয়েছে একরামুল, মোতালেব, মিনহাজ, খলিল, মধুসূদন, আকাস ও নাদের। ওরা ওদের সেকশনগুলোকে চালিয়ে নিয়ে আসছে। ভারবাহী ছেলেরা নৃজ হয়ে পড়ছে, হাঁফিয়ে উঠছে, থেমে যাচ্ছে, ধপাস করে কেউ মাল নামিয়ে ফেলছে। ওদের সবাইকে ঠিকঠাক মতো চালিয়ে নিয়ে আসতে হিমশিম খেতে হচ্ছে সেকশন কমান্ডারদের। শামসুল নামের যে নতুন ছেলেটা, অন্তুভাবে সে মাথার ওপর একটা আটোর বস্তা একাই বয়ে নিয়ে আসছে। সাংঘাতিক জেদ আর সহন শক্তি ওর। একবারও বলছে না, তার বোৰা অন্য কাউকে দিয়ে তাকে কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও রিলিফ দেয়া হোক। হাঁটতে হাঁটতে সজিমউদ্দিন এবার পুরো দলকে নিয়ে ঢোকে একটা গভীর শালবনের ভেতরে। এটা একটা ভারতীয় ছিটমহল।

শালবাগানের ভেতর দিয়ে প্রসারিত অঙ্ককার ছাওয়া কাদাময় পিছল পথ। মাঝে মাঝে ছোটখাটো গর্ত, খানাখন্দ আর ঝরা পাতার পাঞ্জুক পানি। ভূসূন্দেশ কাদা। হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায় পা ফেললে। তাই পা টেনে টেনে অসভ্য সতর্কতার সঙ্গে হাঁটতে হয়। এর মধ্যে দু'তিনজন পা হড়কে কুপুরিষ্ঠ হয়ে কাদাপানিতে মাথামারি হয়ে গেছে। কিছু মালসামান ভিজে গেছে। কুসুম লেগেছে। অসভ্য কষ্টকর এই পদব্যাত্র।

একসময় পা ভারি হয়ে আসে বিশ্বামীর ওপরকার ভারি বোৰা আরো ভারি হয়ে বসে। শরীর জ্বড়ে নেমে আসতে থাকে প্রচণ্ড ক্রাণ্টি। শরীর ঘেমে জবজবে হয়ে ওঠে। শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য মৃত্যুকরতে হয়। চোখের সামনে অঙ্ককার আরো ঘনীভূত হতে থাকে।

— সজিমউদ্দিন, আর কতোদূর?

— বেশি না-হায়। আর একখন হাঁটিলেই বন্টা শ্যাষ হয়ে আসিবে। আরো কিছুক্ষণ শেষ হয়। তারপরও কিছুক্ষণ সবার জীবনীশক্তি যেনো নিঃশ্বেষিত হওয়ার পথে। না, আর এভাবে সম্ভব নয়। যখন মনে হয়, সহ্য শক্তি সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পথে, প্রায় তখনি সামনে হঠাতে ফিকে আলোর একটা মাঠে এসে জঙগলটা শেষ হয়। ছেলেরা টলে পড়ে, ঢলে পড়ে, বসে পড়ে যার যার কাঁধের মাল ধপাস করে নামিয়ে দিয়ে। বিশ্বামীর জন্য বিরতি কিছুক্ষণ। এখানেই রাতের আহার সারবে সবাই। রাইফেলের গুলির বাত্রাটা মাথার নিচে রেখে পিন্টুকে বলি, সবাইকে জানিয়ে দাও এটা।

পিন্টু ঘাসের ওপর ফ্লাট হয়ে শুয়ে থেকেই সকলের উদ্দেশে হাঁক দেয়, শুতি শুতি দম নেও সবাই, আর রুটি খাও। খবরদার যান কাহো ঘুমি পড়েন না।

কিছুক্ষণ বিশ্বামীর পর রাতের আহারপর্য শেষ হয়। কিন্তু পানি নেই। প্রবল পানি তেষ্টা নিয়েই আবার রওনা দেয়ার সময় আসে। পিন্টুর যাওয়ার কথা মোহনপাড়া, আমার হুদাপাড়া। সজিমউদ্দিন জানায়, দুটো জায়গারই অবস্থান বেশ দূরে। ৪/৫

মাইলতো হবেই। তাছাড়া জ্যাগা দুটোকে ভালো করে সে চেনেই না। তাহলে উপায়?

রাত দ্রুত গড়িয়ে আসছে। সাথে প্রচুর লটবহর। এতোগুলো ছেলে। একটা নিরাপদ অঞ্চল যোগাড় করতে হবে। এমনিতেই সীমান্ত পেরিয়ে অনেক ভেতরে চুক্তে পড়েছি। আমাদের দেশের মাটি হলেও এখন সে শক্ত অধিকৃত এলাকা। তাই রাতের ভেতরেই সবকিছু নিয়ে একটা নিরাপদ অঞ্চল অর্থাৎ হাইড আউটে লুকোতে হবে। সবাই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। এতোগুলো মালসামানা টেনে নিয়ে অঙ্ককার হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজের ওপর মেজর দরজির ঠিক করে দেয়া হাইড আউট খুঁজে বেড়ানো এখন একটা বিরাট পাগলামো, সেই সাথে ঝুকিপূর্ণ ব্যাপারও। সমস্ত দল শক্তির হাতের মুঠোয় চলে যেতে পারে, কিংবা তাদের ওংপেতে থাকা কোনো জ্যাগায় তাদের এ্যামবুশের আওতায় পড়ে পুরো দল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। এই মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে দ্রুত সিঙ্কান্তে পৌছানো দরকার।

— মুই একটা কথা কহিবা চাহাছে, চিনতা করি দ্যাখেন, মাথা নিচু করে বসেছিলো সজিমউদ্দিন। হঠাৎ মাথা তুলে সে কথা বলা শুরু করে।

— কি বলবি? এমনিতে মেজাজ খিচড়ে ছিলো ওর ওপর। ও পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে সারাটা রাস্তা বলে এসেছে, এখন বলছে হুন্দুধুড়া-মোহনপাড়া চেনে না। পিন্টুও চিড়বিড়ে মেজাজে ছিলো, ও ক্ষেপে যায় হঠাৎ।

— শালা... কি বলবি বল? বহুত তো ভেলক দেখালি?

— আপনারা আমার বাড়িতে চলেন, শাল পেলায় আন্তরিকভাবে প্রস্তাব দেয় ও।

— তোর বাড়িতে? বলিস কিরে?

— হ, আমার বাড়িত বদলুপাত্ত ভাস্তুবিধা হবে নাই।

— তোদের বাড়িতে গোলে সেক জানাজানি হবে, এমনিতে তুই ঘুঁকি বাহিনীতে এসেছিস, তার ওপর একদল ঘুঁকিবাহিনী নিয়ে একেবারে নিজের বাড়িতে তুলবি। গ্রামের মানুষ জানবেই, তখন তোর পরিবার এবং পুরো গ্রামের ওপর নেমে আসবে সাংঘাতিক বিপদ।

— কি আর হবে? রাইতের মাঝে হামাক কোনোও একটো উঠিবার হবে, বিপদ কোনঠে আছে হামরা তো জানি না। হামার বাড়িতে উঠিলে, বিপদের কোনো তয় নাই, রাইতটাতো থাকি, পরে ভাবিবার পামো কোনঠে যাওয়া যায়। ইয়া যদি পরে বিপদ আইসে, আসিবার পারে, তখন আর কি হবে, হইলে হইবে, কিন্তু এই রাইতোতে হামারা এতোগুলো মানুষ, মুই তুমহাক ধরি আনিনু, কোনঠে ছাড়ি দেও কহেন? হাঁটেন, হামার বাড়িত চলেন, রাইতের বেলায় কাঁহায়ও জানিবে নাই।

সজিমউদ্দিন গোটা দলের নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে বিরাট এক রিক নিতে যাচ্ছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা বিষয়টা নিয়ে। আপাতত এছাড়া আর গত্যন্তর নেই। হয়তো এর জন্য সজিমউদ্দিন ও তার পরিবারকে বিরাট কোনো মূল্য দিতে হতে পারে। কিন্তু সেটা হবে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি। এ মুহূর্তে দলের নিরাপত্তার খাতিরে এ সিঙ্কান্ত নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

— ঠিক আছে, সজিমউদ্দিন, তোর গ্রামে, তোর বাড়িতেই চল। কিন্তু কেউ

‘যেনো জানতে না পারে সেই ব্যাপারটা। দেখিস।

— ঠিক আছে, চলেন। আম্বা আছে উপরে।

— কত দূরে তোদের গ্রাম?

— এখান থেকে এক মাইল হইবে মুই কহচু।

বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং খাবার পর দম ফিরে পাওয়া ছেলেরা আবার উঠে দাঁড়ায়। আবার চলা শুরু হয়। উদ্দেশ্য বদলুপাড়া। মেজের যাই বলুন, আমরা নিজেদের নিরাপত্তা ও সুবিধেজনক জায়গা বদলুপাড়াতেই আমাদের প্রথম ‘হাইড আউট’ স্থাপন করবো।

বদলুপাড়া

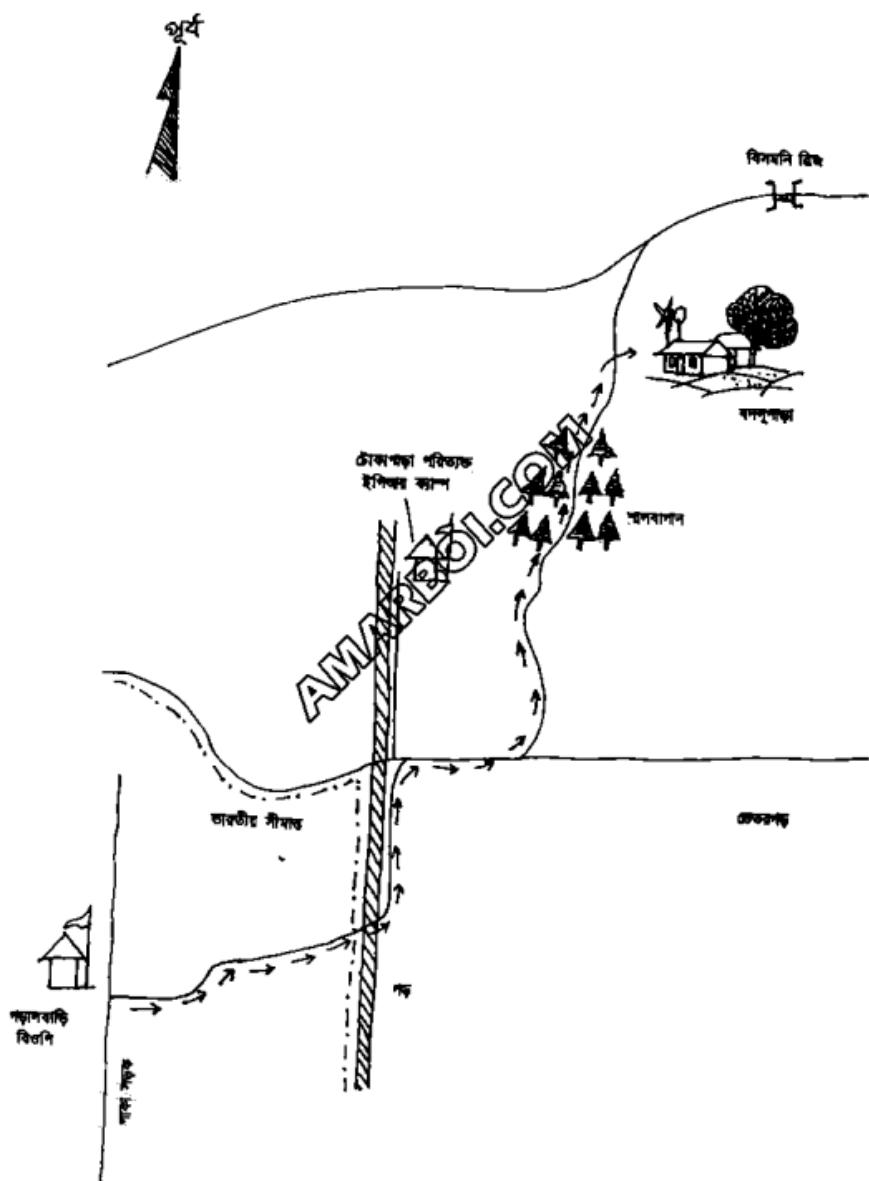
মধ্যরাতে বদলুপাড়া পৌছানো গেলো। সজিমউদ্দিন রাস্তার মোড়ে পুরো দলকে বসিয়ে রেখে গেলো তার বাড়িতে। ফিরলো প্রায় আধা ঘণ্টা পর। সাথে ৩ জন প্রবীণ ব্যক্তি। একজন তার বাবা, অন্য ২ জন চাচা। তারা নিয়ে চললো পুরো দলটাকে আগে আগে পথ দেখিয়ে। সমস্ত আম ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথাও জাগরণের চিহ্নমাত্র নেই। গ্রামের প্রায় যাবামাবিশ অবস্থানে ওদের বাড়ি। অঙ্ককারের সাথে একাকার হয়ে এক এক করে দলের সকল সদস্যকে ঢুকিয়ে নিলো ওরা ওদের বাড়ির উত্তরের আঙিনায়।

বাড়ির ভেতরের এই আঙিনা খুবই প্রশংসনীয়। চারদিকে চৌচালাবিশিষ্ট বড় বড় ছনের ঘর। উচু মাটির দাওয়া। মালসামান মৈত্রীর রেখে ছেলেরা ছড়িয়েছিটিয়ে ক্লান্ত শ্রীরে ঢলে পড়ে মুহূর্তেই। বাড়ির ছাঁচিলা ও পুরুষদের মধ্যে একটা চাপা শোরগোলের সাড়া। মাটির উচু দাওয়ায় আমার একটু দূরে বসা পিটু। মোটাসোটা গড়নের ছেলেও। এমনিতে ওকে অভ্যন্তর ভারিকি দেখায়। অঙ্ককারের ফিকে আলোয় সেই পিটুর কাছে দুজন প্রবীণ চুলাক গিয়ে বলতে থাকে, হাবিলদার সাহেব, এ্যাতো রাইতে কেনহে আসিছেন?

— হাবিলদার কি যিয়া, কমান্ডার বলেন, আমরা কি ইপিআর নাকি? হাবিলদার বলায় পিটুর মেজাজ কিচেরে উঠছে। চুপসে যায় লোকগুলো। তখন তারা বলেন, কমান্ডার সাব কুনহ অসুবিধা হইলে কহিবেন, মুই সজিমউদ্দিনের বাবা আর এহ হইলে উহার চাচা।

— আপনি সজিম উদ্দিনের বাবা, ঠিক আছে চাচা যিয়া, আসেন আমরা বড় কমান্ডারের সাথে কথা বলি। বলেই পিটু তাদের নিয়ে আসে আমার কাছে। দাওয়ার খুঁটিতে হেলান দিয়ে শ্রীর ছেড়ে দেয়া অবস্থায় তাদের সাথে কথা বলি। জানতে চাই শক্তির খবর। স্থানীয় দলালদের খবর, বিসমানি ত্রিজের খবর আর এখানে থাকা যাবে কি না, সে সম্পর্কে চাই তাদের মতামত। রাতটা তো কেটে যাবে, দিনে কোথায় থাকবো, যাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার আর সেন্ট্রি পজিশন ইত্যাদি ব্যাপার সম্পর্কেও তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। আমার কথা থেকে তারা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে বলেই মনে হলো। তাদের চোখ-মুখের অভিব্যক্তি আর কথাবার্তা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে এখানে বেশি দিন থাকা যাবে না। অর্থাৎ এখানে থাকলে আমাদের অবস্থান গোপন রাখা যাবে না।

ক্ষেত্র নং-১০
প্রথম হাইড আউট বদলুগাড়া
২৫.৭.১৯৭১
(কেন্দ্ৰ রাষ্ট্ৰ)



কোনোভাবেই। বিসমনি ত্রিজে পাকবাহিনীর অস্থায়ী ডিফেন্স এবং নিয়মিত টহল রয়েছে। আর গ্রামেই রয়েছে তাদের কয়েকজন স্পাই ও দালাল। আমরা যখন কথা বলছিলাম, তখন সজিমউদ্দিন এসে খবর দেয়, শামসুলের ভীষণ জ্বর।

— বলিস কিরে? চলতো দেখি।

সজিমউদ্দিন তার নিজের ঘরের বিছানায় শামসুলকে শোবার জায়গা করে দিয়েছে। ছটফট করছে সে। তার মাথার কাছে বসে অল্প বয়সী একজন মহিলা তার মাথায় পানির পষ্টি লাগাতে ব্যস্ত। একটা টিম টিমে ল্যাস্প জুলছে ঘরে। শামসুলের হাত ধরতেই চমকে উঠি, সর্বনাশ, এতো সাংঘাতিক জ্বর! একশ তিন-চার হবে।

— কি হয়েছে রে শামসুল?

জ্বরের ঘোরের মধ্যেই চোখ ঝুলে সে বলে, মাথার যন্ত্রণা ঝুব, ঘাড়ে ব্যথা।

সীমান্ত থেকে বদলুপাড়া পর্যন্ত একমণের ওপর আটার কস্তা শামসুল অনেকটা জেদের বসে একই বয়ে নিয়ে এসেছে। অতিমাত্রায় ভার বহনের জন্যই তার এই ব্যথা আর জ্বর। সঙ্গে আনা ঔষুধ দিই জ্বর এবং মাথাব্যথা কমানোর। বউটি জলপষ্টি দিতে থাকে। ল্যাস্পের আলো পড়েছে বউটির আধো ঘোমটা দেয়া মুখে। অসম্ভব লাবণ্যময়ী সেই মুখ। হালকা-পাতলা গড়নের চিরকালৈর গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। বছর দুয়েক আগে বিয়ে হয়েছে সজিম উদ্দিনের সাথে, উচ্চ ন' মাসের একটা ছেলে সন্তানের জননী। পরম মমতা নিয়ে শামসুল ফেরে তার ছোট ভাইটির সেবা করছে। মন বলে উঠলো, চিকিৎসা নয়, এই লক্ষ্মীপ্রতিষ্ঠা মেয়েটির সেবার জোরেই হয়তো শামসুল সেরে উঠবে। ওর দ্রুত সেরে প্রস্তুত ঝুবই জরুরি।

রাত ভোর হয়। বাড়ির পেছনে প্রকালঘর লাগোয়া একটা লম্বা ঘরে ছেলেদের চুকিয়ে দেয়া হয়। ঘরটা এমনিতে প্রস্তুত ইত্যাদি রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাড়ির পেছনকার সুপুরির বাগান, প্রকালঘর এবং পাটক্ষেতের আলের ওপর চারজন সেন্ট্রি বসিয়ে দেয়া হয় এল.এম.জি.সহ। দিনের বেলায় শক্র অধিকৃত এলাকায়, শক্রের অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থান করতে হলে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার দরকার। বলা যায় না, কে শক্রকে ডেকে আনবে? শক্র কখন কোথা দিয়ে এসে আমাদের ওপর চড়াও হয়ে পিণে মারবে সবাইকে? পেছন থেকে সাহায্য পাওয়ার কোনো সংক্ষেপ নেই। আমাদের যা অস্ত্রবল, সেটা পাকবাহিনীর সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দিনের বেলায় তাদের সাথে লড়াই করতে যাওয়া মানে নিজেদের স্বেক্ষ আঘাত্যার পথে ঠেলে দেয়।

সেন্ট্রিরা তাদের ডিউটি দিতে থাকে। ছেলেরা ঘুমুতে থাকে গৃহবন্দির মতো খড়ের গাদায়। এই ফাঁকে সজিমউদ্দিনকে নিয়ে পিটু আর আমি লোকজনের আড়াল দিয়ে পাটক্ষেত, ধানক্ষেত ও সুপুরির বনজঙ্গল দিয়ে ঘূরতে থাকি আর তাদের ফাঁক-ফোকর দিয়ে রেকি করে নিতে থাকি বদলুপাড়ার অবস্থান, তালমা-হাড়িভাসা রাস্তা, বিসমনি ত্রিজ, পাকবাহিনীর বর্তমান অবস্থান এই সব। সেই সাথে নোট বইয়ে টুকে নিই পাকিস্তানি স্পাই ও দালালদের নাম। যে নামগুলো পাওয়া গেলো, সেগুলো হচ্ছে—

সারণি-৩

স্পাইৎ

১. অজি
২. গফুরগান্দিন

শাস্তিবাহিনী

১. অজি
২. আবদুল
৩. পশির পতিত
৪. মহিরউদ্দিন
৫. দরিমউদ্দিন
৬. ইবাহিম
৭. খুলু।

/সৃজ্ঞ : ডায়েরি/

অত্যন্ত সোজা সরল মানুষ এই সজিমউদ্দিনের কাণ্ডে একমুখ কাঁচাপাকা দাঢ়ি, মাথায় টুপি। আমাদের দুশুরের আহারের জন্য একটা কাসি জবাই করলেন। বারবার না করা সত্ত্বেও তিনি শুনলেন না। তার ছেলে মুকিফৌজ। আর সেই মুকিফৌজ ছেলে তার এতোগুলো বক্সুর একটা দলকে নিয়ে তুলেছে তার বাড়িতে। একটা বিরাট বিপদের ঝুঁকি তার মাথার ওপর। কিন্তু বাংলার সেই ক্ষমতান প্রথা, বাড়িতে অতিথি এলে তাদের পরম সমাদর করতেই হবে। ছেলেরা দুশুর মাংস-ভাত খাবে। তাই জবাই করো খাসি। মোটামুটি বড় আয়োজনই। দুশুর যোগাড়য়ার বড় ধরনেরই। বাড়ির ভেতরে হাঁকড়াকের অন্ত নেই। কিছুটই এই পরিবেশটাকে চাপা দিয়ে শান্ত সুন্দরীন রাখা যাচ্ছে না। ইতোমধ্যে সজিমউদ্দিনের দু'চারজন বক্সু তার পরিচয় জেনে ফেলেছে। আর জানবার পরপরই তারা বাড়ির ভেতরে এসে রান্নাবান্না এবং যোগান দেয়ার অন্যান্য কাজে লেগে পড়েছে। না, আমাদের উপস্থিতির ব্যাপারটা আর গোপন রাখা গেলো না। সজিমউদ্দিনকে বললাম হাড়িভাসা-পঞ্চগড় রাস্তায় পাহারা বসাতে। এছাড়া উপায় নেই। দূর থেকে শক্ত আসতে দেখলে অন্ত প্রতৃতি নেয়ার সময়টা যেনো পাওয়া যায়।

দুশুর ভূরিভোজ হলো। ছেলেদের আবার ঘুম। সেন্ট্রি বদল করে অন্য চারজন বনে-জঙ্গলে পজিশনে আছে। বিকেলের দিকে গ্রামের কিছু মানুষকে সজিমউদ্দিনের বাড়ির সামনে ঘূরঘূর করতে দেখা গেলো। মনের মধ্যে কে যেনো কু ডাক দিয়ে ওঠে। শক্তর কাছে খবর পৌছে যাবে। এখানে থাকাটা নিরাপদ নয়। সরে পড়তে হবে রাতেই। সিঙ্কান্ত নিয়ে ফেলি।

সক্ষ্য লাগবার সাথে সাথে বিসমনি ব্রিজ রেকি করে আসি। রাত ঘনিয়ে আসে, ছেলেদের ফ্ল-ইন-এ দাঢ় করানো হয়। তাদের জানানো হয়, এখানকার হাইড আউট শেষ। রাতেই আমরা এখান থেকে চলে যাবো। সবাই প্রস্তুত হয়ে নাও।

ছেলেরা তৈরি হতে থাকে। শামসুলকে নেয়া যাবে না। সে জুরের ঘোরে এখনো বেঁচুশ অবস্থায়। তবুও একজন সহযোগকে এখানে এইভাবে ফেলে রেখে যাবো, মন যেনো মানতে চায় না; কিন্তু উপায় নেই। এখানে থাকলে ও যদি ধরা না পড়ে, তাহলে নিচয়ই সুস্থ হয়ে উঠবে; কিন্তু এ অবস্থায় ওকে যদি কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে মারা যাওয়ার সমৃহ সংজ্ঞাবনা। সজিমউদ্দিনের বউ-বিদের অক্রান্ত সেবায় নিচয়ই ভালো হয়ে উঠবে। এর মধ্যে সজিমউদ্দিনের বাবা গ্রামের ডাক্তার দিয়ে তার চিকিৎসারও ব্যবস্থা করবেন এই রকম কথা হলো। সুতরাং শামসুল থাকলো।

নিশ্চিতি রাত। ছেলেরা বের হয়ে গেলো একে একে। সজিমউদ্দিনও যাবে আমাদের সাথে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখলাম, সজিমউদ্দিন তার বউকে কি যেনো বলছে, আর বটটি ঘরের দাওয়ার খুটিতে মাথা রেখে অঝোরে কেবলে চলেছে। শামবাংলার একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদায়ের এ এক চিরস্মন দৃশ্য। কিন্তু এখন এই দৃশ্যসময়ে দেখা এ দৃশ্যটা চিরদিনের জন্য মনের ভেতরে গেঁথে রইলো। কেনো যে এই যুদ্ধ? যুগ যুগ ধরে এই রকম যুদ্ধ কতো যে বিছেন-বেদনার কাহিনীর জন্ম দিয়েছে, তার অন্ত নেই। কিন্তু তারপরও বউটির এ কান্না কি যুদ্ধকে বন্ধ করতে পারবে? আনতে পারবে শান্তি? দেশের স্বাধীনতা? সজিমউদ্দিন মাথা নিচু করে আমাদের সাথে বের হয়ে আসে। সেই তখন হয়তো তার প্রিয়তমা স্তুর এককান্ত প্রক্ষেপণ তার সেই কান্নার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারিত হয় এভাবে, তুমি ফিরে আসবে, দেশ স্বাধীন হলে তুমি নিচয়ই ফিরে আসবে।

২৫.৫.৭১

দ্বিতীয় ‘হাইড আউট’ : বারাধারের ধনার বাড়ি

কালো কুকুচে শরীরের গাঁটাগেঁটা চেহারার মানুষ ধনা। তার বাড়িই হলো আমাদের দ্বিতীয় হাইড আউট। শামটির মধ্যে বারাধার। বদলুপাড়া সজিমউদ্দিনের বাড়ির ‘হাইড আউট’ থেকে প্রায় মাইল ঢিনেক পিছিয়ে এসেছি। গ্রামের পায়ে চলার পথ। বৃষ্টি-কাদায় পিছিল। কোথাও কোথাও পথ হারিয়ে গেছে হাঁটু সমান কাদাপানিতে। কোথাও গর্ত, কোথাও ডোবা। একটা খালও পেরতে হলো। বুক সমান, কোমর সমান পানির তরঙ্গিত ধারা নিয়ে বিপজ্জনকভাবে বয়ে চলেছে সে খাল। অসম্ভব সতর্কতা নিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। পিছিয়ে আসার ভেতরেও বিপদ অনেক। যুক্তের মাঠে এগিয়ে যাওয়াটা যেমন নিরাপদ নয়, পিছানোটা ও তেমনি বিপজ্জনক। বিশেষ করে ঘুটঘুটে অঙ্ককারে, আকাশে ঘনকালো মেঘ ছাওয়া বর্ধার দিনে। প্রত্যেককেই মোট বইতে হচ্ছে। তাই প্রতিটি পদক্ষেপেই কঠকর। কাদাপানি, জলা-জলা, এর ভেতর দিয়েই ওজনে ভারি মোট বহন করতে গিয়ে প্রত্যেককেই ব্যয় করতে হচ্ছে আসুরিক শক্তি। আর এইভাবে একটানা পথচলা। দাঁড়াবার উপায় নেই। বসবার উপায় নেই। সেই সাথে প্রজন্ম ভয়, পেছন থেকে এই বুঝি শক্ত তাড়া করে আসছে। আর শক্তায় মনের ভেতরেই দ্রুত পিছিয়ে যাওয়ার এবং শক্তর নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা।

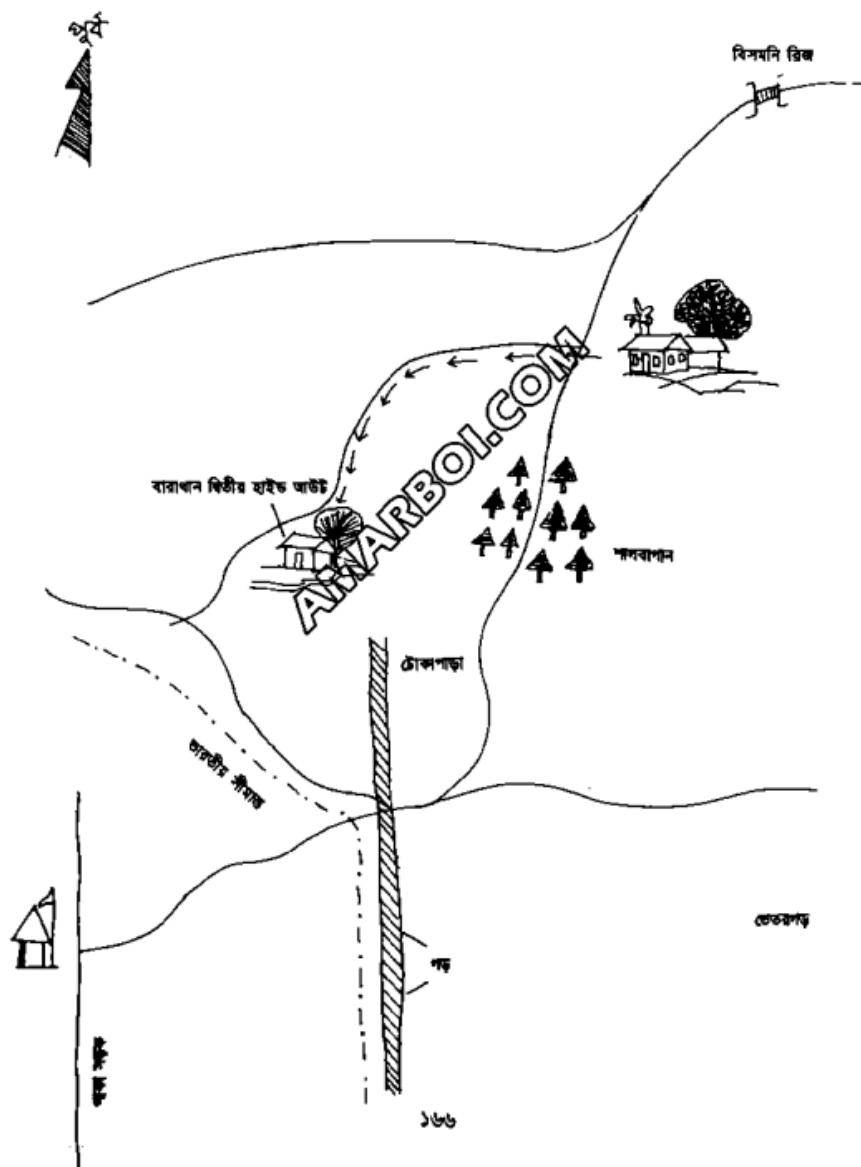
এর পরের গন্তব্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। কোথায় যাচ্ছ, কোথায় হবে পরবর্তী হাইড আউট, তাও জানা নেই। আগে থেকে ঠিক করা নেই। একেবারে

জেক স্যান-১১

বিড়ীয় হাইড আউট—বারাধান

২০. ১. ১৫. ৭৩

(কেল রাঢ়া)



অনিশ্চিত যাতা। মনের মধ্যে তবুও আশা জেগে ওঠে, মিলবে, মিলে যাবে কোথাও না কোথাও হাইড আউটের ঠাই।

— খালের ঐ পারের গ্রামটার নাম বারাথান। হামরালা এঠে হাইড আউট নিবার পারি, সজিমউদ্দিন হঠাতে করে ফিসফিসিয়ে বলে পাশ থেকে।

— গ্রামটা কেমন? মানুষজন?

— হিন্দু গেরাম গে, সোগগুলা মানষিই হিন্দু, ঘোর মন কহছে গ্রামোত কাহোনাই। চল গেইচে ইতিয়া...।

— চলো দেখা যাক। পিন্টুকে পুরো দলসহ বারাথান চুকতে বলি খাল পেরিয়ে। পিন্টু সেভাৰে সৰাইকে প্ৰস্তুত কৰে নিয়ে একেবাৱে অজানা-অচেনা জনপদ, তবে মুহূৰ্তে মাথায় চিঞ্চা এলো, হিন্দুৰা যদি বাড়িঘৰ ছেড়ে ওপারে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে তাদেৱ পৰিত্যক্ত বাড়িঘৰে আস্তানা নেয়া যেতে পাৱে। কিন্তু কোনো বিপজ্জনক বাধা সেখানে আমাদেৱ জন্য অপেক্ষা কৰছে কি না, জানি না। দেখা যাক, কী হয়!

বারাথান গ্রামে চুকলাম। কিন্তু ঢোকার মুখে রিসেপশনটা ভালো হলো না। একদল মানুষ তীৰ, ধনুক, বলুয়, সড়কি ইত্যাদি নিয়ে প্ৰায় ঝন্থে দাঁড়ালো। আৱ এই অবস্থাৰ মুখে পিন্টু টেলগান তাক কৰে ফেললো মুহূৰ্তে একৰামুল এবং মোতালেৰ ওৱাৰ কাঁধেৰ বোৰা নামিয়ে পজিশনে চলে গেলো। তাদেৱ হাতিয়াৰসহ। কাঁধে বোলানো আমাৱ টেলগানেৰ ট্ৰিগারেও আঙুল চাল কৰছে। শুধু টেপাৰ অপেক্ষা মা৤্ৰ।

— কাৰা আইসে? ভুমহাৱা কাৰা বাঁকুচি তদেৱ দলেৱ একজনেৰ চাপা ভীতি যেশানো কষ্টস্বৰ শোনা গেলো। ভয় প্ৰাপ্তি বাৰাথাবিক। চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলাম কালো কালো ছায়া নিয়ে অৰুকাৰে একদল ছায়ামৃতি এগিয়ে আসছে আমাদেৱ দিকে। ওদেৱ ধাৰণায় আমাৱা বুৰি ডাকাতি দল। সীমান্ত এলাকায় তখন ডাকাতিৰ উৎপাত চলছে খুব। দেশেৱ আইন বুলো পুৱোপুৱি ভেংে পড়েছে। সীমান্তে এপাৰ-ওপাৱ মিলিয়ে তখন এক বিৱাটি অৱস্থা। দেশেৱ ভেতৱে যাৰা রয়ে গেছে, ডাকাতিৰ উৎপাতে তাদেৱ জীবন অতিষ্ঠ। তাই নিজেদেৱ দল তৈৰি কৰে, দেশী অন্তৰ্শক্তি সজ্জিত হয়ে তাৰা ডাকাতদেৱ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ গড়ে তুলেছে। সারাৱাত জেগে থেকে তাৰা নিজেদেৱ নিৱাপত্তা রক্ষাৰ চেষ্টায় প্ৰাণপণে লিঙ্গ। ব্যাপৱটা আমাৱা প্ৰথম দিন বাংলাদেশেৱ ভেতৱগড়ে চুকৰাব সময় টেৱে পেয়েছিলাম। এই এখন, এখানে আজ রাতেও এৱা আমাদেৱ ডাকাত ভেবেছে এবং সেটা ভেবেই তাৰা তাদেৱ নিজেদেৱ অন্তৰ্শক্তি নিয়ে আমাদেৱ আক্ৰমণ কৰতে বা বাধা দিতে উদ্বাত হয়েছে।

— আমাৱা মুক্তিফৌজ, অনেকটা আমাৱ মুখ ফকেই যেনো কথাটা বেৱিয়ে যায় এবং বেশ জোৱেই।

— মুক্তিফৌজ?

— হ্যাঁ।

আমাদেৱ জৰাব শুনে টেৱে পাই, ওৱা নিজেদেৱ মধ্যে কি যেনো আলাপ কৰে, তাৰা বলে, আসেন বাবাৱা।

আমাৱা তখন এগিয়ে যাই। লোকগুলো আমাদেৱ একটা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে

তোলে। ধনার বাড়িতে আশ্রয় মেলে আমাদের। রাত ভোর হতে তখন সামান্যই বাকি। কালো কুচকুচে বদখত চেহারা হলেও ধনা দাস মানুষটা খুবই ভালো। অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে সে আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। দুটো ঘর ছেড়ে দেয় থাকার জন্য।

গ্রামটা প্রায় মনিষ্যশূণ্য। যুদ্ধের শুরুতে হিন্দু প্রধান গ্রামের মানুষজন নিচিত্তেই ছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো যুদ্ধের হেঁয়া তাদের মতো এই অজ্ঞ পাড়াগায়ে লাগবে না। বিশ্বাস ছিলো তাদের প্রতিবেশী মুসলমান অধিবাসীরা তাদের প্রতি বৈরী হবে না। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যেই অবস্থা ঘূরে গেলো। একদল মানুষ ঘোর পাকিস্তানপক্ষী হয়ে দাঁড়ালো। তাদের নেতা আনাজ প্রেসিডেন্ট আর ভুইয়া। সরাসরি তাদের কাছ থেকে হুমকি আসা শুরু হলো, যে-কোনো দিন তাদের শ্রাব আক্রান্ত হতে পারে। অন্যদিকে শুরু হলো ডাকাতদের হামলা। এরই মধ্যে 'দু' দু'বার ডাকাতদের হামলা হয়ে গেছে। মানুষ তাই গ্রামে থাকবার আর সাহস পায় নি। সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরে। নিজেদের পৈতৃক ভিটে, বাড়িঘর, গর্ভ-বাহুরসহ সংস্কার জীবনের অধিকাংশ জিনিসপত্রই তারা ফেলে রেখে চলে গেছে। সেগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন। তাই ধনা দাসের নেতৃত্বে কিছু পুরুষমানুষ রয়ে গেছে এইসব সহায়সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য। ধনা আমাদের দেখে বলে ওঠে, বাপুরে কহেন দেখি কেমন করি যাই? ধনার কথায় প্রেরণার সূর স্পষ্ট। আক্রোশ আর ক্রোশ, সেই সাথে অভিমানও বারে পড়ে।

— ভেবো না ধনা, আমরা এসে গেছি, এসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

— ঠিক হইবে? জয়বাংলা কি হইলো তানোদিন, কহেন দেখি?

— হবে ধনা, অবশ্যই জয়বাংলা হবে, ধনাকে সান্ত্বনা দিই। কিন্তু পাশাপাশি নিজের মনের গভীর থেকে সেই দুরিয়ে রাখা সন্দেহটা উঁকি দিয়ে ওঠে, জয়বাংলা কি হবে? দেশ কি আদৌ স্বাধীন হবে? এসব ভাবতে গেলে একরাশ ক্লান্তি এসে ভর করে তাই আর কথা না বাড়িয়ে প্রাপ্তিতে ধনার বারান্দার উচু ধাপটায় শরীর এলিয়ে দিই। পিন্টু ততোক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনহাজ বাইরে কয়েকজনকে নিয়ে সেন্ট্রি কাম প্রেটেল ডিউটিতে। আন্ত-ক্লান্তি আর অবসাদে ঢলে পড়া ছেলেদের নিরাপত্তা বিধান করা প্রয়োজন। তাই এক ক্লান্তিকর যাত্রার পরও মিনহাজকে দাঁড়াতে হয়েছে বাড়ির সামনে সেন্ট্রি ডিউটিতে।

ধনার বাড়ি 'হাইড আউট'-এর জায়গা হিসেবে চমৎকার। শক্তির অনেকটা নাগালের বাইরে, নিরাপদ। গ্রামটায় মানুষজনও কম। আর এরা যেহেতু হিন্দু সম্পদায়ের মানুষ, সেহেতু আমাদের অবস্থানের ব্যবরাখবর অবশ্যই পাকবাহিনীর কাছে পৌছবে না বলে আমার বিশ্বাস। অবশ্য পাক অনুচররা যে এ আন্তান্তর খবর পাবে না, এমন নিশ্চয়তা দেয়াও মুশকিল। ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরুবে না, বাড়ির আশপাশে সেন্ট্রি ডিউটি থাকবে, রাত ঘনাবার আগে কোনো মুভমেন্ট নেই, মোটামুটি এই সব ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেই ধনার বাড়িতে আমাদের দ্বিতীয় 'হাইড আউট' প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো।

কালীদেবী সর্বংহরা তার কল্প

ধনার বাড়ির পেছনে পানের বরজ। সুপুরি গাছের বাগান। গ্রামটা একসময় মনে হয় বেশ সজ্জল ছিলো। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষজন গরিব হয়ে এসেছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর অনেকেই ভারতে চলে গেলেও, এখানে যারা রয়ে গেছে, তারা মোটামুটি সজ্জলতার ভেতর দিয়েই দিন কাটাচ্ছিলো। প্রত্যেকের চাষবাসের কিছু না কিছু জমি রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ পেশায় ছুতোর, কেউ ঘরামি, কেউ কাঠ মিঞ্চি।

বাড়িগুলো পরিত্যক্ত হলেও বেশ বাকবাকে। গ্রাম সংলগ্ন একটা বড় বটগাছের নিচে একচালা টিনের মন্দির। নিয়মিত পুজো-অর্চনা এখন আর হয় না। মন্দিরের ভেতরে এখনো কালীদেবী তার কালো দেহ আর বিরাট জিব বের করে সর্বংহরা ঘূর্ণিতে দাঁড়িয়ে। ছেষ্টা গ্রাম। খুবই সাধারণ বাড়িগুলি, সাদাসিধে মানুষজন। সকলেরই সহজ-সরল জীবনযাপন। এদের কাছে রাজনীতিটা বড় নয়। নিজের মতো করে সাধারণভাবে বেঁচে থাকা আর তার ভেতর দিয়ে নিজেদের রীতিনীতি, সংসার-সংস্কার-ধর্ম মেনে চলাই এদের জীবন দর্শন। সেই সব মানুষকে রাজনীতির ঝোড়ো হাওয়া আজ কীভাবে দলিতমাথিত করেছে, কীভাবে তারা তাদের আজকের মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড় উন্মূল করে ওপারে চলে গেছে, ভাবতে বসলে মাথায় আগুন জলে ওঠে। প্রশ্ন করি তখন নিজের কাছে, যুদ্ধ তাদের কী দিতে পারবে? জয়বাঞ্চল কেন্দ্র এদের জীবনের কতোটুকু পরিবর্তন হবে? কতোটুকু ভালো থাকবে এরা ভাসে-কপড়ে? বিরাট প্রশ্ন এদের কাছে। জয়বাঞ্চল হলেও কি এরা যিন্নতে পারবে যুদ্ধের মাটিতে—এ প্রশ্নেও আলোড়িত তারা। দেশের কিছু মানুষের রাজনীতি কিছু মাথাগরম জেনারেলের সিদ্ধান্ত এভাবে পৃথিবীতে কতোবার যুদ্ধ ডেকে এনেছে তার শেষ নেই আর তার মূল্য দিতে হয়েছে সাধারণ খেটে-বাওয়া মানুষদের। অহেতুক তাদের মরতে হয়েছে। পালাতে হয়েছে বাড়িগুলি ছেড়ে, দেশ ছেড়ে, অস্ত্রায়-ব্রজনদের কাছ থেকে, পরিবারপরিজনদের কাছ থেকে হতে হয়েছে দলছুট। হারিয়ে যেতে হয়েছে সারা জীবনের জন্য। ঠিক এখন যেমন শরণার্থীর দল চলেছে তারত অভিযুক্তে। প্রায় ৭০ লক্ষ শরণার্থী এরি মধ্যে জমা হয়েছে সেখানে। পৃথিবী জুড়ে বাস্তুভিটাত্যাগী শরণার্থীর শেষ নেই। অন্তিম তাদের সংখ্যা। শরণার্থী প্যালেস্টাইনে, শরণার্থী আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায়, শরণার্থী ভিয়েতনাম আর কর্ডিয়ায়। যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধই মানুষের শাস্তি হরণ করেছে। বাস্তুচূড় করেছে লক্ষ কোটি মানুষকে পৃথিবীর দেশে-মহাদেশে। মানব সভ্যতার কপালে বড় লজ্জার, বড় কলঙ্কের তিলক পরানো ঘটনা।

রাতের বেলা দুটো প্রটেকটিভ পেট্রেল পাঠানো হলো আশপাশের গ্রামগুলো রেকি করার জন্য। পাশাপাশি বদলুপাড়ার খবর নেয়ারও ব্যবস্থা করা হলো। এদিকে সুসংবাদ পেলাম শামসুল সুস্থ হয়ে উঠেছে। দৃঃসংবাদ পেলাম, পাকবাহিনী বদলুপাড়ায় আমাদের গতকালকের অবস্থান অবধি পৌছে গেছে। সজিমউদ্দিনের বাবাসহ আমাদের অন্য আর সব আশ্রয়দাতা লোকজন ভীষণ শক্তির ভেতরে রয়েছেন। তাদের ধারণা, পাকবাহিনী তাদের বাড়িগুলি রেইড করতে আসবেই।

রিপোর্টঁ

প্রথম রিপোর্টঁ গড়ালবাড়ি বি.এস.এফ ক্যাম্পে। সকাল ৭টা সময় দিয়েছেন মেজর দরজি। বারাথান থেকে পিন্টুসহ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌছেছি সেখানে। মেজর এলেন ঠিক সময় মতোই। আমরা পায়ের ডগার ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, হাত দুটো শরীরের পেছনে নিয়ে, এ্যাটেনশন হয়ে তাকে স্থান দেখালাম। তিনি 'গুড মর্নিং' বলে হাসিমুখে নামলেন। তারপর কাঁধে হাত রেখে আস্তরিকতার সঙ্গে বললেন, হাউ ডু ইউ ডু, ক্যামোন আছে তোমরা? 'ফাইন, ভালো আছি' বলে তাকে জানালাম। আজ ২৭ তারিখ। ২৪ তারিখে ভেতরে চুকেছি। হাইড আউট খুঁজে বের করা, সেখানে অবস্থান নেয়া, স্থানীয় এলাকা এবং সেখানকার মানবজন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা, ক্লাস্তিক দীর্ঘ ভারবাহী যাত্রা, বদলুপাড়ার হাইড আউট থেকে বারাথানে হাইড আউট খুঁজে নেয়া, পরিশ্রম, কষ্ট, উৎকষ্ট, বিপদের ঝুকির আশঙ্কা, এতোসব গেছে শরীর আর মনের ওপর দিয়ে, সেই সাথে আছে এতোগুলো ছেলের নিরাপত্তা রক্ষা করা, তাদের পরিচালনা করা, অন্তর্শন্ত্র, গোলাবারুদের সংরক্ষণ এবং সেগুলোর হিসেব রাখা, রেশন ও খাদ্যসামগ্রীর হেফাজত এবং সমস্ত দলের তিনবেলা আহারের সংস্থান করার দায়িত্ব। সেন্ট্র ডিউটি প্রেটেল ডিউটি আর রেকি করার কথা না হয় বাদই দিলাম। অনুচরদের নাম ডিক্টকোনা সংগ্রহ ও শক্রপক্ষের বর্তমান অবস্থান এবং মূভমেন্ট সম্পর্কে ব্যবাধানের সংগ্রহ করা এসব দায়িত্বেই ই অংশ। এছাড়া শামসুলের অসুস্থতা, তাকে বদলুপাড়ায় সজিমডিনের বাড়িতে চিকিৎসার জন্য রেখে আসা সব মিল্টি এতোসব কাজ করতে হয়েছে এই তিনিদিনে। আর এসবই করতে হচ্ছে একক সিদ্ধান্তে, একক দায়িত্বে পিন্টুর সার্বক্ষণিক সহযোগিতায়। এবং সেখানে যায়, এসব কাজ মোটামুটি সৃষ্টিভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। 'হাইড আউট' সম্পর্কে খুঁজে নেয়ার ব্যাপারটা ছিলো, ক'দিনের যেটা প্রধান কাজ, সম্ভব হয়েছে সেটা এবং বেশ ভালোভাবেই বলতে গেলে এতোগুলো দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের ওপর যেমন আস্থা এসেছে, পাশাপাশি মনে হচ্ছে, বয়সও বেড়ে গেছে।

মেজর দরজি আমাদের নিয়ে বি.ও.পিতে চুকলেন। সুবেদার তাঁকে স্যালুট দিয়ে নিয়ে গেলেন বসার জায়গায়। বসবার পর দরজি তাঁর ফিল্ড ম্যাপ খুলে ধরলেন সামনে পাতানো টেবিলের ওপর। তারপর জানতে চাইলেন কোথায় আমাদের প্রথম হাইড আউট ছিল এবং এখন কোথায়?

পকেট থেকে নোটবুক বের করে গত তিনিদিনের কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট দিলাম আমি প্রথমে। পিন্টু একই কায়দায় রিপোর্ট দিলো। সামান্য হেরফের করে। মেজর আসবার আগেই পিন্টুর নোটবইয়ে আমি যেভাবে লিখতে বলেছিলাম, পিন্টু সেভাবেই লিখেছে। বর্তমান অবস্থানের জায়গা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। ম্যাপে বারাথান গ্রামের কথা উল্লেখ আছে। পিন্টু ক্ষিতিক্ষণ ইতস্তত করে ম্যাপের ওপর আর একটা জায়গায় তার আঙুল বসিয়ে প্রায় নিক্ষেপ কর্তৃ মেজরকে জানালো, হাম ইধার হ্যায়। মেজর তার নোটে লেখা পিন্টুর উল্লেখ করা বা চিহ্নিত

অবস্থানের জায়গাটার কথা বলতেই সেটা মেলাতে বসলেন। সর্বনাশ, ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আমি আতকে উঠি। পিন্টু তার আঙুল দিয়ে যে জায়গাটা চিহ্নিত করেছে। তা প্রায় হাড়িভাসার কাছে ঘাষড়া নামের জায়গা।। কিন্তু রিপোর্টে সে বলেছে ডাবুরভাঙ্গার কাছে তার হাইড আউটের জায়গা। টেবিলের তলা দিয়ে পিন্টুর পায়ে খোচা দিতেই সপ্রতিভ পিন্টু ত্বরিত সাবধান হয়ে যায়। আমি তখন ঝুঁজে পেতে দিই পিন্টুর অবস্থান ডাবুরভাঙ্গা গ্রাম। মেজের সন্দেহভরা চোখে পিন্টুর দিকে তাকান। পিন্টু, ঠিকতো হ্যায়না? ঝুট তো নেই বলতা? পিন্টু তখন ঝুটা অর্থাৎ মিথ্যেটাকে আরো মিথ্যে করে জোর দিয়ে বলে, নেই স্যার, হাম ইধারই খাকতা হ্যায়। মেজের আমাদের দিকে তাকালে আমি সায় দিই। মেজের তখন আমাদের উল্লেখ করা দু' জায়গায় প্রথমে ক্রশ চিহ্ন দেন। পরে বড় করে লাল পেস্তিল দিয়ে নোট রাখেন ম্যাপের ওপর।—ক্ষোয়াড নম্বর ১ ও ক্ষোয়াড নম্বর ২। এরপর সুবেদার সাহেবের আতিথেয়তা। মেজরের জন্য কাপ ডিসে ধূমায়িত চা। আমাদের জন্যও চা, তবে এনামেলের মগে।

চা খেতে খেতে মেজের দরজি অন্যান্য প্রসঙ্গও তোলেন। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি, ভারতের অবস্থান বা ভূমিকা, পৃথিবী জুড়ে এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া, নতুন অপারেশনাল প্ল্যান ইত্যাদি বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। যুদ্ধের ক্ষেত্র, এই ছন্দছাড়া জীবনে, এই বিদেশ-বিভুইয়ে, এই অপরিচিত জায়গায় ভিন্ন ভবনের মানুষজনের মধ্যে মেজের দরজিকে বড় আপন মনে হয়। তিনি আমাদের অফিসার। তার পরিচালনায় চলছে আমাদের সমস্ত যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং ক্ষমতাও। তার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের জীবনমরণ, প্রায় সবকিছু।

কথাবার্তা শেষ হলো। মেজের উঠলেন। উঠবার সময় তিনি জানালেন, আহিদার আর বিদিউজ্জামান মাস্টারের এক এখনও ঢুকতে পারে নি। তারা সাকাতি সীমান্তের এপারে ভারতীয় অংশেই ভয়ে গেছে। তাদের ব্যাপারে মেজের যথেষ্ট ক্ষোভ আর সেই ক্ষোভ তিনি প্রকাশ করতে দ্বিধাও করলেন না, শালে লোগ ডারতা হ্যায়। কাওয়ার্ডস!

আমরা কিছু বলতে পারি না। ওরা যে কেনো ঢুকতে পারে নি, সেটা জানি না। সম্ভবত তব এবং নেতৃত্বের কোন্দলের জন্যই। তবে অনুমান করলাম, নতুন ছেলেদের নিয়ে গড়া দল দুটোর একক নেতৃত্ব আহিদারের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। মাস্টারের অবস্থাও তাই, বিশেষ করে যে দল দুটোয় ইয়াকুব এবং বাবলুর মতো ছেলেরা রয়েছে। মেজের এখন সাকাতি যাবেন, দল দুটোর রিপোর্ট নেবেন এবং তাদের বাংলাদেশে 'হাইড আউটে' যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

বড় ভাই চাউলহাটি থেকে ছাগলের মাংস রান্না করে পলিথিনে বেঁধে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে আরো কিছু আইটেম। মেজের সেগুলো আমাদের হাতে তুলে দেন। আরো কিছু গোলাবারুদ তিনি আমাদের জন্য এনেছেন, সেগুলো আমরা রিসিভ করি। মেজেরের নির্দেশে নোটবইয়ে টুকে নিই এমনিভাবে—

সারণি-৪

১. শক্তির পরিচিতি
২. তাদের মূভমেন্ট
৩. তাদের অন্তর্শক্তি
৪. সাহায্যকারী দেশীয় দালাল, শান্তিবাহিনীর তালিকা—

<u>Explosives taken</u>		<u>27.7.71</u>
(i) PK	=	24 lbs
(ii) Cartex	=	50 metets
(iii) Detonator	=	15
(iv) Primer	=	20
(v) Safety fuse	=	10 meters
(vi) safety match	=	2

/সূত্র : ডায়েরী।

মেজের চলে যান। যাওয়ার আগে বারবার সম্পর্কে থাকবার উপদেশ দেন। সেই সাথে এর পরের রিপোর্ট করবার আগেই উপদেশ দেন বিসমনি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার এবং আশ্বাস দিয়ে বলেন, তোমরা এইক্ষণে শুরু করছো, দেখো, নিচয়ই এর শেষ একদিন হবে, তু নট ওয়ারি বয়েজ প্রস্তুত ক্রস ইউ।

তার গাড়িটা চলে গেলে বি.এস.পি.সি.র সামনের পাকা রাস্তাটায় দাঁড়িয়ে হঠাতে নিজেদের অস্তুর একা আর নিঃস্বাক্ষর মনে হয়। কিছুক্ষণ পর কেটে যায় সেটা, তখন আসে একটা মুক্তির আনন্দ, প্রজন্ম আর কাজ নেই। গড়ালবাড়িতে কিছুক্ষণ স্থাবন সময় কাটিয়ে তারপর রওনা হওয়া যাবে হাইড আউটের উদ্দেশে।

পিন্টু উদান্ত কর্তৃ গেয়ে উঠে, খোলো খোলো ঘার . . .। আমরা গড়ালবাড়ি বাজারের কোনায় চায়ের দোকানটা লক্ষ্য করে এগুতে থাকি। পিন্টু গান খামিয়ে বলে, আমার হবার নয় মাহবুব ভাই।

— কি হবে না?

— ম্যাপ।

— কেনো হবে না? হাসতে হাসতেই জিগোস করি।

— মুই কিছু বোঝ না, কোন্ঠে যে কোন্ গ্রাম, কোন্ঠে যে হামার ‘হাইড আউট’, আসলে ম্যাপ দেখলেই আমার ধৰ্ক লাগে।

— তুমি কিছু ভাববে না, এরপর যেখানে আমার আঙুল থাকবে, তার ডানে-বাঁয়ে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তোমার আঙুল চালিয়ে দেবে। খবরদার বেশিদূর যেও না আজকের যতো, বাকিটা আমি ম্যানেজ করে নেবো, ঠিক হ্যায়!

— ইয়েস স্যার, বলে পিন্টু একটা স্যালুট ঠোকে।

২৭.৭.৭১

ভালোবাসার মুখ

বিসমনি ব্রিজ উড়িয়ে দিতে হবে। এজন্য ব্রিজ এবং আশপাশের এলাকাটা রেকি করা, শক্তির আনাগোনা সহকে ধারণা নেয়া, ব্রিজে প্রতিবাতে পাহারার ব্যবস্থা করেছে শক্তি বাহিনী, তাদের সংখ্যা এবং শক্তি সহকেও জানা দরকার। সুতরাং রাতের অক্ষকারে একটা প্রটেকচিভ প্রেট্ল নিয়ে বের হই। শামসূলের অসুস্থতার ব্যাপারটাও দেখে আসা দরকার। শক্তির খুব কাছাকাছি অবস্থানে অসুস্থ ছেলেটা রয়ে গেছে। ফুটফুটে ফর্সা ঠাণ্ডা মেজাজের অল্প বয়সের সাদাসিধে মনের ছেলে শামসূল। সদ্য টেনিং সেটার থেকে ফিরে আসা নতুনদের একজন। রংপুর কুড়িগামের রাজারহাট থানার কোনো এক গ্রামের ক্লাস নাইমে পড়া ছেলে। যুদ্ধের ডাকে চলে এসেছে প্রচণ্ড এক উন্মাদনা আর আবেগে তর করে। শামসূল সামান্য সুস্থ হয়ে থাকলে ওকে ফিরিয়ে আনা দরকার। বিসমনি ব্রিজ অপারেশন করলে তাকে কোনো অবস্থাতেই সেখানে রাখা যাবে না।

ধনা দাস অত্যন্ত বিনয়ী আর অতিথিপরায়ণ। সারাদিন সে ঘূরযুর করছে মুখে একটা বিনয়ের হাসি ফুটিয়ে। কিছু করতে পারে যে এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে। সারাদিন কাটে অবসাদে-বিশ্বামৈ। ধনার বাড়ির পেছনে বাঁশের মাচানের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পিন্টু আপন মনে গান গেয়ে চলে। প্রচণ্ড আনন্দবৃশি প্রাণবন্ত ছেলে পিন্টু। মনে হয়, জীবনের কোনো ক্রেশই তাকে কবন্ধ করে না। কিন্তু আপন মনে যথন ও গান গায়, তখন ওর ভেতর থেকে শীর্ষতা চাপা দুঃখ যেনো বেরিয়ে আসে। আসলে প্রত্যেক মানুষেরই তো নিজস্ব নিষ্ঠাপূর্বোধ থাকে। পিন্টুরও হয়তো আছে। দূরে-কাছে কোথাও হয়তো ঘূসুর নিষ্ঠাপূর্বাদি ডাক, আম-সুপুরি আর জামগাছের পাখির অবমিশ্র অক্লান্ত কলকাকুলি আর বাঁশের মাচায় শুয়ে পিন্টুর দুঃখ জাগানিয়া গান। চোখ জুড়ে রাজের ঘূম নিয়ে আসে। বেলা গড়িয়ে বিকেল হয় সেই ফাঁকে। মিনহাজ মিয়া চায়ের মগ ট্রিয়ে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ঘূম ভাঙায়। নিজেদের ওপর দায়িত্ব চেপে বসা একটা অন্য রকম জিনিস। 'হাইড আউটে' এসে যার যেটা দায়িত্ব, তা চমৎকারভাবে তাই পালন করে যাচ্ছে সবাই।

পিন্টু 'হাইড আউটে' থেকে যায়। কয়েকজনের শ্পাইয়ের খোঁজে সে একটা দল পাঠাবে, তেমন কাউকে পেলে ধরে আনবে সে দল। পারলে উড়িয়ে দেবে রেমার চার্জ দিয়ে চিহ্নিত দালাল অর্থাৎ শ্পাইয়ের ঘরবাড়ি। সেন্ট্রি থাকবে অত্যন্ত সচেতন। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় যেনো কোনো ফাঁকফোকর না থাকে, আর জেগে থাকার চেষ্টা করবে সে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত। বিসমনি পর্যন্ত যেতে-আসতে শক্তির এ্যামবুশে পড়ে যেতে পারে রেকিতে নিয়োজিত দল। শক্তির মোকাবিলা করতে হতে পারে যে-কোনো সহয়। সুতরাং তখন পিন্টুর দরকার হবে রিইনফোর্সমেন্ট নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

সজিমউদ্দিন আজকের রাতের গাইড। সন্ধ্যার আগে জানানো হয় নি কাউকে, কোথায় যাবে দল। যাত্রার আগে সজিমউদ্দিনের নিজের গ্রামে যেতে হবে শুনে ওর চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। এ অপারেশনে গেলে সে তার

ডেক মাস- ১২
অপারেশন বিসমনি

২৪. ১. ১৯৭৩
(কল হাতা)

পূর্ব

বিসমনি রিজ

যাইতামা

বনস্থুতা

AMARBOI

শালবাগান

ডেকরণ্ড

বন্দরখন

১৭৮

বাড়িতে যেতে পারবে, আর সেখানে অপেক্ষা করছে ফুটফুটে এক শ্যামলা নারী, সজিমউদ্দিনের স্ত্রী। রাত্তা ছেড়ে অপথে হেঁটে চলা। শক্র এলাকায়, পরিচিত রাত্তা সব সময়ই এড়িয়ে যেতে হয়। গেরিলা যুদ্ধের একটা অন্যতম কায়দা এটা। বদলুপাড়ার পাশ দিয়ে হাড়িভাসার রাত্তা। সেখান দিয়ে বিসমনি ব্রিজের কাছাকাছি আসতেই কিছু মানুষের কথার গুঞ্জন শোনা যায়। ব্রিজ পাহারা রয়েছে। কাল রাতে হয়তো বিসমনি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার জন্য আসতে হবে। সূতরাং আজ রাতে ব্রিজ পাহারারত মানুষদের জানান দেয়া ঠিক হবে না, আমরা এখানে এসেছিলাম। তাই ফিরে আসি।

এবার বদলুপাড়া। সজিমউদ্দিনের বাড়ি। রাত গভীর হয়েছে এখন। অনুমান ১২টার মতো। সজিম উদ্দিনের বাবা জেগেই ছিলেন। সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন একান্ত আপনজনের মতো।

দীর্ঘ পদযাত্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। ওদের এখন কিছুটা বিশ্রাম দরকার। মোতালেব ও ইব্রাহিম রাত্তায় রইলো। অন্যরা বাড়ির ভেতরে মাটির আঙিনাতেই শরীর এলিয়ে দিলো। রাইফেলের ট্রিগারের আশপাশে সজাগ আঙুল রেখেই।

শামসুলকে নিরাপত্তাজনিত কারণে বাড়ির পেছন দিকের একটা ছোট ঘরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। একটা কুপি হাতে সজিম উদ্দিনের বউ শুধু দেখিয়ে চললো। সজিম উদ্দিন তার পাশে পাশে। যেতে যেতে অনুচ্ছ স্বরে ক্লক্লাইডকে বলছে, খোকার মা, তুই ভালো আছিস গো! মাথার আলগা আঁচল কুপি পড়েছে, কুপির কাঁপা নরম আলোয় উদ্ধৃতিত এক উজ্জল মুখ। বাংলার সিক্ষিত নারীর এক ভালোবাসার মুখ সেটা। ক্রতই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই, প্রকৃতে গ্রামের সামান্য নারীর অনাবিল খুশির আনন্দটুকু কেড়ে দেয়া ঠিক হবে না যাচ্ছবে হোক। সজিম উদ্দিন আজ থাকবে তার বাড়িতে। আজকে রাতে ওর ছুটি।

শামসুল অনেকটা সুস্থ বৃক্ষের ব্যথা কমে এসেছে। জ্বর নেই বললেই চলে। আমাদের দেখে ওর চোখে খুশির ফোয়ারা ছোটে। কেঁদে ফেলে ছেলেটা।

— দূর পাগল কাঁদিস কেনোঁ! এই তো ভালো হয়ে গেছিস, কাল তুকে নিয়ে যাবো। আজ রাতটা আর কালকের দিনটা, ঠিক আছে? বলে সামনা দিই ওকে। মাথা নাড়ে ও। আমরা ফিরি।

সজিম উদ্দিন থেকে যায়। ওকে থাকবার অনুমতি দেয়া হবে, ও এটা ভাবতেই পারে নি। কিন্তু যখন সিদ্ধান্তটা জানাই, প্রবল বেগে ঘাড় নাড়তে থাকে, না সে থাকবে না। না তুই থাক, রাতটা বাড়িতেই কাট। দিনের বেলায় ঘোঁজখবর নিবি, ব্রিজের দিকে খেয়াল রাখবি, রাতে আমরা এলে তোর কাছে সব জেনে নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত মেবো।

খুশি হয় সজিম উদ্দিন। আমরা ফিরি। রাত ভোর হয়ে আসতে থাকে।

সজিম উদ্দিনের এই যে ছুটি, এই ছুটি নিচয়ই ওদের দাপ্তর্য জীবনে উৎসব নিয়ে এসেছে। শামসুলের খুশির কান্না, এটা তো এরকম ব্যাপার। আসলে মানুষের জীবন যে কতো অস্তুত! অধিকাংশ মানুষের জীবনে চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটার দাবি খুব বড় নয়, সামান্য এবং অতি তুঁজ পাওয়াও মানুষকে কী দারুণভাবে উঠেলিত করে, আন্দোলিত করে।

প্রচণ্ড শক্তির বিক্ষেপক-প্রেসার চার্জ, রেমার চার্জ

জুলাইয়ের ২৮ তারিখ।

সারাটা দিন কেটে যায় অলস সময় পার করে। এফিজ নামে একজন কথিত স্পাইকে একরামুলের দল ধরে এনেছে। তার বাড়িতে একটা রেমার চার্জ করেছে। তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে বাড়ির আডিনায় খুটির সঙ্গে। নানাভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। কিন্তু তার একই জবাব, মোক তোমহারালা ছাড়ি দ্যান বাগে, মুই কিছুহ জানো না।

পিন্টুকে সাথে নিয়ে একরামুল, শামসুল চৌধুরী ও মোতালেবসহ চলে আমাদের পরিকল্পনা। মাটির ওপর ক্ষেত্র ম্যাচ তৈরি করে বারবার ত্রিফিং। দুপুর গড়িয়ে আসে বিকেল। নিজের মনের মধ্যে অস্ত্রিতা বাড়ে। আজ বিসমনি অপারেশন হবে নিজেদের একক পরিকল্পনায়। একক নেতৃত্ব আর দায়িত্বে। বিজের ওপর সশস্ত্র শক্রপক্ষের পাহারাদারি। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে প্রথমে ব্রিজ দখলে নিতে হবে। তারপর বিক্ষেপক বসিয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার কাজ। দারুণ ঝুকিপূর্ণ অপারেশন। জানি না কী হবে?

প্রস্তুতি শুরু হয় বিকেল থেকে। পিকে অর্থাৎ হলুদ রঙের প্লাস্টিক চার্জ বা বিক্ষেপকগুলো মোড়ক থেকে খোলা হয়। ভিজে আটার ডেলার মতো নরম বিক্ষেপকগুলো পাতলা সিলোফেন পেপারে ঘোড়ানো, সেগুলো মাটির আডিনায় পাতানো বাঁশের চাটাইয়ের ওপর রাখা হয়। প্রতি ৫ প্রটোটাইপের করে ৪টি প্রেসার চার্জ তৈরি হবে, তারই প্রস্তুতি চলে। ধনা দাসের আডিনায় চলছে প্রস্তুতিপর্ব। সে তার ভাতিজা থগনে দাসকে নিয়ে একটু দূরে বসে শাকে বড় বড় চোখের দৃষ্টি নিয়ে। প্রতিটি ৪ প্রটোটাইপের জন্মের পিকে বিক্ষেপক এক্সটেন্ড সাথে আরেকটা চাপ দিয়ে মেশানো হতে থাকে। মোটামুটি গোল পিণ্ডের মতোভাবে হয় বিক্ষেপকের দল। এর ভেতর গিট দিয়ে ঢোকানো হয় হলুদ রঙের কারটেক্সে। কারটেক্সের তারের সাথে বাঁধা হয় প্রাইমার। প্রাইমারের ভেতর ডেটোনেটর ডেটোনেটর-এর ভেতর সেফটি ফিউজ। ব্যস, তৈরি হয়ে যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রেসার চার্জ বা দাবানো বিক্ষেপক, যা ব্রিজের পাটাতনের ওপর বসিয়ে মাটি বা অন্য কোনো ভাবে কিছু দিয়ে চাপ দিয়ে রেখে সেফটি ফিউজে আগুন দিলেই প্রচণ্ড বিক্ষেপণ শক্তি নিয়ে পাটাতনসহ ব্রিজকে মাটির নিচে বসিয়ে দেবে। টেনিং সেন্টারের ডেমোলেশন এক্সপ্রার্টের বিদ্যার ওপর নির্ভর করে চার্জগুলো তৈরি করতে থাকি। সাথে থাকে ইত্রাহিম, একরামুল, মালেক ও সস্ত। পিকে-এর মোড়ক খুলে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করলে একটা ঝাঁঝালো গুঁড় বের হয়। হাত সামান্য জুলা করে। ঝাঁঝালো ভাবটা চোখে ধৰে। পানি বের হয়ে আসে চোখ থেকে। হাত দিয়ে চোখ ঘষবার উপায় নেই। এতে চোখের জুলা-পোড়া হবে। চোখের ক্ষতি হবে। সুতরাং চোখের পানি হাতের কনুই বা হাঁটুর কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হচ্ছে। বাইরে কড়া পাহারা। অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হবে পিন্টু এমন অস্ত্রগুলো রেডি করছে।

চার্জ বানানো শেষ হয়। এরই মধ্যে মিনহাজ বিকেলের চা খাইয়ে দিয়েছে। ধনার হাতেও চায়ের ভাও। চা খেতে খেতে দূরে বসা ধনা এগিয়ে আসে। এতোক্ষণ সে কথা বলে নি। শুধু দেখেছে। কিন্তু এবার আর ওঁৎসুক দমন করতে পারে না।

— এ্যাইগুলান কি বাবাজী কহেন দি?

— এগুলোর নাম পিকে, প্লাস্টিক চার্জ, ধনার উৎসুক মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথার জবাব দিই।

— কি করছিবেন বা এয়াইগুলান দিয়া? ধনা আরো জানতে চায়। খুব স্বাভাবিক তার উৎসুক্য

— রাতে কাজে লাগবে ধনা বাবু, রাতের শব্দে টের পাবেন।

ধনা আর কিছু বলে না, বড় বড় চোখে শুধু তাকায়। ওর ধারণাতেও নেই কি পরিমাণ শক্তি লুকিয়ে রয়েছে এই হলুদ পিণ্ডগুলোর ভেতরে। এর একটার বিক্ষেপণ ধনার সমস্ত বাড়িটা উড়িয়ে দেয়ার জন্যই যথেষ্ট। যুদ্ধের মাঠে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। ধনার সাথে শক্তপক্ষের কোনোরকম যোগাযোগ নেই সেটা জানি। জানি এগুলো দিয়ে যে আজ রাতে বিসমনি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হবে, একথা ধনাকে বললেও ক্ষতি নেই। কিন্তু যুদ্ধ যুদ্ধই। যুদ্ধের মাঠে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা যুদ্ধের বিরাট ট্রাটেজি। অপারেশনে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্তও অপারেশনগামী যোদ্ধাদেরই তা জানানো হয় না, সেখানে ধনা দাসকে বিসমনি ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার ব্ববর আগাম দেয়ার তো কোনো প্রশ্নই আসে না। সক্ষ্যার মধ্যেই দল তৈরি হয়ে যায়। ২০ জনের শক্তিশালী দল। রাইফেল, টেলগান, এল.এম.জি এবং সেই সাথে ২ ইঞ্জি মর্টারটি নিয়ে আজকের রাতের অন্তসজ্জা এবং অভিযান। প্রতিটি অন্তরের জন্য পর্যাণ গোলাগুলি এবং প্রত্যেকের সাথে ঘেনেড দেয়া হয় দুটো করে। সন্ধ্যার ফিকে আলোয় অপারেশনগামী ছেলেদের ধনার বাড়ির আভিযান টেন লাইনে ফল-ইন করিয়ে বিসমনি ব্রিজ অপারেশনের আজকের রাতের টাক্কেজ পৰ্যাণ জানানো হয়। তারপর চলে বিস্তারিত ব্রিফিং। পিন্টু দাঁড়িয়ে থাকে আমার পাশে। অতস্ত আস্তা আর বিশ্বাস নিয়ে আমি ছেলেদের অপারেশনের সমস্ত দিকটি খোঝাতে থাকি—কার কি অন্ত থাকবে, কে কি কাজ করবে—এই সব। অবশ্য প্রথমে সোজাসুজি হেঁটে বদলুপাড়া। সেখানে সজিম উদ্দিনের কাছ থেকে চূড়ান্ত প্রিপোর্ট নিয়ে বিসমনি। ব্রিজ শক্তপক্ষের পাহারা রয়েছে। ব্রিজের কিছুটা আসে পশির পণ্ডিতের বাড়ি। পশির পণ্ডিত পাকবাহিনীর লোক। কুখ্যাত দালাল। শান্তি কর্মিটির সদস্য। সে নিজে তার লোকজন নিয়ে তার বাড়ির সামনে পাহারা দেয়। ব্রিজ পাহারার পুরো ব্যাপারটা সে দেখাশোনা করে। টহলদার পাকবাহিনী এসে অস্থায়ী ক্যাম্প করে তার বাড়িতে। সুতরাং ব্রিজ দখলের আগেই পশির পণ্ডিতকে থামাতে হবে। নিউট্রালাইজ করতে হবে। অবশ্য তাকে প্রথমেই আঘাত করা যাবে না। তাহলে ব্রিজের পাহারায় নিযুক্ত বাহিনী সজাগ হয়ে যাবে। কঠিন হয়ে পড়বে তখন ব্রিজ দখল। একটা দল পশির পণ্ডিতকে আটকানোর জন্য তার বাড়ির সামনে পাহারায় থাকবে। আমাদের উপস্থিতি সে টের পেয়ে গেলে তাকে ঠাণ্ডা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে মেরে ফেলতে হবে গুলি করে। মিনহাজ থাকবে এ দায়িত্বে। বিসমনি ব্রিজের কাছাকাছি রাস্তার দু'ধার দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগুতে হবে। তারপর সিগনাল পাওয়ার সাথে সাথে সবাই তাদের হাতিয়ার থেকে ফায়ার ওপেন করবে এবং একই সাথে ছিধাইন্তাবে এগিয়ে যাবে ব্রিজের দখল নেয়ার জন্য। পিন্টু মর্টার নিয়ে থাকবে কিছুটা পেছনে। ২ জন থাকবে তার সাথে। তালমার দিক

থেকে শক্র পাল্টা আক্রমণ করলে পিন্টু মর্টার থেকে শেল ছেঁড়া শুরু করবে তাদের আটকানোর জন্য। ইত্রাহিমের কাছে থাকবে এল.এম.জি। ব্রিজের দখল হয়ে গেলে সে ব্রিজের ওপারে ৭ জনকে নিয়ে কভারিং পজিশনে থাকবে। ব্রিজের ওপর চার্জ বসানো এবং তা উড়িয়ে দেয়ার মূল কাজে আমার সাথে থাকবে একরামুল, মোতালেব, চৌধুরী, মালেক আর মধু। মোটামুটি এই হচ্ছে ব্রিফিং।

সক্ষ্য ঘনিয়ে আসে। ছেলেরা দাঁড়িয়ে শোনে তাদের দায়িত্ব। বোঝবার চেষ্টা করে, সামান্য টু শব্দটি পর্যন্ত কেউ করে না। ব্রিফিং শেষে তাদের বলি, মনে রাখবে, এটা আমাদের নিজেদের দায়িত্বে প্রথম অপারেশন। এ অপারেশন সফল করতেই হবে যে করেই হোক। কেউ সামান্যতম ডয় পাবে না। গোলাগুলি শুরু হলে যাবড়ে যাবে না। প্লান আর নির্দেশমাফিক কাজ করবে। এককভাবে কেউ ভুল করে বসবে না। দল ছেড়ে কেউ পালিয়ে আসবে না। কোনো অবস্থাতেই হাতিয়ার লস করবে না ব্যাস, কথা শেষ, তোমরা বুঝতে পেরেছো?

— হ্যা,

— কোনো সন্দেহ?

— না।

— কোনো প্রশ্ন?

— না।

— ওকে, দেন ব্রেক, জয়বাংলা।

— জয়বাংলা . . .।

এক সাথে গর্জে ওঠে সবগুলো বৃক্ষ জয়বাংলা' ধ্বনি প্রতিধ্বনি ভেসে বেড়ায় ধনা দাসের আঙিনায়, তার কাউন্ট ছাড়িয়ে আশপাশের বারাথান গ্রামে। ছেলেরা তাদের খাওয়া ও প্রস্তুতি নিষ্ক্রিয়ায়, তখন ধনা দাস ছুটে আসে, অত্যন্ত উত্তেজিত দেখায় তাকে, বলে, ম-হো-রাম বা, মোক যাবা হবে। তুমহার লার সাথ্।

— দূর পাগোল, তুমি যাবে কেনো?

— না মোক যাবা হবে। তুমহারালা জয়বাংলা করিবার তাহনে যাছেন, মোকে যাবা হবে।

উচ্চাসে উত্তেজনায় ধনা দাস পাগলের মতো কথা বলতে থাকে। ও হয়তো ভেবেছে আজকের অপারেশন শেষ হলেই তার কাঞ্জিকত জয়বাংলা আসবে, কিংবা ভাবছে, জয়বাংলা আনার জন্য এই যে আমাদের যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি, তাতে তারও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। ধনা মুক্তিযোদ্ধা নয়, যুদ্ধে যাওয়ার তার টেনিং-প্রস্তুতি এগুলো কিছুই নেই, কিন্তু তাই বলে কি সে আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধের শরিকানার দাবিদার নয়? এতোগুলো মুক্তিযোদ্ধাকে সে হাইড আউটের আশ্রয় দিয়েছে, নিজেদের বাড়িয়ের ছেড়ে দিয়েছে, নিজের আর নিজের কমিউনিটির জন্য জীবনের ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়েছে এর কল্যাণেই তো সে মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই পরমলক্ষ্যে তার অবদান আমাদের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই। ধনার কাঁধে হাত রেখে তাকে নিরস্ত করি, না ধনা, তুমি যাবে না। তুমি গেলে, এই

যে তোমার এখানে আমরা আছি, আমাদের দেখবে কে? ধন্য কিছু বলে না। কেবল দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে।

অপারেশন বিসমনি

পশির পঙ্গিতের বাড়ির সামনেই গোলমালটা শুরু হয়ে গেলো। যেটা এড়ানোর প্রচও চেষ্টা নিয়ে আমরা রাত ৮টার দিক থেকে ঘূর্ণ টার্গেটের দিকে এগুতে শুরু করেছি। বদলপুড়ায় সজিমউদ্দিন আমাদের অপেক্ষায় ছিলো। সে খবর দিলো সব ঠিকঠাক আছে। নরমাল। পাক বাইনী দিনের বেলায় আসে নি। তবে পশির পঙ্গিতের বাড়ির সামনে দিয়ে সাবধানে যেতে হবে এদিকে মুক্তিবাহিনী যে এসেছে, সে জেনে গেছে। গত রাত থেকে ত্রিজের ওপর পাহারা জোরদার করেছে। আজ রাতে ত্রিজের পাহারায় আছে শান্তি কমিটি আর রাজাকার মিলিয়ে ৮ জন। রাইফেল আছে ওদের সাথে। পশির পঙ্গিতের বাড়ির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। অথচ ওখান দিয়েই বিসমনি ত্রিজে যেতে হবে। ২০/২২ জনের দল ছোট নয়। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলো, রাস্তার পাশের জেগে থাকা মানুষ টের পাবেই। হলোও তাই। পশিরের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছুবার সাথে সাথেই সে টের পেয়ে গেলো আমাদের উপস্থিতি। রাস্তার প্রায় লাগোয়া রীতিমতো বিরাট একটা এলাকা জুড়ে পশিরের বাড়িঘর। বাড়ির বাইরে উভয়ের তার লোকজন নিয়ে সে বসা ছিলো। চিন্কার দিয়ে ওঠে সে, কে যায়? কে যায়?

— মিনহাজ কুইক, নির্দেশ চলে যায় মিনহাজের উদ্দেশে। মিনহাজ তার পাঁচজনের দল নিয়ে নেয়ে যায় পশিরের বাড়ির দহলিজে।

— কে, কেটা আসে, কায় আছে হে এদিক আইসো...।

আর তখনি চরাচর চিরে গড়ে শব্দ হয় রাইফেল থেকে। রাতের নিষ্ঠকতা ভেঙে যায়। পশিরের গলা ঢেকে ঝুঁত তাতে। আমরা দ্রুত এগুতে থাকি ত্রিজের দিকে। ধূলোয় ধূসর পঞ্চড়-জলপঞ্চগুড়ি উঁচু জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে। নিজেদের অস্তিত্ব ঢাকবার আর উপায় নেই। আনসার কমান্ডার মিনহাজ পশিরকে সামলে নেবে ঠিক; কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য ত্রিজ দখল করতে হবে দ্রুত। আমরা প্রায় ছুটেছি ত্রিজের দিকে। এমন সময় ত্রিজের ওপর থেকে শুরু হলো রাইফেলের গুলির শব্দ। আমরা তখন ত্রিজের কাছাকাছি, প্রায় ৫০ গজের মধ্যে। থামতে হলো। সবাইকে দ্রুত রাস্তার পাশে পজিশন নিয়ে ফায়ার ওপেন করতে বললাম। আমারও টেল থেকে এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেলো ত্রিজ অভিযুক্তে। অন্য ছেলেরাও তাদের হাতিয়ার থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। রাতের অঙ্ককারের নিষ্ঠকতা ছিন্নিন্ন করে দিয়ে শুরু হয়ে গেলো যুদ্ধের এক প্রলয়ক্ষেত্র তাওব। ত্রিজের ওপর তখনও আমাদের প্রতিপক্ষের দৃঢ় অবস্থান। তাদের চিন্কার, কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, সেই সাথে ঝুঁড়ে গুলি। এসময় সবচেয়ে বেশি যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে এল.এম.জি থেকে একটানা গুলিবর্ষণ। ইত্রাহিমের কাছে এল.এম.জি। পাগলের মতো ধন্তবধন্তি করছে সে ওটা নিয়ে আর সে অবস্থাতেই একসময় চিন্কার করে দুষ্টসংবাদটা দিলো, বাহে চাঞ্জি, এল.এম.জি তো ফোটে না।

শুয়োরের বাচ্চা, মুখ দিয়ে বিস্তি বের হয়ে আসে। হারামজাদা এল.এম.জি চালাতে

পারিস না। তো নিতে গেলি কেনো? এল.এম.জি চলছে না তাতে কি ব্রিজ তো দখলে নিতে হবে। কথাটা শেষ করেই মরিয়া হয়ে ছেলেদের এগুতে বলি। নিজে টেনগানের ট্রিগার টেনে ব্রাশ দিতে দিতে সবাইকে টপকে সামনে যেতে থাকি। ফল ফললো তাতে। একসময় ব্রিজের হতচকিত পাহারাদার বাহিনী রথে ভঙ্গ দেয় আমাদের একটানা প্রবল গুলি-বর্ষণের মুখে। কয়েকজন ঝাপ দিয়ে পড়ে ব্রিজের নিচে কালো পানিতে। দৌড় দেয় কেউ কেউ তালমার দিকে উর্ধ্বাসে। মৃহূর্ত কয়েকের ভেতরেই ব্রিজ দখলে চলে আসে। ব্রিজের ওপারে ক'জনকে কভারিং পজিশনে শুইয়ে রেখে আমরা দ্রুত কাজে লেগে পড়ি।

ব্রিটিশ আমলে তৈরি শক্ত ইটের গাঁথুনির প্রায় ২০ ফুট স্পানের ব্রিজ। সুবিধা মতো জায়গায় চার্জগুলো বসিয়ে দিই। সজিম উদ্দিন রাস্তার ঢালুতে কোদাল দিয়ে মাটির চাপ কাটতে থাকে। মোতালেব, ইব্রাহিম, মালেক, মমতাজ সেগুলো বয়ে আনতে থাকে। আর আমি, শামসুল চৌধুরী, একরামুল ও মোতালেবের সাহায্যে লাগানো চার্জগুলোর ওপর মাটির সেই সব চাপ বসাতে থাকি। দ্রুত চলছে হাত। ৪টা চার্জের সাথে সংযোগ করে একটা সার্কিট করে ফেলি। হাতের কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ঠিক এমন সময় তালমার ব্রিজের ওপরে অবস্থান নেয়। পাকবাহিনী গুলিবর্ষণ শুরু করে। মনে হয়, বিসমনি ব্রিজে আক্রমণের খবর পেন্টেন্ডারী ডিফেন্স ছেড়ে উঠে এসে গুলিবর্ষণ শুরু করেছে এবং বিসমনির রাস্তা ধরে প্রবিষ্ট আসছে। প্রচও তাদের ফায়ার পাওয়ার মনে হলো, আসছেও তারা দ্রুতগতিতে প্রয়োগয়ে। হাতে কাজ সামান্য বাকি। এদিকে ব্রিজের ওপরে অবস্থান নেয়। জলেরা অস্ত্রির হয়ে উঠেছে। ইব্রাহিমের এল.এম.জি সচল হয় নি। সে পেছনে পেন্ট তার সাথে। পিন্টুর কাছে ২ ইঞ্জিং মর্টার। এখন পাকবাহিনীর অগ্রগতি থামাতে ২ ইঞ্জিং মর্টারের গোলাবর্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু পিন্টু ব্যাপারটা ধরতে পারছে না। তাই মধুকে পাঠাই পিন্টুকে মর্টারসহ এগিয়ে আসার জন্য। সময় নষ্ট না করে পিন্টু সৌড়ে আসে। একরামুল, চৌধুরীকে তাদের হাতের কাজ চালু রাখতে বলে, পিন্টু আসতেই তার হাত থেকে ২ ইঞ্জিং মর্টারটা নিয়ে হাঁটু শেড়ে বাঁ পায়ের আঙুলের ওপর মর্টারের গোড়ার পাঠাটা বসিয়ে তালমার দিকে সেট করি। পিন্টুকে শেল খুলতে বলি, পিন্টু রীতিমতো কাঁপছে। মর্টারের শেলের মুখে প্যাচ দিয়ে বসানো ঢাকনা খুলতে পারছে না সে। তাই তার হাত থেকে শেল নিয়ে গায়ের জোরে ঢাকনার প্যাচ ঘোরাই। খুলে যায় প্যাচ। এরপর মর্টারের মুখ গহরের দিয়ে শেল ভরে লিভারে চাপ দিই। ৪৫ ডিগ্রি এঙ্গেলে ধরা মর্টার কাঁপিয়ে আগুনের ঝলক দিয়ে শেল উড়ে যায় তালমার দিকে একটা টপু শব্দ করে। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে তা বিস্ফোরিত হয় আগুন। পাকবাহিনীর সামনে প্রচও শব্দ ভুলে। এতে কাজ হয়। আগুন। পাকবাহিনী যেনে হঠাত করে থেমে যায়। তাদের গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। না, আর দেরি করা যায় না। মনে শক্ত এলো, ওরা হয়তো গুলিবর্ষণ বন্ধ করে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। তাই পিন্টুর হাতে মর্টার ধরিয়ে দিয়ে আবার ব্রিজের ওপর উঠে আসি। আকাস, নাদের, মধুসহ ব্রিজের সামনে অবস্থান নেয়া ছেলেদের দ্রুত ব্রিজের এপারে চলে আসার নির্দেশ দিই। ওরা চলে আসে।

এদিকে পাকবাহিনী আবার শুরু করেছে পুরোমাত্রায় গুলিবর্ষণ। এবার ঠাণ্ডা মাথায় ব্রিজের ওপর বসে কোমরে গুঁজে রাখা সেফ্টি ম্যাচ বের করি। বের করে সেফটি ফিউজের মাথার ওপরে ছেঁয়াই জুলত আলোহীন কাঠ। আর লাগতেই ফরফর জুল ওঠে ২ ফুট সমান সেফ্টি ফিউজ তারের মাথা। আর মাত্র ৩০ সেকেন্ডের মতো সময় পাওয়া যাবে। দৌড়তে বলি সবাইকে পেছনের দিকে। নিজেও মাথা নিচু করে দ্রুত পিছিয়ে এসে রাস্তার ঢালতে শুয়ে পড়ি। সেই অবস্থাতেই গুণে চলি সময়। হ্যাঁ, ওই তো প্রথমে একটা নীল আলোর ঝলক, তারপর একটা তীব্র আলোর ছটা—তারপর আকাশ আর মাটি কঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ তুলে বিস্ফোরিত হলো প্রেসার চার্জ চারটা। বিস্ফোরণের শব্দ এতোটা প্রচণ্ড হবে, সেটা আমাদেরও ধারণাতে আসে নি। শক ওয়েভের ধাক্কা প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয় আমাদের সবাইকে। সবাইরই বধির, হতচকিত, নির্বাক আর নিশ্চল হওয়ার দশা। খোয়া-বালি-পানি-কাদা আকাশে নিষ্কিঞ্চ হয়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে সেগুলো ঝুরঝুর করে। সম্ভত পরিবেশ একটা নারকীয় অবস্থার রূপ নেয়। সবিং ফিরে আসে ধাক্কাটা সামলানোর পর। একরাত্ন, চৌধুরীসহ দ্রুত এগিয়ে যাই ব্রিজের অবস্থা দেখবার জন্য। রেলিংসহ ব্রিজটার অধিকাংশই ধসে গিয়ে ডেবে গেছে নিচের কালো পানিতে। ব্রিজের ওপর জমাট বাঁধা কালো ধোয়া, পোতা বাকদের গঞ্জ, বিস্ফোরক পোড়ার টুকরো টুকরো আগনুরে স্ফুলিঙ্গ। ব্রিজটা কাঁক্কলি উড়েই গেলো! কিছুক্ষণ আগেও তো ছিলো। সত্যি অবাক লাগে বিস্ফোরণের এই ঘৰ্সনাত্মক ক্ষমতায়।

ফিরে আসি। পেছনে হতবিহুল দলের সমন্বয় তখনও পজিশনে। পাকবাহিনী এই এলাকায় এই প্রথম প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের শব্দের ধাক্কা থেঁয়েছে। চুপ করে গেছে ওরাও। এবার পশির পদ্ধতির বাড়ি মিনহাজ প্রথমেই বলে বসে, গুলি করে দিয়েছি।

— করেছিস!

— হ্যাঁ।

— এমনিতে থামাতে পুরালি না?

— না, শালা দাও দিয়ে মারতে এসেছিলো।

— ঠিক আছে, কোথায় সে?

— এই ঘরে, আসেন।

গেলাম, অক্কারে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে একজনকে রক্তাপুত অবস্থান দেখলাম। পিন্টু হাত ধরে টানে, আসেন।

আমি বলি, মিনহাজ, বাঁচবে তো?

— মনে হয় না।

— রেমার চার্জগুলো কোথায়?

— আছে।

— নিয়ে আয়, মেয়েলোক আর বাচ্চারা কোথায়?

— এই ঘরে যেখানে পশির পড়ে আছে।

৪টা বড় বড় টিমের দোচালা ঘর। বড় আঙিনা। যে ঘরে মিনহাজ ওদের জড়ে করেছে, সে ঘরটা ছাড়া অন্য তিনটা ঘরে রেমার চার্জে আগন দিয়ে ছুঁড়ে দ্রুত বেরিয়ে

আসি। বাস্তায় ওঠার পর চার্জগুলো বিক্ষেপিত হতে থাকে। প্রচণ্ড বিক্ষেপণ আগুনের হলকা নিয়ে যেনো ছাদ ঝুঁড়ে বেরিয়ে আসে। পরপর তিনটে ঘরের একই অবস্থা। আমরা ফিরে চলি। পেছনে পড়ে থাকে উড়ে যাওয়া বিসমনি ট্রিজ। আর পশিরের জ্বলন বাড়িয়ার। দ্রুত পা চলে সকলের। পেছন থেকে কিছু একটা যেনো তাড়া করে আসছে এমনি একটা অনুভূতি কাজ করে মনের মধ্যে। বদলুপাড়ায় এসে শামসূলকে সাথে নিই। সজিমউদ্দিন আর বাড়িতে থাকতে পারবে না। আসতেও হয়তো পারবে না।

বদলুপাড়ায় যারা আমাদের হাইড আউটের ব্যবস্থা করেছিলো, অঙ্ককারে সেই আপনজনেরা আমাদের চারপাশে জড়ো হয়ে থাকে। জড়িয়ে ধরে সবাই। সেই সাথে ভৌতিক তাদের মনে। আমি মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলি। আর তখনি মনে পড়ে, আমাদের খুঁজে বের করতে আগামীকাল পাকবাহিনী এখানে আসবেই। জানি না এদের জন্য, বদলুপাড়াবাসীর মাথার ওপর আমরা কোন্ ভয়ঙ্কর মরণবিপদ ঝুলিয়ে রেখে যাচ্ছি।

২৮. ৭. ৭১

ডাবুরডাঙ্গা : তৃতীয় 'হাইড আউট'

ডাবুরডাঙ্গা গ্রামে আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়িতে স্থাপিত হলো তৃতীয় হাইড আউট। বিসমনি অপারেশন থেকে ফিরেই বাত শেষ হওয়ার আগে সমস্ত দলকে সরিয়ে নিতে হয়েছে। বারাথানে ধনা দাসের বাড়িতে হাইড আউটে থাকা নিরাপদ মনে হয় নি। বিসমনি ট্রিজ অপারেশন পাকবাহিনী আঁকড়ে দেবে, টনক নড়িয়ে দেবে তাদের ব্রহ্মির আর শান্তির, সকালেই ওরা চলে অসমস্ত বিসমনি। সেখান থেকে সোজা চলে আসবে পশির পঙ্গিতের বাঢ়ি। হয়তো এসে দেখবে তাদের বক্স পশির পঙ্গিত মৃত। ভূমিভূত তার বাড়িয়ার। উড়ে গেছে বিসমনি ট্রিজ। আর এসবই ওরা সহজভাবে নেবে না। এতোদিন ওরা প্রায় চূপচাপ বসেছিল অমরখানা ভেতরগড়ের দিকে। সামনের দিকে মুখ করে। কিছু এবার মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ডানপাশ দিয়ে এসে পাঁজরে থাবা বসিয়েছে। এতে করে ওরা পাগলা কুতুর মতো হন্তে হয়ে উঠবে। পাতিপাতি করে খুঁজ ফিরবে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান। তাদের আগমন-নির্গমন পথ। খুঁজ বের করবে তাদের মিত্রদেরও। উচ্চার করে জেনে নেবে তাদের বর্তমান অবস্থান। তারপর হয়তো সম্মুখে বিনাশ করার জন্য অমিতশক্তিসহ অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়বে তাদের ওপর। সুতরাং একটা অপারেশন শেষে গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য হাইড আউট পরিবর্তন করা আবশ্যিকীয় হয়ে দাঢ়ায়। আমাদের পিছু ধাওয়া করে পাকবাহিনীর পক্ষে ধনা দাসদের বারাথান গ্রাম পর্যন্ত আসা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। সুতরাং দলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বারাথান ছেড়ে চলে যাওয়া প্রয়োজন। এছাড়া আমাদের আশ্রয়দানকারী বারাথানবাসীদের কথাটাও ভাবতে হবে। এমনিতে এরা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। পাকিস্তানিদের জাতক্ষেত্র এদের ওপরই বেশি। এখানে এলে তারা হত্যা করবে অবশিষ্ট মানুষ কঢ়িকে। ধরতে পারলে বাঁচিয়ে রাখবে না কাউকেই। এছাড়া পুরো গ্রামটা লঙ্ঘণ করে দেবে। জুলিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে সবকিছু। তাই গেরিলা মুক্তের ট্রেটেজি অনুযায়ী সরে যেতে হবে আমাদের এখান থেকে

এবং আজ রাতেই। শেষ রাতে তাই শুরু হয়ে যায় গোছগাছ করার পালা।

— তুমহারলা যাচ্ছেন গে?

— হ্যাঁ, যাচ্ছি।

— কুঠে যাচ্ছেন, কেনহে যাচ্ছেন, আর থাকিবেন নি? ধনা দাসের উৎকস্তিত প্রশ্ন। ও হয়তো ভেবেছিলো, আমরা এখানে বেশ ক' দিন থাকবো। আমাদের উপস্থিতির ভেতর দিয়ে ওরা ওদের উৎকস্তা আর অনিচ্ছ্যতার অবসানের কিছুটা আশ্বাস খুঁজে পেয়েছিলো। আর সেই আমাদের যাওয়ার প্রস্তুতি দেখে ও দৃঢ়থে প্রায় কেঁদে ফেলে।

— আমরা কাছাকাছিই থাকবো ধনা, আঞ্চলিক ভাষায় আমার সান্ত্বনা, তোমরা চিন্তা করিও না।

— তুমহারলা যাচ্ছেন, তাইলে জয়বাংলা, জয়বাংলা হবে নিগে? ধনা দাসের বুক চিরে যেনে আর্তনাদের মতো, তার গভীরতম বিশ্বাসের কথাটা প্রশ্নের মতো বেরিয়ে আসে, জয়বাংলা তাহলে কি হবে না? আমরা রওনা দিই। শেষ রাতের অঙ্ককার গায়ে মেখে ধনা দাঁড়িয়ে থাকে তার জিজ্ঞাসা নিয়ে, যে জিজ্ঞাসা এখন শুধু ধনা নয়, সারা দেশের প্রতিটি মানুষের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়িটা রীতিমতে গ্রামের একটা সম্পদশালী আর সন্তুষ্ট লোকের বাড়ি। সে নিজে করতো মুসলিম লীগ। যুদ্ধের প্রভৃতি পাকিস্তান রক্ষার আদর্শ নিয়ে নিজেকে সে লিপ্ত করে প্রাণপণে। এর ফলে সম্মত এলাকায় নিজেদের বাড়িতে তার থাকাটা নিরাপদ না হওয়ায় সে গিয়ে অস্থির সেয়েছে পঞ্চগড় শহরে, পাকবাহিনীর প্রতিরক্ষা বৃহের মধ্যে। সেখানে থেকে স্থানক্ষেত্রে পাকিস্তান রক্ষার কাজে নিজের তৎপরতা বজায় রেখেছে। পাকবাহিনীর দোষক্রমে দুজে বসেছে। অনেকটা অনিচ্ছ্যতার মধ্যে ভাসতে ভাসতেই শেষ পর্যন্ত তাই আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়িতে হাইড আউট স্থাপনের সিদ্ধান্তটা, বলা যায়, আকর্ষিতভাবেই নিয়ে ফেলি। আনাজ মিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান। এখন পঞ্চগড়ে শক্তিবাহিনীর ছত্রছায়ায় তাদের সাহায্যকারী দালালের কাজ করছে। আর সেই দালালের নিজের বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি, এটা প্রথমত, পাকবাহিনী বিশ্বাস করবে না। দ্বিতীয়ত, যদি পাকবাহিনী এটা বিশ্বাস করেও তবে আনাজ মিয়া তাদের দুশ্মন সেজে যাবে অনিবার্যভাবে। আনাজ মিয়ার মতো একটা দুশ্মনকে ওরা যদি দুনিয়া থেকে রেগে-মেগে সরিয়ে দেয়, তবে সেটা হবে আমাদের জন্য একটা বিরাট কল্যাণমূলক সাফল্য।

আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়িতে তার এক ১৬/১৭ বছরের ছেলেকে পাওয়া গেলো। পাওয়া গেলো তার বৃক্ষ মাসহ কয়েকজন নারী-পুরুষ ও আচার্যসন্তানকে। প্রথমে আমাদের দেখে ওরা আঁতকে উঠলো। ভয় পেয়ে কিছুটা চেচামেচি করলো। তারপর পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কিন্তু অস্তি, ভয় আর সন্দেহটা কাটলো না সম্ভবত। একটা লম্বা চৌচালা টিনের ঘরে আশ্বাস নিলাম আমরা। ঘরটায় বড় বড় লাগোয়া শোয়ার চৌকি। বিছানা তোশকও রয়েছে। ছেলেরা চৌকি ও মেঝে উভয় জায়গাতেই শুতে পারবে। আনাজের বৃক্ষ মা আমাদের জন্য আর একটা ঘরের ব্যবহা করলেন। তিনি ভয় পাওয়ার কারণে সম্ভবত একটু বেশি বেশি করে খাতি-

যত্ন করার চেষ্টা করছেন।

বেশ বড়সড়ো এলাকা নিয়েই আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়ি। বনেদি পরিবার। সচলতাও প্রচুর। বাড়ির ভেতরে প্রশস্ত আঙিনা। তিনদিকে চৌচালা বিরাট বিরাট কয়েকটি টিনের ঘর। গোয়াল ও পাকের ঘরসহ আরো ৩/৪টি ঘর। পাকা ইন্দুর। বাড়ির পেছনে বিরাট আম-কাঠাল-সুপুরির বাগান। উচু করে বাঁশের ফালা দিয়ে বাড়িটা ঘেরা দেয়। বাড়ির সামনে গাছগাছালি ছাওয়া চমৎকার একটা দহলিজ। একটা বেড়াবিহীন ছনের চালা দেয়া বৈঠকখানা। সামনে সুন্দর মাঝারি সাইজের একটা পুরুর। পুরুরের দু'ধার দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা গিয়ে মিশেছে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে। বাড়ির সামনে একটা ছাইলা গঁরুগাড়ি। ২/৩টা খড়ের গাদা। গ্রামের একটি বিস্তৃত সুবীর সন্তুষ্ট লোকের বাড়ি বলতে যা বোঝায়, এ বাড়িতে তার স্পষ্ট নিদর্শন। ক'দিনের কষ্টের পর এখানে এসে অবধি সত্যিই ভালো লাগছে। অনেকটা গ্রামের নানা ও দাদার বাড়ির ছাপ রয়েছে এ বাড়িটার সারা অবয়বে।

আনাজ চেয়ারম্যানের ম্যাট্রিক পাস করে সদ্য কলেজে ভর্তি হওয়া ছেলেটা আমাদের প্রথমে খুব একটা সহযোগিতা করতে চায় না। একটা ঘাড় ট্যারা ট্যারা ভাব। খানিকটা বেয়াদৰ ধরনেরই। সকাল দশটার টিকে দেখা যায়, মোতালেব চোখেযুক্ত ক্রোধের আগুন জুলিয়ে টেনগানের নলজলের বুকে ঠিকিয়ে ঠিলতে ঠিলতে তাকে বাড়ির বাইরে টেনে আনছে। মেতালেব যেমন ভালো মানুষ, তেমনি আবার হঠাতে করে হিস্ত হয়ে উঠতেও তার বীভূত না। আর তখন কিছু একটা করে বসতেও পারে। মোতালেবের ঘটনার প্রক্রিয়া শুশ্বর্যস্ত হয়ে উঠ। দহলিজের গাছের ছায়ায় বাঁশের মাচার ওপর অলস ভঙ্গ দিয়ে শোয়া অবস্থায় আমরা তখন। স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে ইনফরমেশন যোগাড় করে কাজে ব্যস্ত। পিছু আর চৌধুরী, একরামুলও রয়েছে আমার সাথে। আর সেই অবস্থায় মোতালেব কিংবা আর কেওখানিত অবস্থায় আনাজ চেয়ারম্যানের ছেলেকে আমাদের সামনে এনে হাজির করলো।

— কি হয়েছে রে?

— দেখেন দেখি, শা... দালালের বাঢ়া কহছে কি, হামরা নাকি পরিবার নাহি খানদের সাথে, কহছে দেশ নাকি স্বাধীন হবে নাই।

— দূর পাগল, বলে এগিয়ে যেয়ে ওর হাত থেকে টেনগানটা নিয়ে নিই। ছেলেটা সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে, রীতিমতো কাঁপছে।

— তুমি একথা বলেছ?

— না মানে আমি ঠিক এভাবে কহি নাই।

— ঠিক আছে, যাও আর বলবে না।

আনাজ চেয়ারম্যানের কলেজে পড়া ছেলে মোতালেবদের সাথে বোধ হয় রাজনীতি নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে পাকবাহিনীর সাজসজ্জা যা সে নিজে দেখেছে এবং পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার ব্যাপারটা, যা এখনও তার কাছে অবিষ্মাস্য, তাই হয়তো অন্তরঙ্গ আলোচনায় মোতালেবদের কাছে বলে ফেলেছে। তাতেই যতো বিপন্নি। ছেলেটা তার চোখের পানি হাতের তালু দিয়ে মুছছে। মায়া লাগে ছেলেটার এ

অবস্থা দেখে । বলি তাকে, যাও, আর এসব কথা বলবে না, কেমন?

ছেলেটা মাথা অবনত করে । তারপর তাকে আশ্চর্ষ করার জন্য বলি, এই ছেলে, তোমাদের জাল আছে? পুকুরে মাছ ধরবেন? আমি এবার মোতালেবকে বলি, মোতালেব, যা তো মাছ ধরার ব্যবস্থা কর দেখি এর সাথে । মোতালেব খুশিতে লাফিয়ে ওঠে: মন থেকে মুছে যায় তার কিছুক্ষণ আগেকার সেই গনগনে রাগ । জড়িয়ে ধরে ছেলেটাকে, চলেন, চলেন বন্ধু মাছ ধরি, বহুত দিন মাছ থাই না হামরা । ওরা জড়াজড়ি করে বাড়ির ভেতরে চলে যায় । পেছন থেকে পিন্টুর উচ্ছ্বসিত কষ্ট ভেসে আসে, পাগল কোথাকার ।

দুপুরে মাছে-ভাতে পেটপুরে খাওয়া হয় । বিকেলে বিমবামিয়ে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে । বৃক্ষ জননী বারবার আশপাশে ঘূরঘূর করেন । আর কিছুক্ষণ পরপর জিগ্যেস করেন, কহন্তি বা, তুমহারালা কেনহে আসিছেন?

— আমরা তো মুক্তিকৌজ বুড়িমা । দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তি নেমেছি ।

— তুমহারালা মোর ছইলডাক মারিবিবেন, কহন্তি বা?

আনাজ চেয়ারম্যানের বৃক্ষ জননী বারবার তার আকুতিভরা কষ্টে জানতে চান, আমরা তার ছেলেকে হত্যা করবো কি না?

— কহেন তুমহারা, তাক মারিবিবার তানে আসিবেন?

— না, কে বললো আপনাকে?

— তুমহারা তার কুনো ক্ষতি করেন না প্রিয়ো, যা চাহিবেন, তুমহারা তাই দেয় মুই, কহেন কি নিবেন?

— না, বুড়িমা, আমরা তাকে যাহারো না, তাকে ফিরে আসতে বলেন । বলেন, সে যেনো আর পাকবাহীনীর মুলালি না করে । বাড়িতে এসে থাকুক । জয়বাংলার পক্ষে কাজ করবুক । তাহলে তুমকেনো ক্ষতি হবে না ।

— নাহি, ব্যাটা মোর ঝুরি দালালি করবিবে নি, মুই তাকে আসিবার তাহনে কহে দিম । মানুষ পাঠায় তুমহারা তার কুনো ক্ষতি করেন না গে ।

বৃক্ষ ঘ্যানৰ ঘ্যানৰ করতে থাকে । আমরা আনাজ চেয়ারম্যানের সারেভার করার শর্তে তাকে হত্যা না করার প্রতিশ্রুতি দিই । তবু বৃক্ষার মন মানে না । প্রচণ্ড একটা ভয় তাকে তাড়িয়ে ফেরে ।

মজিব : বাদল দিনের আগত্বক

লোক ঘরের চৌকিতে পাতা মাদুরের ওপর শুয়ে আছি । রাতের অপারেশনের প্ল্যান ঘূরছে মাথায় । পিন্টু এক মাথা জল নিয়ে ঘরে ঢেকে । আকাশ ভেঙে পড়বে না কিরে বাবা? বলতে বলতে সে বিছানার কাছে আসে । চোখে-মুখে একবার বিরক্তি ফুটিয়ে ক্ষুক্ষ গলায় পিন্টু বলতে থাকে, ব্যাটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ইয়ং ছেলে, বাড়িতে বসে শান্তির দিন কাটাচ্ছেন, আর এখন আসছেন ভদ্রতা দেখাতে শা... ।

— কি হয়েছে, কে? জানতে চাই ওর বিরক্তিমাখা মুখের দিকে তাকিয়ে ।

— এক ব্যাটা এসেছে, আমাদের সাথে পরিচিত হতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ।

— কোথায় সে?

— ও ঘরে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। চালচলন দেখে মনে হয় ব্যাটি পাকিস্তানি স্পাই।

— ঠিক আছে, ডাকো তাকে, এই ভরা বৃষ্টির মধ্যে যখন এসেছে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। একরামুল নিয়ে আসে তাকে। মুখে তার কালো দাঢ়ি। শুকনো পাতলা গড়নের এক যুবক। চোখে-মুখে শিক্ষার পালিশ দেয়া। ভদ্রবরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। পরনে লুঙ্গি। গায়ে শার্ট, খালি পা। কিছুটা ভীতিমাখা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। মনে হয়, কিছু বলবে বলে দূর থেকে এসেছে।

— আমার নাম মজিবর রহমান। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টেন্সির অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আপনাদের সাথে পরিচিত হতে এসেছি। সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দেয় আগন্তুক যুবক।

— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়েন, তো ভালো কথা, যুক্ত যান নি কেনো?

— জি অসুবিধা ছিলো। আমতা আমতা করে বলে যুবক।

— কি অসুবিধা? পিন্টু প্রায় ধরকে ওঠে।

— দ্যাখেন সবার পক্ষে কি যুক্ত যাওয়া সম্ভব?

— শাট্ আপ। প্রচঙ্গভাবে এবার ধরকে উঠি আসুন—দেশের এই দুর্যোগের সময় ইউনিভার্সিটিতে পড়া একজন যুবক বাড়িতে বসে আছেন, লজ্জা করে না? দেখেন তো তাকিয়ে ছেলেদের দিকে—বলেই পিন্টু ফেরতুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় শোয়া-বসা ছেলেদের দিকে। দেখেন তো, এই সব জল এরাও পড়তো, কেউ কুলে, কেউ বা কলেজে। আবার কেউ পড়তো না হলে চাষ করতো। কেউ ছিলো দিনমজুর। এরা কেনো এসেছে? কেনো এসেছে এবার আপনার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া না বলে?

মজিব ধরকের চোখে ঝুঁটিলা কুকড়ে যায়। মোতালেব তার সাথের যে এল.এম.জিতে পুল থ্রি মারাছিলো সেটা সে রেখে দিয়ে পাশে শোয়ানো একটা টেনগান নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এবার তয় পেয়ে ফ্যাকাশে মুখে মজিব চৌকিটার ধার ঘেঁষে আমার কাছাকাছি চলে আসে। আমি মোতালেবকে ইশারা করি। সে আবার বসে পড়ে।

— তো, কী জন্য এসেছেন? গলায় স্বর ওপরে তুলে জানতে চাই তার আগমনের উদ্দেশ্যে।

— আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে সারেন্ডার করতে।

— সারেন্ডার করতে? কেনো?

— জি আমাদের বাড়ি সর্দার পাড়া, আমার বাবার নাম হালিম মাস্টার।

— হালিম মাস্টার? ন্যাট কালপ্রিট মুসলিম লীগার, দালাল হালিম মাস্টার?

ঘরে যেনো বাজ পড়ে। আমাদের অন্যতম টার্গেট পাকবাহিনীর দালাল হালিম মাস্টারের ছেলে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, সারেন্ডার করবে! আমি এবার ভালোভাবে তার মুখের দিকে চাই। ঘরের আর সবার উৎসুক দৃষ্টি তার দিকে। মোতালেব আবার যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়িয়েছে। পিন্টু চৌকি থেকে নেমে গেছে। দরোজার কাছে দাঁড়ানো একরামুল, চৌধুরীসহ দু'একজন এগিয়ে আসে।

মজিব নিজের বিপদ টের পায়। সে তখন থায় কানুজড়িত গলায় বলতে থাকে, বিশ্বাস করেন, আমি দালাল নই, পাকিস্তানি স্পাই নই। আমি এসেছি আপনাদের আশ্রয়স্থার্থী হতে, সারেন্ডার করতে। আমার বাবা আর দালালি করবেন না। আমরা যুদ্ধ করতে চাই। আমরা জয়বাংলা চাই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাই।

বাইরে বন্দরমিয়ে বৃষ্টি ঝরতে থাকে। টিনের চালের ওপর একনাগড়ে খই ফোটার শব্দ। ঘরের আলো কমে এসেছে তখন। তার মধ্যে হালিম মাট্টার, শক্র তালিকার শীর্ষে যার নাম, তার ছেলে মজিবের রহমানের আকৃতি তরা কঠের আবেদন সকলের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। একটা শিক্ষিত ছেলে, নিশ্চয়ই অভিনয় করছে না, তাছাড়া, তার নামের সাথে অন্তর্ভুক্তভাবে মিল রয়েছে এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের, যার ডাকে সারা বাংলাদেশে চলছে এক মরণপণ যুদ্ধজ্ঞ। যে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে আমরা একদিন ছিনিয়ে আনবো আমাদের স্বাধীন মাতৃভূমি।

— বসেন, মজিবকে বসতে বলি। মিনহাজ তখন তার বৈকালিক চা দিয়ে যায়। কী অবাক করা ব্যাপার, মজিব আমাদের সাথে স্বার্যীভাবে যেনো থেকে গোলো।

সক্ষ্যার দিকে বৃষ্টি ধরে আসে। রাতের অঁধারে দুটো পেট্রল পার্টি বের হয়। একটা হাড়িভাসা, অন্যটি ঠাকুরপাড়া হাটের দিকে। পিন্টুর হাতে থাকে হাইড আউটের নিরাপত্তা। বাধের ঘরে ঘোগের মতো অবস্থা আমাদের। একেবারে শক্রের বাড়িতে হাইড আউট। ব্যাপারটা অত্যন্ত ঝুঁকিপুঁকি। তাই হাইড আউটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিদ্র হওয়া প্রয়োজন। পিন্টুই একটীকে সামাল দেবে। প্রথম পেট্রল পার্টি নিয়ে যাচ্ছি আমি নিজে। এলাকাটা ভূমিষ্ঠবে দেখা প্রয়োজন। আর খুঁজে নেয়া প্রয়োজন একটা নিরাপদ হাইড আউটের আস্তানা।

মজিব আমার সাথে। যামের সম্মতির কাদাপাঁকে ভরা পিছল পথ দিয়ে পেট্রল পার্টিসহ থেমে থেমে যখন ছাঁচাই, তখন মজিবের তাঁর পারিবারিক ইতিবৃত্ত এবং বর্তমান দূরবস্থার কাহিনী বিলে চলে। তাদের আদিবাড়ি ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জ থানায়। যাটি দশকের প্রথম দিকে তার বাবা হালিম মাট্টার জীবন নির্বাহে সেখানে সুবিধা করতে না পারায় যা কিছু বিষয়আশয় বেচেটেচে দিয়ে চলে আসেন পঞ্চগড়ের ভেতরগড় এলাকায়। ভাগ্যের ওপর চরমভাবে বাজি ধরেই তিনি এ কাজ করেন। এবং জিতেও যান।

ভেতরগড় অঞ্চলে তখন প্রচুর জঙ্গলময় অনাবাদি জায়গা। মানুষজনের সংখ্যাও খুব কম। হালিম মাট্টার ও হাজার টাকায় পাঁচ হাল জমি অর্থাৎ প্রায় ৬০ বিঘা জমি কেনেন সর্দার পাড়া এলাকায়। বন কেটে বসত গড়েন। জঙ্গল পরিষ্কার করে অনাবাদি জমিকে চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসেন। সেইসাথে স্থানীয় একটা প্রাইমারি ঝুলে শিক্ষকতার চাকরিও নেন। ধীরে ধীরে সাংসারিক অবস্থা কিছুটা সচ্ছল হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় স্থানীয় মানুষজনের সাথে লড়াই করে ঢিকে থাকার। তাই নিজেদের কমিউনিটির লোকজন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তিনি ময়মনসিংহের তার আদি নিবাসস্থান থেকে আঁচ্ছীয় ও নিকটজনদের নিয়ে এসে তাদের জায়গাজমিসহ জীবনধারণের ব্যবস্থা করে দেন। ক্রমে ক্রমে সর্দার পাড়ায় হালিম মাট্টারের নেতৃত্বে ময়মনসিংহের লোকজন

একটা বর্ধিষ্ঠ জনসংখ্যা হিসেবে আত্মকাশ করে। হালিম মাস্টার কষ্ট করে হলেও তার দু'ছেলে সফিকুল ইসলাম এবং মজিবের রহমানকে কুল-কলেজের পড়াশোনা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠান। সফিক এম.এস.সি বায়ো কেমিস্ট্রির ছাত্র, মজিব অনার্সে একাউন্টেন্সি। সফিক ওরফে দুদু ছাত্রলীগের সমর্থক। মজিব নিজে ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। হালিম মাস্টার পাকিস্তানভঙ্গ মুসলিম লীগের মানুষ। ত্র্যাক ডাউনের পর হালিম মাস্টারের ডাক পড়ে পঞ্চগড়ে। তাকে শাস্তি কর্মটির দায়িত্ব দেয়া হয়। দু' চার বার পাক বাহিনীর টহলদারি দল সর্দারপাড়ায় তার বাড়িতে এসে ঘুরেও যায়। হালিম মাস্টার ফলে ভালোভাবেই পাকিস্তানি এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়েন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের টার্গেট হয়ে যান। মজিব এবং সফিক ঢাকা থেকে পালিয়ে সর্দারপাড়া গ্রামে চলে আসে। পাকিস্তানিদের কাছে এ ব্যাপারে খবর চলে যায়। তারা হালিম মাস্টারকে খবর দেয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া তার দু'ছেলেকে পঞ্চগড় পাকবাহিনীর কাছে রিপোর্ট করার জন্য। তখন পঞ্চগড়ে রাজাকার আর আলবদর বাহিনী মাঝে গঠন করা হচ্ছে। মজিব আর সফিককে রাজাকার কিংবা আলবদর বাহিনীতে যোগ দিতে হবে। কিন্তু হালিম মাস্টার সাহস পান না পাকবাহিনীর এ নির্দেশে সাড়া দিতে। তাহাড়া রাজানীতিসচেতন মজিব-সফিকও রাজাকার আলবদর হতে চায় না। পাকবাহিনীর একটা দল তখন সর্দারপাড়া আসে দু'বুককে ধূল ঘূরে যাওয়ার জন্য। জসলে আঞ্চলিক করে ওরফে নিজেদের রক্ষা করে। পাকবাহিনী হালিম মাস্টারকে দারণভাবে তিরকৃত করে এজন্য এবং চরম ঝুঁশিয়ারি দিয়ে যায়, হালিম মাস্টারের দু'ছেলেসহ সর্দারপাড়ার যুবকদের পঞ্চগড় রাজাকার আলবদর বাহিনীতে নাম লেখাতে না পাঠালে মাস্টারকে চরম শাস্তি পেতে হবে। হালিম মাস্টার তাদের মিথ্যে করে বলেন যে, তার ছেলেরা ঢাকা থেকে ফিরে আসে নিষ্পত্তি পাকবাহিনীর দলনেতার কাছে কাকুতি-মিনতিও করেন। তবু দলবেত্তা পারকারভাবে জানিয়ে দেয়, ইয়ে সব নেই হোগা, হামলোগ তোমহারা লাড়কে কো চাহিয়ে। চরম বিপদ নেমে আসে হালিম মাস্টার এবং সর্দারপাড়া গ্রামের ওপর। কী সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। একদিকে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দালাল হিসেবে চিহ্নিত আর সেই সুবাদে তাদের টার্গেট হয়ে আছেন, ফলে যে-কোনোদিন মুক্তিযোদ্ধাদের হামলার শিকার হতে পারেন, এ আশঙ্কা যেমন সবসময় রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পাকবাহিনীর দাবি অনুযায়ী ছেলেদের রাজাকার আলবদর হতে না পাঠালে, পাকবাহিনীও তাকে শক্ত হিসেবে টার্গেট করে ফেলবে। চরম একটা দৃঢ়সময় চলছে। এমন সময় মুক্তিবাহিনীর আগমন এবং বিসমনি ব্রিজ অপারেশনসহ মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার খবর এসে পৌছায় সর্দারপাড়ায়। মজিব তখন নিজেদের এবং তার সর্দারপাড়া গ্রামবাসীকে বাঁচানোর জন্য একটা রিক্ষ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সে সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের আস্তানায় গিয়ে সারেভার করবে এবং তাদের কমান্ডারের কাছে বিদ্যমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তাদের সাহায্য চাইবে। এই রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। আর এতে করে মুক্তিযোদ্ধাদের মিত্রতা পেলে পাকবাহিনীকে মোকাবিলা করা যাবে। সুতরাং সর্দারপাড়ার রাতের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, পাকবাহিনীর সাথে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন এবং মুক্তিবাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন

করা হবে। ইতোমধ্যে মজিবের এক চাচা ইপিআর-এর হাবিলদার রাইফেলসহ পালিয়ে সর্দারপাড়ায় উপস্থিত হন। তার উপস্থিতিতে পাকবাহিনীর বিপদ আরো বেড়ে গেছে। তারও মত, মুক্তিযোক্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। মজিব তখন তার কলেজে পড়া ভাতিজাকে নিয়ে রওনা দেয় মুক্তিযোক্তাদের আস্তানা অভিযুক্তে। অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করেই অবশ্যে মুক্তিযোক্তাদের দেখা যাবে। তাদের বর্তমান দৃষ্টিক্ষণ পরিস্থিতির বিবরণ দেয়া গেছে। এখন তাদের তরফ থেকে কী সিদ্ধান্ত আসে, শুধু তারই অপেক্ষা।

অঙ্ককারে পথ চলতে চলতেই মজিব তার কাহিনী শেষ করে বলে, তারা দু'ভাই-ই ই আমাদের আশ্রয়ে থাকতে চায়। সমস্ত সর্দারপাড়া গ্রাম আমাদের সাহায্য চায়। তারা পাকবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। মজিবের কথা শুনে মনে হলো তার বলা কাহিনীর সবটুকুই সত্য। তার কঠের আন্তরিক আকৃতি মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করে যে, সত্যিই তারা বিপদগ্রস্ত এবং আমাদের সাহায্যপ্রার্থী। সেই সাথে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনন্দগত্য। এদের মতো ছেলেরা দলে থাকলে জ্ঞানিয়তাবে তাদের চমৎকার গাইড হিসেবে কাজ করানো যাবে এবং সর্দারপাড়া গ্রামের পুরোটাই আমাদের মিত্র হয়ে গেলে পঞ্চগড়ের কাছাকাছি তালমা পর্যন্ত আমাদের গতিবিধি হবে অত্যন্ত নির্ভর ও নিশ্চিন্ত। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই, মজিবের কাঁধে হাত রেখে বলি, ঠিক আছে।

— ঠিক আছে?

— হ্যাঁ।

— তাহলে আমরা আপনাদের কর্মসূচি আসতে পারবো?

— অবশ্যিই পারবেন, কালো পিয়ে আপনার বড় ভাইকে নিয়ে আসবেন। আর আপনার বাবা এবং অন্যদের কর্মসূচি আমরা তাদের মিত্রতা গ্রহণ করেছি।

— ঠিক বলেছেন মাহবুব ভাই! এবার আবেগাপুত হয়ে ওঠে মজিব। আমি তার কাঁধে হাত রেখে বলি, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের খুব তাড়াতাড়ি জয়বাংলা দরকার। আর এজন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ছেলেদের যুক্তে যোগদান। আপনাদের মতো ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে এলে, দেশটা দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি স্বাধীন হয়ে গেছে। মজিব আর কিছু বলে না। নীরবে পথ হাঁটে।

তোরের দিকে ফিরে আসি হাইড আউটে।

২৯. ৭. ৭১

ভাবলা মিয়ার বাড়ি

সকাল ৭টায় পূর্ব নির্ধারিত গড়ালবাড়ি বিশেষতে মেজের দরজির কাছে রিপোর্ট পেশ করা হয় ভেতরে ঢোকার পর দ্বিতীয়বারের মতো। মেজের অত্যন্ত শুশি হন, উৎসাহের আতিশয়ে ঝুটিয়ে ঝুটিয়ে শোনেন বিসমানি ব্রিজ উদ্ভিয়ে দেয়ার ঘটনা। টুকেও নেন তাঁর নোটবইয়ে। তারপর বলেন, এবার পাকবাহিনী মরিয়া হয়ে এগিয়ে আসবে, তোমাদের ক্র্যাশ করতে চাইবে, সুতরাং সাবধান। বুঝেশুনে কাজ করবে। দিনের

বেলায় কোনোভাবেই তাদের মোকাবিলায় থাবে না। ওরা যদি আসে এবং এদিকে ক্যাম্প করে, তাহলে তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের সম্পূর্ণ ধৰ্ষণ করে দেবে। এরপর তিনি এক সঙ্গাহের রেশন ভুলে দেন আমাদের হাতে, গোলাবারগুদ দেন। শেষে জানতে চান, আমাদের হাইড আউটের অবস্থান তাঁর বিস্তারিত ম্যাপ মেলে ধরে। পিন্টু আবার ভুল করতে যাচ্ছিলো। তার আগেই ওকে থামিয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই, পিন্টুর কল্পিত অবস্থান। পিন্টু ফ্যালফ্যাল দৃষ্টি নিয়ে ঢেয়ে থাকে ম্যাপের দিকে।

গাড়িতে উঠবার মুখে দরজি বলেন, তাদের হত্যা করো, তাদের অন্তর্শস্ত্র, গোলাবারগুদ নিয়ে আসো। আর তাদের লাশ যদি আনতে না পারো, তবে নিয়ে আসো তাদের ক্যাপ, ব্যাজ, আইডেন্টিটি কার্ড, কাগজপত্র এইসব। নিজেরা যতোখানি পারো সাবধানে থেকে শক্তি করবার চেষ্টা করবে ঝিগুণ। খোদা হাফেজ, গুডবাই।

মেজের চলে গেলে গড়ালবাড়ি বাজারে কিছুটা অলস সময় কাটিয়ে মেজরের দেয়া রেশন, রসদ আর গোলাবারগুদসহ ফিরে আসি হাইড আউটে। মজিবর চলে গেছে সর্দারপাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিত্রতার সূखবর নিয়ে। হয়তো রাতে আবার ফিরে আসবে সে। বিকেলের দিকে হাইড আউট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বড় বেশি প্রকাশ্য জায়গাটা। এছাড়া শক্তপুরিতে থাকার ব্যাপারটাতেও মন থেকে সায় পাই না। সন্ধ্যার অক্ষকারে ছেলেরা তৈরি হয়ে নেয়। ক্ষুভি আউটের পরিবর্তন হবে, এখানে আর নয়, এবার ভাবলা মিয়ার বাড়িতে হাইড আউট। ডাবুরডাঙ্গা গ্রামের একপাশে নিরিবিলি ও মোটামুটি নিরাপদ জায়গাটে।

ভাবলা মিয়া লোকটা ভালোই মনে রাখে। তাদের বাড়ির ৪/৫টা ঘরের মধ্যে ২টা ছেড়ে দেয় আমাদের জন্য। বড় বৃক্ষচ্ছন্নের ঘর। বাড়ির চারাদিকে গাছগাছালিতে ছাওয়া। বাড়িতে লোকজন বিশেষ বড়-বড় নেই বললেই চলে। যুক্তের ডামাডোলে সম্ভবত তাদের সরিয়ে দেয়। ক্ষুভি নিরাপদ কোনো আশ্রয়ে। কুপি জালিয়ে হাইড আউটের অবস্থান গুছিয়ে সিংতে রাত প্রায় ১০টা হয়ে যায়। মিনহাজ-মমতাজরা রাতের আহার সরবরাহ করে।

ঝুটিয়ে অঙ্ককার গাছগাছালিতে ভরতি বাড়িটাকে গভীর অরণ্যের ভেতরে একটা ভুত্তড়ে বাড়ি বলে মনে হয়। পিন্টু আর একরামুলের তত্ত্বাবধানে হাইড আউটের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। ছেলেরা সেন্ট্রি পোস্টে দাঁড়িয়ে যায়। পাকবাহিনীর মুভমেন্টের খবর পাওয়া গেছে। রাতের বেলা প্রেটেল পার্টি পাঠিয়ে তাদের খৌজখবর নিতে হবে। প্রেটেল পার্টির দুটো দল তৈরি হয়। সেকশন কমান্ডার আক্রাস একটা দল নিয়ে যাবে টোকাপাড়া ভেতরগড়ের দিকে। অন্যটায় পিন্টুসহ আমি যাবো হাড়িভাসার দিকে। কিন্তু আক্রাস বিদ্রোহ করে ওঠে, না, আমি যাবো না।

— যাবি না? যাবি না কেনো?

— যাইতে ইচ্ছা করে না, তাই যাবো না, ঘাড় বেঁকিয়ে আক্রাস একগুয়ের মতো কথা বলে।

চিমটিমে আলোয় আকাসের দিকে তাকাই। সুঠাম স্বাস্থ্যের লম্বা চওড়া ছেলে আক্রাস। রংপুরের কাকিনা-হাতিবাঙ্কা এলাকায় বাড়ি। সবসময় হাসিয়ুশি চাপা স্বত্বাবের

ছেলে। এতোদিন ধরে বিভিন্ন অপারেশনে যাওয়ার ব্যাপারে কথনেই ওর না শুনি নি। কিন্তু আজ যেতে চাইছে না সে কেনো? একগুঁয়ের মতো বলছে, যাবো না। তাই পাশে দাঢ়ানো পিটুর দিকে তাকাই। পিটু ফিসফিসিয়ে বলে, ভয় পেয়েছে, ভীতু, কাওয়ার্ড।

— ভয় পেয়েছিস? ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাই। আঙ্কাস মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না।

— ঠিক আছে, তাহলে তুই থাক। একরামুল যাবে তোর জায়গায়। হাইড আউটের দায়িত্ব তোর ওপর থাকলো। কি পারবি তো?

— জি পারবো, এবার উজ্জ্বল দেখায় তার চোখ-মুখ। আমরা বেরিয়ে পড়ি রাতের অক্ষকার সাঁতরে সাঁতরে।

পথ চলতে চলতে পিটু একসময় যেনো জুলে ওঠে। মনের ক্ষেত্র উগড়ে দিয়ে বলে, ব্যাটা কাওয়ার্ড! ভয় পেয়েছে। ইচ্ছে করেই গেলো না। যুদ্ধের মাঠে কমাত না শোনা বিরাট অপরাধ।

— আসল কারণটা কি জানো পিটু?

— না। জানি না। কন্তো!

— যুদ্ধে আসবার একমাস আগে ও বিয়ে করেছে। মাড়িতে ওর নতুন বউ।

— আরে তাইতো, যুদ্ধে আসবার আগেই জেনে ব্যাটা বিয়া করে এসেছে। সারাক্ষণ বউয়ের মুখ ভাসে মনের মইধ্যে।

— এটাই তো স্বাভাবিক।

— ঠিক বলেছেন মাহবুব ভাই, একজন্মেও সবসময় চূপচাপ থাকে। খালি বাড়ি আর বউয়ের কথা ভাবে। এজন্যই ওৱে যুদ্ধে যেতে ভয়। যদি মারা যায়। যদি ফিরতে না পারে বাড়িতে...

রাতের গভীর আধারে, পিটুর কথাগুলো গভীর দীর্ঘস্থাসের হয়ে যেনো ভেসে বেড়ায়। এখন যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের মাঠে মোকাবিলা করতে করতে কে বাঁচবে, কে মরবে কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে যুদ্ধ যুদ্ধই। এর আলাদা কোনো মানে নেই। যুদ্ধের মাঠে মৃত্যুর ব্যাপারটা আলাদা করে দেববার কোনো উপায় নেই। এটা একটা কঠিন বাস্তব ব্যাপার। যুদ্ধে যে কেউ মরতে পারে, সকল যোদ্ধাই মরতে পারে, কেবল জানে না কে কখন, কোথায়, কীভাবে মরবে? আর যুদ্ধের মাঠে শক্ত যখন অত্যন্ত বলশালী, ত্বর আর হিংস, যুদ্ধটা যেখানে অসম্ভবির মধ্যে, শক্তর সমরসজ্জা যেখানে আমাদের চেয়ে অনেক গুণে বেশি, শক্ত যেখানে অনেকটা অমিত শক্তির অধিকারী, সেখানে আমাদের এই সামান্য সমরসজ্জা আর কম বয়সী অনভিজ্ঞ যোদ্ধার দল, সেখানে যুদ্ধের মাঠে মৃত্যু কখন কাকে থাবা বসিয়ে নিয়ে যাবে কে জানে!

রাতের বেলা ভুত্তড়ে আঁধারে পথ চলার ব্যাপারটা অন্য রকম। বর্ষার রাত। আশপাশের সবকিছুই ভিজে জবজবে। রাস্তার পাশের ডোবা, খানাখন্দগুলো পানিতে ভরাট হয়ে আছে। শুরু হয়েছে ব্যাঙ্গদের ডাকাডাকি। রাস্তার পাশেকার ঝোপঝাড় থেকে ঝিঁঝির ডাকের কোরাস। সেই সাথে নানা রকম পোকামাকড়ের কর্কশ শব্দ। জোনাকিদের ছুটোছুটি, মাতামাতি। আশপাশে, কাছে ও দূরের গ্রামগুলো গভীর ঘুমে

আচ্ছন্ন। এর মধ্যে চলে আমাদের গন্তব্যপথ ধরে হেঁটে চলা। কখনও কখনও গ্রামের দু'একটা কুকুর টের পায় আমাদের অতিক্রম। চিরকার করে তাই ডাক দিয়ে ওঠে। তার সাথে গলা মেলায় তার অন্য সঙ্গী-সাথিগাঁও। কিছুক্ষণ পর তারা আবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। নিশিজাগা পাখি কোথাও ডেকে ওঠে। হিতোম পেঁচা কখনও ফর্ফর করে উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে। কোনো আচীন বৃক্ষের ভালে বসে ডেকে উঠে আবার থেমে যায়। খ্যাক্ষ্যাক্ শব্দ তুলে ঝেকেশ্বাল পাশ কেটে চলে যায়। ধাঢ়ি শেয়ালের দল হুক্কা হুয়া শব্দ তুলে রাতের প্রহর ঘোষণা করে। শান্তি ভঙ্গ হওয়ায় কুকুরের দল তাদের লক্ষ্য করে গালাগাল ছেঁড়ে দলবদ্ধভাবে। এর মধ্যেই রুটিনমাফিক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় অমরখানায়, জগদলহাটে। সারারাত ধরে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা পাকবাহিনীর মেশিনগানের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ। সেই সাথে গুড়ম গুড়ম শব্দ তুলে ওপার থেকে ছুটে আসা ভারতীয় সাপোর্ট বাহিনীর কামানের গোলার বিস্ফোরণ পাকবাহিনীর অবস্থানের ওপর, তার আশপাশে। পঞ্চগড়ের দিক থেকেও পাকবাহিনীর কামানের গোলা একইভাবে ছুটে যায় অমরখানা-জগদলহাটের উল্টোদিকে, সামনাসামনি বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধা ও নিয়মিত বাহিনী এবং ভারতীয় অগ্রবর্তী বাহিনীর ওপর।

রাতের বেলা যুদ্ধের সে তরঙ্গমালা অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে আমাদের পাশপাশেই ঘোরাফেরা করে। এর মধ্যে আমরা কোনো গ্রামের প্রশংসিত একজনের বাড়িতে গিয়ে উঠি। বাড়ির মালিক জেগে থাকেন অথবা দুর্ঘট্যে থাকেন। আমাদের পেয়ে আতিথেয়তায় ব্যক্তসমস্ত হয়ে উঠে এগিয়ে দেওয়ান-বিড়ি। কেউবা ঘরে তৈরি মূড়ি-চিড়ে ভাজার সাথে গুড়ের চা। তার কাছ থেকে খবর জানা হয়ে গেলে আবার অঙ্ককারের ভিজে রাস্তায় নেমে পড়া আমনে আর একটা নির্দিত গ্রাম। সেখানেও আবার একটুখানি থেমে যাওয়া প্রশংসিত মানুষের কাছ থেকে শক্ত গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কোথাও গ্রামের জনতর শ্রেণীর মানুষ কিংবা মুরাবিদের সাথে বৈঠক করা। যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা। সেই আলোচনার ভেতর দিয়ে তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটা জাপিয়ে রাখা, তারা যেন পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা না করেন। অনুকূল সাড়া মেলে প্রায় সবখান থেকেই। অধিকাংশ মানুষই রাজনৈতিক জ্ঞান-বিবর্জিত। নানা যুক্তিকর্তা তোলে কেউ কেউ। কারো কারো ভাবতেও কষ্ট হয়, পাকিস্তান ভেঙে কীভাবে বাংলাদেশ হবে, আর বাংলাদেশ হলেই-বা কী লাভ হবে তাতে? গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দলে টানবার ব্যাপারটা যুদ্ধের একটা বড়ো স্ট্রাটেজি। গ্রামের মানুষ পক্ষে না থাকলে, তাদের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করা মূল্যক্ষিণি। গেরিলা যুদ্ধের প্রধান কথাই হচ্ছে, গ্রামের মধ্য থেকে গ্রামের লোকজনকে নিয়ে যুদ্ধ করা। তাই যুদ্ধের পাশাপাশি গ্রামের মানুষকে বন্ধু করে নিতে হয়। তাদের মধ্যে আস্থা জন্মাতে হয়। তাদের প্রতি এ বিশ্বাস জন্মাতে হয় যে, দেশ স্বাধীন অবশ্যই হবে। জয়বাংলা হলে, তাদের জীবনযাপনের সুবিধা হবে। সবার জন্য ভাত-কাপড় আর কাজ জুটিবে। আর এককম কৌশল গ্রহণ করার পর গ্রামের মানুষজনের ভেতর থেকে দু' একজন সার্বক্ষণিক গাইড জুটে যায়। নিজেদের প্রাণপাত করে থাটতে থাকে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। হাইড আউটের সন্ধান দেয়া থেকে শুরু করে প্রতিরাতে

মুক্তিযোদ্ধাদের রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা তারা করে অত্যন্ত বিশ্বস্ততা আর নিষ্ঠার সাথে। পরিণামে তারা কিছুমাত্র বৈষম্যিক লাভ চায় না। ‘জয় বাংলার’ প্রতি তাদের প্রবল মানসিক টুন, দেশের এই দুর্দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস আর অকৃতোভ্য অভিযানই তাদের কাছে বড়ো পাওয়া। স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য সবাই তো আর একরকমভাবে ঝাপিয়ে পড়তে পারে না। যারা পারে তারা হচ্ছে এই ধরনের মানুষ। যেমন ডাবুরডাসায় এসে পাওয়া গেছে কোম্পানি মুসিকে। মাথায় টুপি আর ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে চাপিয়ে এই লোকটা এখন আমাদের সর্বক্ষণের সাথি। রাতের অক্ষকারে তার নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতি দেখে মনে হয়, নিচয়ই তার মূল পেশা বাতের অক্ষকারে চুরি করা। কে জানে, হতেও পারে। হয়তো সে চুরিচামারি করেই জীবনযাপন করে। কিন্তু আমাদের সাহ্য করার ব্যাপারে তার আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি সহজে নজরে পড়ে না। আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়িতে হাইড আউট স্থাপনের দিন থেকে এই কোম্পানি মুসি রয়ে গেছে আমাদের দলে সর্বক্ষণিকভাবে। সেই আমাদের তুলে এনেছে তাবলা মিয়ার বাড়িতে।

৩১. ৭. ৭১

পাকবাহিনীর আগমন

পাকবাহিনী অবশ্যে এসে গেলো। সকাল ১১টার দিকে ভীত মানুষজনের ছুটোছুটিতে ব্যাপারটা টের পাওয়া গেলো। উর্বরস্থাসে মুক্তিযোদ্ধাদের ছুটে আসছে সীমান্তের দিকে। বিসমনি আক্রমণের দিন থেকে আমরা আক্রমণ ওরা আসবে। হাড়িভাসার দিকটা এতোদিন খোলা ছিলো। ওপারে বেরবাড়ি, সাকাতি, মানিকগঞ্জ ও হলদিবাড়ি। এদিকটায় এতোদিন ওরা নজর পেলার প্রয়োজন বোধ করে নি। কিন্তু অমরখানা-তেতোবঙ্গের দিকে মুখ করে ব্যক্তিকাঙ্ক্ষা পাকবাহিনীর ডান দিকটা রক্ষা করা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাই এদিকে মুক্তিবাহিনী চুকে পড়ায় তাদের ট্র্যাটেজি পরিবর্তন করতে হয়েছে। বেরবাড়ির উল্টেদিকে হাড়িভাসা এবং পরিত্যক্ত ইপিআরদের ঘাঘড়া বিশেষ পর্যন্ত এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে এনে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা বক্সের উদ্যোগ নিয়েছে তারা। এতোদিন শক্ত কাছাকাছি বলে অনেকটা নিশ্চিত ও নিরুদ্ধেগ ছিলো হাইড আউটের জীবনযাপন এবং চলাফেরা। এখন প্রায় নাগালের মধ্যে শক্তির অবস্থান সেটা ব্যাহত করবে। সবসময় টেনশন থাকবে। নার্ত থাকবে টানটান এবং সদা সচেতন।

রাতের বেলা দুটো শক্তিশালী পেট্রেল পার্টি তৈরি করা হয়। পিন্টুর নেতৃত্বে একটা দল বদলুপাড়া হয়ে পানিমাছের দিকে, অন্যটি আমি নিয়ে যাই হাড়িভাসায়। পাকবাহিনীর সঠিক উদ্দেশ্য, তাদের শক্তি ও গতিবিধি এবং অবস্থান সম্পর্কে তথ্য উদ্ঘাটন করা পেট্রেল পার্টি দুটোর মূল লক্ষ্য।

হাড়িভাসা থেকে পাকবাহিনী কিরে গেছে কি না জানা যায় নি। সুতরাং হাড়িভাসা অভিযুক্ত দলটি নিয়ে যাওয়ার সময় অত্যন্ত সচেতন হতে হয়। কে জানে রাস্তার কোন্‌মোড়ে কোথায় মৃত্যুর ফাঁদ পেতে আয়মবুশে রয়েছে কি না পাকবাহিনীর কোনো দল। আমরা এগুচ্ছি রাস্তা ছেড়ে আলপথ ধরে। কোম্পানি মুসি গাইড হিসেবে আমাদের পথ

দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। দুদিন আগেও লোকটার সাথে পরিচয় ছিলো না। অথবা এখন এই মধ্যরাতে সে তার নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিসহ আমাদের আগে আগে পথ চলছে। এখন সে রাস্তা ছাড়িয়ে আলপথে নেমে এসেছে। পাটক্ষেত-ধানক্ষেত আর তরা বর্ষায় ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে সে আমাদের নিয়ে চলেছে হাড়িভাসার দিকে। এই মুহূর্তে কোম্পানি মুসি আমাদের অস্তরঙ্গ আপনজন। তাকে বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

সোজাসুজি সে আমাদের একটা গামে নিয়ে আসে। হাড়িভাসার রাস্তা বাঁয়ে। তারপর একটা উচুমতো মাঠ, লম্বা লম্বা নলখাগড়া আর কাশবনের ঘোপ। একটা ছেষ্টা খাল গ্রামটার পাশ দিয়ে চলে গেছে। মুসি তার থুত্তির কালো দাঢ়িতে এবার হাত বুলাতে বুলাতে ফিসফিসিয়ে বলে, হাড়িভাসা। ওই উচু গাছগুলো পার হলেই হাড়িভাসা বাজার। অর্থাৎ আমাদের সে হাড়িভাসা গ্রামে এনে তুলেছে। উচু মাঠের ওপর একটা চিবির আড়াল নিয়ে বসে পড়ি। দলের অন্যরাও ছড়িয়েছিটিয়ে বসে। গ্রামে যাওয়া ঠিক হবে না। দিনের বেলা পাকবাহিনী এসেছিলো। তারা এখনও গেছে কি না জানা যায় নি। তাছাড়া শক্রের কাছাকাছি কোনো গ্রামের মানুষজনকে না জেনে চট করে বিশ্বাস করা কঠিন। দেশের ভেতরে বহু মানুষ এখনও পাকিস্তানকে তাদের বুকের ভেতরে লালন করছে। পাকবাহিনী এখানে অসমবার পর নিশ্চয়ই তাদের পক্ষের মানুষদের খুঁজে নিয়েছে। কেউ হয়তো তাদের পক্ষে গেছে প্রাণের ভয়ে, কেউ হয়তো গেছে পাকিস্তান রক্ষার প্রবল উচ্ছ্঵াস নিয়ে। আর এই ছবি প্রায় সর্বত্তী, অর্থাৎ পাকবাহিনী যেখানেই অবস্থান নিয়েছে, একস্তুপ মানুষ তাদের সেবায় তৎপর হয়ে উঠেছে। সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতায় তাদের অবস্থান ও বসবাসকে সুগম করে তুলেছে। তারা তাদের তোষায়েনে আর দালালি করছে, নয় তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে আশপাশের গ্রামে। ধরিয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার পক্ষের মানুষদের, মুক্তিবাহিনী সদেহে গ্রামের প্রকৃত-তরুণদের। আর নয় তৈরি করেছে তাদের জন্য বাস্কার বা ট্রেক্স, সেই সাথে গ্রাম থেকে ধরে এনেছে গরু-ছাগল, মুরগি, ডিম আর পাকবাহিনীর ভোগের জন্য রাতের অন্ধকারে তুলে নিয়ে এসেছে ঘরের সোমস্ত যেয়ে বা বড়-বিদের। এই শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু এদের তৎপরতা এলাকায় সৃষ্টি করেছে এক ভয়াবহ তাসের। পাকবাহিনী হাড়িভাসায় থেকে থাকলে নিশ্চয়ই প্রাথমিকভাবে এধরনের কিছু মানুষ জুটিয়েছে। এরা সব এ এলাকারই মানুষ। সুতরাং ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আমাদের উপস্থিতি এদের জানান দেয়া যাবে না। হাড়িভাসা বাজার রেকি করতে হবে আমাদের নিজেদেরই।

মধ্যরাতের ঘোষণা শেয়ালের দল তাদের হুক্কা হুয়া ধ্বনি তুলে জানান দেয়। দূরে অমরখানা থেকে ভেসে আসে কামানের শব্দ। সেই সাথে মেশিনগানের অবিশ্রান্ত আর্টিলারি। আমরা উঠে পড়ি।

কোম্পানি মুসি আগে হাঁটে। আকাশে গভীর থমথমে কালো মেঘ। একটা হাঁফ ধরা গুমোট গরম। সক্ষ্য থেকেই এ অবস্থা। যে-কোনো সময় বৃষ্টি হতে পারে এ ধরনের আশঙ্কা করা গিয়েছিলো। খালটা পার হয়ে উচু রাস্তার ওপর উঠতেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমে আসে। বৃষ্টি বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে শরীরের

ভেতরে পানি ঢুকে যায়। পায়ের বিচেকার পিছল পথ অনেকটা সহজ হয়ে ওঠে। হাত দিয়ে ঘন-ঘন চোখ-মুখ মুছে দৃষ্টি ঠিক রাখতে হয়। অন্তের মুখগুলো সব নিম্নমুখী করে রাখা, যাতে বৃষ্টির পানি না ঢুকতে পারে নলের ভেতরে। তবে কোমরে গামছায় পেঁচিয়ে বাধা ফ্রেনেডগুলো ভিজে যায়। বৃষ্টির আড়াল নিয়ে অনেকটা স্বচ্ছন্দেই আমরা হাড়িভাসা বাজারে এসে উঠি। খালটার ওপরে একটি ছোট কালভার্ট। কালভার্ট পেরিয়েই বাজার। রাস্তার পাশে একটা বিরাট গাছ, সম্ভবত বটের। বাজারে ঢুকবার মুখে একটা দোকানের পাশে অবস্থান নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে, তারপর দুটো দলে ভাগ হয়ে বাজারে ঢেকা হয়। বেশ বড়ো ধরনের বাজার। স্থায়ী দোকানপাট, ইউনিয়ন বোর্ড অফিস, পোর্ট অফিস সবই আছে এখানে। দুটো দলই কিছুক্ষণের মধ্যে বাজার ঘুরে হাজির হয় রাস্তার ওপর। জেলা বোর্ডের এ রাস্তা ধরেই সকালের দিকে এসেছিলো পাকবাহিনী। সারাদিন ছিলো এখানে। বিকেলের দিকে ফিরে গেছে। এখন কেউ নেই। বাজারটা যেনো মরে পড়ে আছে। না, হাড়িভাসায় পাকবাহিনী নেই। জায়গাটা দেখা অর্থাৎ রেকি করা হলো। এবার ফিরে চলা। ফিরবার মুখে বৃষ্টি ধরে এলেও ঝরতে থাকে ঝিরঝির করে। মুসি হঠাৎ তার এক পরিচিত বাড়িতে যায়। আমরা বসে থাকি রাস্তার ওপর। মাথায় বৃষ্টি নিয়েই। প্রথম আধ ঘণ্টা পর মুসি ফেরে তার সঙ্গে তারই মতো একজন লোককে নিয়ে। সেইসঙ্গে গুথমটায় ইতস্তত করলেও তারপর সহজ ভঙ্গিতে বলতে থাকে পাকবাহিনীর অভিযন্তের কাহিনী।

সকাল ১১টার দিকে একটা জিপ গাড়ি দুটো আর্মি ভ্যানে পাকবাহিনীর দলটি আসে। তাদের দেবে বাজারের মানুষজন ফ্রেনেড শুরু করে। হামের মানুষজন ভয়ে পালাতে থাকে। এই অবস্থায় ওরা রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে নেমে আসে। বাজারের চারদিকে পজিশন নেয়। তারপর স্থানীয় কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে জানতে চায় মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগের কর্মসূচি-নেতা, বিধীর্ণ হিন্দু এবং জয়বাংলার মানুষজনের মৌজখবর। ডেকে নেয়া মনুষগুলোর মধ্যে আমানুল্লাহ মিয়াও ছিলো। তার ভাষায়, লোকগুলো সব লম্বা, উচ্চ উচ্চ, দেখিলেই তয় লাগে, উদুত্তে উমহারা কাথা কহেছিলো, কয়েকজন বাঞ্ছলি ছিলো, উমহার সাথে। তারা উমহারালাক বুকাছিল, হামরা কি জানি আর কি কহেছি। হাড়িভাসায় তাদের অবস্থান নেয়া হয়ে গেলে তাদের মধ্যে ১৩ জন এগিয়ে যায় ঘাঘরা বিওপির দিকে। অবশিষ্ট লোকজন এখানে পজিশন নিয়ে থাকে। তাদের কমান্ডার মোটা, উচ্চ-লম্বা মানুষ। লাল চোখ, বড়ো গৌফ। বারবার বলে, ডরো মাত্। হাম তোমহারা বক্স হ্যায়। মুক্তি কি ধার হ্যায়, বোলো। হাম মুক্তি শালোকো খতম করেগা। বেলা বাড়ে। দুপুরের পর ঘাঘরাগামী দলটি ফিরে আসে। তাদের খুব উৎসুক দেখায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারে ঝটি-মাঙ্স দিয়ে। বিকেলের দিকে ফিরে যায় পঞ্চগড়ের দিকে। যাওয়ার সময় বলে যায়, আবার তারা আসবে, এখানে থাকবে পাকাপাকি। মুক্তিবাহিনী এলে কেউ যেনো আশ্রয় না দেয়। তাদের সাথে সহযোগিতা না করে। ওরা দেশ ও জাতির দুর্শমন।

আমানুল্লাহ মিয়ার কথা শেষ হয়। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদেরকে এইসব খবর দেয়ার জন্য। আমাদের সাথে তার দেখা এবং আলাপ হয়েছিলো, এটা

যেনো সে কড়কে না জানায়, এই বলে তাকে সাবধানও করে দেয়া হয়। সে জানায়, পাগোল হইছেন, মুদিল ওমরাহ জানিবার পায়, তুমার সাথে মোর দেখা হইছে, কথা হইছে, তাইলে যোক তারা থুবে? মারিহ ফালাবে। ঠিক আছে, সাবধানে থাকবেন, আমরা আপনার সাথে পরে যোগাযোগ করবো। আজ চলি, খোদা হাফেজ। কিন্তু রওনা দেয়ার আগে আমানুল্লাহ মিয়া হস্তাং করে জিগ্যেস করে বসে, তুমহারালা তো মুক্তিফৌজ, একটা কথা কহেন দি।

— কি কথা?

— জয়বাংলা কি হবে নাই?

— হবে, আমানুল্লাহ মিয়া হবে, একটু অপেক্ষা করতে হবে।

— হইবে তাইলে?

— হবে, দেখবেন অবশ্যই হবে।

সারাটা দেশ পাকবাহিনী তাদের জবরদস্তলে রেখেছে। কিন্তু ঘরে ঘরে মানুষজনের মনের গভীরে খোদিত রয়েছে জয়বাংলার স্বপ্ন। তার জন্য তাদের যেনো অন্তর্হীন অপেক্ষা। পাকবাহিনী ক'জন মানুষকে তাদের দলে ভেড়াবে? তৈরি করবে দালাল, রাজাকার, আলবদর—ক'জনকে? দেশের অধিকারণ মানুষের গভীর বিশ্বাস, জয়বাংলার প্রতি তাদের অসীম অগ্রহই হয়তো একটী এদেশকে স্বাধীন করে ফেলবে। সেটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

নুরনুর্দীন মিয়ার বাড়ি

শেষবারতে ফিরে আসে পিটুর দল, ক্ষেত্রের কাছ থেকে পাওয়া যায় খারাপ খবর। পাকবাহিনী পানিমাছ পকুরি বাজার-তাদের স্থায়ী ধাটি গেড়ে বসেছে। বিসর্গনি ত্রিজ মেরামত করে তার ওপর দিঘি-ঝাড় পার করে এনেছে। প্রায় ১ কোম্পানি সমান শক্তি তাদের সাথে। ভারি মারারস্তু সব ধরনের শক্তিশালী অন্ত রয়েছে। বাজারের চারদিকে তারা ট্রেঞ্চ করেছে, বাস্কার করেছে। মেশিনগান পোষ্ট করেছে। মার্টার বসিয়েছে হাড়িভাসার দিকে শুরু করে। স্থানীয় মানুষদের ধরে নিয়ে গেছে ট্রেঞ্চ-বাস্কার তৈরি করার জন্য। তবে কারো ওপর অত্যাচার করে নি। শুধু মুক্তিবাহিনীর লোকজন সম্পর্কে ঝোঁক্ষবর নেয়ার চেষ্টা করেছে সবার কাছ থেকে। আরো জানা গেলো, পসির পশ্চিত মারা যায় নি। গুলিতে আহত মুরুর্ব অবস্থায় তাকে পঞ্চগড় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বদলুগাড়ার মানুষজন ভয় পেয়ে গেছে খুব। আমাদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন তাই রাত শেষ হওয়ার আগেই হাইড আউট সরিয়ে নেয়া হয় আরো পেছনে, বায়ে নুরনুর্দীন মিয়ার বাড়িতে। সারাটা দিন কাটে চৃপচাপ হাইড আউটের ভেতরে। চারদিকে কড়া পাহাড়া বসানো হয়। বাড়ির পেছন দিককার আমগাছের উচু ডালে বসিয়ে দেয়া হয় মালেক-মঙ্গ দুই মানিক জোড়েক। ওরা দুরের রাঙ্গায় চলাচলকারী মানুষজন কিংবা শক্তির গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবে। নুরনুর্দীনের গ্রামের কয়েকজন পুরুষ ছাড়া বাদবাকি সবাই চলে গেছে ইতিয়ায়। গরিব বসতি, ছনের তৈরি ভাঙাচোরা ঘরবাড়িগুলো জনমনিষ্য শূন্য। নুরনুর্দীন সারাদিন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পাশে

থাকে। সাহায্য-সহযোগিতা করে সব ব্যাপারে। সব সময় মুখের মধ্যে এক অনাবিল হাসির আভা। এই সহজসরল ভালোমানুষ নুরুন্দিনই শুল্ক সময়ের ব্যবধানে আমাদের আপন হয়ে যায় এবং বঙ্গুর থাতায় নাম লেখা হয়ে যায় আর একজন নতুন মানুষের :

রাতের বেলা একটা প্রেটেল যায় হাড়িভাসার দিকে। একরামুল নিয়ে যায় দলটা। পিন্টুসহ আমরা ক'জন রাতের অক্কারে বেরিয়ে পড়ি একটা নতুন আস্তানা অর্থাৎ হাইড আউটের ঘোঁজে। নুরুন্দিনের বাড়িতে থাকাটা নিরাপদ নয়। কেননা এটা একেবারে হাড়িভাসা রাস্তার ধারেই। এখানে নিজেদের অবস্থান গোপন রাখা যাবে না। এছাড়া, একটা নিরাপদ ভালো আশ্রয়ও দরকার। যেখানে দু' চারদিনের চাইতে একটু বেশি সময় ধরে থাকা যাবে। কিছুটা স্থিব হওয়া যাবে। এভাবে ঘন-ঘন আর দ্রুত হাইড আউট পরিবর্তন খুব অসুবিধার সৃষ্টি করছে। সুস্থির হয়ে বসতে না পারলে অপারেশনের প্লান ঠিক করা যাচ্ছে না।

অবশেষে একটা সুবিধে মতো জায়গা পাওয়া যায়। মধুপাড়ায় বসির মেঘারের বাড়ি। বাড়িটা দেখে প্রথমে পছন্দ হয়। একেবারে ভারতীয় সীমান্ত ঘেষে এর অবস্থান। হামটা সম্পূর্ণ জনবিরান। লোকজন কেউ তেতরের দিকে চলে গেছে। কেউ ভারতের শরণার্থী শিবিরে। বসির মেঘার নিজে থাকছেন তার অন্য একটা বাড়িতে। সেটা হাড়িভাসার কাছাকাছি। স্ট্র্যাটেজিগিত দিক থেকে জায়গাটা ব্যবহৃত অত্যন্ত সুবিধেজনক। পাকবাহিনী যদি এ গ্রামে হামলা করতে আসেও, তার সাথে সাথে ২৫/৩০ গজের মধ্যে ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে ওপারে নিরাপদ অভ্যন্তরে যাওয়া যাবে।

মধ্যরাতে ফিরে আসে হাড়িভাসার প্লান পার্টি। পাকবাহিনী হাড়িভাসায় আজ আসে নি। শেষ রাতে হাইড আউট ছাড়ে আসে মধুপাড়ায়। সকালে হাইড আউটের নিরাপত্তার ভাব একরামুল আর শুশুরুল চৌধুরীর ওপর দিয়ে সজিম উদ্দিনকে নিয়ে পিন্টুসহ আমরা ও জন রঞ্জন সহ বেরুবাড়ির উদ্দেশে। আজ রিপোর্টিংয়ের দিন। দরজি অপেক্ষা করবেন বেরুবাড়ি বি.এস.এফ ক্যাম্পে।

১.৮.৭১

বেরুবাড়ি

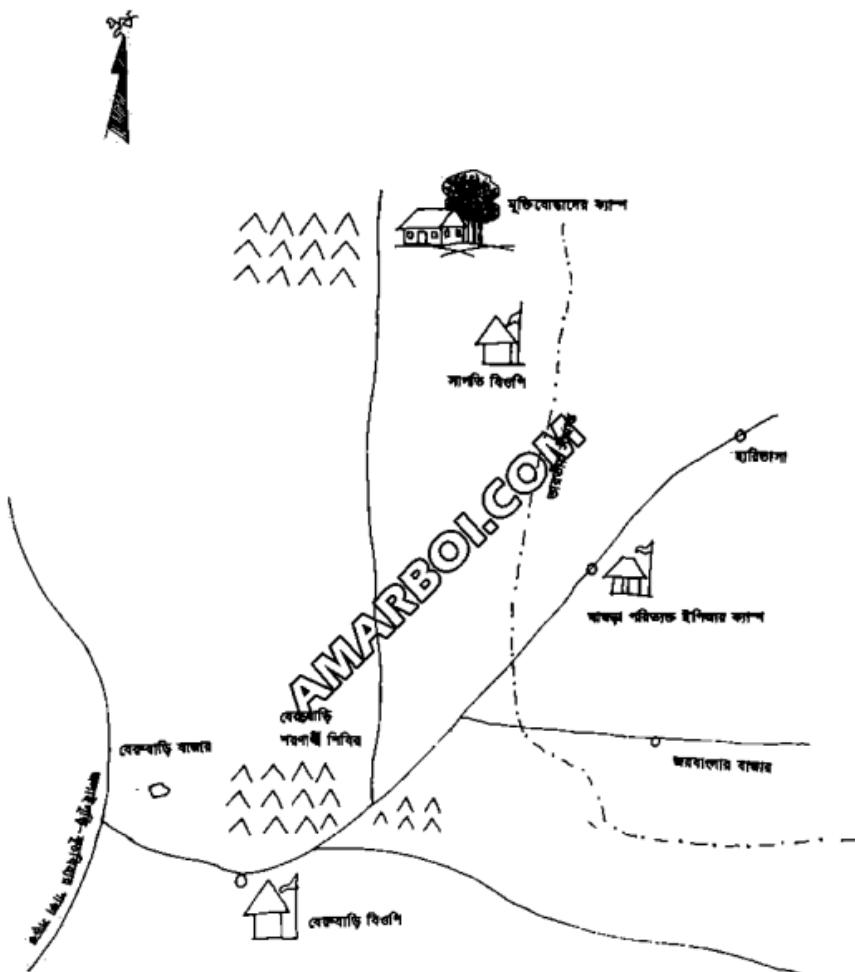
বেরুবাড়ি বি.এস.এফ ক্যাম্পে বসে মেজের দরজি ফুসছেন রাগে। পিন্টু আর আমি তাঁর সামনে টেবিলের উল্টো দিকে আসামির মতো দাঁড়িয়ে।

— উহু শালে লোগ আভিতক ঘূচনে নাহি সাকা, দোজ আর সিটিং আইডেল বাগার্স ...

— কারা সার, তু আর দে? ভয়ে ভয়ে জানতে চাই।

— দোজ কাওয়ার্ডস, রাগত চোখে তাকান মেজের আমার দিকে। বলেন, আহিদার আর বদিউজ্জামান। ওরা এখন পর্যন্ত সাকাতিতে বসে আছে। বাংলাদেশের সীমান্ত অভিক্রমের সাহসই পাছে না। শালে লোগ সেখান থেকে রাতে কিছুদূর ভেতরে যাচ্ছে আর ফুটফাট করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে আসছে, আর আমাকে রিপোর্ট করছে, তারা নিয়মিত পাকবাহিনীর সাথে মুদ্র করছে। এই দেখো তাদের

ଶରଣାର୍ଥୀ ଲିଖିତ-ମେଳବାଡ଼ି ଡାକାତି
(କେବ ହାତ)



এখানে হাইড আউট করার কথা, মেজর তার বর্ধিত ফিল্ড ম্যাপটা মেলে ধৰেন। বর্ধিত ম্যাপটার মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার গ্রামগঞ্জ-রাস্তাঘাট-খাল-বিল-পুরু-যোগজঙ্গল ইত্যাদি সবকিছু চিহ্নিত। খুবই শ্পষ্টভাবে দেখানো রয়েছে। তিনি এক জায়গায় তার আঙুল রাখলেন, দেখো এটা দিঘি, এটা একটা বিরাট দিঘি। এর নাম কাজলদিঘি। এর উচু পাড়ের চারদিকে গভীর জঙ্গল। জায়গাটা সীমান্তের ও মাইলের মধ্যে। এর ডানে প্রায় ২ মাইল দূরে গলেয়া বাজার। পাকবাহিনী একই সাথে হাড়িভাসা আর গলেয়ায় এসেছে দু'দিন আগে। সংক্ষেপে তারা এখন গলেয়ায় ডিফেন্স তৈরির মতলব করছে। কাজলদিঘির জঙ্গলে ওদের হাইড আউট করার কথা অথচ আজ নদিন হতে চললো, ‘ওহ শালে লোগ ঘুচনে নেই সাকা, শালে লোগ ডরতা হ্যায়, দিস ইজ ওয়্যার, জেন্টেলমেন, ইউ শুড টেক রিস্ক ...’ মেজর দরজি একটানা রাগের ভাষায় কথা বলে থামেন কিছুক্ষণ। আমরা নিচল পাথরবৎ দাঢ়িয়ে থাকি তার সামনে। আবার তিনি শুরু করেন, এদিকে হয়েছে কি, ওরা তো রাতে সীমান্ত এলাকায় ফুটফাট করছে, এপারে সাকাতিতে স্থাপিত রামকৃষ্ণ মিশন শরণার্থী শিবিরে এবং স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি হচ্ছে। বি.এস.এফরা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুক্তে হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করেছে। আমাকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আবার মেজর থামলেন। চিত্তিভাবে স্বপ্নে করে রিপোর্ট করেছেন। আমাকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আবার মেজর থামলেন। চিত্তিভাবে স্বপ্নে করে রিপোর্ট করেছেন। আমাকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। আবার মেজর থামলেন।

অনেকক্ষণ দাঢ়িয়ে থাকার পর আমরা স্মৃতি সুযোগ পেলাম। চা-পান চললো আলাপচারিতা ছাড়াই। চা শেষ করে তাকালেন আমার আর পিন্টুর দিকে। বললেন, ওকে বয়েজ, ইউ গো দেয়েছো অলাভিস দেম। ওদের সাহস দাও। পরিকল্পনা দাও। ওদের বাংলাদেশে ঢোকাব ব্যবস্থা করে দাও। আজকের মধ্যেই তোমাদের সাথে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ইউনিটের যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা দাঁড় করাও। ওরা ভেতরে চুকে আস্তানা পাতবে, এটাই প্রথম টাঙ্ক। তারপর পরিকল্পনা করা। তোমাদের চার ইউনিটের শক্তি একত্র করে গলেয়া পাক ডিফেন্সকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলো। ওদের পেছনের রুট কেটে দাও। দেন এয়াটাক, টেক দেয়ার পজিশন, কিল দেম, টেক দেয়ার অল আর্মস অ্যান্ড এ্যামুনিশন্স ...। তু ইট ইমেডিয়েটলি। এখনও পাক ডিফেন্স গলেয়াতে মজবুত হয়নি। তবে একবার তারা সেখানে পাকা ঘাঁটি গেড়ে বসলে, সেটা অমরখানার মতো শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে। এ পারের শরণার্থী শিবির, বি.এস.এফ ক্যাম্প এবং আমাদের অন্যান্য ইনস্টলেশনস হুমকির সম্মুখীন হবে। সুতরাং রিস্ক নেয়া যাবে না, সো বয়েজ, মুভ টু সাকাতি ইমেডিয়েটলি, ইউ গো এ্যান্ড সলভ আউট দ্য প্রেরণ। আই থিস্ক আই ক্যান রিলাই অন ইউ, ইজ নট ইট?

— ইয়েস স্যার, বলে সম্ভতি জানাই দরজিকে। আমার সম্ভতিতে অনেকটা নিচিত হন যেনে তিনি। এরপর তিনি আমাদের গত ও দিনের রিপোর্ট দেন। আমরা যেই বলি হাড়িভাসা পার হয়ে ঘাঘরা বিওপি পর্যন্ত পাক আর্মি এসেছিলো, অমনি যেনো তিনি খানিকটা হতভুব আর অস্ত্র হয়ে ওঠেন মুহূর্তে। বলে ওঠেন, সর্বনাশ! বেরুবাড়ির উল্টোদিকেই তো ঘাঘরা। মাইলখানেকের দূরত্ব। শক্রকে এতো কাছাকাছি

আসতে দেয়া যাবে না। ওরা হাড়িভাসায় ঘাঁটি গাড়তে পারবে না। তোমাদের এটা ঠেকাতে হবে যে করেই হোক। আমি তোমাদের ইনফোর্মেন্ট এবং হাতিয়ার-গোলাবারুদ পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। চোখ কান খোলা রাখো। জীবন মরণপণ করে হাড়িভাসা মুক্ত রাখতেই হবে। তারপর তিনি এগিয়ে আসেন। কাঁধে হাত রেখে তারপর অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে বলতে থাকেন, তোমাদের এখন বড়ো দুষ্টসময়। এর ধাক্কা আমাদের গায়েও এসে লাগছে। সুতৰাং ছাড়া যাবে না ওদের। এখন তোমরা সাকাতি থাও। বিকেলের মধ্যে ফিরে এসে চলে যাবে তোমাদের হাইড আউটে। হাড়িভাসা এলাকা মুক্ত রাখার পরিকল্পনা করো। পরের তারিখে বিজ্ঞারিত জানাবে। কথা শেষ করে মেজর দরজি তার গাড়িতে উঠে চলে যান। আমরা বি.এস.এফ কমান্ডারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইটাতে থাকি। শরণার্থী শিবিরের দিকে।

শরণার্থী শিবির

বেরুবাড়ি একটা ঐতিহাসিক নাম। সকলের কাছেই এ নামটা বিশেষভাবে পরিচিত। একটা বর্ধিষ্ঠ জনপদ। কিছু দোকানগাট, স্থায়ী দালানকোঠা, বাড়িবর, কয়েকটা মারোয়ারি গদি আর একটা স্থায়ী বাজার। সওহে দুদিন বয়ে। পাশ দিয়ে চলে গেছে হালদি বাড়ি-জলপাইগুড়ি অর্থাৎ আসাম বেঙ্গল হাইড-জলপাইগুড়ি শহর কাছেই। প্রায় ১০/১২ কিলোমিটার দূরত্বে। সরকারি বাসে প্রায় পাচ আলা ভাড়া দিতে হয়। এই জনপথটা নিয়ে দেশ ভাগের পর থেকে পার্সিস্তেম-ভারতের মধ্যে গোলমাল চলছে। পাকিস্তান বলছে, এটা আমাদের অংশ। ভারত ছাড়ছে না। এ নিয়ে অনেক দেন-দরবার, দরকষাকথি, লেখালেখি আর দাঙ্গাতার তুবড়ি ফোটানো হচ্ছে। তবুও দেশীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক স্তরে মধ্যে সমস্যার কোনোরকম সুরাহা হয় নি। দুদেশের মধ্যে এটা একটা স্বীকৃত সমস্যা থেকেই গেছে। সেই বেরুবাড়ির ওপর দিয়ে আমরা হাঁটছি। এখানে আশ্রয় দিয়েছে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু শরণার্থী।

চারদিকে একটা বৌটকা গুৰু। প্রায় মাইলখানেক দূর থেকে এ গুৰুর তীব্রতা নাকে এসে লাগে। শরীর গুলিয়ে ওঠে। দূর থেকে এ গুৰুটা জানান দিয়ে যায়, সামনে কোথাও শরণার্থী শিবির রয়েছে। লাখ লাখ মানুষের এক জায়গায় কিলবিল কেঁকের মতো বসবাস। তাঁবুর ছাউনির তলায় কয়েকটা করে পরিবারের মাথা গুঁজবার মতো জান্তব পরিবেশ। স্যানিটেশনের অভাব। ফলে শরণার্থী শিবিরের আশপাশেই লোকচক্রু সামনে মানব-মানবীর প্রাকৃতিক কর্মাদি সমাধা, নোংরা জঙ্গলের স্তুপ। রাতের অঙ্ককারে পুঁতে রাখা মৃতদেহ টেনে তুলে শেয়াল-কুকুরের মহাভোজ উৎসব, মানুষের গলিত লাশের তীব্র গুৰু, ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা মৃত গুরু-ছাগল-হাঁস-মুরগির দুর্বৃক্ষ। সবকিছু মিলিয়ে নিদারঞ্জন এক অস্বাস্থ্যকর অসহ্য পরিবেশ। শরণার্থী শিবিরের আশপাশের ঘাস লাল হয়ে গেছে। বোপাড়াড় নেই, এমনকি পাট গাছের মরা পাতাও অবশিষ্ট নেই। রাস্তার দুপাশের কচু-ঘেু, শাকপাতা ইত্যাদি যেগুলো মানুষের খাদ্য হিসেবে চলতে পারে, সেগুলো সব তুলে এনে অনাহারী-অর্ধাহারী মানুষ খেয়ে ফেলেছে। দূর থেকে ভেসে আসা গুৰু যেমন বলে দেয় সামনে লাখ লাখ মানুষ নিয়ে

গড়ে ওঠা শরণার্থী শিবিরের অস্তিত্বের কথা, তেমনি শরণার্থী শিবিরের কাছাকাছি এলে দেখা যায় আশপাশের গাছগাছালি ন্যাড়া, পাতা শূন্য। ঘোপঝাড় উধাও। ঘসের সবুজের অঙ্গিত্ব বিলুপ্ত। চারদিকে। প্রকৃতি এখানে মৃত।

পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে বেরুবাড়িকে কেন্দ্র করে যতো বিরোধ আর শক্তাই থাক, বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসে লাখ লাখ শরণার্থী আজ সেখানে অঙ্গিত। ছোট আয়তনের বেরুবাড়ি বাজার উপচে উঠেছে উদ্বাস্তু মানুষজনে। বাজারের আশপাশে অস্থায়ীভাবে আস্তানা গেড়েছেন অনেকে। এদের মধ্যে রয়েছেন পঞ্চগড় এলাকার এমপি কমরুদ্দিন মোজার। আছেন দিনাজপুর-ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় এলাকা থেকে পালিয়ে আসা অনেক সরকারি চাকুরে, ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক নেতা-কর্মী। বাজারের দক্ষিণে স্থাপিত হয়েছে বিরাট শরণার্থী শিবির। প্রায় ৪ লাখ লোক আশ্রয় নিয়েছে সেখানে। শিবিরটিকে একটা খাল দুর্ভাগে বিভক্ত করেছে। একপাশে হিন্দু, অন্য পাশে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিবির। এখানে আশ্রয় নিয়েছেন মূলত কৃষক-দিনবঞ্চি-শ্রমিক সর্বস্ব হারানো পরিবারের লোকজন এবং সেইসব মধ্য বিস্তুবান, যারা এপারে এসে রাজনৈতিক ছত্রহায়া পান নি, আস্থায়স্বজন বা পরিচিত মানুষজনের আশ্রয়ে উঠতে পারেন নি। প্রতিদিন শরণার্থী আসছে। উপচে উঠেছে বেরুবাড়ি বাজার। এতোস্থ্যক মানুষকে স্বাগত জানানোর মতো বেরুবাড়িক্ষেত্রেই প্রতুত ছিলো না। তাই এখানে সৃষ্টি হয়েছে এক এলোমেলো অরজন অবস্থার। চিৎকার, কান্নাকাটি, ঝগড়া, কোলাহল আর গোলমাল চারদিকে। ক্ষেত্রগুলোর যেনো বাজার বসে গেছে। আর সেই সাথে বাতাস ভারি করে থাকে স্বাধীন গুরুর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সমষ্টি পরিবেশটাকেই এক দৃশ্য অমানবিক প্রয়ায়ে নামিয়ে এনেছে। একদল স্বার্থাত্ত্বী ভিন্নদেশী বর্ষারের দলের দেশ দখল করার পরিগতিতে শুরু হলো প্রতিরোধ যুদ্ধ। আর সেই দু'পক্ষের লড়াইয়ের ভাস্তুগুলের ভেতরে লাখ লাখ মানুষ হলো গৃহহারা, ভিটে ছাড়া। প্রাণ বাঁচানোর জন্য তারা ভাসতে ভাসতে সীমান্তের এপারে এসে নিয়েছে আশ্রয়। তাদের জন্য তৈরি হলো শরণার্থী শিবির। শিবিরবাসী মানুষ জীবন ধারণের তাগিদে সমস্ত লৌকিকতা গেলো ভুলে। লাজলজ্জার কথা ভুলে গেলো, ছোটবড়ো, উচ্চ-নিচু জাতি ও বর্ণভেদ কিছুই রইলো না। পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে এখনেরে যুদ্ধ হয়েছে। আর তার ফলে মানুষকে ভাসতে হয়েছে, দেশান্তরী হতে হয়েছে। বেছে নিতে হয়েছে মানবের জীবন। তাই যেখানে যুদ্ধ, সেখানেই শরণার্থী মানুষের ঢল। পৃথিবী জুড়েই চলছে শরণার্থীদের এই যাত্রার পর যাত্রা। রাজনীতি আর যুদ্ধের এক চরম পরিণতি।

লাল তামাটে রঙের তাঁবু। সার বেঁধে সাঁটানো। প্রতিটি তাঁবুতে ৮/১০টি পরিবারকে ঠাঁই দেয়া হয়েছে। দু'সারি তাঁবুর ভেতর দিয়ে চলাচলের পথ। বর্ধার পানিতে পথচাট কাদাপাঁকে থকথকে। শিবিরগুলোর বাইরে কিছু অস্থায়ী দোকানপাটও বসেছে। একশ্রেণীর মানুষ রাস্তার ধারে মাদুর বিছিয়ে একটা চটের খলে বা বাস্তু-তেরঙ নিয়ে অস্থায়ী ভাসমান ব্যবসায়ে নিয়েজিত। মুবাই লাভজনক ব্যবসা বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষদের প্রথমেই প্রয়োজন হয় ভারতীয় টাকার। তাই কিছু মানুষ অর্থ বিনিয়োগের ব্যবসায় নেমেছে। পাকিস্তানি টাকা নিয়ে ভারতীয় টাকা দেয়ার ব্যবসা।

বিনিময় হার ১০০ টাকা বিনিময়ে ৭০/৮০ ভারতীয় রূপি। আমরা যখন যুদ্ধের শুরুতে সীমান্ত পার হই, তখন এর হার ছিলো ৯০/৯৫ টাকা। যুদ্ধের আগে পাকিস্তানি টাকার সাথে ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য ছিলো ১০০ টাকায় ১১০/১২০ টাকা। যতোই দিন যাচ্ছে পাকিস্তানি টাকার মূল্যমান ততোই কমছে। অবশ্য অধিনীতির হিসেবে এটাই হওয়া উচিত। একদিকে যেমন প্রচুর পাকিস্তানি টাকা ভারতে শরণার্থীদের হাত ধরে আসছে, তেমনি বাংলাদেশে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করায় সেই টাকা চোরাকারবারি ব্যবসায় খাটানোর মতো সহজ পথেরও দরোজা উন্মুক্ত হয়েছে। সম্ভবত পঞ্চম পাকিস্তানির সীমান্ত দিয়ে এ টাকা সে অঞ্চলে চালানোর প্রচেষ্টা থাকায় এখন পাকিস্তানি টাকা বাংলাদেশ শরণার্থীদের কাছ থেকে সন্তায় কিনে নেয়ার লাভজনক ব্যবসায়ী নিয়োজিত রয়েছে অনেকেই। এছাড়া রয়েছে সোনা রূপা কেনার, কাঁসার ইঁড়ি-পাতিল ও আসবাবপত্র কেনার মানুষ। অন্যান্য নিয়ন্ত্ৰণযোজনীয় জিনিসসহ শৌখিন দ্রব্য আর গুৰু-ছাগল-ভেড়া-হাঁস-মূরগি পর্যন্ত কেনার মানুষ। দেশ থেকে সর্বব্রাত্ত হয়ে পালিয়ে আসা মানুষ এপারে এসে প্রথমেই অর্থের বিনিময় করছে। তারপর শরণার্থীর খাতায় নাম তোলার আগে এবং পরে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য এসব দালালের কাছে যথাসম্ভব সন্তায় সঙ্গে আনা সবকিছু বিক্রি করে নিঃশ্ব হয়ে যাচ্ছে এবং পরবর্তীকালে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে শরণার্থী শিবির কর্তৃপক্ষের ওপর।

শিবিরের একপাশে কর্তৃপক্ষের অফিস, মন্তব্যের গিজগিজে ভিড় সেখানে। শিবিরগুলোকে স্থায়ী করা এবং সুরুভাবে পরিচালনা করার জন্য বেশ কিছু ভারতীয় এদেশীয় নারী-পুরুষ কর্মী হিসেবে কাজ করেছে। একটা তাঁবুতে মেডিক্যাল সেন্টার খুলে সেখান থেকে চিকিৎসা সেবা দেয়ার চেষ্টা নেয়া হচ্ছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা বর্তমানে যোটেই আশ্বাসন্দ নয়। কলেজ ভাইয়ের ছাড়িয়ে পড়েছে শিবিরে। চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ঘণ্টায় প্রতি ৮/১০ জন করে লোক মরছে। বৃক্ষ এবং শিশুরাই মরছে বেশি। রাস্তার পাশে দুটিনটা তাঁবুমিলিয়ে রেশন বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কেন্দ্রটার সামনে বিরাট লোহা লাইন। রোদ বৃষ্টি মাথায় করে তোর থেকে রাত অবধি লেগে থাকে রেশনের জন্য মানুষের লাইন। এখনও সবকিছু সুরু ব্যবস্থাপনায় আনতে পারে নি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। এখন কার্গুণ্য প্রতি পরিবারকে চাল-ডাল-আলু-তেলসহ লাকড়ি পর্যন্ত দেয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো এ সুবিধা আরোও বাড়তে পারে। কিন্তু পরিবারের মাথাপিছু রেশনের যা প্রাণি, তা দিয়ে সঙ্গাহে ৭ দিন চালানো অসম্ভব ব্যাপার। ঘাটাতি মেটানোর জন্য তাই তাদের যেতে হয় রাস্তার পাশের দালাল ব্যবসায়ীদের কাছে। শন্তায় বিক্রি করে দিতে হয় দেশ থেকে বয়ে নিয়ে আসা প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস। আর তার থেকে পাওয়া সামান্য অর্থে কটা দিন কোনোমতে চালানো।

আওয়ামী লীগ অফিস বসেছে কংগ্রেসের অফিসের পাশে। সেখানেও উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। মোচাকের মতো মানুষের জ্বলা আর ঠেলাঠেলি-চিংকার হৈচৈ। শরণার্থী হিসেবে যারা এসেছে, তাদের প্রথমেই নিজেদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। নাম রেজিস্ট্রি হওয়ার পর তারা জায়গা পাবে শিবিরে, তাঁবুর গাদাগাদি করা আশ্রয়ে। পাবে মাথা গুঁজবার ঠাই। পাবে রেশন কার্ড। বাড়িয়ের আর সহায়-সম্পত্তি ফেলে

পালিয়ে আসা ছিম্মুল মানুষগুলোর জন্য এখন সব থেকে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে মাথা গুঁজবার আস্তানা পাওয়া। প্রয়োজন খাদ্য এবং ওষুধপত্রে। এ জন্য তাদের দরকার রেজিস্ট্রেশন কার্ড। বাজার উপচে বাইরেও ছিম্মুল মানুষের বিস্তৃত অবস্থান। রাস্তার পাশে, গাছের নিচে, দোকান-বাড়িয়ারের সামনে, যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানেই মানুষ তাদের অস্থায়ী ঠাই পেতেছে। ছেলে-বুড়ো-যুবক-কিশোর, কোলের শিশু-নারী-পুরুষ অর্থাৎ সব বয়সের মানুষের গিজগিজে ভিড়। সবচেয়ে অসুবিধায় পড়েছে কিশোরী যুবতী বয়সের মেয়ে আর গৃহবধূ। দেশ থেকে পালিয়ে আসবার সময় সঙ্গে বয়ে আনা সংসারের সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে খোলা আকাশের নিচে সকলের চোখের সামনে উন্মুক্ত তাদের ঘর-সংস্থার, তাদের দিনান্তদৈনিকতা, তাদের লজ্জা আর সন্তুষ। সকলেরই এক অবস্থা। তাই বোধ হয় পারছে তারা তাদের এই অবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করতে। সাধারণ নিয়মে যা একেবারে অচিন্তনীয়, এখানে তাই ঘটেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার পাশে মাঠের মধ্যে মহিলারা নির্বিন্দে তাদের প্রাকৃতিক কাজ সারছেন। এটা আমাদের সামাজিক পরিবেশে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার, না দেখলে কারুরই বিশ্বাস হবে না। কিন্তু বাস্তবে এখানে তাই ঘটেছে। এ এমন এক দৃঢ়সময়, যখন মানুষের সমস্ত সামাজিকতা, কৌলীন্য আর সন্তুষমূর্ধাধ লোপ পেতে বসেছে। ভাসমান এই মানুষগুলোর স্বাভাবিক মানসিকতাবোধও এভুক্তহারিয়ে যাচ্ছে।

সময় মানুষকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছে, অথচ ওপারে বাংলাদেশের নিজেদের গ্রামের অথবা শহরের বাড়িতে তাদের জীবন-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ-হাসিকাঙ্গা মিলিয়ে নিজেদের একটা সুখী জগৎ ছিলো, সেখান থেকে আজ তারা সম্মুলে উৎপাটিত। এখানে তারা যে ধরনের জীবনযাপন তাদের করতে হচ্ছে, যার কথা দেশে থাকতে তারা কোনোদিনও ভাবতে প্রয়োগ নেই। এমনকি ক'দিন আগেও তাদের ধারণা ছিলো না। গুচ্ছ গুচ্ছ মানুষ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঝুঁকছে। অসুস্থ হয়ে পড়েছে প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কিছু কিছু সদস্য। নিজের দেশ নেই, মাটি নেই, আশ্রয় নেই, আস্তানা নেই, খাদ্য নেই, ওষুধ নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। এদেশের কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করতে পেরেছেন, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। কর্মীবাহিনী কাজ করছে, ভলানটিয়ারারা দোড়বাপ করছে, নতুন নতুন তাঁবু তৈরি হচ্ছে, ঠাই দেয়া হচ্ছে সেখানে নতুন শরণার্থীদের, বিস্তু প্রয়োজনের তুলনায় স্বীকৃত সামাজিক সেবা দেয়ার মতো নয়। ভাসমান মানুষ আসছে স্নোতের মতো। ব্যাপারটা এমন নয় যে, এখানে কর্তৃপক্ষ সবকিছু আগে থেকেই তৈরি করে ফিটফাট সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছেন, আর এখানে এলেই হিসেবে অনুযায়ী সবাই সবকিছু ঠিকঠাক মতো পেয়ে যাবে। নিদারণ এক অগ্রসর আর অনিচ্ছিত অবস্থার মধ্যে আকাশিকভাবে মানুষের উত্তাল চেউ এখানে এসে আছড়ে পড়েছে এবং একে সামাল দেয়া সত্যিকার অথেই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

এখানে আগত প্রতিটি মানুষেরই হতবিহুল অবস্থা। তাদের পরনের কাপড়-চোপড়গুলোও মলিন হয়ে এসেছে। অনেককে এক কাপড়ে চলে আসতে হয়েছে। পেছনে ফেলে এসেছে অনেকে তাদের জুলিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া বাড়িঘর।

তাদের শরীরে উদামতা নেই। চোখের উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে। জয়বাংলা বা মুক্তিযুদ্ধ এদের অতোটা আর উদ্বেলিত করে না। এদের এখন একটাই কামনা, রেজিস্ট্রেশন, শরণার্থী কার্ড, শিবিরে মাথা গুঁজবার মতো সুযোগ, রেশনের বরাদ্দ পাওয়া। সেইসাথে চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারটি ছাড়া অন্য কোনোদিকে এদের নজর দেয়ার ফুরসত নেই। এগুলো সত্ত্বর পূরণ হওয়া দরকার। এখনকার নিদারণ এই অরাজক ব্যবস্থার মধ্যেও হয়তো এইসব সুযোগ-সুবিধা তারা দুদিন আগে-পরে হয়তো পেয়ে যাবে। তারা একটুখানি সুস্থির হয়ে বসবে, আর তখনি তাদের মুখে আবারো ঘনিষ্ঠ হবে 'জয়বাংলা' প্রতিষ্ঠার কথা। মুক্তিযুদ্ধের অংগতি, স্বাধীনতার প্রশংসন, বঙ্গবন্ধুর কথা, ভারতসহ পৃথিবীর বিবেকবান দেশ ও জাতির স্বীকৃতি এসব বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামাবার সুযোগ পাবে। এদের মধ্যে কিছু কিশোর-যুবক আবেগের বশবর্তী হয়ে যুক্তের খাতায় তাদের নাম লিখিয়ে চলে যাবে ট্রেইনিং সেটারে। কিছুদিন পর কাঁধে অন্ত ঝুলিয়ে ফিরে আসবে মুক্তিযোদ্ধাবেশে হয়তো এ এলাকায়, ন্যাতো অন্য কোনো ক্রস্টে, অন্য কোনো সেক্টরে।

ঢাকাইয়া নুর

শরণার্থী শিবিরের অস্থান্ত্রিক গা যিনিখনে অমানবিক প্রারবেশের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা বেরবাঢ়ি বাজারে পৌছাই। সজিম সৈফিন, নুর মিয়া নামের এক যুবকের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। বেঁটে কাঁচে একহাতা লিকলিকে শরীরের মানুষ নুর মিয়ার চোখে চশমা। বাজারের ডেক্কে একটা চৌকির ওপর লুঙ্গ-গেঞ্জি আর ছিট কাপড়ের দোকান দিয়ে বসেছেন। অভ্যন্তরের চৌকির ওপরে আগ্রহভরে বসান তিনি। ঢায়ের অর্ডার দেন। তা আসে, তার বেচাকেনা চলে, ফাঁকে ফাঁকে তার গল্প শোনা হয়। নুর মিয়ার আদি বাড়ি প্রায় বিক্রমগুরে। পঞ্জগড়ে ব্যবসার কারণে তার পিতার আগমন। পঞ্জগড়েই তার প্রেশব-কৈশোর কেটেছে। সেখনকার স্কুল-কলেজেও তার লেখাপড়া। ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী। কলেজ শাখার নেতা। বাবা মারা যাওয়ার সংসারের সমৃদ্ধ দায়দায়িত্ব তার ওপর। যুদ্ধের বছরখানেক আগে বিয়ে করেছেন। বর্তমানে স্ত্রী গর্ভবতী, অসুস্থ। পরিবার, আঘাতীয় জনসহ বেরবাঢ়ি বাজারের কাছেই এক পরিচিত মানুষের বাড়িতে একটা ঘরে কোনো রকমে ঠাই মিলেছে ভাড়ার বিনিময়ে। জীবনধারণের জন্য পালিয়ে আসবার সময় সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছিলেন। আর তাই দিয়ে এখন এ ব্যবসা শুরু করেছেন। ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে শরণার্থীদের দেখাশোনা করা, নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি সমন্বয় করা ইত্যাদি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলে তিনি জানালেন। একথাও জানালেন যে, 'ঢাকাইয়া নুর' হিসেবে তিনি সবার কাছে পরিচিত। এ নামে খোজ করলেই লোকে তার অবস্থান জানিয়ে দেবে। ঢাকাইয়া নুর অন্তরিক্তাপূর্ণ ব্যবহার আমাদের ভালো লাগলো। পছন্দ হয়ে গেলো লোকটাকে। কথায় কথায় তিনি জানালেন যে, বেরবাঢ়িতে শুকলাল বাবু বলে একজন মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী আছেন। খুবই বিখ্যাত লোক তিনি। অত্যন্ত প্রতাপশালী এবং ক্ষমতাধর। তার কাছে বাংলাদেশের নেতাদের

নিয়মিত যাতায়াত, ওঠাবসা আছে। আপনারা এ ফ্রন্টে যুক্ত করছেন, তার সাথে দেখা করে পরিচিত হতে পারেন, করবেন নাকি দেখা? — না। কী দরকার মাড়োয়ারির সাথে দেখা করার! ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে আমাদের কী দরকার? পিন্টুর সোজা সাপটা উন্নত। নুরু মিয়া এ ব্যাপারে আর কথা বাঢ়ান না। এবার আমি বলি, আমাদের সাকাতি যেতে হবে, কিভাবে যাওয়া যাবে বলেন দেখি।

সাকাতি যাবেন? সেতো ৫ মাইল দূরে। রিকশায় যেতে হবে, দাঁড়ান ব্যবস্থা করছি বলে নুরু মিয়া তার ভাসমান দোকানের চৌকি থেকে নেমে রাস্তার মোড়ে এসে দুটো রিকশা ঠিক করে দেন।

রিকশাওয়ালা দু'জন বাংলাদেশের মানুষ। যুদ্ধের আগে ওরা পঞ্জগড় শহরেই রিকশা চালাতো। পঞ্জগড় পাকবাহিনীর হাতে ছলে গেলে ওরা রিকশা নিয়েই সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে। রিকশার পেছনে লালকালিতে বড়ো বড়ো হরফে লেখা 'জয়বাংলার রিকশা'। এরাই ভালো করেছে। রিকশা চালানো এদের পেশা। শরণার্থী হয়ে এসেও তাই চালাচ্ছে। আসলে শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোনো নির্দিষ্ট তোগোলিক সীমানা নেই। সবখানে সব পরিবেশেই এদের দৈহিক শ্রম বেঁচে জীবনধারণ করতে হয়।

নুরু মিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা জয়বাংলার রিকশায় ঢেঢ়ে চললাম সাকাতি মিশনের উদ্দেশে।

২.৮.৭৩

সাকাতি ক্যাম্প

দুপুর নাগাদ সাকাতি পৌছানো হচ্ছে। বিবাটি শরণার্থী শিবির স্থাপিত হয়েছে এখানে। বেরুবাড়ির চেয়েও বড়। প্রায় ৫ লাখ লোককে আশ্রয় দেয়া হয়েছে। ক্যাম্পটা বেশ গোছানো এবং উজ্জ্বল মনে হলো। সামনে বড়ো সাইনবোর্ডে লেখা 'রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক পরিচালিত'। শিবিরের উল্টোদিকে প্রায় ৩০০ গজের দূরত্বে একটা পরিত্যক্ত ঝুলু বাড়িতে আহিদারদের আস্তান। কাছে যেতেই ওরা হৈ-হৈ করে ছুটে এলো। সকলের আনন্দোজ্জ্বল মুখ। বড়ো আপন আর পরিচিত। ট্রেইনিং সেটার থেকেই আমরা সবাই একসাথে ছিলাম। নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো সহৃদয়প্রতিম এক নিরিড সম্পর্ক। যুদ্ধের প্রয়োজনে এখন বিছিন্ন হয়ে ছলে এসেছে এখানে। ওদের আনন্দ-উজ্জ্বল আমাদের পেয়ে তাই হঠাৎ করেই অমেকটা আবেগঘন পরিষ্কৃতির সৃষ্টি করে। খলিল-মতিয়ারসহ কয়েকজনকে চোখও মুছতে দেখা যায়। ওরা কেঁদে ফেলেছে আমাদের পেয়ে। ওদের অনেক কথা, অনেক অভিযোগ।

এক সময় তখন ওদের আবেগ-উজ্জ্বল খিতু হয়ে আসে আহারপর্বের সময়। ঝুলোর বারান্দায় সবার খাবারের পাত পড়ে। একসাথে থেতে বসি ওদের সাথে। কাঁকরযুক্ত গুঁক চালের ভাত। সঙ্গে বয়ঙ ছাগলের মাংসের তরকারি। তেলের বদলে রেশনের ডালডা ব্যবহার করতে হয় তরকারিতে। তাই বিশ্বাদ লাগে। মসলার ঘাটতি-তো আছেই। মাংস দাঁত দিয়ে টানলে স্প্রিং-এর মতো বেড়ে যায়। আর সেই মাংস দাঁত কামড়ে টানতে পিন্টু রসিকতা করে, প্লাটিকের মাংসের বাবা!

খুওয়ার পাট চোকার পর আহিদার, বন্দিউজ্জামান মাস্টার, ইয়াকুব, আখতার —
এই চার কমান্ডারের সাথে আমার আর পিন্টুর একান্ত বৈঠক বসে। সজিম উদ্দিন
একপাশে তার বকুদের শোনাতে থাকে বিসমনি বিজ ওড়ানোর রোমাঞ্চকর কাহিনী।

— আহিদার, মেজের দরজি তোমাদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছেন, সেটা
কি তোমরা জানো?

— জি, তিনি আজ সকালে এসেছিলেন, গালাগালি করে গেছেন খুব।

— তোমরা নাকি বিএসএফদের সাথে গোলাগুলি করেছো, হেডকোয়ার্টারে এটা
রিপোর্ট হয়েছে, কীভাবে ঘটলো এটা?

— রাতের বেলা একটা কালো কুকুর দেখে আমাদের সেন্ট্রি শক্ত ভেবে ফায়ার
ওপেন করে, এ নিয়েই বিপত্তির সৃষ্টি, চৌকিস ছেলে ইয়াকুবের উপর।

— ছিঃ! এটা কি কোনো ব্যাপার হলো? এভাবে তো তোমাদের তৈরি করা হয়
নি। আমাদের চাউলহাটি ইউনিট বেসের সুনাম তোমরা নষ্ট করে দিলে।

— তুল হয়ে গেছে, সেন্ট্রি বুঝতে পারেনি, আহিদারের দুর্বল জবাব।

— তোমরা এখনও বর্জারে বসে আছো কেনো? কেনো ভেতরে ঢুকতে পারো নি?

— চোকার এ্যাটেম্প্ট নিয়েছিলাম, কিন্তু সুবিধাজনক জায়গা পাওয়া যায় নি।
বন্দিউজ্জামান মাস্টার নিজেদের ডিফেন্স করতে চায়।

— আসলে তোমরা তব পাছে। আহিদার ভুল হচ্ছে, এদের মধ্যে সিনিয়র
কমান্ডার, তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করতে পারছো না, আর কমান্ডার হিসেবে
তোমারও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলেও এখানে নিরাপদে বসে থাচ্ছে-ধাচ্ছে,
শরণার্থী শিবিরে গিয়ে আড়া দিলেও আর বর্জারে বসে ফুটুস-ফাটাস করছো।
এভাবে যুদ্ধ হয় না। এখানে থেকে তোমরা নিজেদের ইমেজ খারাপ করছো, আর
শরণার্থীদের এই ভিড়ের মধ্যে ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে তাদের নষ্ট করে দিচ্ছো।
এভাবে চলবে না, তোমাদের ঢুকতে হবে ভেতরে। আজই। তোমাদের কাজল
দিঘিতে হাইড আউট করার কথা তাই না?

— জি, আহিদার জবাব দেয়।

— তাহলে তৈরি হয়ে নাও। আমরা তোমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর ফিরবো।

— আমরা লোক মারফত জানতে পেরেছি কাজলদিঘির ধারেকাছে কোনো জঙ্গল
নেই, তাছাড়া কাছাকাছি গলেয়াতে পাকবাহিনী এসে ডিফেন্স করেছে, আহিদারের
বিধান্বিত স্বর।

— তুমি নিজে গিয়েছিলে কাজলদিঘিতে?

— না।

— তাহলেও এটা যুদ্ধের মাঠ, এখানে আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি, বেড়াতে নয়,
লোকের কথা শুনে বিশ্বাস করে বসে আছো। কাজলদিঘিতে না হলে অন্য কোথাও
বর্জারের কাছাকাছি হাইড আউট করবে। আমরা যদি প্রথম দিনই পিন্টুসহ ৮/১০
মাইল ভেতরে ঢুকতে পারি, তোমরা পারবে না কেন? অবশ্যিই পারবে। আসলে
তোমাদের সমন্বয় ঠিকমতো হচ্ছে না। আহিদার তুমি লিডারশিপ দিতে পারছো না।

আর ইয়াকুব, আখতার, মাস্টার তোমরা তাকে মানছো না। এটা ঠিক না। যুদ্ধের মাঠে কমান্ডারের প্রতি অনুগত থাকতেই হবে, এটাই যুদ্ধের বীতি। নাও ওঠো। আজ এখনই তোমরা ভেতরে ঢুকবে।

— কিন্তু কাজলদিঘি?

— গুলি মারো তোমার কাজলদিঘি। সীমান্তের আধা মাইলের মধ্যে যেকোনো পরিত্যক্ত গ্রামের বাড়িঘরে তোমরা আস্তানা গাড়বে। সেখান থেকে আপাতত অপারেশন চালাবে। আর মেজের দরজিকে রিপোর্ট করবে তোমরা কাজলদিঘিতেই হাইড আউট করেছো। আছে সীমান্তের ওপারে এরকম কোনো পরিত্যক্ত বাড়িঘর?

— আছে, আছে, ইয়াকুবের চটপটে উত্তর।

— তবে রেডি হও, তাড়াতাড়ি, কুইক। আমরা তোমাদের রওনা করিয়ে দিয়ে তবে ফিরবো, ও. কে?

— ও. কে।

— আজ রাতেই গলেয়া পাকবাহিনীর ডিফেন্স রেকি করবে, ওদের শক্তি জেনে নেবে, আমাদের তা জানবে। এরপর আমরা দুদিক থেকে যৌথভাবে আক্রমণ করে ওদের পিয়ে মারবো, ঠিক আছে?

— হ্যা, মাথা নাড়ে সবাই।

— তাহলে ওঠো মূড়, গেট রেডি এ্যাট দ্য ম্যারিলিয়েন্ট। তোমরা রওনা হলে আমি বি.এস.এফ ক্যাম্প থেকে মেজের দরজিকে ওয়ারলেসে জানিয়ে দেবো। উই হ্যাভ নো টাইম। বিরাট শক্তি হয়ে দেওয়া পারে। তোমাদের কোর্ট মার্শাল ফেস করতে হতে পারে। বি.এস.এফ-রা মহান ক্ষেপে গেছে।

ওরা উঠলো। বটপট তৈরি হয়ে নিল। পড়স্ত বিকেলে ওদের বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম আর পিন্টুসহ। সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢুকবার মুখে ছেলেদের অত্যন্ত বিমর্শ দেখাচ্ছলো। আহিদার এবং অন্যান্য কমান্ডারের মুখে শঙ্কার কালো মেঘ। আহিদার বললো, দোয়া করবেন মাহবুব ভাই, দোয়া করিস পিন্টু।

— হ্যা, মনের মধ্যে সাহস রেখো। আমরা ভেতরে, ৫/৭ মাইলের মধ্যেই আছি। বিপদে সাপোর্টের জন্য ভেবো না। উইশ ইউ গৃহ লাক।

ওরা এগিয়ে চলে গেলো অধিকৃত বাংলাদেশের দিকে। আর আমরা ফিরছি মনের মধ্যে একটা শূন্যতা নিয়ে। ওদের চুকিয়ে দিলাম জোর করে। জানি না, কী আছে ওদের ভাগ্যে? ওদের ভেতর থেকে কাজন ফিরতে পারবে কে জানে? সবাই কি ফিরবে? ফিরবে না। হয়তো ফিরবে না।

বাংলাদেশের হৃদয় হতে

আহিদার তার দলবল নিয়ে ভেতরে চলে যাওয়ার পর আমাদের যেনেো কাজ ফুরিয়ে গেলো। এবার ফেরার পালা। বি.এস.এফ ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ফিরছি, এমন সময় ক্যাম্প কমান্ডার আমাদের উদ্দেশে বলে উঠলেন, আইয়ে সাব, বইঠিয়ে। তিনি ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমাদেরই অপেক্ষায়। আহিদারদের ভেতরে ঢোকার

ম্যাসেজটা পাঠানোর তাগিদে ক্যাম্পে ঢুকলাম।

সুবেদার সুকোমল কমান্ডার আহিদারের ওপর চটে আছেন খুব। আলাপের শুরুতেই সেটা প্রকাশ পেল। কারণও জানা গেলো। অনেকটা অভিযোগ আর উচ্চা নিয়ে সুকোমল বললেন, জানেন, আয় ৮/১০ দিন থেকে এরা এখানে বসে আছে, ভেতরে ঢুকছে না। আসলে ভয়, বুঝলেন ভয়। আমরা ওদের ভেতরে ঢুকবার ব্যাপারে সাহায্য করার কথা বারবার বলেছি, তাও সাহস পায় না। এরা যুদ্ধ করবে, দেশকে স্বাধীন করবে ... ! উত্তেজিত রাগী কষ্ট সুবেদারের হঠাতে থেমে যায় এবং তিনি তার হাবিলদারের উদ্দেশে হাঁক দেন, জলদি কিজিয়ে হাবিলদার সাব, দেখা নেই হামরা মেহমান আয়া? খাকি হাফপ্যান্ট শাদা গেঞ্জি গায়ে জঁকালো গোফের অধিকারী নিরসন্তাপ হাবিলদার আমাদের আপ্যায়নের যোগাড়যন্তে লেগে যান।

টেবিল-চেয়ার পাতাই ছিলো। আমরা তাতে বসলাম। বিশ্বাপির চারদিকে উঁচু মাটির দেয়াল। অনেকটা চতুর্ভুজ আকৃতির। টিন শেড, পাকা দালানের লম্বা একটা ব্যাসাক। পেছনে রান্নাঘর। মাটির উচু দেয়ালের চারকোণে শক্ত মজবুত বাঙাক। দুটি বাঙারের মুখ বাংলাদেশের দিকে। সেখানে হালকা মেশিনগান বসিয়ে বাঙারের ফুটোতে তার নল রেখে অলসভঙ্গিতে বসে আছে দুই জেয়ান। বিশ্বাপির প্রবেশ পথে সদা প্রবৃত্ত সশ্রম প্রহরী। সামনেই সীমান্তের ওপারে প্রকৃত শুক্ৰবাহিনীর ঘাঁটি। তাদের শক্তাজনক আনাগোনা। বিশ্বাপির নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে জোরদার করতে হয়েছে।

সুবেদার এখন অনেকটা সুস্থির। মেজেজিতে অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে আহিদার তার দলবল নিষ্কেত ঢুকতে পারছে না, এ নিয়ে সুবেদারের উত্তেজনা এবং উচ্চার বহির্গামী প্রথম আমাদের অবস্থিতে ফেললেও, তার বর্তমান আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার এখন ভাসন লাগছে।

— থাক, আজ তো ওরা ঢুকছে, প্রত্যেম সলভড় কি বলেন সুবেদার সাহেব, কথা শুরু করলাম আমি।

— জি, আপনারা এসেছেন বলে। সুবেদারের হাসিমুরের জবাব।

আসলে ওরা একটু সময় নিছিলো, জায়গাটা রেকি করা প্রয়োজন...। পিন্টু আহিদারদেরকে সাপোর্ট করতে চায়।

— কি বলেন, রেকি করা প্রয়োজন? পিন্টুকে থামিয়ে দিয়ে সুবেদার সুকোমল সরাসরি তার মতামত দেন, রেকিফেকি কিছু না। আসলে ভয়। ভেতরে না গেলে কি যুদ্ধ হয়? দেশটা স্বাধীন করতে হবে না? তার কথায় চমৎকৃত হলাম।

— ওরা ঢুকতে পারে নি কেনো?

— চেষ্টাই করে নি। খালি আড়ো দিতো শরণার্থী শিবিরে গিয়ে। আমি নিজে বরিশাল পটুয়াখালীর ছেলে। দেশটার প্রতি আমাদের টান রয়েছে না? এখন আমরা এদেশের নাগরিক, কিন্তু আদিনিবাস তো বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে আমি যেতে পারছি না, কিন্তু ওরা যাবে না কেন?

বোৰা গেলো বাংলাদেশ থেকে অনেক আগে চলে আসা বর্তমানে মধ্যবয়সী এই বাঙালি ভারতীয় সৈনিক, যার আদিনিবাস বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চলে। তিনি

চাইছেন দেশটা দ্রুত স্বাধীন হোক, এ জন্য যুদ্ধ প্রয়োজন। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করতে এসে এখানে বসে রয়েছে, এ জন্য তার রাগ। এ জন্যই আহিদাবের সাথে তার বিরোধ। লোকটাকে ভালো লাগলো।

সুবেদার সুকোমল ওয়ারলেনে মেজর দরজিকে খবরটা পাঠিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন। আমরা উঠলাম। উষ্ণ করমার্দন। আবার দেখা হবে, দেশটা স্বাধীন হলে একবার বেড়াতে যাবো, জন্মভূমির জন্য মনটা বড়ো কাঁদে কমান্ডার মাহবুব সাহেব, জন্মভূমির মায়া ভীষণ গভীর, বুঝালেন, আবার আসবেন। জয়বাংলা।

সুবেদার সুকোমল দণ্ড একজন বাঙালি। তিনিও একজন উদ্বাস্তু। আজ থেকে প্রায় ২৩/২৪ বছর আগে ওরা শরণার্থী হয়েছিলেন। আজ তিনি এদেশের ডিফেন্স ফোর্সে চাকরি করছেন। ইতিহাসের নির্মাণ এক ঘটনা এটা। ঠিক ২৪ বছর পর একইভাবে শরণার্থীর ঢল আসছে এপারে। আর ক্যাম্প কমান্ডার হিসেবে শরণার্থীদের রিসিভ করার দায়িত্ব আজ তার ওপর ন্যস্ত। হয়তো এ দায়িত্ব পালনের সময় তার মনে পড়ে দেশ বিভাগের সেই দৃশ্য। সে এক উন্ন্যাতাল পরিস্থিতি। সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আসা এক তরুণ তার পিতামহ বা পিতার নেতৃত্বে পরিবারের সকলের সাথে একইভাবে বেনাপোল বর্জীর পার হয়ে ভিন্নদেশে শরণার্থী হয়ে চুক্ষে, পরের দেশে উদ্বাস্তু হয়ে থাকবার যে ইনশ্যান্যতা, সেই অমানবিক জীবনযাপন হয়তো তাকে উদ্বেল করে তোলে, সে জন্যই তার আন্তরিক তাড়না, আফেলুর তার দলবল নিয়ে বাংলাদেশে চুকে পড়ুক। প্রচও যুদ্ধে লিঙ্গ হোক। যুদ্ধ মুক্তিবালে তো বাংলাদেশ হবে না। আর দেশ স্বাধীন না হল তো এই লাখ লক্ষ মানুষ দেশে ফিরতে পারবে না। নিজের জন্মভূমি হারানোর ব্যথা তিনি আজকেই এই '৭১-এর শরণার্থীদের মধ্যে দেখতে চান না। হায়রে মাতৃভূমি! স্বর্গাদপী পরিমোসা। সুকোমল বাবুর মতো কতো শত সহস্র বাঙালি, যারা এককালে রাজ্যবন্দেশে ছিলেন, তারা নীরবে নিরস্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আমাদের জন্য। এখন আর কোনো দিন ফিরবেন না বাংলাদেশে। কিন্তু আমরা ফিরবো। একটা নতুন দেশ হবে। এয়া বলবেন, আমাদের জন্মভূমি।

নকশাল পরিচয়ে পরিচিত এক যুবকের কথা

ফিরবার পথে বেরুবাড়িতে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেলো। কিছু টুকটাক কেনাকাটা সেবে মধুপাড়া হাইড আউটের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময় দেখা গেল ঘন অঙ্ককার জাঁকিয়ে রাত নেমে এসেছে। অঙ্ককারে হাঁটতে হাঁটতে মধুপাড়ার রাস্তা ঠাহর করা গেল না। রাস্তা ভুলে বিপথে আমরা অনেক দূর চলে এলাম। অপরিচিত একজনের সাহায্যে বেলতলা নামে একটা মুসলমান বাসিতে পৌছতেই গোলজার হোসেন নামের মাথায় টুপি পরা, কাঁচা পাকা দাঢ়িবিশিষ্ট সৌম্যদর্শন একজন মানুষ আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তার বাড়িতে সপরিবারে আশ্রিত এক ছিপছিপে গড়নের ফর্সা যুবকের সাথে আমাদের পরিচয় হলো। যুবকের নাম মাহবুবার রহমান দুলু। অত্যন্ত পরিমার্জিত দুলু আর সপ্রতিভ যুবক দুলু আমাদের পরিচয় পেয়ে আপ্যায়নের জন্য ব্যক্ত হয়ে উঠলো। আমাদের রাতের হাইড আউটে ফেরার প্রচও তাগিদ। একরামুল, শামসূল চৌধুরীর হাতে হাইড আউটের ভার।

আমাদের সারাদিনের অনুপস্থিতি, হাড়িভাসা এলাকায় পাকবাহিনীর আনাগোনা, বিরাট এক দুশ্চিন্তার বোৰা মাথায় চেপে বসেছে। সারাদিনের পদচারণায় শরীর অত্যন্ত ঝুঁস্ত-শ্বাস্ত, তবুও উপায় নেই, রাতেই ফিরতে হবে মধুপাড়ায়। আমরা যতোই তাদের তাগিদ দিই রওনা হওয়ার জন্ম, ততোই গোলজার সাহেব বলেন, চারটা খেয়ে যেতে হবে। এতো রাতে না খেয়ে যাবেন; এটা কি করে হয়?

তাদের অনুরোধ ফেলা গেলো না। মধ্যরাতে যখন খাবার শেষ হলো, তখন মধুপাড়া ফেরার উপায় রইলো না। দুলু বাইরের দহলিজে সয়ত্রে বিছানা পেতে শোবার ব্যবস্থা করলো। বহুদিন পর নরম তোশকের বিছানায় শোয়া গেলো। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। তখন দুলুর গল্প চলতে লাগলো। তার গল্প থেকে জানা গেলো, কেমন করে ভাসতে ভাসতে দুলু তার মা-ভাইবোন এবং অন্যদের নিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। গল্পটা এই রকমের—

দুলুদের গ্রামের বাড়ি সীমান্তের ওপারে, এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে নালাগঙ্গা গাম। বাবা ছিলেন চেয়ারম্যান। প্রতাপশালী ব্যক্তি। গ্রামে প্রচুর জায়গাজমি রয়েছে। পঞ্চগড় শহরের বাড়িতে তারা স্থায়ীভাবে থাকতেন। বছর তিনেক আগে বাবা মারা গেলে সমস্ত পরিবারের দায়দায়িত্ব মুক্ত দুলুর কাঁধে দেপে বসে। পঞ্চগড় কলেজে পড়াবার সময় সে প্রগতিশীল বাম আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে ভাসানী ন্যাপের একজন সক্রিয় কর্মীতে পরিণত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিনকের প্রতিরোধ যুদ্ধে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত পঞ্চগড় এজাকামুক্ত রাখার ব্যাপারে সংগ্রাম পরিষদের সাথে যুক্ত থেকে সে প্রতিক্রিয়া যোদ্ধা ইপিআর-আনসারদের সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। পঞ্চগড় পাকবাহিনী দখল করে নেয়ার পর অন্যদের মতো সপরিবারে তাকে পালাতে হয়। এমপর ভীষণ অনিষ্টিত অবস্থায় এবং অসহায়ভাবে ভাসতে ভাসতে অবশ্যে এক্ষেত্রেই এই গোলজার সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় মিলেছে। গোলজার সাহেব তার চাচাতো ভাই। দেশ বিভাগের পর তারা এপারেই থেকে যান। অত্যন্ত ভালো মানুষ তার এই গোলজার নামের ভাইটি। এমনিতে কোনো অসুবিধে নেই। তবে এখানে শরণার্থী কার্ড যোগাড় করা যায় নি। রেশন কার্ডও পাওয়া যায় নি। যেহেতু দেশে সে ভাসানী ন্যাপ করতো, তাই এপারে আসার পর তাকে নকশাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এপারে খোলাখুলি ঘোরাফেরা করা তার জন্য বিপজ্জনক। দেশের ভেতরে যাওয়ার উপায় নেই। তরুণী দু'বোন, মা আর ছেট ছেট দু'ভাইকে ফেলে রেখে মৃত্যুবন্ধে যাওয়াও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সাথে নিয়ে আসা টাকা-পয়সা আর গোলজারদের সাহায্য-সহযোগিতায় তাকে চলতে হচ্ছে। বড়ো অনিষ্টিত জীবন মাহবুব ভাই! এভাবে কতোদিন চলবে, কবে দেশ স্বাধীন হবেঁ?

দুলুর গল্প শেষ হয় এক বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে। দীর্ঘস্থাসের ভেতর দিয়ে। তাকে আশ্বাস দিই, ঘাবড়াবেন না, দেখবেন সব ঠিক হয়ে আসবে।

রাত নিম্বুম হয়ে আসে। জানালার ফাঁক দিয়ে হিমালয়ের বিরাট শরীরের ওপর দাজিলিং শহরের উজ্জ্বল আলোর উকিমুকি দেখা যায়। একটা নির্মল বাতাসের প্রবাহ

হিমালয়ের গা বেয়ে নেমে আসে। এখন বড়ো দুঃসময়। সারাদেশে যুক্ত চলছে। শুধু তো এক দুলু নয়। এমনি লাখ লাখ দুলু দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। এপারে এসে তারা দারুণ এক অনিষ্টয়তা আর সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। এ সঙ্কট উত্তরণের একমাত্র পথ যুক্ত। তুমুল যুদ্ধশেষে দেশকে মুক্ত করা। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। এটা এখন শুধু কল্পনা নয়, একটা কঠিন বাস্তবতার রূপ নিয়ে সবার সামনেই হাজির। জানি না, কবে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ? কবে এরা দেশে ফিরবে? আবার কবে আপন মহিমায় অধিষ্ঠিত হবে নিজেদের বাড়িঘরে? নিজেদের আপন ভূবনে? আদৌ এরা ফিরতে পারবে কি? কে জানে!

রাতে ঘূম হয় নি। সূর্য উঠবার সাথে সাথে শুধু চা খেয়ে রওনা দিলাম। মধুপাড়া হাইড আউট অভিযোগে। দুলু আর গোলজার সাহেব পথ-প্রদর্শক। মনের মধ্যে অস্ত্রিতা। সে অস্ত্রিতা হাইড আউটে অবস্থানরত ছেলেদের নিয়ে। কোনো বিপদ এলে শামসুল চৌধুরী ও একরামুলের পক্ষে সামাল দেয়া মুশকিল। আসবার সময় দুলুর বাড়ি থেকে বের হতে দেরি হচ্ছিলো। পিন্টুর শাদা সাপটা প্রশ্ন, দেরি যে? বাদ দেন, মেয়েদের ব্যাপার। অর্থাৎ দুলুকে তার মা-বোনের আসতে দিতে চাহিলো না। পেছনে হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি, গোলজার সাহেবও আসছেন। দুলু গৌয়াড় ছেলে, সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যাতে যুক্তে জড়িয়ে না পড়ে এবং জন্য গোলজার সাহেবকে পাঠিয়েছেন দুলুর মা ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অস্ত্রের মায়ের মন! আমাদের মায়ের কোথায় আছেন? এক অস্ত্রির জ্বালা এসে ঝুকে প্রিক্সেরে। দ্রুত পা চালাই যুক্তের দিকে।

ওরা আসছে

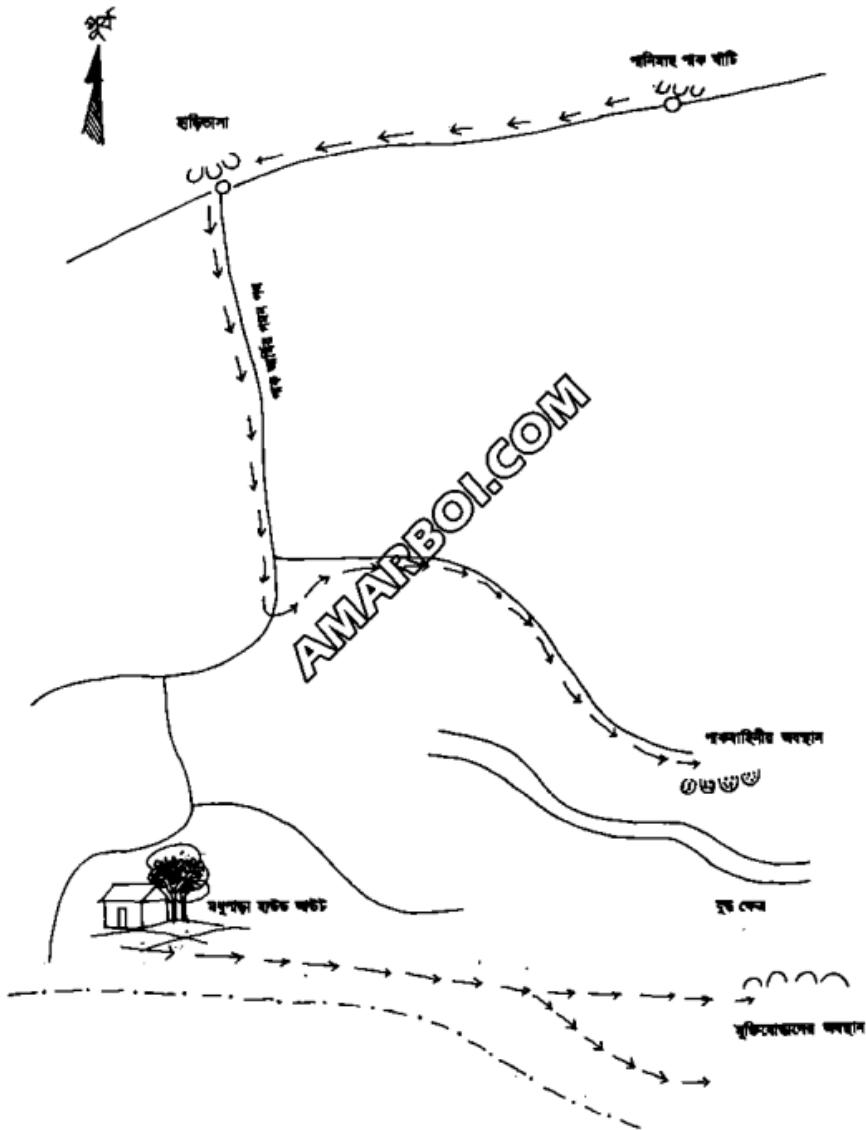
আমরা যেমন ভাবছিলাম হাইড অন্তর্টের ছেলেদের নিয়ে, ওরাও ঠিক একইভাবে ভাবছিলো আমাদের জন্য। আবার এসে পৌছুতেই সবার মধ্যে আনন্দ আর স্বত্ত্বির একটা সাড়া পড়ে গেলো যেনো। শুয়ে-বসে ইত্তেক বিঞ্চিণ অবস্থায় থাকা ছেলের দল এসে ভিড় করলো আমাদের চারপাশে। সবার চোখে-মুখে কেমন যেনো একটা শক্তার ছায়া। সবার হাতেই হাতিয়ার। যেনে যুক্তের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

চৌধুরী রিপোর্ট দেয়— গতকাল পাকবাহিনীর একটা দল পানিমাছ পার হয়ে হাড়িভাসা পর্যন্ত এসেছে। তাদের মতিগতি বোঝা যাচ্ছে না। তারা গতরাতে হাড়িভাসাতেই অবস্থান নিয়েছিলো। রাতের বেলা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেছে।

- তাদের সংখ্যা কতো?
- প্রায় দেড় শ' বলে শোনা গেছে।
- কোন ইউনিট, অন্তর্শন্ত্র কি আছে, কটা গাড়ি নিয়ে এসেছে জানতে পেরেছো?
- না।
- রাতে প্রেটল পাঠিয়েছিলো?
- না, রাতে ওরা এদিকে আসতে পারে এ জন্য সারা রাত ডিফেন্স নিয়ে ছিলাম, আর তাছাড়া আপনারা নেই . . .।

চৌধুরী আর একরামুলের কাছে এর চেয়ে বেশি আশা করা বৃথা। শক্ত

চে বাপ- ১৪
মধুগাঁড়ির যুদ্ধ
০. ব. ৩৫৫
(কল শাঢ়া)



হাড়িভাসায় রয়েছে। হাড়িভাসা থেকে ঘাঘরা বিওপির দূরত্ব প্রায় আধা মাইল। সেখান থেকে বেরুবাড়ি এক মাইলের পথ। ত্রিশ আমলে তৈরি পঞ্চগড়-হাড়িভাসা-বেরুবাড়ি-জলপাইগুড়ির জেলা বোর্ডের এই রাস্তাটা উচু এবং প্রশস্ত। পাকবাহিনী এই রুট ধরে সোজাসুজি বেরুবাড়ির উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌছে যেতে পারবে স্বাধীনভাবে। বেরুবাড়িতে রয়েছে প্রায় ৪ লাখ শরণার্থী। হাড়িভাসা থেকে মর্টার বা কামানের গোলাবর্ষণ করলে তা শরণার্থী শিবিরের ওপর গিয়ে সরাসরি আঘাত করবে। অথচ এদিকে মুক্তিবাহিনীর কোনো ডিফেন্স নেই। বি.এস.এফরাও পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়ার জন্য কোনোরকম রিস্ক নেবে না। একটা ভয়ানক বিপদ ডেকে এনেছে পাকবাহিনীর হাড়িভাসায় উপস্থিতি। তাই ওদের হাড়িভাসা থেকে হটিয়ে দিতে হবে। বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরকে শক্ত হুমকির হাত থেকে বাঁচাতে হবে যে করেই হোক। মাথার ওপর বিরাট এক দায়িত্ব এসে চাপলো। এখন এদের জনবল, অন্ত শক্তি আর মতিগতি সম্পর্কে জানতে হবে আর নিজেদের ডিফেন্স শক্তিশালী করে ওদের ক্ষেত্রের জন্য ট্র্যাটোজি ঠিক করতে হবে।

এ পরিস্থিতিতে মনটা তেতো হয়ে গেলো। গতরাতেই আমাদের আসা উচিত ছিলো। এলে অন্তত রাতের বেলায় শক্তির অবস্থান এবং তাদের মতিগতি সম্পর্কে খবর যোগাড় করা যেতো। গতরাতে গোলজার সাহেবের বাড়িতে আয়োজী ভদ্রলোক সেজে খাওয়া-দাওয়া আর পরিপাটি বিছানায় শুয়ে স্বাক্ষরাপনের জন্য নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে লাগলো। যুদ্ধ মুক্তি। ফলক ডেকে আয়োজী জীবন চলে না। ভদ্রলোক হওয়া চলে না। যুদ্ধের ডেকে আয়োজন একটুবাণি এদিক-ওদিক কিংবা একটা ভুল সিদ্ধান্ত একটা দলের জন্য হচ্ছে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

ছেলেদের প্রস্তুত হতে নিম্নলিখিত দলাম। মিনহাজ সকালের নাস্তা পরিবেশন করেছে। মেহমানদের নিয়ে প্রস্তুতি সাতার খালায় হাত দিয়েছি, এমন সময় খবর এলো, ওরা আসছে। সকাল সাড়ে মিটার দিকে আমরা আক্রান্ত হলাম। যুদ্ধের সময় শক্তির নাগালের আওতায় আসলে কোনো জায়গাটা নিরাপদ নয়। এখনে হাইড আউট নেয়ার সময় মনে হয়েছিলো, জায়গাটা খুবই নিরাপদ। একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে এর অবস্থান। ইউনিয়ন বোর্ডের একটা ছোট পথ গ্রামটার পাশ দিয়ে গেছে। শক্তির এপথ দিয়ে একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে এই ঝৌপবাড়ি ঘেরা পিছল পথময় গ্রামটাতে আসতে পারবে না। কিংবা আসার জন্য রিস্ক নেবে না। জায়গাটার অবস্থান এবং এর নিরাপত্তা নিয়ে কিছুক্ষণ আগেও আমাদের নিজেদের মনে একটা বিরাট আঙ্গু ছিলো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সে ধারণা পুরোপুরি ভুল ছিলো। যুদ্ধের মাঠে নিরাপদ জায়গা বলে কোনো কিছু নেই। এখন মনে হচ্ছে যা নিরাপদ কিছুক্ষণের ডেকেই সেটা বিপদসম্মত হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্যে আমরা আক্রান্ত হলাম। খবরটা দৌড়ে নিয়ে এলো হাইড আউটের সামনে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে পজিশনে থাকা দুজন সেন্ট্রির একজন—মজিদ মির্য। হাঁফাতে হাঁফাতে সে দৌড়ে এলো। রাইফেলটা হাতে ধরা। পরনের লুঙ্গ হাঁটুর ওপর। কোমরে গামছায় পেঁচানো ঘেনেড। কাঁধের ওপর দিয়ে বুক পেঁচিয়ে সবুজ

খাকি কাপড়ে বাঁধা শ্রী নট শ্রী গুলির মালা। এলামেলো চূল। বিধৃষ্ট চেহারা। চোখে-মুখে শঙ্কার ছায়া। হাত-পা কাদামাটিতে মাখামাখি। উর্ধ্বশাসনে দৌড়ে এসেছে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে তার রিপোর্ট দিলো, ওরা আসছে!

— আসছে?

— হ্যাঁ।

— কতোদূরে আছে? কতো জন? খাবার থালা থেকে হাত উঠে আসে। দ্রুত উঠে দাঁড়াই।

— এদিকে আসছে?

— হ্যাঁ।

— ঠিক?

— জি।

— দেখেছিস তুই, কীভাবে বুঝলি?

— গ্রামের লোক সব পালায় আসেছে, ওমহার কাছোত শুনিনো, ওরা আসেছে হাঁটে হাঁটে।

— কতো জন?

— অনেক।

মিনহাজের পরিবেশন করা সুস্বাদু নাট্য কেবল করে করেছিলাম। শেষ করা গেলো না। মেহমানরাও নাট্য ছেড়ে হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। এখন আর খাওয়া নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। পাকবাহিনী আমাজন্স ক্যাম্প দখলের উদ্দেশ্যে আসছে। শক্তি-অন্ত-জনবল আর রসদ ব্যবস্থা সব ঘোষণা দিয়েই ওরা আমাদের চেয়ে অনেকগুণে বলীয়ান। তবুও আটকাতে হবে ওদের। সামনাসামনি হতে হবে দিনের বেলায় এই প্রথম। মানুষজনকে রক্ষা করতে হবে। ক্যাম্প রক্ষা করতে হবে। ওদের মারতে হবে। তাড়িয়ে দিতে হবে এলাকা থেকে। এই এখনকার এই মুহূর্তের এটাই বাস্তবতা। পিছুবার উপায় নেই। ভয় পেলে চলবে না। সামনে বিরাট বিপদ। একটা ভয়াবহ সম্মুখ্যুদ্ধ অপেক্ষমাণ। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত। আমাদের ক্যাম্প থেকে বেশ দূরে থাকতেই ওদের ঝুঁতে হবে। এরপর দু'পাশ থেকে দিতে হবে কাউন্টার এ্যাটাক।

পিন্টু, একরামুল, চৌধুরী পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেহমানদের হতবিহুল চেহারা। ওরা যুদ্ধের মাঠে এসেছেন। যুদ্ধের মধ্যে কখনও থাকেন নি। প্রাকটিকাল যুদ্ধ দেখেন নি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকলে, একজন সিভিলিয়ানের অবস্থা এ সময় অ্যান্ট খারাপ হওয়ার কথা। এদেরও হয়েছে তাই। পাকবাহিনী তাড়িত মানুষের ঢল তখন বসির মেঘারের বাড়ির সামনের পথ দিয়ে দ্রুতভাবে সাথে সীমান্তের দিকে ধাবিত। চোখে-মুখে মৃত্যুর শঙ্কা নিয়ে উদ্ব্রান্তের মতো পলায়নমান সবাই। পেছনে তাদের মৃত্যু ধাবমান। ওরা পালাচ্ছে জীবনের জন্য। সীমান্তের ওপারে তাদের জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে। তাই ওদের এখন আটকানো যাবে না। কেনো সাহায্যও পাওয়া যাবে না ওদের কাছ থেকে। নিরন্তর নিরন্তর সাধারণ গ্রামের মানুষ ওরা। —এইরকম মুহূর্তে ওদের না পালিয়ে উপায় কী!

৩.৮.৭১

ମଧୁପାଡ଼ାର ଯୁଦ୍ଧ

— ପିନ୍ଟୁ, ଏକରାମୁଲ, ଚୌଧୁରୀ, ଆକାସ, ମଧୁସୂଦନ ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି, ଫଳ-ଇନ ଏଭରିବଡ଼ି, କୁଇକ! ସହକାରୀଦେର ପ୍ରତି ଦ୍ରୁତ ତୈରି ହେୟାର କମାନ୍ ଦିଇ ଆମି, ସେଇ ସାଥେ ଦ୍ରୁତ ସିନ୍ଧାନ୍ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପରିକଳ୍ପନାର ଛକ କରେ ଫେଲି ।

— ସକଳେ ନିଜ ହାତିଆର ନେବେ । ସାଫିସିଯେନ୍ଟ ରାଉଡ ନେବେ, ଫେନେଡ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ । ଯତୋଗୁଲୋ ସମ୍ବନ୍ଧ ନେବ୍ବା ଯାଏ । ସବ ଛେଲେଇ ତୈରି ହବେ । କ୍ୟାମ୍ପେ ଥାକବେ ମିନହାଜ ୫ ଜନମହେ । ଶକ୍ତ ଆମାଦେର ପରିଜଣନ ଓଭାର ରାନ କରାର ମତୋ ଅବଶ୍ୟ ଏଲେ ମିନହାଜ କ୍ୟାମ୍ପେର ସମନ୍ତ ମାଲାମାଲ, ଗୋଲାବାର୍ଦ ଆର ଅନ୍ତର୍ଶତ୍ରୁମହେ ପିଛିଯେ ଯାବେ । ସାମନେ ଦାଢ଼ାନୋ ମିନହାଜକେ ନିର୍ଦେଶ ଦିଲାମ, ମିନହାଜ ଓ, କେବେ ମିନହାଜ ମାଥା ନେବେ ତାର କାଜେ ଲେଗେ ଯାଏ । ଏରପର ସକଳେର ପ୍ରତି ନିର୍ଦେଶ, ଗେଟ୍ ରେଡ଼ି, ଉଠି ହ୍ୟାଙ୍କ ନେ ଟାଇମ । ଫଳ-ଇନ ସେକଶନ ଓୟାଇଜ, ଏୟାଟ ଓୟାକ୍, ଗୋ ମୁଦ୍ରା!

ପିନ୍ଟୁ ତାର କାଜ ଶୁରୁ କରଲୋ । ସେକଶନ କମାନ୍ଡାରରା ତ୍ର୍ୟାନ ହେୟ ଉଠିଲୋ । ଛେଲେରା ଦୌଡ଼୍‌ବୌପ ଛୁଟୋଛୁଟି କରେ ତୈରି ହତେ ଲାଗଲୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାଜେ । ଆର ଓଦିକେ ବାଇରେର ରାତ୍ରା ଧରେ ପାଲିଯେ ଯାଓ୍ଯା ନାରୀ-ପୁରୁଷରେ ଢଳ, ତାଦେର ଚିତ୍କାର, କୋଲେର ଶିଶୁ ଆର ଛୋଟ ଛେଲେ-ମେଘେଦେର ତାରବସ୍ତରେ କାନ୍ଦା, ପାକବାହିନୀର ହାତ ଥିକେ ବୀଚବାର ଜନ୍ୟ ଧାବିତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଆର ବସିର ମେଖରେ ବାଡ଼ିର ଭେତରେ ଯୁବକଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜନ୍ୟ ହାତିଆର ନିଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେୟାର ଖଟାଖଟ ଶବ୍ଦ ।

ମୋଟ ଦୁ' ପ୍ଲାଟିନ । ୮ଟା ସେକଶନ । ଲଙ୍ଗର କମାନ୍ଡାର ମିନହାଜ ଓ ତାର ସହକାରୀ କର୍ଜନ ବାଦେ ସବାଇ ଦାଢ଼ିଯେଛେ ଫଳ-ଇନ-ଏ । ମୁଦ୍ରାକର ସେକଶନ କମାନ୍ଡାର, କାଁଧେ ଟେନଗାନ । ଅନ୍ୟଦେର ହତେ ୩୦୩ ରାଇଫେଲ ଏବଂ ଏସ. ଏଲ. ଆର । ୨ ଇଞ୍ଜିନ ମର୍ଟାର ମଧୁସୂଦନର ସେକଶନେ । ଏକମାତ୍ର ହାଲକା ଏଲ. ଏମ. ଜିଟା ମୋତାଲେବେର କାହେ । ପିନ୍ଟୁ, ଏକରାମୁଲ ଆର ଚୌଧୁରୀ ଚମ୍ବକାର କୃତିତ୍ତ ଦେଖିଲେ ସବ ଛେଲେକେ ୫ ମିନିଟେର ମତୋ ସମୟର ମଧ୍ୟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜନ୍ୟ ତୈରି କରେ ଫେଲେଛେ । ପିନ୍ଟୁ ରଇଲୋ ମର୍ଟାର ସେକଶନେର ସାଥେ । ଚୌଧୁରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ପ୍ରଟେକଶନେ । ଏକରାମୁଲ ବା ଥିକେ ସରାସରି ଶକ୍ତର ପେଛନେର ଦିକେ । ଆମାର ସାଥେ ରମେଛେ ମୋତାଲେବ ତାର ହାଲକା ଏଲ. ଏମ. ଜି ନିଯେ ସରାସରି ଆଗ୍ୟାନ ଶକ୍ତର ମୁଖ୍ୟମୁଖୀ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁରିତ ଗତିତେ ଶକ୍ତର ସାମନେ ହାଜିର ହତେ ହେୟାରେ । ଆମାଦେର ଅବଶ୍ୟନ ଏକଟା ଖାଲେର ଉଚ୍ଚ ପାଡ଼େ । ସାମନେର ରାତ୍ରାଟା ଶେଷ ହେୟାରେ ଏହି ଖାଲେର କାହେ ଏସେ । ଖାଲେ ହାଁଟୁ ସମାନ ପାନି । ଏ ପାଡ଼େର ରାତ୍ରାର ଦୁନିକେର ପରିଜଣନ ଆମାଦେର । ଜାଯଗଟା ଠିକ ଆଦର୍ଶ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ମତୋ । ବୋପାବାଡ଼ ଜୟମ ଉଚୁନିଚୁ ଜମି, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବାଡ଼ିର । ବୋପାବାଡ଼ର ମଧ୍ୟେ ଶରୀର ଲୁକିଯେ ରେଖେ ଚମ୍ବକାର ଏକଟା ସୁବିଧେ ମତୋ ପରିଜଣନ ଆମାଦେର । ଏଥିନ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତର ଜନ୍ୟ—ଓରା ଆସଛେ ।

ହାଇଡ ଆଉଟ ଥିକେ ଛୁଟାନ୍ତ ବ୍ରିକ୍ଷିଶେଷେ ସକଳେର ବେର ହେୟାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପିନ୍ଟୁ ଚମ୍ବକାର ଏକଟା କାଜ ଦେଖିଯେଛେ । ଯଥନ ଛେଲେରା ଦୌଡ଼୍‌ବୌପ କରେ ତୈରି ହଜିଲୋ, ଆମାର ନିଜେର ପ୍ରିୟ ଟେନଗାନଟା କାଁଧେ ଝୁଲିଯେ ମ୍ୟାଗଜିନ, ଅଭିରିତ ରାଉଡ଼, ଫେନେଡ ଗୋଛାତେ ଗୋଛାତେ ନିଜେକେ ଦ୍ରୁତ ତୈରି କରେ ନେୟାର ସମୟ ନଜର ଗୋଲୋ ଦୁଲୁ ଆର ପୋଲଜାରେର ଦିକେ । ଭୟେ ମୁଖ ଫ୍ୟାକାଶେ ହେୟ ଯାଓ୍ଯା ପୋଲଜାର ସାହେବ ଦୁଲୁର ହାତ ଧରେ ଟାନଛେ । ତାକେ ନିଯେ ଯାବେନ

বলে। দুলু মিয়ার হতচকিত অবস্থা, যাবে, না থাকবে—এরকম একটা দোটানার মধ্যে রয়েছে। ব্যাপারটা পিন্টুর নজরে আসে। ভাবি শরীর নিয়ে ধপাধপ্প পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে দুলুর সামনে গিয়ে হাজির হয় হাতে একটা রাইফেল নিয়ে। তারপর রাইফেলটা ছাঁড়ে দেয় তার দিকে। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে দুলু উড়ে আসা রাইফেলটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে। পিন্টুর চেহারা এখন পরিবর্তিত। কিছুক্ষণ আগেও সে ছিলো একজন অতিথিপরায়ণ নিতান্ত অমায়িক আর সুবী গৃহস্থ মানুষের মতো। এখন পিন্টু একজন যোদ্ধা। একজন দায়িত্বশীল কমান্ডার। একজন দৃঢ় ভাবলেশশূন্য রুক্ষ সৈনিক। দুলুর হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিয়েই তাকে বললো, ফলো মি। গোলজার সাহেব স্থাবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দুলুর হাতে রাইফেল উঠলো। তাঙ্কশিকভাবে সে আমাদের সহযোগী হয়ে উঠলো এবং পিন্টুর দলের সাথে এগিয়ে গেলো শক্ত মোকাবিলার উদ্দেশ্যে।

প্রথম আঘাত করলো একরামুল। বেলা এগারোটার মতো সময় তখন। একরামুলের নজরে আসা মাত্রাই সে ফায়ার ওপেন করে দিয়েছে। তার দলের সকলের হাতিয়ার গর্জে উঠেছে একসাথে। শক্ত ওপর তুমুল এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলো শক্ত জবাব, পাল্টা গুলিবর্ষণ অবোর ধারায়।

অবশ্যে দেখলাম ওদের। পাক আর্মি! প্রায় চার শ' গজ দূরত্বে, রাস্তার দু' ধার দিয়ে সবুজাভ হেলমেট মাথায়, ঝাঁক বাধা বুনো পাঞ্জাবীর মতো এগিয়ে আসছে ওরা। প্রথমে ছায়া ছায়াভাবে, পরে স্পষ্ট দেখা দেলো তাদের। আর দেখা মাত্রাই শিরদাঁড়া বেয়ে শিরশিরিয়ে একটা শীতল প্রয়োজনে যাওয়ার অনুভূতি। না, ঠেকাতে হবে ওদের। বায়ে পাশ ঘুঁঠে শোয়া আক্রমণ।

দেখেছিস? ফিসফিসিয়ে জিগোম করে তাকে। মাথা কাত করে আক্ষাস। ডানে ৩/৪ গজ দূরে এল.এম.জি স্মার্ট মোতালেবও শোয়া অবস্থায়। সেও দেখেছে। মোতালেব মিয়া দু' পাওয়ালা এল.এম.জিটা সেট করে তার টার্গেট ঠিক করা নিয়ে একাগ্রচিত্বে ব্যস্ত। গুলি ছেঁড়া হলো প্রথমে রাইফেল থেকে। সবগুলো প্রায় একই সাথে। এরপর ক' মুহূর্তের বিরতি। বিরতির পরই শুরু হয় মোতালেবের এল.এম.জির ত্রাস। আবার বিরতি। সবগুলো হাতিয়ার এরপর একসাথে আবিরাম গুলি চালাবে। অগ্রবর্তী দলের সকল সদস্যের প্রতি নির্দেশ ছিলো এই ধরনের। যদি খালের মধ্যে নেমে ওরা পড়ে তাহলে প্রয়োজনে সকলে ছেনেড চার্জ করবে। আমাদের ফায়ার ওপেন হলে পিন্টুকে বুঝে নিতে হবে, শক্ত আমাদের সামনে দু' তিন শ' গজের মধ্যে। সে অনুসারেই সে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে শক্ত দিকে ২' মাটারের শেল পাঠাতে থাকবে। প্রয়োজন মতো আগে-পিছে জায়গা বদল করে।

যুক্ত যুক্তই। এর আলাদ কোনো সংজ্ঞা নেই। যুদ্ধের মাঠে শক্ত সামনাসামনি মাথা ঠাণ্ডা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা কষ্টকর। নাৰ্টের ওপর যে চাপ আসে সেটা যোদ্ধাদের চমৎকার সব পূর্ব পরিকল্পনা অনেক সময় এলোমেলো করে দেয়। ভেসে যায় সব হিসেব-নিকেশ করা কর্মধারা। বিশৃঙ্খল হয়ে যায় অনেক কিছু। এর মধ্যে কমান্ডারকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হয়, যুক্ত চালিয়ে যেতে হয় তাঙ্কশিকভাবে সব গুছিয়ে নিয়ে। যুক্ত জয়ের চেষ্টা করতে হয়। এভাবেই যুক্ত চলে এসেছে যুগে যুগে।

আমাদেরও হিসেব মতো কাজ হলো না। মোতালেব ইশ্বারা পাওয়ার আগেই তার এল.এম.জির ট্রিগার চেপে ধরলো। ছুটে গেলো একরাশ গুলির ত্রাশ ঠা-ঠা-ঠা শব্দে। সেই সাথে শুরু হয়ে গেলো অন্য সব হাতিয়ার থেকেও গুলিবর্ষণের কাজ। শক্রও সাথে সাথে পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে দিলো। মাথা তুলবার উপায় নেই। শক্রের গুলির ধারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে ওপর দিয়ে মৌমাছির গুঞ্জন তোলে। হাইড আউটের নিরাপত্তার জন্য ডিফেন্সিভ পজিশনে থাকা চৌধুরীও গুলিবর্ষণ শুরু করেছে। তার মানে শক্রের ওপর আমাদের ত্রিমুখী আক্রমণ শুরু হয়েছে। শক্রও মরিয়া হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক ধার্কা সামলে নিয়ে ওরা এগিয়ে আসছে ‘ফায়ার এন্ড মৃত্যু’ ভঙ্গিতে। এ সময় পিন্টুর সাপোর্ট দরকার। ওর মর্টার এখনও কাজ শুরু করেছে না কেনো?

এলো পিন্টুর মর্টার অবশেষে। সশব্দে ফাটতে লাগলো আমাদের ১০০/২০০ গজ সামনে। সেই সাথে তার দলের ছেলেদের যারা আমাদের পেছনে ডানদিকের অবস্থানে ছিলো এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ চলতে থাকলো। এখন আমাদের চারটা দলই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পিন্টু তার মর্টার পাঠাচ্ছে। শক্র অবস্থানের ওপর গিয়ে পড়ছে সেগুলো। প্রচণ্ড শব্দে বিক্ষেপিত ও হচ্ছে মাটি কঁপিয়ে। ছিটকে উঠেছে কাদা মাটি, সেই সাথে ধোয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে বাতাসে। স্বত্ববরত গুলিবর্ষণ। বাতাসে পোড়া বারুদের গন্ধ। গুলি আসছে, গুলি যাচ্ছে। ক্রমতিহীন, বিরতিহীন। চারদিকে গোলাগুলি, শেল ফাটার শব্দ। চিৎকার, হাঁকড়াকড়া। একটা বাস্তব রণক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি। এই চির প্রাণিত্বময় গ্রামীণ পরিবেশে। শক্রপক্ষের অগ্রযাত্রা খেমেছে, কিন্তু তারা যুদ্ধ থামায় না। সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। গড়িয়ে যাচ্ছে সময় আর ফুরিয়ে আসছে আবহানের গোলাগুলিও।

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে পিন্টু পিছু হটতে শুরু করলো। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই পিছু হটে গেলো তারা আর সেই সাথে এক সময় থেমে গেলো তাদের গোলাগুলি। হঠাতে যেমন করে শুরু হয়েছিলো, তেমনি হঠাতে করেই যেনে থেমে গেলো সবকিছু। বন্ধ হয়ে গেলো দুপক্ষেরই গোলাগুলি। শান্ত হয়ে গেলো সবকিছু। আমরা শক্রকে প্রতিহত করতে পেরেছি। এটাই ছিলো আজকের আমাদের যুদ্ধের মূল লক্ষ্য। আমরা আমাদের ইন্সিডেন্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছি।

পিন্টুকে পাওয়া গেলো একটু পেছনেই। সে এক পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির সামনে ঝড়ের গাদায় কাত হয়ে শুয়ে ছিলো। সোলাসে দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো সে উষ্ণ আলিঙ্গনে, মাহবুব ভাই, শালে লোগ ভাগ গিয়া। অন্তত আজ ওর ১০ জনের লাশ নিয়ে গেছে।

— চল, লাশগুলো নিয়ে আসি।

— ধ্যাঁ, বসেন তো! চাল ভাজার অর্ডার দিয়েছে দুরু মিয়া। বসে বসে থাই।

প্রত্যেকটা সফল লড়াইয়ের পর পিন্টু সব সময়ই এভাবেই লাশের হিসেব করে। যদিও সঠিক তথ্যের সাথে এর খুব একটা মিল থাকে না। অবশ্য পিন্টুর তুলনা পিন্টু নিজেই।

এখন যুদ্ধ শেষ। পেটের ক্ষুধা জানান দিয়ে যাচ্ছে সারা শরীরে। আর এর ভেতরেই

স্টেনগানটা হয়ে ওঠে পিন্টুর স্প্যানিশ গিটার। উদাস কষ্টে সে গেয়ে ওঠে, ‘ব্যর্থ রাতের আবর্জনা কৃড়িয়ে ফেলে, আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো’। দুরুও ওর সাথে পলা মেলায়। আমি বসে পড়ি ওদের পাশে। ক্লাস্ট-শ্রাস্ট ছেলেরাও বসে পড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। পিন্টুর গান ভেসে বেড়ায় বাতাসে। চাল ভাজা আসে। সাথে লবণ আর কাঁচা মরিচ। চমৎকার মধ্যাহ্ন ভোজ। এখন এ মুহূর্তে বড়ো ভালো লাগে সকলকে, সবকিছুকে।

রাতে খবর এলো, পাকবাহিনী ফিরে যাওয়ার পথে বদলুপাড়ায় ব্যাপক অত্যাচার আর লুটত্রাজ চালিয়েছে। ধর্ষণ করেছে ৭ জন মহিলাকে। তারা বিসমনি থেকেও ৩ জন মহিলাকে তুলে নিয়ে গেছে। বদলুপাড়া গ্রামে ছিলো আমাদের প্রথম হাইড আউট। বাংলাদেশে প্রবেশের পর বদলুপাড়া গ্রামের মানুষজন আমাদের অশ্রয় দিয়েছিলো, নিরাপত্তা দিয়েছিলো, দিয়েছিলো আতিথেয়তা। আমাদের একজন অসুস্থ ছেলেকে অশ্রয় আর চিকিৎসা সেবাও দিয়েছিলো। বিষয়টি অবশ্যই পাকবাহিনীর অজ্ঞান থাকে নি। আমাদের সঙ্গে আজকের যুক্তে পাল্টা মার খেয়ে ফিরতি পথে তারা বদলুপাড়া তাই আক্রমণ করেছে প্রচণ্ড আক্রমণ আর প্রতিশেধ স্পৃহার প্রবলতা নিয়ে। হঠাৎ করেই সেদিন গভীর রাতে নিবু নিবু কেরোসিনের কুপি বাতির আলোতে দেখা সেই কম বয়সী নরম কোমল আর শ্যামল মুখশ্রীর রমণীর মুখখানা ভেসে ওঠে। সজিম উদিনের বউ। বদলুপাড়ায় যে অত্যাচার চালানো হয়েছে মা-বোনাচ্চে ওপরে, তার মধ্যে সজিম উদিনের স্ত্রী কি আছে? বুকের ভেতরটা ছ্যাত করে ওঠে। সজিম উদিনও খবরটা পাওয়া মাত্র অসম্ভব বিষয় হয়ে পড়ে। তাই প্রিমেরকে সাথে দিয়ে দুটো মেনেডসহ ওকে বদলুপাড়ায় তার বাড়ির দিকে পাট্টিয়ে দিই। মনটা তবু ভার হয়ে থাকে। আর সেটা এই রকম মনোভাব থেকে যে বদলুপাড়া গ্রামে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় না দিলে, পাকবাহিনী নিষ্চয়ই তাদের ওপর রৈকম আঘাত করতো না। অনুমান করতে কঠ হয় না, আজকের পাকসেনিকদের প্রশংসিক আঘাত আর অত্যাচারে গ্রামটা কী রকমভাবে তচ্ছন্দ হয়ে গেছে। কী রকম জনশূন্য আর বিরাম হয়ে গেছে। মেয়েদের সম্মান কীভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে! বড়ো অপরাধী মনে হয় নিজেকে। আমাদের সবাইকে।

৩.৮.৭১

শহিদ আক্তাস

আক্তাস মারা গেলো। তার বুকে গুলি লেগেছিলো। এফোড়-এফোড় হয়ে বের হয়ে গিয়েছিলো মেশিনগানের গুলি। তাকে বাঁচানোর চেষ্টায় দ্রুত বেরুবাড়ি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিলো, কিন্তু পথেই সে মারা যায়। আমাদের চাউলহাটি ইউনিট বেসের দ্বিতীয় শহিদ সেকশন কমান্ডার আক্তাস।

দিনের বেলা পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি যুক্তের পর রাতটা পার হয়ে গেলো টহল দিয়ে। সবাইকে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত আর সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। কেবল ডিফেন্স শক্ত করার জন্য যতোন্দূর সঙ্গে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আজ ওরা এসেই ফিরে গেছে কিন্তু কাল তো তারা আবার আসতে পারে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে।

নিজেদের গোলাগুলি কমে গেছে, যা আছে তার হিসেব-নিকেশ করে দলকে

পুনর্বিন্যাস করে আগামীকালের প্রস্তুতি নিতে নিতে রাতটা কেটে গেলো। একববর-সজিম উদ্দিনরা ফেরে নি। বদলুপাড়ার পরিস্থিতি এখনো পুরোপুরি জানা যায় নি। এদিকে রাতের বেলায় পাকবাহিনীর মুভমেন্টের খবরও পাওয়া গেলো না। তাদের আগমনে এলাকার লোকজন প্রচণ্ড ভীত হয়ে পড়েছে। জনশূন্য হয়ে পড়েছে আশপাশের গ্রামগুলো। সমস্ত এলাকাটা যেনে পরিণত হয়েছে মৃতপুরীতে।

পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হলো অক্ষাৎ সকাল ৯টার পর। আজ অনেকটা চুপিসারেই এসেছে ওরা। ওদের আগমনের কথা টের পেয়েই আগে থেকে ঠিক করা পরিকল্পনা মতো হাইড আউটের কিছুটা সম্পূর্বর্তী এলাকা খুরমে আঞ্চলিক অবস্থান গ্রহণ করেছে আমাদের সেকশন। আজও ওদের আটকাতে হবে। মধুপাড়া গ্রামে চুক্তে দেয়া হবে না ওদের কোনো অবস্থাতেই।

হঠাৎই শুরু হয় আক্রমণটা। সমানে গুলিবর্ষণ করে এগিয়ে আসতে থাকে ওরা। ওদের আজকের শক্তি পতকালকের তুলনায় অনেক বেশি। বিভিন্ন গাছগাছালি আর ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে নেয়া আমাদের অবস্থানের ওপর শক্ত তাদের সুবিধাজনক অবস্থান থেকে অবিরাম গোলাগুলি পাঠাচ্ছে। উদ্দেশ্য, প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে আমাদের ডিফেন্স গুড়িয়ে দিয়ে মধুপাড়া হাইড আউট দখল করা। আমাদের অবস্থানগুলো থেকেও তাদের সঙ্গে যথাসম্ভব পাল্লা দিয়ে সমান বাধার প্রাচীর প্রস্তুতোলা হয়েছে। জান থাকতে তাদের এগুতে দেয়া হবে না, সবাইর প্রতি এই প্রস্তুতি দেয়া হয়েছে। ছেলেরা মাটি কামড়ে পড়ে থেকে শক্ত মোকাবিলা করে চলেছে। নিচে স্যাতসেতে ভেজা মাটি। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে। ভরা বর্ষাকাল প্রস্তুতি গাছের বরাপাতা, ঝোপজঙ্গল, ঝরা ডালপাতা, পানি জমে থাকা গর্ত-ডোক প্রতিক ভেসে আসা দুর্দক্ষময় বাতাস, সশব্দ মশার ঝাঁক। নানা ধরনের জঙ্গলে পেকে পেকড়ের অবাধ বিচরণ। এর ভেতরে শুয়ে থেকে অবিরাম শক্তির জবাব দিয়ে আছে আমরা একটা ক্লান্ত বিষণ্ণ সকালকেলায়।

আক্সাস গুলি খেলো। আক্সাসের সেকশনের সাথে আমার নিজের অবস্থান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই আমার পাশে শোয়া অবস্থানে থেকে শক্ত মোকাবিলা করছিলো সে। সৃষ্টাম শরীরের অধিকারী, ঠাণ্ডা মেজাজের মিতভাষী ছেলে, সেকশন কমান্ডার আক্সাস। রংপুর জেলার হাতিবাঙ্গা কালিগঞ্জ এলাকায় তার বাড়ি। ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় প্রাণের টানে চলে এসেছে সরাসরি যুদ্ধের মহাদানে। যুদ্ধের মাসখানেক আগে তার বিয়ে হয়েছে। নতুন বটকে রেখে তাকে যুদ্ধে আসতে হয়েছে। তাই সব সময় কেমন একটা বিষণ্ণতা যিরে থাকতো তাকে। এমনিতে সে অপারেশনে যেতে চাইতো না, বাড়িতে পিছুটান থাকায় সে বড়ো ধরনের ঝুকিও নিতে চাইতো না। কিন্তু আজকে আক্সাস সাহসের সাথে লড়তে এলিয়ে এসেছে। তার ৮/১০ হাত সামনে নাদের স্টেনগান নিয়ে। আক্সাস দাঁড়িয়ে তার স্টেনগানের ম্যাগজিন ভরছে। ঠিক এসময় হঠাৎ করে বাঁ হাতে বুক চেপে ধরে ও হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারপরই একটা আঞ্চিকার করে ওঠে সে, আমার গুলি লেগেছে মাহবুব ভাই, বাঁচাম!

দ্রুত ত্রলিং করে ওর কাছে গোলাম। আমার কোলে ওর মাথা। গলগল করে রক্ত বেকছে বুক দিয়ে। উষ্ণ তাজা রক্তে হাত আর শরীর-কাপড় মাথামাথি। খুব কষ্ট

পাছে আকাস। মুখ হাঁ করে বড়ো বড়ো নিষ্ঠাস নিছে। ফুসফুসে বাতাস নেয়ার জন্য হাঁসফাস করছে। শরীর দুমড়ে-মুচড়ে আসছে ওর। মিনহাজ দ্রুত এগিয়ে এসে ওর গামছাটা ছিড়ে ফেলে। ইতিমধ্যে খুলে ফেলা হয়েছে আকাসের গায়ের জামা। বুকের ডানদিকে বুলেটের গর্ত এফোড়-ওফোড় হয়ে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেছে। শঙ্কুর পকেটে কিছু তুলো পাওয়া গেলো। সেগুলো ভাঁজ করে ওর বুক ও পিঠে ফুটো হয়ে যাওয়া আঘাতের গর্তে তা বসিয়ে দিয়ে মিনহাজ দ্রুত আর যত্নসহকারে বাধতে লাগলো ব্যাডেজ। খুবই কষ্ট হচ্ছে আকাসের। টেনে টেনে কোনোমতে বলতে পারলো, মাহবুব ভাই, আমি বাঁচবো না, আপনারা যুদ্ধ করেন, দেশ স্বাধীন করেন, জয়বাংলা করেন...। কথাগুলো বলতে বলতেই নেতিয়ে আসে আকাস। তাকে ঘিরে জড়ো হওয়া ছেলেরা সবাই কাঁদছে। ধীরে ধীরে নিষ্ঠেজ হয়ে আসছে সেকশন কমান্ডার আকাস আলীর জীবনীশক্তি। কিন্তু এখন তো আহাজারি করবার সময় নয়। সামনে প্রচণ্ড শক্তিশালী শক্তি। সামান্য ফাঁক পেলেই তারা ঢুকে পড়বে আমাদের প্রতিরোধ উভিয়ে দিয়ে। তাই আমি প্রায় নির্দেশের সুরেই বলি, মিনহাজ, ওকে বাঁচাতে হবে। তুই আর শঙ্কু ওকে নিয়ে হাইড আউটে যা। সেখান থেকে লোক যোগাড় করে দ্রুত যাবি বেরবাড়ি হাসপাতালে। কুইক অ্যাড!

আকাসকে ধরাধরি করে নিয়ে ওরা পেছন দিকে চাঁকায়। শক্তকে নিয়ে আমরা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তবু এরি ফাঁকে ফাঁকে শঙ্কুর গভীরে লুকিয়ে রাখা একটা চাপা কান্না উখলে উঠতে থাকে আর একটী সৈক্ষাসনিভর আশা জুলজুল করতে থাকে। মনে মনে বলতে থাকি, আকাস সেনো বেঁচে যায়। আকাস যেনো বেঁচে থাকে। যুদ্ধ বাধবার ১ মাস আগে দেখে করা নতুন বউ বাড়িতে রেখে ও যুদ্ধে এসেছে, ওর বেঁচে থাকাটা এক স্বতন্ত্র দরকার।

মাহবুব ভাই, আপনি ভালো আছেন? হঠাৎ উদ্ব্লাসের মতো দুলু পেছন থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় ওপর। শক্তির দিকে তাক করা হাতিয়ার হাতে ওকে দেখতে পেলাম খুবই উত্তেজিত আর উৎকৃষ্ট অবস্থা তার। আমার হাত আর পরনের শার্ট লুঙ্গিতে রক্তে একাকার। ভীত আর উদ্বিগ্ন চাউলিতে সবকিছু দেখছে দুলু। আমরা খবর পেয়েছি, আপনার গুলি লেগেছে। সে জনাই দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছি। আপনি ভালো আছেন তো, মাহবুব ভাই! হাঁপাতে হাঁপাতে দুলু তার কথা বলে যায়। আমি মাথা নাড়ি। মুখে কিছু বলি না। মালেকের হাতে ধরা আকাসের ক্ষেপণাণ্টা আমি নিজের হাতে নিলাম। আমার রাইফেলটা দিলাম দুলুকে। আকাস চলে গেলো। তার শূন্য হানটি কোথা থেকে এসে পূরণ করে দিলো মাহবুবার রহমান দুলু।

‘ওকে বাঁচানো গেলো না মাহবুব ভাই, বাঁচানো গেলো না... , ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদছে বেরবাড়ি ফেরত শঙ্কু আর করিম। যুদ্ধ বিধ্বন্ত ছেলেরা হাইড আউটে ফিরে এসেছে। দুপুরের পর পাকবাহিনী ফিরে গেছে। শক্তির আরো একটা আক্রমণ সফলভাবে প্রতিহত করা হলো। কিন্তু বিনিশয়ে হারিয়ে গেলো আমাদের সকলের আকাস।’

বেরুবাড়িতে বিষপ্প সন্ধ্যা

ভারতীয় সেনাবাহিনীর দু'জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এসেছেন। সীমান্তের ওপারে তারা অপেক্ষা করছেন, আমাদের সাথে কথা বলবেন বলে। যুদ্ধের খবর এবং আকাসের মৃত্যু সম্পর্কে বিজ্ঞারিত জানতে চান তারা। বেরুবাড়ি বিশপ্পির হাবিলদার তাদের গাইড করে নিয়ে এসেছেন সীমান্তের ওপারে মধুপাড়া হাইড আউটের কাছাকাছি। হাবিলদার নিজেই খবরটা নিয়ে এসেছেন সীমান্ত পার হয়ে হাইড আউট পর্যন্ত। যুদ্ধ তখন থেমে গেছে। ছেলেরা পজিশনে রয়েছে যে যার জায়গা মতো। হাবিলদার জানালেন, একজন লে. কর্নেল, অন্যজন মেজর। তারা কথা বলবেন, সামান্য ক্ষণের জন্য হলেও আপনাদের যেতে অনুরোধ করেছেন।

এ অবস্থায় ছেলেদের রেখে যেতে মন চাইছিলো না। আকাসের মৃত্যুর ব্যাপারে জবাব চাইতে এসেছে নাকি! মনের কোণে এরকম একটা সংজ্ঞাবনার উকিবুকি। তাই পিন্টুকে বলি, চলো, দেখা যাক কি বলে ওরা।

হাইড ওপরে লুঙ্গি তোলা আর শরীর রক্তে ও কাদামাটিতে মাখায়াখি। বিশ্বস্ত চেহারা। কাঁধে স্টেনগান। আর এই অবস্থায় আমাদের দেখে আঁতকে ওঠেন তারা, এ কী অবস্থা আপনাদের? ওয়ার ফ্রন্ট থেকে উঠে এলেন আমাদের সংক্ষিপ্ত জবাব। জি। দু'জনই বাঙালি অফিসার। কর্নেল সাহেব বলে উল্লেখ, না-না এটা উচিত হয় নি, আপনারা যুদ্ধ করছেন, ওয়ার ফ্রন্ট থেকে উঠে আসা ঠিক না। সঙ্গে সঙ্গে ক্লান্ত স্বরে জবাব দিই, আপনারা ডাকলেন তাই এসেছিলো আমরা এতোটা বুঝি নি।

— ঠিক আছে আপনারা যান উইলিয়াম্সেট ক্যাজুয়েলটিজ তো ওয়ার হয় না। আমরা ব্যাপারটা বুঝতে এসেছিলাম আসলে কী হচ্ছে? ও হ্যাঁ আপনাদের গুলির আঘাত পাওয়া ছেলেটা মারা গেছে? বেরুবাড়িতে, জানেন তো?

— জি, মাথা নাড়ি কেনে একটা আচ্ছন্ন অবস্থায়। অফিসার দু'জন বলে ওঠেন, গো এ্যাহেড বয়েজ। হবে, জয়বাংলা হবে। রক কি কোনোদিন বৃথা যায়? আমরা তাহলে আসি। ওকে, গুড বাই, তোমাদের এ যুদ্ধের খবর আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবো।

হাইড আউটে ফিরে এসে বেরুবাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। আমাদের জন্য ওরা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছে। মৃত আকাসের কাছে যেতে মন টানে না, একটা বিষপ্প অনুভূতি মনের ওপর চেপে বসে আছে, তবুও এক সময় রওনা দিতে হয় আকাসের জন্য। বিকেল তখন গড়িয়ে গেছে।

মিনহাজ, শষু, করিম আর মমতাজ এই চারজন দ্রুত একটা বাঁশের মই যোগাড় করে সেটা ট্রেচারের মতো বানিয়ে আকাসকে তার ওপর শুইয়ে একরকম দৌড়ে গিয়েছিলো বেরুবাড়ি পর্যন্ত। কিন্তু হাসপাতাল পর্যন্ত ওকে নিয়ে যেতে পারে নি। ওদের কাঁধের ওপর ছটফট করতে করতেই একসময় ও নিখর হয়ে যায়। কাঁধ থেকে তবুও ওকে নামায় নি। উর্ধ্বাসে ছুটতে ছুটতে তারা ক্লান্তি আর শ্রান্তির প্রায় চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিলো। তবু ঘাম দরদর শরীরে বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরের পাশে গড়ে তোলা হাসপাতালের সামনে গিয়ে আকাস যার ওপর শুয়ে আছে, ওরা

যখন সেই মহায়ের ট্রেচারটা নামায়, তখন আর ডাক্তার ডাকবাব প্রয়োজন হয় নি। খবর পেয়ে শরণার্থী শিবিরের লোকজন ছুটে আসে। মৃত্যুর্ধানেকের ভেতরেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত বেরবাড়ি এলাকায়। লোকজন দৌড়ে আসতে থাকে একজন মৃত মুক্তিযোদ্ধাকে দেখবার জন্য।

বেরবাড়ি পৌছুতে পৌছুতে বিকেল প্রায় ৫টা বেজে যায়। পৌছে দেখি রাস্তার ধারে একটা গাছের নিচে অত্যন্ত অবহেলা ভরে আকাসকে ফেলে রাখা হয়েছে। রক্তাক শরীর। তার মুখ থেকে বুক পর্যন্ত জ্যায়গা কোমরে পেঁচানে গামছাটা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। মৃত মানুষের গুরু পেয়ে কিছু মাছি এসে জুটেছে। সেগুলো তার শরীরের ওপর দিয়ে ওড়াউড়ি করছে। করছে হাঁটাহাঁটি। দেশের স্বাধীনতার জন্য সদ্য প্রাণ বিসর্জনকারী একজন শহিদের খুলোর মধ্যে পড়ে থাকার এই অবমাননাকর দৃশ্য দেখে হঠাতে করে যেনো মাথায় আগুন জুলে ওঠে। তাই চারদিকে ভিড় জমানো শরণার্থী লোকজনদের লক্ষ্য করে চিন্তকার করে উঠি, কী দেখছেন, তামাশা? শরণার্থী হয়ে এসে সবাই তো শুশ্রবারড়িতে এসে উঠেছেন। রেশন পাছেন, থাচেন, আরামে আছেন, নিশ্চিতে আছেন, আর দেশের জন্য যারা যুদ্ধ করে প্রাণ দিচ্ছে, তাদের জন্য নেই সামান্য মরতা! লাশটাকে একটু যত্ন করে ভালো জ্যায়গায় রাখতে পারেন নি? জয়বাংলা চান, না? জয়বাংলা এমনি হবে? মাথাটা মুসলিময়ে গিয়েছিলো যেনো। আমার এলোপাতাড়ি চিংকারে জড়ে হয়ে থাক মুসলিমগুলো তায় পেয়ে সরে যায়। পিন্টুকে বলি, ধরো। পিন্টু এগিয়ে আসে, শৈশবমনহাজও হাত লাগায়। আকাসের মৃতদেহ বয়ে এনে রাস্তার নিচে সবুজ ঘনজঙ্গলের ওপর শুইয়ে দিই। ঠিক এসময় একজন মধ্য বয়সী ভদ্রলোক এগিয়ে আছেন। অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, আমি দিনাজপুরের ডিসি অফিসে ছান্কার করতাম। আমরা মুসলমান ক্যাপ্সে থাকি। আপনারা যদি অনুমতি দেন তবে ওনাকে আমরা ধর্মীয়ভাবে সমাহিত করার দায়িত্বটা নিতে চাই। মুসলিমান ক্যাপ্সের সবাই আমরা নিজেরা এ কাজ করবো, আপনাদের কষ্ট করতে হবে না। এ সুযোগটুকু আমাদের অনুযায়ী করে দিন।

ভদ্রলোকের কথার বিনীত ভঙ্গিটা ভালো লাগে। পিন্টুর দিকে তাকাই। ওর চোখে সম্পত্তি।

আকাসের মৃতদেহ ওরা বহন করে নিয়ে আসেন বেরবাড়ি ক্যাপ্সের মুসলমান অংশে, মাঝখানের সাকাতি যাওয়ার রাস্তার খালটা পার হয়ে। তারপর দিনাজপুর ডিসি অফিসের সেই ভদ্রলোকের নেতৃত্বে অন্যরা আকাসের মরদেহ গোসল করালেন। কাফনের কাপড় ইত্যাদি যোগাড় করাসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করালেন। একদল মানুষ গিয়ে বেরবাড়ি-হারিডাস অর্থাৎ ‘জয়বাংল’ সড়কের পার্শ্ববর্তী মাটের মধ্যে কবর খুঁড়তে থাকেন। আর আমরা বসে থাকি ঘাসের ওপর। মনের অবস্থা ভায়ায় প্রকাশ করবার নয়। বিকেল ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। হিমালয়ের বিরাট কালো শরীরের ওপর বরফের শাদা টুপি পরানো। চকচকে সেই উজ্জ্বলতার দিকে তাকিয়ে বসে থাকি আমরা।

সঞ্চার আগেতাগে মেজের দরজি এসে পৌছান। সাথে বড় ভাই নুরুল হক,

মতিয়ার ও জব্বারসহ আরো ক'জন। দরজি গাড়ি থেকে নেমে সোজা হেঁটে আসেন আমাদের দিকে। আমরা উঠে দাঢ়ি ই। একদম কাছে এসে কাঁধে হাত দেন তিনি, কেয়া হয়া মাহবুব? ক্যায়সে হয়া?

তার গলায় গভীর দুঃখ আর উদ্বিগ্নতার সূর। মেজের দরজি আমাদের আপন মানুষ, আমাদের কমান্ডিং অফিসার, তার ভেজা গলার সমবেদন বুকের গভীরে এতোক্ষণ ধরে আটকে থাকা অদমিত কান্নার বাঁধটা ভেঙে যায়।

— স্যার আক্স মর গ্যায়া। ওকে বাঁচানো গেলো না, বলতে বলতে কান্নায় গলা ভারি হয়ে আসে, ফুপিয়ে উঠি কান্নায়। অন্যরাও কেঁদে ফেলে। এ পরিস্থিতিতে নিজেকে সামলাতে মেজের কিছুটা সময় নেন। তারপর বলেন, মাত রোও বয়েজ, দেখো সব ঠিক হো যায়গা।

বড় ভাই নুরুল হক দৌড়োপ শুরু করে দেন। সক্যার আগেই মরদেহ তৈরি হয়ে যায়। কাফনে আচ্ছাদিত করা হয় আকাসের মৃতদেহ। ততক্ষণে কবর খোঁড়া হয়ে গেছে। মেজের দেখতে চান আকাসকে। নিয়ে যাই তাকে বাঁশের মাচায় শোয়া আকাসের কাছে। মুখের কাপড় সরিয়ে দেন ডিসি অফিসের সেই ভদ্রলোক। দরজি সেদিকে, মৃত আকাসের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। বিড়বিড় করে কী যেনো বলেন। তারপর তার মুখ ঢেকে দেয়া হয়। কাঁধের মাচা চারদিক ধরে কাঁধে তোলা হয়। মেজের দরজি এগিয়ে এসে আমার জনপাশের বাঁশের মাচায় কাঁধ স্পর্শ করে আকাসের মরদেহ বহনে অংশহৃষণ করেন।

সক্যার ফিকে অঙ্ককারে আকাসকে সমাহিত করার কাজ শেষ হয়। মোনাজাতের সময় সবার সঙ্গে দরজিও হাত জোড়েন। তারপর সব শেষ হয়ে যায়। ডিসি অফিসের ভদ্রলোকসহ আমরা ঘৃনেন্টপর বসে থাকি কিছুক্ষণ। দরজি বলেন, নুরুল হক, মাহবুব, তোমাদের ধূম মৃত মানুষের জন্য বেশকিছু ফর্মালিটিজ আছে, আমি অবশ্য ডিটেল্স জানি না। তোমরা সেগুলো পালনের ব্যবস্থা করবে। পকেট থেকে তিনি কিছু টাকা বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, এগুলো আমার তরফ থেকে দিলাম, তোমরা খরচ করো। পরে আরো টাকা পাঠাবো। তার মৃত আত্মার শাস্তির জন্য সবরকমের ধর্মীয় আচার পালন করতে তোমরা ভুল করবে না।

এই রকম অবস্থার ভেতরেই আমরা তাকে যুক্তের সর্বশেষ অবস্থা জানাই। শুনে তিনি বলেন, পাকবাহিনীকে হাড়িভাসায় ক্যাম্প করতে দেয়া হবে না। তোমরা তা হতে দেবে না। দু'দিন ধরে যুদ্ধ করছো তোমরা, সামনে হয়তো আরো করতে হবে। গিত দেম স্ট্রং গ্রো। আজ তোমাদের একজন সাথি মারা গেছে, আরো হয়তো মারা যাবে। তোক্ট রিট্রিট বয়েজ, ধীর শান্ত গলায় বলেন মেজের দরজি।

আমরা তখন তাঁকে জানাই আমাদের গোলাপুলি প্রায় শেষ। আরো কিছু ছেলে দরকার ইনফোসমেন্ট হিসেবে, সেই সাথে হতিয়ার আর পর্যাণ গোলাবারুদ, কিছু ফার্স্ট এইচের ওষুধপত্র, ব্যাডেজ ইত্যাদি। জরুরি ভিত্তিতে পাঠানো দরকার। জবাবে তিনি বলেন, ঠিক আছে কালকেই পাবে। ঘাবড়িও না, আমরা আছি তোমাদের সাথে। জয়বাংলা অবশ্যই হবে। নান ক্যান স্টপ ইট। তারপর নরম গলায় বলেন,

কাল বিকেলে এসো বেরুবাড়িতে, ও.কে?

— ইয়েস স্যার বলে তাকে স্যালুট করি। যাওয়ার সময় বড় ভাই জড়িয়ে ধরেন, ছেলেমানুরের মতো মাথায় হাত বুলিয়ে আমাদের আদর করেন। মাহবুব, আমি গর্বিত সবার জন্য। তার চোখে জল। অদমিত কান্নার বেগ সামলাতে তার কষ্ট হয়। সে অবস্থায় তিনি শুধু বলতে পারেন, মাহবুব তোমরা বেঁচে থেকো, মারা যেওনা। তাঁর এই আকুল আকৃতি হন্দয়ের মধ্যে গৌথে যায় এই বিষণ্ণ সক্ষয়। তারপর তারা চলে যান।

রাত নামে। ডিসি অফিসের ভদ্রলোকের সাথে তিনি দিনের মাথায় মিলাদ অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কথা শেষ করে তার হাতে প্রয়োজনীয় টাকা গুঁজে দিই খরচের জন্য। এরপর আমরা ৭ জনের দল হাঁটতে থাকি বেরুবাড়ি বাজার অভিমুখে। কৃধা এবং পিপাসায় ক্লান্ত সবাই। কিছু খাওয়া দরকার। ডিসি অফিসের ভদ্রলোক তার সাথিদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের পেছনে অক্ষকারে মাটির নিচে আঙ্কাসের নিখর প্রাণহীন দেহ শুয়ে থাকে।

কোথায় যেন গরমিল

হাইড আউটে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় ১১টা হয়ে বিষণ্ণ আতঙ্কিত ছেলেরা সজাগ রয়েছে। একরামুল পুরো দলকে জাগিয়ে রেখেছে শুক্রের সাজে। হাইড আউটের চারদিকে সশ্রম সেন্ট্রি বসানো হয়েছে। দুটো বিল্বেরিয়েছে পেটলে।

— ছেলেরা থেয়েছে?

— জি, একরামুলের বিষণ্ণ উত্তর

— ওদের খবর কি?

— শালারা হাড়িভাসায় গুলি করেছে, কাল আবার আসতে পারে।

— কাল আসলে ঠেকানো যাবে?

একটা টিমটিমে ল্যাস্পের অনুজ্ঞল আলো। চারদিকে গোল হয়ে বসা আমার সব সহযোগ্য কমান্ডার পিটু, একরামুল, চৌধুরী, মধুসূদন, শুভ, মিনহাজ, জয়নাল আর মোতালেব। শুধু আঙ্কাস নেই। গতকালও সে ছিলো, আজ নেই। ব্যাপারটা কেমন অবাস্তব মনে হয়। বিশ্বাস করতে চায় না মন। আঙ্কাসের মৃত্যুর ঘটনা সবার ওপরেই ফেলেছে দারুণ প্রভাব। ল্যাস্পের শিখা মৃদু বাতাসে নড়ছে। তার আলোতে এই এখন এখানে আলো-আঁধারির একটা খেলা চলছে যেনো। মনে হচ্ছে কালো গ্রানাইড পাথরের তৈরি এক একটা মৃত্তি। অন্তত তাদের মুখের ভঙ্গিটুকু। আবার নীরবতা ভাঙে।

— কাল যদি ওরা আসে, ঠেকানো যাবে?

— না, পিটুর সোজাসাপটা উত্তর।

— গোলাগুলি কমে গেছে, একরামুল বলে।

— আমাদের অবস্থান ওরা জেনে গেছে। আমরা এক্সপোজ হয়ে গেছি, এবার চৌধুরীর কথা। কেমন নিষ্পত্ত স্বর তার।

— ওকে দেন, এবার আমরা সিদ্ধান্তের কথা বলি। আমরা আজ রাতেই এ হাইড আউট ছেড়ে দেবো। পরবর্তী হাইড আউট হবে মধুপাড়া-ডাবুরডাসাৰ মাঝামাঝি জয়গা নুরু মিয়াৰ বাড়িতে। আধ ঘণ্টাৰ ভেতৱেই আমরা রওনা দেবো। সবকিছু গুটিয়ে নাও, কুইক!

রাতেৰ মধ্যেই হাইড আউট সৱে এলো নুরু মিয়াৰ বাড়িতে। নুরু মিয়া বৰ্তমানে ওপারে বেৰুবাড়ি শৱণাৰ্থী শিবিৰে বসবাস কৱছে সপৰিবাৰে। গ্ৰামটা ছেঁটে। কয়েক ঘৰ বসতি মাত্ৰ। অধিকাংশ মানুষই পালিয়ে গেছে। বৰ্ষাৰ মাতামাতিতে পৰিয়ন্ত ঘৰবাড়িগুলোৰ অবস্থা ও জৱাজীৰ্ণ হয়ে উঠেছে। চাৱদিকে ছেট ছেট বোপঝাড় আৱ বুনো ঘাসেৰ জঙ্গল। রাতেৰ বেলা জায়গাটা ভালোভাবে রেকি কৱে নেয়া হয়েছে। পিন্টু আৱ একৱামুল নিজেৰাই পেট্টেল পার্টি নিয়ে বেৱিয়েছে। বিপদ কোথায় ওঁৎ পেতে থাকে বলা যায় না।

নিজেৰ দেশ, নিজেদেৱ মাটি, মানুষজন সব আপন অথচ কোথায় যেনো একটা গৱামিল আছে। এই নিয়ে মধুপাড়া হাইড আউট দু'বাৰ আজন্ত হলো। তাৰ মানে পাকবাহিনীকে মধুপাড়া পৰ্যন্ত পথ দেখিয়ে নিচ্যই কেউ না কেউ নিয়ে আসছে। যারা পাকবাহিনীকে গাইড কৱছে, তাৰা অবশ্যই আমদন্তে চেনে-জানে এবং তাৰা ঠিকঠাক যোগাযোগ রাখছে পাকবাহিনীৰ সাথেও। কিন্তু স্বাধীন হোক, এটা সমন্ত বাঙালিৰ লালিত স্বপ্ন হলেও, একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। আৱ এ কাৱণেই সৰ্বাংশে বিশ্বাস কৱা যাচ্ছে না। আশ্রয়দাতা মানুষজনক এবং যারা আমাদেৱ দিনৱাত সাহায্য কৱছে, তাৰেকেও। এৱা আমাদেৱ সন্তুষ্টি যোৰ্কা। এদেৱ ওপৱ নিৰ্ভৰ কৱতে হয়, বিশ্বাস আৱ আস্তা রাখতে হচ্ছে। এৱা কেউ কেউ অত্যন্ত কাছেৰ এবং আপনজনেৰ মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলৈও হয়তো এদেৱ ভেতৱে থেকেই কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকেৰ কাজ কৱছে, কিন্তু সাথে যোগাযোগ রাখছে, তাৰে ভেকে আনছে। এৱা পাকিস্তানেৰ পক্ষেৰ ঢোক। বাংলাদেশ চায় না এৱা। কিন্তু কাৱা এৱা? বসিৰ মেঘাৱ, আনাজ চেয়াৱম্যান বা তাৰ ছেলে? কোম্পানি মুসি, সুৱাদিন, মজিব, মতিন বা দুলু? মন বিশ্বাস কৱতে চায় না। হয়তো এদেৱ মধ্যে কেউ কিংবা অন্য কেউ, যাদেৱ আমৱা চিনি না ভালোভাবে অথচ তাৰা নিবিড়ভাৱে লক্ষ্য কৱছে আমাদেৱ গতিবিধি। এৱা বিশ্বাসঘাতক, পাকিস্তানি অনুচৰ। এদেৱ চিহ্নিত কৱা প্ৰয়োজন এবং অবিলৱেই। তা না হলে চুপিসাৱে বিপদ এসে একেবাৱে সৰ্বনাশ কৱে দেবে। সবকিছু। নিয়ে যাবে আমাদেৱ ধৰ্মসেৱ কিনাৱায়।

নতুন হাইড আউটেৰ অবস্থানে নিকষ কালো অঙ্ককাৱ। তাৰ ভেতৱেই নিজেদেৱ তুতুড়ে সক্ৰিয়তা দিয়ে গোছগাছ কৱতে কৱতে রাত ভোৱ হয়ে এলো। একৱামুল ফিৰে এলো তাৰ পেট্টেল পার্টি নিয়ে। সে ঠাকুৱপাড়া হাট হয়ে পানিমাছ পাকবাহিনীৰ অবস্থানেৰ কাছাকাছি গিয়েছিলো। ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা পাকবাহিনীৰ দলটি পানিমাছে রায়ে গেছে, তবে পঞ্চগড় থেকে আগত সৈন্যেৰ দলটি ফিৰে গেছে। তাৰ মানে, পঞ্চগড় পাকবাহিনীৰ মূল ঘাঁটি থেকে বিশেষভাৱে আনা হয়েছিলো তাৰে। কিছুক্ষণেৰ ভেতৱে পিন্টু ফিৰে এলো বিধৰ্ণ অবস্থা আৱ ঝড়ো কাকেৱ রূপ নিয়ে।

হাড়ভাসা বাজার পর্যন্ত গিয়েছিলো সে। শক্র নেই সেখানে। ফিরে গেছে পঞ্চগড়ে। দুটো পেটেল পার্টির রিপোর্ট বিশ্বেষণ করলে এই দাঢ়ায় যে, আপাতত শক্র তরফ থেকে আঘাতের সম্ভাবনা থেকে আমরা মুক্ত। পরপর নতুন উদ্যম আর শক্র বলে বলীয়ান হয়ে ওরা আবার আসবে। আসুক। আমরা হাইড আউট বদলে ফেলেছি। নিয়মিত প্রক্রিয়াতেই হাইড আউটের বদল ঘটছে। এক হাইড আউট থেকে অন্য হাইড আউটে, এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। এরপর সহজে শক্র আমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে না; কিন্তু আমরা ওদের আগমন বার্তা আগেভাগে ঠিকই পেয়ে যাবো। আবার যদি ওরা আসে আমাদের জায়গা দখল নিতে, যুদ্ধ বাধবে আবার। হয়তো সে যুদ্ধ হবে আরো ভয়াবহ আরো প্রচণ্ড। হোক। আমরা ঠিক লড়ে যাবো। ধরে রাখবো আমাদের অবস্থান। আমরা সবাই রইলাম। হারিয়ে গেলো শুধু আক্রাস। যুদ্ধ চলছে সীমান্ত এলাকা জুড়ে। দেশের ভেতরে। গোটা দেশটাই এখন যুক্তে জড়িয়ে পড়েছে। গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে দেখা গেছে, একবার তা শুরু হলে সহজে শেষ হয় না। আমাদের যুদ্ধও হয়তো তেমনি অনেকদিন ধরে চলবে। আক্রাস গেলো, এর আগে গোলাম গড়স গেছে। যুদ্ধের এই প্রক্রিয়ায় হয়তো আরো অনেকেই চলে যাবে। আমার আজকের সহযোগিদারের সাথে হয়তো আমি নিজেও চলে যাবো একদিন। আসবে নতুন ছেলেরা। নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা। তারাও চালিয়ে যাবে এ যুদ্ধ বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া প্রয়োগ।

৫.৮.৭১

মেজরের শৰ্ষী মেজাজ

সারণি-৫

১. অবস্থানের সঠিক জায়গা। (Exact location of positions)
২. সঠিক শক্তি। (Exact strength)
৩. সঠিক অস্ত্রশস্ত্র, শক্তিবলের প্রকৃতি। (Exact weapons, Strength, types)
৪. ইউনিটের নাম। (Name of the units)
৫. তাদের লক্ষ্য এবং করণীয়গুলো। (Their aims and tasks)

সূত্র : ডায়েরী।

মেজর দরজি রিপোর্ট গ্রহণ ও তার ব্রিফিং শেষে শক্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য ওপরের কাজগুলো করতে বললেন। কথা হলো, আগামীবারের রিপোর্টখন্দের সময় শক্র সম্পর্কে তার চাহিত তথ্যাবলি তাঁকে সরবরাহ করতে হবে। শক্রের বিবরণে নতুন রণনীতি গ্রহণের জন্য এগুলো অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোলাবারুদ যা কমে এসেছিলো বলে আমরা জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহের অনুরোধ করেছিলাম গতকাল, দরজি যথেষ্ট পরিমাণে তা নিয়ে এসেছেন। সেই সাথে নিয়ে এসেছেন সংগ্রহের রেশন এবং অন্যান্য আনুবন্ধিক সরবরাহ। নতুন এক সেকশন

মুক্তিযোদ্ধার একটি দলকেও সাথে করে এনেছেন তিনি আমাদের দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য। পরপর দু'দিন মধুপাড়ার মুক্তি আমাদের গোলাগুলির মজুদ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিলো। হারিয়েছি আক্ষসের মতো একজন বলিষ্ঠ সেকশন কমান্ডারকে। মেজর দরজি তা পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন।

অবশ্য এর আগে তিনি ভীষণ চৌটপাট করেছেন আমাদের ওপর। মধুপাড়া হাইড আউট থেকে সক্ষ্যার পর ৬ জন ছেলে পালিয়ে গেছে। ওরা সব রংপুরের নাগেশ্বরী-ভূরসামারী এলাকা থেকে এসেছিলো। আক্ষসের মৃত্যুতে ওরা ভয় পেয়ে কাউকে না জানিয়ে পালিয়ে গেছে। সকালবেলা ব্যাপারটা ধরা পড়ে। ওদেরই সঙ্গের ছেলে করিম খবরটা প্রকাশ করে। ওরা তাকেও পালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলো, কিন্তু সে যায়নি। এখানে মৃত্যুর সংজ্ঞাবনার পাশাপাশি জীবনেরও সংজ্ঞাবনা রয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে গেলে, মৃত্যুর সংজ্ঞাবনা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। তবে ওরা পালিয়ে গেলে সেটা হতো এক ভীষণ বিপজ্জনক ব্যাপার।

মেজর দরজি ওদের পালানোর খবরটা পেয়ে অত্যন্ত ক্ষেপে যান। মুহূর্তে এই গুরুী মানুষটির মুখ-চোখের অভিব্যক্তি ভয়ানক রূপ ধারণ করে, রাগে গরগর করতে থাকেন তিনি। আর বলতে থাকেন, কিউ ভাগা, ক্যায়সে ভাগা? কিউ ভাগা? তোম কেয়া কিয়া? কমান্ডার বনা হ্যায়, মাগার কন্ট্রোল নেই জান্তা? দরজির তর্জনগর্জনের তোড়ে নিজেকে ভীষণ অপরাধী আর অযোগ্য মনে কী? মনের মধ্যে আলোড়িত হতে থাকে একটা চাপা রাগ আর অভিমান। তবু ক্ষুজ্জু কথার শেষ হলেই আমি বলে উঠি, স্যার, আই এ্যাম আনফিট, প্রিজ উইথড্র বিং সামার কথায় মেজর দরজি কিছুটা থমকে যান যেনো। দু' চোখ বিশ্বারিত করে টক্কান আমার দিকে। তারপর চিন্কার করে বলতে থাকেন, নো, নট ইউ আর, এন্ট এ্যাম আনফিট টু কমান্ড ইউ।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে তখন। বেরুবাড়ি বি.এস.এফ ক্যাম্পের ভেতরে গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে আসা পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যের ত্রিয়ক আলোর ঝলকানি। দরজির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা। তার হঠাতে চিন্কারে বিওপির লোকজন সব সচকিত হয়ে ওঠে। বিওপির সামনে জড়ো হয়ে থাকা লোকজনের মধ্যে কেউ কেউ উকিবুকিও মারে। রাস্তায় ওপারে শরণার্থীদের তাঁবুর ঠাসা ঠাসা ভিড়ের জীবনযাপন তেমনি প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু হঠাতে করেই মেজর সামলে নেন নিজেকে। এ ধরনের চিন্কারে তিনি নিজেই কিছুটা অস্বত্ত্বে পড়ে যান। তাই বলে ওঠেন, তোমনে জয়বাংলা নেহি চাহিয়ে?

— ইয়েস স্যার, বলি তার কথার উত্তরে।

— জয়বাংলা হোনে কি লিয়ে মুক্ত করনে হোগা, ইয়ে ঠিক নেহি?

— ইয়েস স্যার আবাব বলি।

— দ্যান, বলে তিনি কিছুক্ষণ থামেন। তারপর বলেন, দেন গো অন। যারা ভেগেছে, তারা ভাগুক। ডরপুক ওরা, কাওয়ার্ড। তাই ভেগেছে। বাট ইউ গো অন ফাইটিং। ডোন্ট বি ডিমর্যালাইজড। উই আর উইথ ইউ।

এরপর স্বাভাবিক হয়ে আসে পরিবেশ। তিনি রিপোর্ট নেন। ব্রিফ করেন। নতুন রণকৌশল সুপারিশ করেন। গোলাবারুদ এবং রেশনের সরবরাহ বৃক্ষিয়ে দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নতুন সেকশনটার দায়িত্ব বৃক্ষিয়ে দেন। এবং জরুরি ভিত্তিতে যে কাজগুলো করতে হবে, সেটা নেট করে নিতে বলেন। আমরা লিখে নিই সেগুলো। এরপর চা আসে। চা পান শেষে তিনি ওঠেন। গাড়িতে উঠবার সময় তিনি বলেন, সরি বয়েজ, আজ আমার ব্যবহারটা ভালো হয় নি। এটা ওয়ার ফিল্ড, তোমরা যুক্তের মধ্যে আছো, সবসময় এটা মনে রাখবে। যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, সেভাবেই চালিয়ে যাও। গর্ব করবার মতো ঘটনা অবশ্যিই তোমরা ঘটিয়েছো। তবে যাওয়ার সময় আঙ্কাসের কবরটা একবার দেখে যেও।

মেজর দরজি চলে গেলেন। আমরা হাঁটতে হাঁটতে আঙ্কাসের কবরের কাছে যাই। গত সক্ষায় তাকে কবর দেয়া হয়েছে। এখনও কবরের মাটি ভেজা। দিনাজপুরের ডিসি অফিসের কর্মচারী সেই ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। এই সৌম্য দর্শন ভদ্র পরিবারের মানুষটি নিতান্ত কষ্টের মধ্যে আছেন। শরণার্থীদের এই গাদাগাদি ভিড়ে মানবের জীবনযাপন করছেন। কবরটা আপাতত বাঁশ দিয়ে ঘিরে দেয়া প্রয়োজন। পরবর্তীকালে পাকা করতে হবে। আঙ্কাসের কবরের চিহ্ন আজ অঙ্কুশ না রাখতে পারলে তবিষ্যতে আর ঝুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর জনে, সময় কোথায় নিয়ে যাবে মুক্তিযুক্তের এইসব শহিদকে। অবশ্যে ভদ্রলোকই দায়িত্ব নেন কবরটা ঘিরে দেয়ার। তিনি জানান, আগামীকাল মিলাদের প্রয়োজন করা হয়েছে। দোয়া-দরুণ পড়া হবে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা আঙ্কাসের আত্মার কল্যাণ কামনা করে। কবর ঘেরার জন্য ভদ্রলোকের হাতে কিছু টাকা আপনি দিই। এরপর চলে যাই বেরবাড়ি বাজার অভিযুক্তে। সেই নূর মিয়ার দেৱকুণ্ঠে

একজন রাজনীতিবীদের সাথে বৈঠক

নূর মিয়া দোকানদারিতে ব্যস্ত। বিকেলের দিকটায় তার দোকান সরগরম হয়ে ওঠে। শরণার্থী শিবিরের লোকজন আসে নূরুর দোকানে। কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে দেশের কথা ওঠে। শরণার্থী শিবিরের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে। নূর মিয়ার সাথে নেতাদের ওঠাবসাও রয়েছে। তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করেন সেইসব সমস্যা তাদের জানিয়ে কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে।

আমাদের দেখে নূর মিয়া তার দোকানদারি রেখে উঠে দাঁড়ান। তার ভাতিজার ওপর দোকান সামলানোর দায়িত্ব দিয়ে বলেন, চলেন যাই মোক্তার সাহেবের আন্তর্বাণ থেকে ঘুরে আসি।

— মোক্তার সাহেব কে?

— আরে, আমাদের কয় মোক্তার, কমরুদ্দিন এমপি। তিনি বাজারের বাইরে বড়ো রাস্তার পাশের এক বাড়িতে আন্তর্বাণ গেড়েছেন। চলেন যাই, শরণার্থীর সমস্যা নিয়ে আমারও কিছু আলাপ রয়েছে। আপনারাও আপনাদের কথা বলবেন।

— ঠিক আছে, চলেন।

আমাদের সরাসরি ভারতীয় অফিসারদের অধীনে থেকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে কোনো যোগাযোগ নেই। নেতারাও কোনো খোজখবর নেন না। তাই সব সময় একটা হীনস্মন্যতায় ভুগতে হয়। আঙ্কাস মারা গেলো, কেউ এলো না তাকে দেখতে। এ নিয়ে মনের মধ্যে ঘটে ক্ষেত্র আর অভিমান জমে রয়েছে। জমেছে অনেক প্রশ্ন, যার উত্তর জানা দরকার।

কর্মকর্তৃদিন মোকাব পঞ্চগড় এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের এমপি। আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ কর্মী। বয়স হয়েছে। হালকাপাতলা শরীরের একজন ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। তাঁর আন্তর্নায় অনেক মানুষের ভিড়। পঞ্চগড়-ঠাকুরগাঁও এলাকার অনেক ছোটবড় নেতা-কর্মী তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। এছাড়া শরণার্থী আঞ্চলিকজনরাও এসেছেন তাদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে।

মোকাব সাহেব আমাদের পরিচয় পেয়ে নিজেই উঠে এলেন। মেঝেতে শতরঞ্জি জাতীয় কিছু বিছিয়ে তার ওপর সকলকে নিয়ে বসেছেন তিনি। আমাদের তিনি তার পাশে নিয়ে বসালেন। তখন সক্ষ্য পার হয়ে রাতের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে। টিমটিমে হারিকেনের আলোয় মোকাব সাহেবের সৌম্য দর্শন মুখ অত্যন্ত আপন মনে হয়। তিনি বলেন, আপনাদের কথা শুনেছি। আপনারা কষ্ট করছেন। আমি নিজে যেতাম আপনাদের দেখতে, এটা আমার কর্তব্য, আপনারা এসেছেন তাই খুব খুশ হয়েছি। আপনারা যুক্ত করছেন বলেই আমরা এভাবে একে পর্যন্ত টিকে আছি। বিশ্ববাসীর কাছে বলতে পারছি...।

— সবই শুনলাম, কিন্তু আমাদের যাই নেন না কেন? ভালোই তো জমিয়ে বসেছেন, ঠোঁটকটা পিটু হাঁতে করেই কেমাড়া প্রশ্ন করে বসে। আমি তার হাতে চাপ দিয়ে ইশারা করি চুপ করে থাকেন এবং দেখলাম পিটুর কথায় মোকাব সাহেব কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়েছেন। তার একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন। পরমতসহিষ্ণু রাজনীতিবিদের চরিত্রের একটা বড়ো গুণ। মোকাব সাহেবের ভেতরেও সে গুণ রয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়ে উদারভাবে হেসে উঠেন তিনি পিটুর কথায়। তারপর বলেন, বাবাজি ঠিক কইছেন। আমরা কোনো খবর নিতে পারছি না, এ কথাটা ঠিক। তবে এখন থেকে দেখবেন, সব ঠিক হয়ে গেছে। সব ওলোটপালোট ব্যাপার বাবাজি, কুন দিক যাবেন কহেন? খালি সমস্যা আর সমস্যা। সমস্যার পাহাড় জমেছে চারদিকে। তবে এগুলো থাকবে না। আর কিছুদিন সময় পেলে সবকিছু সামাল দেয়া যাবে। আপনারা মনের মধ্যে কোনো ক্ষেত্র রাখবেন না, যখন কোনো অসুবিধা হবে, আমাকে জানাবেন।

চা-নান্তা আসে। খাবার ফাঁকে ফাঁকে আরো কিছু আলোচনা হয়। যুদ্ধের জন্য আরো হাতিয়ার-গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সরঞ্জামের প্রয়োজন, এটা তাকে জানাই। আসবাব সময় তাকে একটা অনুরোধ করি, তিনি যেনেো ব্যক্তিগত উদ্যোগে আকাসের কবরটা পাকা করে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

কথাবার্তা শেষে তিনি আমাদের সাথে বাইরে আসেন। বিদায়ের সময় কেন যেনেো তিনি আবেগে আপুত হয়ে বলেন, বাবারা, সাবধানে থাকিবেন, তোমহারা যুক্ত

করেছেন, মরেছেন, আমি শান্তি পাই না বাবা। বয়স নাই, নাইলে আমিও আপনাদের মতো যুক্ত যেতাম। আপনাদের এই সামান্য অস্ত দিয়ে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দিয়ে এপারে এভাবে থাকতে খুব খারাপ লাগে, অপরাধী মনে হয় সব সময়। ভালো থাকেন। সাবধানে থাকেন। প্রয়োজনে খবর দেবেন। বেরুবাড়ি আসলে দেখা করবেন। আমিও খোজখবর রাখবো। খোদা হাফেজ।

কমরুদ্দিন মোকারের কাছে এসেছিলাম অনেক অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু সেগুলো আর বলা হলো না। মনে হলো, বলেই-বা কি হবে তাকে, কীই-বা করতে পারবেন তিনি? নিজেও তো এপারে বাস করছেন পরজীবীর মতো। তবে তার পিতৃসূলভ মেহমানানো আশীর্বাদ ঘনটাকে গভীরভাবে ছুইয়ে গেলো। হাঁটতে হাঁটতে পিন্টু বললো, আসলেও লোকটা ভালো মানুষ মাহবুব ভাই।

আসলেই ভালো। পা চালাও। রাত হয়ে গেছে, বলেই তাড়া দিই পিন্টুকে। এরপর বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবির পেছনে ফেলে দুই সৈনিক এগিয়ে চলি রণক্ষেত্রের দিকে।

নালাগঞ্জ হাইড আউট

হাইড আউটে ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে যায়। চারদিকে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। ছেলেদের মধ্যে শঙ্কার ভাব। একজুল আর চৌধুরী মোটামুটি উত্তেজিত। ওই মেজাজেই তারা তাদের রিপেট দেয়। নতুন একটা দল এসেছে পঞ্চগড় থেকে তাদের পানিমাছ খাচিতে। একজুলের খবর পাওয়া গেছে তাদের। সঙ্গত আমাদের এই হাইড আউটের খবর তারা জেনে গেছে। রাতে আমাদের ওপর তাদের হামলা হতে পারে।

- কে তাদের নিয়ে আসছে?
- জবান আলী ভুইয়া, শুভাগানের।
- এ খবর কে দিলো?
- তোতা আর সজিম উদ্দিন।

পরিস্থিতি তাহলে এই! জবান আলী ভুইয়া পাকবাহিনীর দালালি করছে খোলাখুলিভাবে, এটা আগেই জানা গিয়েছিলো। কিন্তু সে যে নিজে গিয়ে পাকবাহিনীকে নিয়ে আসবে, এটা বিশ্বাস করা যায় নি। ভুইয়া তাহলে এ অঞ্চলের পাকবাহিনীর প্রধান এজেন্ট! তাকে নিউটাল করা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে এখান থেকে হাইড আউট সরিয়ে নিতে হবে। এতোগুলো ছেলের জীবন। রিক্ষ নেয়া উচিত হবে না। কিন্তু নতুন হাইড আউট পাওয়া যাবে কোথায়? একটা দুর্ভেদ্য আর নিরাপদ জায়গার প্রয়োজন, যাতে পাকবাহিনী সহজে আমাদের কাছে ঘেষতে না পারে। এভাবে ঘন ঘন আস্তানা বদল করে আর পারা যাচ্ছে না। কোথাও একটা স্থায়ী আস্তানা নেয়া দরকার। স্থায়ী নিরাপদ আস্তানা পেলে, সেখান সুষ্ঠির হয়ে বসা যাবে, চিন্তাভাবনা করে অপারেশনাল প্লান করা যাবে। এভাবে যুত্সই কিছু হচ্ছে না। এতোগুলো ছেলে নিয়ে দু' একদিন পরপর হাইড আউট পরিবর্তন করতে করতে প্রতিদিনই একটু একটু করে বেশ শক্তি ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। প্রচুর ধকলও যাচ্ছে শরীর।

আর মনের ওপর দিয়ে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই আকঞ্জিকত নিরাপদ আর স্থায়ী চরিত্রের আস্তানা? সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসে। মাহবুবার রহমান দুলু। হ্যাঁ আছে এরকম একটা আস্তানা, আপনারা যাবেন? দুলু বসির মেষারের বাড়িতে আমাদের এগিয়ে দিতে এসে সেই যে থেকে গেছে, আর যায় নি। শুধু একদিন দিনের বেলা গোলজার সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার মা-ভাইবোনদের ঘোঁজ নিয়ে এসেছে। সেই দুলু বলে উঠে সেখানটায় আপনাদের চমৎকার হাইড আউট হতে পারে।

— কোথায়?

— নালাগঞ্জে, আমাদের গ্রামের বাড়িতে।

তোরের আকাশে আলো ফোটবার আগেই আমরা এক গহন জঙ্গলের পাশ দিয়ে ধান ক্ষেত্রের হাঁটু পানি আর কাদা মাড়িয়ে সমস্ত লটবহরসহ নালাগঞ্জে পৌছে যাই।

একটা ইংরেজি এল আকারের লাল টিনের ঘর। চারদিকে বাঁশের উচু বেড়া। একটা প্রশস্ত আভিনা। দুটো ছোট আকারের ছনের ঘর। একটা মাটির পাত কুয়ো। এটা দুলুদের গ্রামের বাড়ি। এখন কেউ থাকে না, পরিত্যক্ত। যুদ্ধ বাঁধবার কিছুদিনের ভেতরেই দুলুর গ্রামের আঞ্চলিকজনদের সবাই ভারতে গিয়ে অশ্রয় নিয়েছে। তার চাচাতো ভাই মতলুবুর রহমান প্রধানকে পাকবাহিনীর দোসররা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তার স্ত্রী হালিমা খাতুন স্তানদের নিয়ে স্বৰ্ণপুরী হিসেবে মানবেতর জীবন যাপন করছেন ভারতের এক দূর আঞ্চলিয়ের বাড়িতে। এখন জনশূন্য পরিত্যক্ত এই বাড়ি আগাছার দখলে। চারদিকে অ্যাক্রে প্রিন্ট। বাঁশের বেড়া, কাঁচা ঘরের ছনের ছাউনি ঝুলে পড়েছে। বর্ষার পানিতে সাঁজপ্রতে পরিবেশ।

টিনের ঘরটায় মূল আস্তানা বানানো হচ্ছে। মিনহাজ তার টোরের জন্য আলো ছনের ঘরটা বেছে নেয়। অন্য ঘরটাকে সে চটপট লঙ্গরখানা বানিয়ে নেয়। সবাইকে গোছগাছ করার কাজে ব্যস্ত হন পিন্টু আর দুলুকে সাথে নিয়ে আমরা দিনের আলোয় এলাকাটা দেখতে বের হইয়ে দুলুদের বাড়ির প্রায় শ' দূরেক গজ দূরে বেশ কয়েক ঘর লোকের বাস ছিলো। মাত্র একটি পরিবার ছাড়া সবাই পালিয়েছে ওপারে। একটা পুকুর, মাঝ বয়সী একটা আমগাছ পুকুরটার পঞ্চিম পাড়ে। বাঁকালো কাঙুলো হাতের নাগালের ভেতর থেকে ওপর দিকে উঠে গেছে। আমগাছের নিচে একটা ধানক্ষেত। দুলু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, এই ধানক্ষেতটার ওপারেই ইডিয়া। একেবারে হাতের কাছেই। তার মানে বিপদ এলেই ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে ঢলে যাওয়া যাবে।

আবার মূল বাড়ির দিকে ফিরে আসি। বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটা পথ এখন প্রায় দেখাই যায় না। বেশ কিছুদিন অব্যবহৃত থাকার কারণে বর্ষার পানিতে বুনোঘাস গজিয়ে লকলকিয়ে উঠে প্রায় সম্পূর্ণ পথটাকে গ্রাস করে ফেলেছে। সেই সাথে অবাধ গতিতে নিজেদের কাঁটামঘ শরীর ছড়িয়েছে লজ্জাবতী লতারা। বাড়িটা ছেড়ে প্রায় ৫০ গজ দূরে এসে চমৎকৃত হয়ে যাই। বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক গহিন বন। গতরাতে আমরা এই বনের পাশ দিয়েই নালাগঞ্জে এসে উঠেছি। তখন এর বিশালতা ঠিক ঠাহর করা যায় নি। এই জঙ্গলের ভেতরটাই হতে পারে আমাদের আদর্শ হাইড আউট অর্থাৎ লুকিয়ে থাকার জায়গা। এখানে দীর্ঘদিন লুকিয়ে থাকলেও

বাইরে থেকে কেউ তা হিসেব করতে পারবে না। ট্রেনিং সেটারে গেরিলা যুদ্ধের জন্য যে জঙ্গলের কথা বারবার বলা হয়েছে এবং যে ধরনের জঙ্গলে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য মোটামুটিভাবে আমাদের গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, এ ধরনের জঙ্গলের ভেতর থেকেই সেটা করা সম্ভব। জঙ্গল মানে মঙ্গল। আমরা জঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলের ইশারা খুঁজে পাই। দুলুদের চিনের বাড়িতে দু'একদিন থিভু হয়ে বসতে পারলেই আমরা জঙ্গলের গভীরে নিজেদের জন্য স্থায়ী আস্তানা গড়তে পারবো।

হাঁটাপথটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা ছোট প্রোটোনী খালে। এটা একটা প্রাকৃতিক বাধা। কেউ এলে তাকে খাল পেরিয়ে আসতে হবে। আর সে যদি শক্ত হয় তবে এপার থেকে সফলভাবে তাদের বাধা দেয়া যাবে। খালের ধারেই একটা উঁচু জঙ্গলে গাছ। দিনের বেলা পালা করে ছেলেদের বসিয়ে দূর থেকে শক্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এর মগডালকে ওপি বা অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। একটা টেলিকোপের প্রয়োজন হবে। জলপাইগুড়ি শহর থেকে সময় মতো কিনে আনতে হবে সেটা।

নালাগঞ্জের হাইড আউট আমাদের পছন্দ হয়ে যায়। এর অবস্থান এবং যোগাযোগের মাধ্যমও ভালো। সবচেয়ে আকর্ষণীয় এর গহন জঙ্গল। এর ভেতরে আমাদের স্থায়ী আস্তানা গড়ে নিতে হবে। এটা স্বত্বাধিকারেই আমাদের এখনকার আস্তানাটিকে পুরোপুরি স্থায়ী বেস বা হেডকোম্বাইর হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এখান থেকেই আশপাশে অস্থায়ী গ্রাহ করে প্রিয়তাকালে সুবিধে মতো জায়গায় ২/১ দিনের মতো হাইড আউট করে অপারেশন চালানো যাবে এবং কিনে আসা যাবে স্থায়ী হাইড আউটে।

ছেলেরা ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে। মিনহাজ সবাইকে এরি মধ্যে নাস্তা খাইয়ে দিয়েছে। এরপর শুরু হয় আক্রমনের জঙ্গল অভিযান। দুলু ছায়ার মতো সাথে সাথে রয়েছে। ওর মুখখানা খুশি আর আনন্দে ঝলমল করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সে তার বাড়িতে নিয়ে আসতে পেরেছে সেই কারণে। এখন সে তার নিজের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ছআছায়ায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। ফসলের মাঠে সোনালি ধান গাছের নুয়েপড়া দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে তার চোখ চকচক করে ওঠে। বারবার সে ওই দৃশ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে থাকে, আপনারা এসে গেছেন, এখন আমি আমার ফসল কাটতে পারবো। নিজের ক্ষেত্রের ফসল পেকে রয়েছে। একলা কাটতে আসবার মতো সাহস আমার ছিলো না। আপনারা না এলে আমি ফসল কাটতেই পারতাম না।

জঙ্গলের গভীরে ফাঁকা মতো একটা জায়গা পছন্দ হয়ে যায়। কিছু ছোট গাছগাছালি, ঝোপঝাড় এসব কাটার পর চমৎকার হবে জায়গাটা। একটা ঘর তুলতে হবে, মাটির নিচে ইন্দুরের গর্তের মতো করে করতে হবে ডাগ আউট। একটা দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। এখানে থাকবার মতো সকল ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে। তার জন্য খাটতেও হবে প্রচুর। ছেলেরা সেই নির্দেশ পেয়ে জঙ্গল পরিকারের কাজে লেগে যায়।

বিকেলের দিকে রিপোর্ট আসে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে। সজিম উদ্দিন রিপোর্ট দেয়ার সময় বাঢ়া ছেলের মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে বলতে থাকে, ক'দিন আগে পাকবাহিনী ওদের গ্রাম বদলুপাড়ার ওপর ঝাপিয়ে পড়েছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেয়ার অপরাধে প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছে গ্রামবাসীর ওপর। ৭ জন মহিলার ওপর দৈহিক অত্যাচার চালিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। তারা, তাদের সবাইকে ধর্ষণও করেছে। সজিম উদ্দিনের সেই লক্ষ্মীপ্রতিম বউটি কি তাদের মধ্যে রয়েছে? কে জানে? সজিম বলতে চায় না। জিগোস করতেও সাহস হয় না। শুধু জানা যায়, তার স্ত্রী অসুস্থ এবং সে তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে সরিয়ে রেখে এসেছে। বাড়ি থেকে ফিরে এসে সজিম উদ্দিন অন্যরকম হয়ে গেছে। তার সেই বোকা বোকা ধরনের কথাবার্তা আর প্রচণ্ড সাহসিকতায় তরা উজ্জ্বল চেহারাটা খান হয়ে গেছে।

বিকেলে পুরুর পাড়ের আমগাছের তলায় বসে প্রাণ সমন্ব রিপোর্ট পর্যালোচনা করে মূল টার্ণেট স্থির করা হলো। আমাদের এবারের টার্ণেট জবান আলী ভুইয়া। লোকটা পুরোপুরি বাঙালি নয়। ক্যালকেশিয়ান। ডাবুরুডাঙ্গা গ্রামের মাইলখানেক দক্ষিণে ভারতীয় ছিটমহলের শালবাগান এলাকার একচৰ্ক্ক অধিপতি হিসেবে ভুইয়া সেখানে তার রাজত্ব কার্যম করে বসেছে। প্রচুর তার জায়গা জমি-সম্পত্তি। যোৱ পাকিস্তানপুরী এবং বাংলাদেশ-বিরোধী। নিয়মিত সে পাকবাহিনীর সাথে পঞ্জায়েগ রক্ষা করে চলেছে। গত পরশু দিনও সে পঞ্জগড় গিয়েছিলো পাক পঞ্জকের সাথে দেখা করার জন্য। জোৱ গুজব রয়েছে, আগামী পরশু সে পাকবাহিনীর একটা দল তার বাড়িতে নিয়ে আসবে। সম্ভবত সে পাকবাহিনীর একটা টার্ণেটি তার এলাকায় স্থাপনের পাঁয়তারা করছে। টার্ণেটি তালিকায় আরো দুটো নাম যোগ হলো, প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার সামাদ, বয়রা মাস্টার নামে যে প্রকাশিত। কানে কম শোনে বলে তার এই নাম হয়েছে। আসাদের বাবা আনাজ চেয়েবাবু, বর্তমানে পঞ্জগড়ের বাসিন্দা। তার মার দেয়া ওয়াদা অনুযায়ী সে আমাদের কাছে সারেভার করে নি। উপরন্তু তার ছেলে আসাদকে দিয়ে সে পাকবাহিনীর পক্ষে তাদের দালালিসুলভ তৎপরতা বৃক্ষি করেছে। যে-কোনো দিন পাকবাহিনীর দল নিয়ে সে তার এলাকায় আসবে, এরকম একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। আসাদ মাঝে মাঝে বাড়িতে থাকে আবার পঞ্জগড় যায়। বয়রা মাস্টার প্রচণ্ডভাবে পাকিস্তানপুরী। প্রকাশ্যে সে পাকিস্তান রক্ষার ব্যাপারে লোকজনের কাছে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। স্কুলের কোনো কাজকর্ম এখন আর করে না। তবুও সে তার স্কুলে নিয়মিত পাকিস্তানের পতাকা টাঙ্গিয়ে রাখে। অতএব ভুইয়াকে খতম করা দরকার। ধৰা দরকার আসাদ এবং বয়রা মাস্টারকে। আপাতত এই হচ্ছে মূল অপারেশনাল টার্ণেটি। এই টার্ণেটি সামনে রেখে রাতে দুটো মিশন বের হয়ে যায়।

৬.৮.৭১

ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া

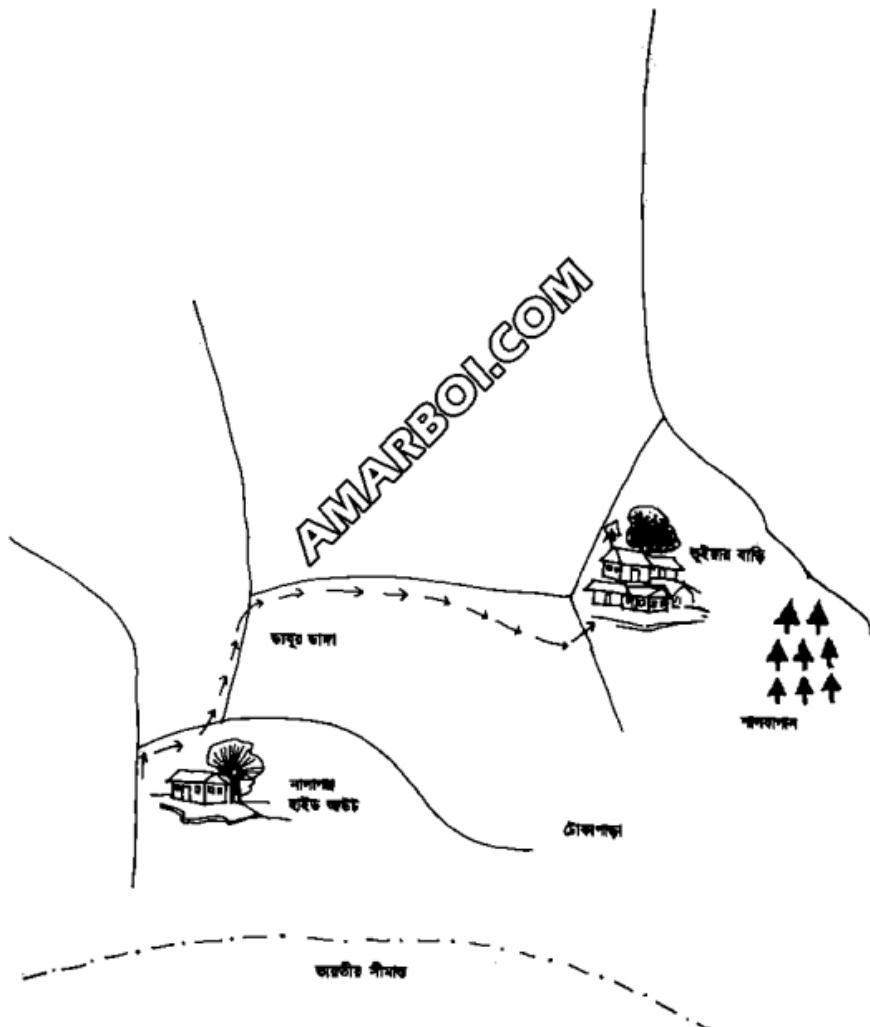
সকালে নাস্তির পর যথর্যাতি জঙ্গলের ভেতরে আস্তানা তৈরির জন্য বোপবাড় আর গাছ কাটার কাজ চলতে থাকে। দুলু মিয়া তার জমি থেকে ধান কাটবে। তাদের

- দেশ সংখ্যা - ১৫

ভুইয়া ষষ্ঠি অভিযান

১. ৮. ১৯৭৩

(কলকাতা)



সাঁওতাল প্রজা মহেন্দ্র সর্দারের নেতৃত্বে একদল মজুর ধান কাটার কাজে লেগে যায়। দুলু মিয়া রাতেই তার আবদার জানিয়ে রেখেছিলো, সকালে সে ধানক্ষেতে লোক লাগাবে। এর জন্য তার প্রোটেকশন চাই। মোতালেবকে দেয়া হয়েছে সেই দায়িত্ব। হাইড আউটের টিনের ঘরের সামনে থেকে রৌদ্রকরোজ্বল সকালের পটভূমিতে দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখা যায়। প্রায় ৩০০ গজ সামনে। মোতালেব ফসলের ক্ষেতের পাশে একটা উচু মতো জায়গায় তার এল.এম.জি টাগেটি করে শোয়া পজিশনে রয়েছে। তার সেকশনের অন্যরা এল.এম.জির দু'পাশে কেউ বসা, কেউ শোয়া অবস্থায়, ঠিক যেনো যুদ্ধরত অবস্থায় রয়েছে। দুলু অত্যন্ত ব্যস্তসমষ্ট অবস্থায় একবার তার কিষানের কাছে, একবার মোতালেবের কাছে ছুটোছুটি করছে। দৃশ্যটা অত্যন্ত চমৎকার। চিরদিনের জন্য মর্মে গৈথে রাখবার মতো একটা ছবি। আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। জনযুদ্ধের বৈশিষ্ট্য বুঝি এধরনের। এ যুদ্ধে আমাদের কেবল শক্রপঙ্ক পাকবাহিনীর সাথেই যুদ্ধ করতে হচ্ছে না, সেই সাথে দেখতে হচ্ছে অনেক কিছু। যুক্ত এলাকার মানুষজনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সাথেও আমাদের জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। জমিতে পাকা ফসল যারা বুনেছে, তারা নিরাপত্তার অভাবে তা কাটতে পারছে না। আমাদের দিতে হয়েছে সেই নিরাপত্তার গ্যারান্টি। মোতালেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রহরাধীনে তারা নির্বিঘ মনে ফসল কাটার উৎসবে মেঝে ছাড়ে। এটা একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার তাদের জন্য। দু' দিন আগেও তাবৎে পাক নি, তাদের নিজেদের জমিতে বপন করা ফসল তারা ঘরে ভুলতে পারে এ মনোরম দৃশ্য গায়ক পিন্টুকে বিমোহিত করে তোলে। গেয়ে ওঠে কেওড়ানাথের সেই বিখ্যাত গান, ‘ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়া...’।

দুপুরে খাবার বিরতির পরে জঙ্গলের আনন্দনার কাজে ক্ষান্ত দেয়া হয়। মোতালেবকে ফিরিয়ে আনে তাকে রিলিভ করে অন্য একটা দল। রাতে একটা বড়ো অপারেশন রয়েছে যার এজন্য ছেলেদের বিশ্বামি, মানসিক প্রত্নতি দরকার। পুরুর পাড়ে আঘাতাচ্ছে ছায়ায় মাদুর বিছিয়ে বাসে রচিত হতে থাকে আমাদের রাতের অভিযাত্রার পরিকল্পনা, চুলচেরা বিশ্বেষণ। পরিকল্পনায় যাতে ফাঁক না থাকে, এ জন্য বারবার ঝালিয়ে নেয়া হয় সবকিছু। পরিকল্পনা প্রণয়নে আমার সাথে রয়েছে পিন্টু, একরামুল আর চৌধুরী। রাতের অপারেশনের মূল পরিকল্পনা পূর্বাহ্নে ঠিক করে নেয়া হয় সিনিয়র কমান্ডারদের সাথে নিয়ে। অপারেশনে যাওয়ার আগে এ শোপনীয়তা ফাঁস করা হয় না। নিয়ম নেই। অপারেশন যাত্রার প্রস্তুতিপর্বে ছেলেদের ফল-ইন করে দাঁড় করিয়ে তাদের মূল অপারেশন পরিকল্পনার কথা বিস্তারিতভাবে জানানো হয় এবং অপারেশনে যাওয়ার আগে চূড়ান্ত ব্রিফিং করে সবকিছু ঝালাই করে নেয়া হয়।

বেলা গড়িয়ে সক্ষ্য নামে। অপারেশনে যারা যাবে, তাদের বিকেলেই বলে দেয়া হয়েছে। রাতের প্রথম অক্ষকারেই সকলের আহারপর্ব শেষ হয়ে যায়। নির্বাচিত ছেলেদের তৈরি হতে বলা হয়। ওরা তৈরি হতে থাকে। আজকের গাইড দুলু আর কোম্পানি মুক্তি তৈরি হতে থাকে। রাতে অন্ত্র আর গোলাবারুদ কী কী নিতে হবে,

তাও বলে দেয়া হয়েছে। একরামুল আর মোতালেব সেগুলোর তদারকিতে ব্যস্ত। ভেতরের আঙিনা থেকে বাইরের খোলা চতুরে বেরিয়ে আসি। পায়ের নিচে নরম ভেজা ঘাস। চারদিকে আবছা জোছনার আলো। আকাশে পঞ্জমী বা ষষ্ঠীর চাঁদ। বর্ষার আকাশে চাঁদের লুকোচুরি। ঘাসের ওপর বসে পড়ি। পাশে বিষ্ণু সাধি পিন্টু। এক ব্যাডের রেডিওটা চড়া স্বরে বেজে ওঠে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ধরেছে ওরা, ভেসে আসে উদ্বীপনাময় প্রিয় সঙ্গীত জয়বাংলা, বাংলার জয়, হবে হবে নিশ্চয়...। হঠাৎ দুলু বলে, টানবেন?

— কি?

— বিড়ি, মতি বিড়ি।

— দ্যান। তিনজনের ঠোটে ঠোটে জুলতে থাকে মতি বিড়ি। সিগারেটের অভাবে বিড়িই চলছে এখন প্রায় সবার। বিড়ি কিংবা সিগারেটের আগুন কি কোনো রকম সাহসের উৎস? হয়তো-বা তাই। না হলে সবাই টানে কেনো? মতি বিড়ির তেজে ধোয়া ভালো লাগে না। কিন্তু টানতে যেনো বিষণ্ণ মনটা হালকা হয়ে যায়। বিপজ্জনক অপারেশনে যাওয়ার আগে মনের ভেতরে একটা অস্ত্রিতার বাঘ দাপাদাপি করে সবসময়। এতোগুলো ছেলের জীবন-স্মৃতির জিম্মাদার হয়ে মুক্তের দিকে এগুনোর ভেতরে বিরাট একটা ঝুঁকি আর অনিষ্টমুক্তি কাজ করে। অবশ্য প্রস্তুতি আর রওনা দেয়ার আগেই অস্ত্রিতার এ ভূটটা ছিপে ধরে। কিন্তু একবার রওনা দিয়ে সুযোগ মতো টার্গেটের ওপর ঝাপিয়ে দিয়েছেন সেটা আর থাকে না। আজকের অপারেশনটা নানা কারণে যেমন গভীরভূতি, তেমনি বিপদসঙ্কলও। টার্গেটের আশপাশে পাকবাহিনী এসে পৌছেও পারে। তারা এসে থাকলে এক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে-শারে। আর টার্গেটকে মোটামুটি যদি অরক্ষিত পাওয়া যায়, তবে এ অপারেশনের ভেতর দিয়ে এ এলাকার বিক্রীগ অঞ্চল হয়ে যাবে শক্তমুক্ত। সবার জীবনযাপন, বসবাস আর ঘর গেরহুলি হয়ে উঠবে নিরবদ্ধে, নির্ভয়। পাকবাহিনী কোনোদিনই আর এদিকে আসতে পারবে না।

রাত আটটার দিকে একরামুল বেরিয়ে আসে। এসে বলে, সব রেডি। বিষ্ণু কম্বারের রিপোর্ট।

ঠিক আছে, মিনহাজকে বল চা দিতে। সাড়ে আটটায় ফল-ইন।

— হ ইজ দেয়ার? কে ওখানে? হঠাৎ করে নালাগঞ্জ রাস্তা বরাবর দাঁড়িয়ে থাকা সেন্ট্রির কর্কশ স্বরের ছক্কার সচকিত করে তোলে সবাইকে। সামনে দু'তিনটি ছায়ামূর্তিকে অগ্রসরমান দেখে সেন্ট্রি মাজেদ মির্যা চ্যালেঞ্জ করে বসেছে তাদের। ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। এমনি চলে কিছুক্ষণ। সেন্ট্রি মাজেদ আবার চিৎকার করে ওঠে, কে আসে? কথা কয় না কেনো? এবার তার হাতে রাইফেল খটাখট শব্দ তুলে অঙ্ককারের ছায়ামূর্তিকে লক্ষ্য করে তাক করে। এবার ভয়ার্ট কম্পিত গলা ভেসে আসে, আমরা, আমরা, গুলি করবেন না।

— আমরা কারা? মাজেদ মির্যার যাঁক্কিক কঠ। কি নাম, এতো রাইতে কি চাই?

— আমার নাম মজিবর। সাথে আমার ভাই। সর্দারপাড়ার হালিম মাস্টারের

ছেলে। আপনাদের কম্বাদার মাহবুব ভাই-পিন্টু ভাইয়ের সাথে দেখা করবো।

— মজিবের, সর্দারপাড়া? ঠিক আছে সামনে আসেন, ধীরে ধীরে।

টেনিং সেন্টারের প্রাণ সেন্ট্রি ডিউচির শিক্ষা নিয়ে মাজেন্ড মিয়া হয়তো আরো কিছুটা এগিয়ে যেতো, আগন্তুকদের বাজিয়ে দেখার জন্য পিন্টুকে এগিয়ে যেতে বলি। পিন্টু ফিরে আসে ও জন ছায়ামূর্তিসহ। সামনে এসে দাঁড়ায় মজিব।

— কি খবর?

— জি এলাম।

— একেবারে এলেন?

— জি, সাথে আমাদের বাড়ির লোক।

— ঠিক আছে, থাকেন।

মিনহাজ বাইরে এসে মজিবের দায়িত্ব নেয়। অপারেশনে যাওয়ার আগেভাগে বহিরাগত কাউকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখতে হয়। কে জানে কোনো সর্বনাশ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে কি না? যুক্তের মাঠে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। এমনকি নিজের অন্তরঙ্গ পরমাঞ্চায়কেও।

ভুইয়া খতম, ধৃত সামাদ মাস্টার

ছেলেরা বাইরের ঢেউরে ফল-ইন-এ দাঁড়িয়েছে। এত্যেকের কাঁধে অন্ত। বুকের আড়াআড়ি গুলির মালা। কোমরে গামছা নিয়ে জোবা ছেনেড। ১৮ জনের শক্তিশালী দল। সামনে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষমাণ চূড়ান্ত প্রাতঃক্ষয়ের জন্য।

— পিন্টু, সব ঠিক আছে? চেক কৰেছো?

— জি।

তা হলে আজকের টাঙ্ক স্কলেক্ট শোনো। অক্ষকারের ফ্যাকাশে আলোয় সার বেঁধে তিন লাইনে দাঁড়ানে। ছেলেদের উদ্দেশে আমার ত্রিফিং শুরু হয়। আজ রাতে আমরা ভুইয়ার বাড়িতে আক্রমণ চালাবো। ধরতে পারলে ওকে হত্যা করা হবে। ভুইয়া সভ্বত তার বাড়িতে পাকবাহিনীর একটা দল নিয়ে এসেছে। যদি তাই হয় তাহলে খুবই সাবধানে এগিয়ে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে হবে সবদিক থেকেই। তাদের সেন্ট্রিকে প্রথমে গুলি করে মারতে হবে। ওরা প্রত্যুত্ত হওয়ার আগেই ছেনেড হামলা চালিয়ে ওদের ঠাণ্ডা করে দিতে হবে। কভারিং-এ থাকবে পিন্টু। মোতালেব সেন্ট্রি সাইলেন্ট করে এগিয়ে যাবে। একরামুল থাকবে আমার সাথে চূড়ান্ত এসোল্টের জন্য। বাড়ি দখল হয়ে গেলে রেমার চার্জ দিয়ে গোটা বাড়ি উড়িয়ে দিতে হবে। তবে একটা ব্যাপারে সকলেরই প্রথর দৃষ্টি রাখতে হবে, সেটা হলো ভুইয়া যেনো পালাতে না পাবে কোনোভাবেই। সবাই নিজেকে সেফ রাখার চেষ্টা করবে, গুলি কম খরচ করবে। নির্দেশ না পেলে কেউ পিছু হটবে না। ত্রিফিং শেষ। কোনো প্রশ্ন নেই। চৌধুরী উইল সুক আফটার হাইড আউট, টেক কেয়ার, এভরিবডি, ও. কে? পাশে দাঁড়ানো চৌধুরী অক্ষকারে মাথা নাড়ে।

এবার যাওয়ার পালা। সিঙ্গেল ফাইলে সবাই। রেডি মুভ বলে সবাইকে এগিয়ে

যাওয়ার নির্দেশ দিই। আপসা আলো-আঁধারিতে ছেলেরা এগিয়ে গিয়ে পথ ধরে। সেন্ট্রি মাজেদ মিয়ার পাশ কাটিয়ে ওরা এগিয়ে যায় একের পর এক। সবশেষে পিন্টু আর আমি। কাঁধে ঝোলানো প্রিয় ধাতব অন্তর্টার কাঠিন্য বুকের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে জানান দেয়, আমি আছি তোমার সাথে। দূরে অমরখানায় চলছে তখন যুদ্ধের মহড়া। গুড়গুড় মেঘের গর্জনের মতো ভেসে আসে কামানের শব্দ। এর ভেতর দিয়েই চলতে থাকে ছেলেদের ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে চলার হপচপ শব্দের ঐকতান। নালাগঞ্জ হাইড আউট থেকে প্রথম যুদ্ধযাত্রা শুরু হয় আমাদের।

ছেট খাল। বর্ষার পানি উচ্ছলে উঠছে। প্রত্যেককে গলা সমান পানি পার হতে হয়। খালের ওপর উঠতেই দেখা গেলো, সবাই ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। গায়ের কাপড়-চোপড়ের অবস্থাও একই রকমের। শরীর নিঙড়ে পানি পড়তে থাকে। আবার কলাম ধরে সবার যাত্রা শুরু হয়। কোম্পানি মুসির বাড়ি পার হয়ে আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়ি। এ বাড়িটাতে আমরা দু' বাত থেকে গেছি। কিন্তু আর এখন ওদেরকে বিস্তাস নেই। আনাজ চেয়ারম্যানের ছেলে পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করছে, এ ধরনের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। টার্গেট তালিকায় তার নামও এসেছে। আনাজ চেয়ারম্যানের বাড়ির পাশ কাটিয়ে রাস্তা থেকে যেমে পড়তে হয়। চলা শুরু হয় ফসলের ক্ষেত্রের আলপথ ধরে। বৃষ্টি ভেজা শুরু হাঁটাপথ। শুবই পিছল। কোথাও আল কেটে পানি বের করা হয়েছে। মেলে সৃষ্টি হয়েছে কাদাপাকে তরা গর্তময় জলাশয়। যতোদূর সম্ভব নীরবে অথচ স্তুপণে আমাদের দলকে নিয়ে এগুতে থাকি। পাশে রাস্তা। গাইড মুসি। সামনে ছাড়া ছাড়া কয়েকটা বাড়িঘর। কোথাও কোনো প্রাণের সাড়াশব্দ নেই। দুর হেঁজে কেবল মাঝে মাঝে ভেসে আসে কুকুরের তারস্বরের চিক্কার ধ্বনি। তখনে উঠেছে অমরখানা-জগদলহাটের যুদ্ধ। একই তালে। আর সেই রণাঙ্গনের দিকে ঝুঁকতে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। সামনে ভুইয়ার বাড়ি। এ হাঁটাপথই নিয়ে যাবে সেখানে। কী জানি কী অপেক্ষা করছে সেখানে আমাদের জন্য।

ভুইয়ার বাড়ির পক্ষাশ গজের মধ্যে পৌছুনো গেলো নির্বিন্দেই। এরপর যাত্রাবিবরিতি। কর্দমাক ফসলের মাঠে হাঁটু গেড়ে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা। পাকবাহিনী আস্তানা গেড়েছে কি না, সেটা জানা দরকার সবার আগে। ভুইয়া বাড়ির দিক থেকে কোনো সাড়া শব্দ নেই। পাকবাহিনীর ছোটোখাটো একটা দল থাকলেও তাদের অতিক্রম টের পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ সলাপরামর্শ। এরপর হাতিয়ার বাগিয়ে ধরে মাথা নিচু করে কোমর বাঁকিয়ে পুরো দলটাকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সোজাসুজি একেবারে বাড়ির কাছাকাছি। আর সেখানে এসেই আবার থেমে যাওয়া। সবাই হাঁফিয়ে উঠেছে কাদাপাকে তরা ফসলের মাঠের হাঁটু-সমান কাদাপানি ডিঙিয়ে আসতে। শক্তকে সামনে রেখে কোমর বাঁকিয়ে হাতিয়ার হাতে অঘসর হওয়ার ব্যাপারটা আসলে শুবই কষ্টকর। ক্রতিতে শরীর ঘর্মাক্ত। ঘন এবং ভারি শ্বাসপ্রশ্বাসে সবাই অস্থির। তাই বেশ কিছুক্ষণের অপেক্ষা। মিনিট-ঘটাগুলো যেনো সব জমাট বাঁধা পাথরের মতো। কাটতে চায় না। বুকের ভেতরে দ্রুম দ্রুম ঢাকের ধ্বনি।

কেউটে সাপের চাইতে বিষাক্ত শক্তি ভুইয়ার এতো কাছাকাছি এসে পৌছেছি আমরা! বিরাট এলাকা নিয়ে দোমহলা বাড়ি ভুইয়ার। একজন জোতদার। এলাকার একজন সামন্ত প্রতু। শুধু কি পাকিস্তান রক্ষার জন্য সে ঝুকেছে, তার পাক প্রভুদের মন রক্ষার জন্যও উঠেপড়ে লেগেছে। জয়বাংলা হলে তার হয়তো এ সম্রাজ্য থাকবে না, এ তব আর সত্ত্বনা থেকেও সম্ভবত সে ঝুকেছে পাকিস্তান রক্ষার কাজে। এ বাড়ির বিরাট চতুরের আনাচেকনাচে সে কোন ধরনের মরণ ফাঁদ পেতে রেখেছে, কে জানে?

এ অঞ্চলের অন্য ধর্মী বাড়িগুলোর মতোই ভুইয়ার বাড়ি। চারদিকে উঁচু করে বাঁশের বেঠনী বেড়া। বাড়ির সামনে প্রশস্ত চতুর। বেশ কটা বড়ো বড়ো খড়ের গাদা, ভিটির কাছ যেমে আম-কঁচালসহ নানা ধরনের ফল-ফলারির গাছ। ফ্যাকাশে অঙ্ককারের মধ্যরাত। ভুইয়ার বাড়ির প্রাণ্ত ছুঁটে গাছগাছালির ঘন কালো অঙ্ককারের সাথে মিশে থাকে আমাদের শোয়া-বসা অবস্থান। আরো কিছুটা সময় নিতে হয়। না, পাকবাহিনী নেই। থাকলে ওদের সেন্ট্রি থাকতো, টহল থাকতো, রাতজাগা ভিন্দেশি সেপাইদের আলাপচারিতা থাকতো। তবে একটু খেয়াল করতেই বাড়ির ভেতরে জাগরণের আভাস পাওয়া গেলো। কিন্তু কারা ওরা? ভুইয়ার চাকরবাকর বা ভাড়াটে লোক? হঠাতে একটা কুকুর চিঢ়কার করে ওঠে। একটা পাঁচ ব্যাটারির টর্চের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ে একবারে সামনে। তারপর ডানে-বামে ঝুঁক্ত থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সিন্ধান্ত নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি একরামুল, মোতালেব, মালেক আর দুলুদের বলি, ওঠো জলদি, আসো। পিন্ট পিঙ্গলে কভারিংয়ে থাকো। আলোর উৎস লক্ষ্য করে ছুটে যাই। মুহূর্তের ভেতরে ছালো হাতে লোকটা আমাদের চারদিকের বৃক্ষের মধ্যে এসে যায়। একরামুল হেহেজনেয় তার হাতের টর্চলাইটটা। তারপর তার সেই টর্চলাইট দিয়েই তার মুখে ছিল আলো। তৈরি আলোরছটায় ভাব-বিহুল হয়ে পড়ে বেঠেখাটো, শক্ত গড়েন্টে লাকটা গুড়িয়ে ওঠে।

— বল ব্যাটা, ভুইয়া কোথায়, বল?

— লোকটা কিছু বলতে পারে না, শুধু তার মুখ দিয়ে একটা পশুর গোঁজনির শব্দ বেরিয়ে আসে। ধাই করে একরামুল তার রাইফেলে বাঁটৈর আঘাত করে বসে লোকটার পিঠে, বল ব্যাটা কোথায় রাজাকারের বাক্ষা ভুইয়া?

— বা-গে বলি চিঢ়কার দিয়ে মাটিতে বসে পড়ে লোকটা। আর সেই সময় আমার দৃষ্টি যায় বাঁপাশের বেগুন ক্ষেতের পাতলা বাঁশের বেড়াটার দিকে। দেখতে পাই, বেড়াটা মাড়িয়ে একটা উচা-লম্বা ধরনের মানুষ ছুটে পালানোর চেষ্টা করছে। নিচয়ই এ ব্যাটা ভুইয়া—মনের ভেতরকার ইন্টাইশন কথা বলে ওঠে। এ যে শালা পালাচ্ছে, দৌড়া, ধর ব্যাটাকে বলে টেনগানটা হাতে শরীরের সমন্ত ক্ষিপ্তা নিয়ে এক দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে প্রায় হাইজাম্প দিয়ে বেড়াটা পার হই এবং পার হয়েই বেগুন ক্ষেতের মাঝামাঝি জায়গায় ভুইয়াকে পেছন থেকে তার বুক বরাবর আড়াআড়ি জাপটে ধরি। ভুইয়া মরিয়া হয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমি আমার শরীরের সমন্ত শক্তি দিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে অনেকটা তার শরীরের সঙ্গে ঝুলে থাকি। আর মুখ দিয়ে একমাগাড়ে চিঢ়কার করে বলতে

থাকি, দৌড়া তোরা, ধরে ফেলেছি শালাকে। দৌড়া।

ভুইয়া ধরা পড়ে এভাবে। ভুইয়ার বাড়ি দখলে এসে যায়। পিন্টু ঘটপট সেন্ট্রি বসিয়ে নিজেদের অবস্থান নিরাপদ করে নেয়। বাড়ির ভেতর থেকে মানুষজনের মান ধরনের ভীতিবিহুল শব্দের রাশি। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে অনেকের পালিয়ে যাওয়ার পায়ের শব্দও পাওয়া যায়। আমাদের হাতের মুঠোয় এখন ভুইয়া। প্রায় ছ' মুটের ওপরে গৌরবর্ণের সুপুরুষ ধরনের মানুষ। ষাটের কাছাকাছি বয়স। রাতের অঙ্ককারেও তার গায়ের ফর্সা রঙ আর শরীরের গড়ন বলে দেয়, সে এ দেশীয় মানুষ নয়, বাঙালি অরিজিন তো নয়ই। ক্যালকেশিয়ান মানুষ, সুযোগের স্বয়বহার করে এখানে জাঁকিয়ে বসেছে আর পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার বন্ধ দেখছে। পরনে সাদা রঙের লুঙ্গি, সাদা গেঞ্জি, মুখে কাশের মতো শ্বেতশূভ্র চাপদাঢ়ি। মাথায় চুলের অবস্থাও তাই। মনে হয়, গল্পে শোনা শাদা রঙের সেই জিনের বাদশাকে বন্দি করেছি আমরা। এরকম ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা ঠিক নয়। তাই গামছা দিয়ে তার চোখ বাঁধা হয় দ্রুত। প্রাণ ভিক্ষা দেয়ে সে বলতে থাকে, ‘আপনারা যা চাহিবেন, সবকুচ দিবো, এ ধরনের কথা।

কাছেই একটা ছোটোখাটো কাঁঠাল গাছ। ভুইয়াকে শেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে দ্রুত গাছের সাথে পেছমোড়া করে শক্ত করে বাঁধতে কিন্তু একরামুল ও মোতালেব অন্যদের সহযোগিতায় সে নির্দেশ ঘটপট পালন করে ফেলে। ইত্রাহিম দৌড়ে নিয়ে গোয়ালঘর থেকে এরিমধ্যে দড়ি খুলে নিয়ে এসেছিলো। সেই দড়ি দিয়েই তাকে বাঁধা হয়। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হয়ে যায়। পরের সবাইকে পিছিয়ে যেতে বলি। পাশে থাকে শুধু পিন্টু আর মোতালেব। মোতালেব পারবি?

— জি।

— নে ধর বলে আমির স্কুল টেনগানটা কাক করে অটোমেটিক-এ সেট করে দিয়ে তার হাতে তুলে দিই। আর সেটা মাত্র ও গজ দূর থেকে তাক করে মোতালেব ভুইয়ার বুক লক্ষ্য করে। ‘বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু’ বলে কমান্ডারের স্বরে আদেশ দিয়ে বলি, মোতালেব দুই রাউন্ড ব্রাশফায়ার। ভুইয়া তখনে যেনো কিছু বলতে চাচ্ছিলো; কিন্তু তখনি মোতালেবের হাতের টেনগান থেকে আগুনের ঝলক ঠা-ঠা-ঠা শব্দে বেরিয়ে আসে। পরপর দুটো ব্রাশ। ভুইয়ার মাথা কাত হয়ে পড়ে। তারপর একটা গোঁজনি তুলে থেমে যায়। ‘বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু’ বড়ে বড়ে করে কালো কালিতে শাদা কাগজের ওপর লেখাটি দুলুর হাত থেকে একরামুল নিয়ে এসে সামনের গাছটায় লাগিয়ে দেয়। খুব দ্রুত আর সংক্ষিপ্ত সময়ের ভেতরেই কাজটা শেষ হয়ে যায়। তারপর ফিরে অসি গাছগাছলির তলায় অপেক্ষমান ছেলেদের কাছে। ভুইয়া খতম। অপারেশন শেষ। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। দ্রুত ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ঠিক রওনা দেয়ার সময়ই একটা বিপত্তি দেখা দেয়। গোয়াল থেকে পাঁচটা গুরু বের করে এনেছে মিনহাজ। কোয়ার্টার মাস্টার-মিনহাজ আজ রাতে অপারেশনে এসেও তার রসদ যোগাড় করে ফেলেছে। পাঁচটা গুরুর গলায় বাঁধা রশি ধরে আছে ইত্রাহিম। আইয়ুব ও মাজেদ মিয়াসহ মিনহাজ এ অপারেশনের কাজ শেষ

করেছে। ব্যাপারটা দেখে প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হলো। প্রশ্ন জাগলো মনে, এভাবে গরু নিয়ে যাবো? পর মুহূর্তে মনে হলো না, ঠিক আছে, ভুইয়ার তো লুটের মাল। সীমান্ত অভিযুক্তি পলায়নপর মানুষদের পথ আটকে তাদের গরু-মোৰ আৰ সোনা-দানা-টাকা-পয়সা সবকিছুই লুট করে নিয়েছে ভুইয়া আৰ তাৰ অনুচরের দল। মিনহাজ আৰ ইত্রাহিম দাঙ্ডিয়েছিলো গৱৰ দড়ি ধৰে, কেবল আদেশেৰ অপেক্ষায়।—এসব কিছু নেয়া ঠিক হবে কি না! ব্যাপারটা বুঝতে পেৰে বলি, ঠিক আছে নিয়ে চলো, কাজে লাগবে। সফল অপারেশন শেষে এবাৰ ফেৰোৱাৰ পালা। তবে এবাৰ সঙ্গে পাঁচটি গৰু।

পথে পড়লো মিঞ্চিৰ বাড়ি। বাইৱেৰ ঘৰে ধাক্কা দিয়ে প্ৰায় ভেঙে ফেলাৰ মতো অবস্থা কৰা হলো। সেই অবস্থায় দৰোজা খুলে গোলো। ভুইয়াৰ বাড়িৰ পাহারাদাৰৰ ব্যাটোৱ কাছ থেকে দৰ্খনকৃত পাঁচ ব্যাটোৱ টৰ্চে আলোয় আলোকিত কৰা হলো ঘৰে। পিন্টু কাৰ যেনো চুলেৰ মুঠি ধৰে বাঁকানি দেয়। আৰ বলতে থাকে, এয়াই ব্যাটো কি নাম তোৱ?

— জে, কি কইলেন?

কালো কুচকুচে খালি গা, তেলতেলে শৰীৱেৰ খূতনিতে একগোছা দাঢ়ি-মোটামুটি একটা কদাকাৰ দৰ্শন মানুষ। পৱনে লুঙ্গি। সেটা বাৰবাৰ খোলা আৰ গিটি লাগাতে ব্যস্ত লোকটা। আসলে সে বুঝতে পাৰছে না শেষ বাতেৰ এই অন্তসমেত আমাদেৱ মতো যুবকদেৱ আগমনেৰ কাৰণ। তাৰ দিজন্দিৰ মাথাৰ দিকটা ওলটাতেই বেৰ হয়ে আসে স্যান্ডেল ভাঙ্গ কৰে রাখা পাকিস্তানৰ পতাকা। মাথাৰ মধ্যে ধীঁ কৰে রঞ্জ চলে যায়। প্রচণ্ড একটা চড় কমে দিই শৈলশোলে, বল শালা তোৱ মাথাৰ নিচে পাকিস্তানেৰ পতাকা কেনো? চিৎকাৱ কল্পনা জন্মতে চাই। টলে পড়তে পড়তে সামলে নেয় সে নিজেকে আবাৰ সম ওজনেৰ জুলোকটা চড় কষাই অন্য গালে, বল, কোথায় পেলি পতাকা? ধীঁই কৰে পিন্টু এন্দৰ লাখি কমে তাৰ পাছায়, ক' হারামজাদা তোৱ নাম কি? এতোক্ষণে যেনে সামলে কৰে লোকটাৰ, আমাৱে মাইৱেন না, আমাৱে নাম কইতেছি, হাঁপাতে হাঁপাতে খুলো, আমাৱে নাম সামাদ মাস্টাৱ।

শালা, তুমই সামাদ মাস্টাৱ, বলে রাগে গড়গড় কৰতে কৰতে এগিয়ে এসে একৰামুল তাকে পেছমোড়া কৰে গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে। বিছানা-বালিশেৰ তলা, একটা চিনেৰ তোৱঙ্গ খুলে কিছু মানুষেৰ নাম লেখা কাগজ, নোটবই, ‘রাজাকাৰ বাহিনীতে যোগ দিন, দেশকে রক্ষা কৰুন, ভাৰতেৰ দালালদেৱ ধৰিয়ে দিন’—এ ধৰনেৰ স্লোগান লেখা বেশকিছু পোষ্টোৱ আৰ রাজাকাৰেৰ একটা ব্যাজ পাওয়া যায়। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে বেৰ হতে হতে প্ৰায় রাত শেষ হয়ে আসে। ফিরতি পথে ৫টা গৱৰ সাথে যোগ হয় একজন দালাল। উদ্ধাৰ কৰা পাকিস্তানেৰ পতাকটা দিয়ে মোতালেৰ তাৰ চোখ বেঁধে ফেলে এবং কোমাৱে দড়ি বেঁধে তাকে গৱৰ মতোই টেনে নিয়ে চলে।

৭.৮.৭১

যুক্তেৰ বাইৱে যুক্ত

হাইড আউটেৱ আভিনায় বয়ৱা বা সামাদ মাস্টাৱকে পেছমোড়া কৰে বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। তাৰ সাৰ্বৰ্ক্ষণিক পাহারায় নিযুক্ত রাখা হয় গাধা কমান্ডাৰ রেফুকে। চোখে

পঞ্চি বাঁধা অবস্থায় বয়রা মাটোর বিড়বিড় করে অনবরত দোয়া-দরূণ্দ আউড়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট বোৰা গেলো মৃত্যুভয় চুকেছে বয়রা মাটোৱেৰ মনে।

তুইয়াৰ বাড়ি থেকে নিয়ে আসা ১টা গুৰু জবাই করে তাৰ মাংস ৱান্না করে মিনহাজ। তাই দিয়ে দুপুৱে ছেলেদেৱ জন্য ভূরিভোজেৱ আয়োজন। ব্যাপারটা অনেকখানি মহাভোজেৱ সাথেই তুলনীয়। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়াৱ পৰ এই প্ৰথম গুৰুৱ মাংস জুটলো ছেলেদেৱ কপালে তাদেৱ গতানুগতিক রেশনেৱ সাথে। একটা আন্ত গুৰু জবাই কৰা, সেটা ছেলা, কাটাকুটি আৱ রান্না ইত্যাদি কৰাৰ ব্যাপার-স্যাপার সমস্ত হাইড আউট জুড়ে একটা আনন্দঘন পৱিবেশেৱ সৃষ্টি কৰে। গতৱাতেৱ অপাৱেশন সমস্ত হাইড আউটেৱ ছেলেদেৱ মধ্যে একটা সফলতাৰ আনন্দবাৰ্তা বয়ে এনেছে। এৱি ভেতৱে খুচিতে বাঁধা দালাল বয়রা মাটোৱকে উত্তৃক কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলছে। পাশ দিয়ে যাওয়াৰ সময় কেউই খৌচা দেয়াৰ লোভ সংবৰণ কৰতে পাৰে না। গায়ে খৌচা লাগলৈই বয়রা মাটোৱ কঁকিয়ে উঠছে, বাবাৱে আমাৱে ছাইড়া দ্যান, মাইৱেন না। লোকটাৰ আঝলিক টান থেকে বোৰা যায়, সঙ্গবত কুমিল্লা অঞ্চলেৱ লোক। পেটেৱ ধাক্কায় এদিকে মাটোৱ কৰতে এসে পাকিস্তানেৱ দালাল বনে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে একটুখানি ভাবি। কেনো সে এমনটা হলো। হয়তো এ অঞ্চলেৱ লোক নয়, এদিকে তাৰ কোনো বেস নেই। তাই উন্মুক্ত এই লোকটা হয়তো ভেবেছে, শক্তিশালী পাকিস্তানি পক্ষে থাকতে পাৱলৈই এদিকে তাৰ শিকড় গেড়ে বসা সন্ধি। দুপুৱেৱ পৰ মিনহাজ স্থানীয় দুজন মানুষ পিষ্টুচুটো গুৰু বিক্ৰি কৰতে চলে যায় গড়ালবাড়ি হাটে। হাত খৰচেৱ পয়সা নুৰুন্দি। দৱকাৰ আনুষঙ্গিক অনেক কিছু। মূলত কেনাকটাৰ জন্যই। গুৰু দুটো বুক্সকাৱেই বিক্ৰি কৰা।

তুইয়া নিহত আৱ দালাল সময়ে মাটোৱ বেসি। পাকিস্তানী আৱ দালালদেৱ মধ্যে অবশ্যই এ খৰ খুবই আঁকড়ে সৃষ্টি কৰবে। ফলে পাকিস্তানী চাইবে মুক্তিবাহিনীকে পাল্টা আঘাত কৰতে। এ ভৱনেৱ একটা সম্ভাৱনা বা আশঙ্কাৰ কথা সকাল থেকেই মনেৱ মধ্যে ভিড় কৰছিলো। দুপুৱে খাবাৰ পৰ তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, একদিনেৱ জন্য নালাগঞ্জ থেকে সৱে যেতে হবে। এখানে একটা সেকশন নিয়ে মালসামান পাহাৱাৰ দায়িত্ব থাকবে মিনহাজ। অবশিষ্ট দল মুভ কৰবে আগেকাৰ হাইড আউট নুৰুন্দিনেৱ বাড়িতে। হাড়িভাসা-পানিয়াছ রাস্তা ওখান থেকে কভাৰ কৰাৰ সুবিধে রয়েছে। অগ্সুৱান পাক বাহিনীকে ওখান থেকে সফলভাৱে বাঁধা দেয়া যাবে। আৱ ওভাৱেই সংক্ষ হবে নালাগঞ্জ বেসকে রঞ্জ কৰা।

জঙ্গেৱ পাশেৱ বোপাড় ভেড়ে নুৰুন্দিনেৱ বাড়িতে বিকেলেৱ ভেতৱেই সবাৰ সফল সিফ্টিং হয়ে যায়। ছেলেৱা তাদেৱ সাথে এনেছে শুধু অন্ত আৱ গোলাবাৰুণ। মালসামান রয়ে গেছে নালাগঞ্জ। রাতেৱ হালকা খাবাৰ নালাগঞ্জ থেকে নিয়ে আসা হবে, এ বন্দোবস্তেৱ ভাৱ মিনহাজেৱ সেকেন্দ ইন কমান্ড মমতাজ নিয়েছে।

বেশ সুন্মান আৱ নিৰিবিল নুৰুন্দিনেৱ শ্রাম। নুৰুন্দিন লোকটা ব্যক্তসমস্ত হয়ে সবাইৰ আৱাম-বিৱামেৱ দিকটা দেখছে। এদিকে দ্রুত গড়িয়ে আসছে বিকেল। সূৰ্যেৱ আলোৱ তেজ তাই কমে আসছে। পিন্টুকে সাথে নিয়ে বাড়িৰ আঞ্চলিক

খড়বিচুলির গাদায় শরীর এলিয়ে দিয়ে রাতের অপারেশন পরিচালনার খুঁটিনাটি দিকগুলো ঝালিয়ে নিছি। রাতে প্রোটেকটিভ পেট্রল নিয়ে যেতে হবে বদলুপাড়া। জানতে হবে পানিমাছ পাক ঘাঁটির সর্বশেষ অবস্থা। ওরা রাতের বেলা মূত করলে ওদের সাথে যুক্তে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। সে জন্য জোরদার প্রোটেকটিভ পেট্রল দল তৈরি করতে হয়েছে। একাব্বার, সজি আর করিম যাবে শান্তিবাহিনী আর চিহ্নিত দালাল আজিজুল হক প্রধানসহ অন্যদের বাড়ির দিকে। সুযোগ পেলেই তারা চিহ্নিত দালাল যাকেই পাওয়া যাবে, তার বাড়িতেই ঘোনেড চার্জ করে তাদের হত্যা করে আসবে। পিন্টুর সাথে টুকটাক কথা সেরে পরিকল্পনাগুলো চূড়ান্ত করছি। বিকেলের সূর্য হিমালয়ের সুবিস্তৃত দেহের ওপর তার সোনালি আভা ছড়িয়ে দিয়েছে। হিমালয়ের নিচের দিকটা ছায়া ছায়া অঙ্ককার হয়ে আসছে। মাথায় তার ঝকঝকে সোনালি মুকুট। চমৎকার নয়নত্বরাম দৃশ্য।

ঠিক এমন সময় আহিদার এলো। একটা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এলো সে। তার পাশে হাফপ্যান্ট পরা দুলুর কিশোর বয়সী ভাই তরু। সে আহিদারকে ডাবুরডাঙ্গার এই হাইড আউটের পথ চিনিয়ে এনেছে। বেরুবাড়ি-সাকাতি এলাকার কমান্ডার আহিদার। ভাঙচোরা কর্দমাক্ত রাস্তায় সাইকেল ঠেলে আসতে গিয়ে গলদণ্ড হয়ে পড়েছে সে। সাইকেল ঘরের সাথে বেঞ্জে দিয়ে রেখে ধপাস করে বসে পড়ে সে আমার পাশে বড়ের গাদায়। পানি চালিলো সে। একজন দৌড়ে গিয়ে পানি এনে দিলো। সময় নিয়ে পানি খেল। জীৱনের হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছলো। আহিদার এভাবে আসবে ব্যাপারটা ভাবুচ্ছ অবাক লাগছে। আহিদার বড়ো কোনো বিপদ বাধিয়ে বসেছে কি?

— কি হয়েছেরে আহিদার? তুম ক্লান্ত-শ্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করি। পিন্টু কিছুক্ষণ আগে উচ্চ প্রদৰে ছেলেদের ফল-ইন করিয়ে ব্ৰিফিংয়ের প্রস্তুতি নিছিলো। সেও এসে বসলো পাশে, কী দোষ, হঠাৎ করে যে! শালা পালাইচো অপারেশন ছাড়ি?

আহিদার পিন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত হাসি হেসে বলে, না দোষ। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, ওরা আসছে।

— কারাব? কেনো? কোথায়?

— ওরা, আজ রাতে দুলুকে ধৰতে আসবে, আর সেই সাথে তুলে নিয়ে যাবে বাড়ির মেয়েদের।

— কি বলছিস পাগলের মতো? ওদের কেনো নিয়ে যাবে?

— দুলু নকশালিট, এ জন্য তাকে ধৰবে আর সেই সাথে নিয়ে যাবে ওদের বাড়ির মেয়েদের।

— দূর, বাজে কথা, কোথায় পেলি তুই এসব?

— সংবাদ সঠিক মাহবুব ভাই, আজ রাতেই ওরা আসবে দলবল নিয়ে, প্ৰোগ্রাম হয়ে গেছে।

— কে পাঠাচ্ছে ওদের?

— বেরুবাড়ির শুকলাল বাবু, পেছনে নেতার হাত রয়েছে। নেতার হয়ে কাজ করছে শুকলাল বাবু।

— কেনো?

— দুলু তো নকশাল হিসেবে চিহ্নিত। শুকলাল বাবুর ভয় নকশালদের। বাংলাদেশের নকশালিট দুলুকে ধরিয়ে দিতে পারলে শুকলাল বাবু কিছুটা বাহাদুরি নিতে পারবেন। ওদের নেতাও বেশ ক'বার দেখা করতে বলেছিলো দুলুকে। কিন্তু সে যায় নি।

— যায় নি কেনো?

— দেশে থাকতে সে ভাসানী ন্যাপ করতো, নেতার সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধ ছিলো। এবাবে এসে নেতা ছড়িয়েছেন যে, সে একজন পাকা নকশালিট। এসব বলে তিনি শুকলাল বাবুদের মতো লাখপতি মানুষদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন, এখন বেরুবাড়ির শুকলাল বাবুসহ অন্যরাও চাইছেন দুলু ধরা পড়ুক।

— সর্বনাশ! দুলু নকশাল নয়, সেতো এখন আমাদের সাথে থেকে রাতিমতো মুক্তিযুদ্ধ করছে।

— সে খবরও ওরা পেয়েছে, কিন্তু তিনি এ সুযোগটা কাজে লাগাতে চান।

— কখন আসবে?

— আজ রাত আটটার পর।

— তুই এতোসব কনফার্ম জানলি কী করিবো?

— নুরুল ভাইয়ের কাছ থেকে। কেন্দ্রীয় এসেছিলাম কিছু কেনাকাটা করতে। নুরুল ভাইয়ের সাথে দেখা হতেই হচ্ছে ব্যাপারটা জানালেন। তিনি জেনেছেন বি.এস.এফ-এর হাবিলদারের কাছ থেকে। গতরাতে শুকলাল বাবুর আসরে হাবিলদারও উপস্থিত ছিলেন। নুরুল ভাই এই সাইকেলটা যোগাড় করে দিয়েছেন দ্রুত খবরটা আপনাকে পৌছে দিতে।

— নুরুল ভাই তোকে পাঠিয়েছে? ওরা আসবেই?

— হ্যা, নুরুল ভাই না পাঠালেও আমি আসতাম। আপনারা তো জানেন, দুলুদের সাথে আমার মোটামুটি একটা নিকট আঞ্চলিক সম্পর্কই রয়েছে। আমার মায়ের দিক থেকে। আমার খালা হন দুলুর মা। এ অবস্থায় ব্যাপারটা জানতে পেরে আমি অস্ত্র হয়ে পড়েছি। আমি তো অনেক দূরে থাকি। আমার পক্ষে অতো দূর থেকে কিছুই করা সম্ভব না। আপনারা ওদের কাছাকাছি আছেন, কিছু করলে আপনাদেরই করতে হবে। কৃতাদের হাত থেকে ওদের বাঁচাতেই হবে। কথা বলতে বলতে আহিদার রাগে-দুঃখে ইমোশনাল হয়ে ওঠে।

— ঠিক আছে, তুই ঠাণ্ডা হয়ে বস, আমরা যখন আছি তখন একটা কিছু উপায় হবেই। একরামুলকে ডেকে ওদের জন্য কিছু খাবার যোগাড় করতে বলে, পিন্টুকে নিয়ে বাইরে এলাম। কিছুটা পরামর্শ করা দরকার। যুক্তির বাইরে যুক্ত। একটা বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার। এক্ষেত্রে ঝুঁকিটা নেয়া ছাড়া উপায়ও নেই। দুলুরও সকাল থেকে পাতা নেই। সম্ভবত ক্ষেত্রে ফসল তোলার ব্যাপারে সে তার আধিয়ার প্রজাদের নিয়ে

ব্যক্তি। এই গভীর সংকটের কথা সে হয়তো জানেই না।

অবশ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আমরা যাবো। রাতের অপারেশনের কিছুটা পরিবর্তন করা হলো। একটা ছোট দল নিয়ে যাবে মধু বদলুপাড়া পর্যন্ত। একাব্বার যাবে তার তিনজনের দল নিয়ে। আমরা যাবো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যুক্তি, যে যুক্তি রুটিন বা গতানুগতিক কিছু নয়। বাটপট তৈরি হয়ে নিতে বললাম পিন্টুকে। আমি নিজেও তৈরি হয়ে নিলাম।

আজকের রাতের নির্ধারিত অপারেশন বাতিল। পাকবাহিনী আজ নিশ্চিতে থাক, আমাদের সামনে অন্য এক অপারেশন। ভিন্নধর্মী এক যুক্তি। কী সময়! কী মানুষ!

সূর্য ভুবুর মুহূর্তে আমরা রওনা দিলাম। আল-কাদা ভেঙে ভাঙচোরা রাস্তা ডিয়ে আমাদের যেতে হবে নালাগঞ্জ। সে প্রায় চার মাইলের মতো পথ।

৮.৮.৭১

বিতাড়িত হায়েনার পাল

কোনো দেশ বা জাতি যখন যুক্তি জড়িয়ে পড়ে, তখন সবার ভূমিকা এক থাকে না। কেউ শক্তির পক্ষে থাকে প্রকাশ্যে, কেউবা পরোক্ষে। শক্তিপক্ষে যারা থাকে, তাদের চেনা যায় সহজে। তাদের মনোভাব আর কাজের ধরণকে বলে দেয় তারা শক্তিপক্ষের, তাদের চিনতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যারা পরোক্ষে থাকে, আড়ালে-আবাদালে কাজ করে শক্তির মতো, পেছন থেকে, তাদের চেনা সহজেই মুশকিল। মুক্তিযুক্তের ছবিহায় এ ধরনের কতো অমানুষ যে দাঁড়িয়ে গেছে দেশে, তার শেষ নেই। সামনে বিরাট একটা যুদ্ধ, দেশটাকে স্বাধীন করব জন্য একদিকে প্রতি ফ্রন্টে দিনরাত লড়াই, গোলাগুলির তাওবলী, বিভাসিক বাতসতা, হত্যা আর মৃত্যুর মৃশংসতা, দেশের ভেতরে বাদি মানুষজনকে দখলেন্দুর বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার জন্য লড়াই, অন্যদিকে তখন সীমান্তের এপারে প্রায় এক কোটি শরণার্থী মানুষজনকেও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই। হায়েনারা দেশের ভেতরটাকে খুবলে খুবলে থাক্কে। মানুষ মারছে নির্বিচারে। লুট করে নিছে ধন-সম্পদ। পুড়িয়ে ছারখার করে দিছে শহর-বন্দর আর গ্রামের জনপদ। লুট করা হচ্ছে মা-বোন আর নারীর সম্রম-ইজ্জত। তাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য প্রতিদিন শত সহস্র মানুষ আসছে সীমান্ত পেরিয়ে। তারা আসছে সর্বস্বাত্ত্ব হয়ে। এপারে আসছে তারা—একটা বিরাট অবিচ্ছ্যতার দুর্ব্বিতাকে সঙ্গী করে। তবু তাদের বিশ্বাস, আছে এপারে আশার আলো। এপারে এলে অস্তত জীবন বাঁচবে। নারীর সম্রম লুট হবে না। এপারের শরণার্থী শিবিরের জীবনযাপনের ধারা তা অত্যন্ত মানবেতর। কিন্তু তা হলেও আছে স্বত্তি। এ ধারণা নিয়েই প্রতিদিন মানুষের ঢল আসছে এ পারে। আসছে আর আসছেই।

কিন্তু এপারে জীবনের নিচয়তা থাকলেও স্বত্তি আছে কি আসলে? হায়েনার পাল ঘোরাঘুরি করছে এপারেও। এসব হায়েনা এসেছে দেশের ভেতর থেকে। মুক্তিযুক্তের নামে, মুক্তিযুক্তের আবরণে। যারা দেশে সবকিছু ফেলেফুলে রেখে কেবল জানটুকু সংহল করে এপারে এসেছে, আশ্রয় নিয়েছে শরণার্থী শিবির কিংবা এদিকে-ওদিকে

আস্থায় কিংবা অনস্থায়ের বাড়িতে, তাদের সাথে আসা কিশোরী বা যুবতী মেয়েরা এসব হায়েনার পালের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ওপারে যেমন প্রতিদিন হিস্ট্রি পাকবাহিনীর পাশবিকভার শিকার হতে হচ্ছে দেশবাসীকে, তেমনি কিছু অসহায় পরিবারকে তাদের সন্ত্রম রক্ষার জন্য ছুটোছুটি করে বেড়াতে হচ্ছে এপারেও। দুলুদের পরিবার তেমনি একটি।

ফ্যাকাশে জোছনার রাত। বিকেলের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে পাতলা মেঘের ছুটোছুটি। অর্ধ বৃত্তাকার চাঁদ মেঘের ফাঁক গলিয়ে মুখ দেখাতে পারছে না। মেঘের আবরণ ভেদ করে। পৃথিবীর বৃক জুড়ে তার আলো পৌছে দেয়ার তীব্র প্রচেষ্টা। ফলে সৃষ্টি হয়েছে একটা ঘোঘাটে ফিকে আলো-আঁধারির ভৃত্যে পরিবেশ। সেই ভৃত্যে আলো-আঁধারিতে পথ চিনে চিনে আমরা তখন হাজির গোলজার সাহেবের বাড়িতে। হাইড আউট থেকে সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় ৪/৫ মাইলের কাদা-পানি সিঙ্গ ভাঙচোরা রাস্তা ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে। একটানা ক্লান্তিকর হেঁটে আসবার কারণে পরিশ্রান্ত সবাই বাড়ির বাইরের চতুরে এদিক-ওদিক ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়েছে। আহিদার বাড়ির ভেতরে গেছে। কিছুক্ষণ পর সে বের হয়ে আসে, তার পেছনে একজন প্রবীণা। হাতে হারিকেন নিয়ে একজন তার পেছনে। বয়ঙ্কা ওই মহিলাই দুরু মা। আহিদার তার খালার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। হারিকেনের জাবছা আলোয় আমি প্রবীণার ভেতে পরা চেহারা দেখি। এগিয়ে এসে তিনি আমার হাত জড়িয়ে ধরেন এবং কেঁদে ওঠেন ফুপিয়ে। আমি তার এই কষ্টের কান প্রস্তুত করি। অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন মহিলা। কল্পাভেজা গলায় তিনি বলেন, মাঝে, এপারে এসেও কি মেয়েদের বাঁচাতে পারবো না? দেশে থাকলে এর চেয়ে কেমন আর কি হতে পারতো? পাকবাহিনী না হয় গুলি করে মারতো। কিন্তু এখানে এপারে কীভাবে বাঁচাই বাবা ওদের?

— আপনার ছেলে দুল ক্ষেত্রে, সে আসে নি?

— ওর কি বাবা শান্তি জানে? তোমাদের কাছে থাকলে ভালো থাকে, কিন্তু এপারে ওকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। ও নাকি নকশাল। ওকে ধরার জন্য ওরা খোজাখুঁজি করে। প্রবীণার কথা শোনার পর তাকে আমি সাস্ত্রণা দিই। আপনি অস্থির হবেন না। শাস্ত্র হোন। দেখবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তো এসেছি। যান ভেতরে যান। কোনো ভয় নেই। কোনো বিপদ হবে না। আহিদার তুমি ওনাকে ভেতরে নিয়ে যাও।

আহিদার তাঁকে ভেতরে নিয়ে যায়। আমরা বাড়ির বাইরের চতুরে। এখন আমাদের যুক্ত শুরু করতে হবে দুই ফ্রন্টে। দেশের ভেতরে এবং বাইরে, সীমান্তের এপারে। সুতরাং প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ছেলেদের বিভিন্ন পজিশনে রেখে আমরা পুরুরের ধারে এলাম। বসলাম মাঝে বয়সী ঝাঁকড়া আমগাছটার গুড়িতে ঠেস দিয়ে। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। বাড়ির লোকজন ভয় পেয়েছে। ভালো মানুষ গোলজার সাহেব আমাদের উপস্থিতিতে সাহসী হয়ে উঠেছেন। তিনি বারবার বলেছেন, ব্যাপারটা তিনি কালকেই জলপাইগুড়ি গিয়ে কংগ্রেস নেতাদের কানে তুলবেন। সারাজীবন তিনি কংগ্রেস করেছেন। দেশে কংগ্রেসের রাজত্ব চলেছে। তিনি দেখে নেবেন তার বাড়িতে

হামলা করার সাহস তারা কীভাবে করে! আজ রাতটা ভালোভাবে কাটুক। গোলজার সাহেবে চাইছেন, আজ রাতটা ভালোভাবেই কাটুক। কিন্তু তার কথাতেই আমার শক্তি ঘরে পড়ে। রাতটা ভালোভাবে কাটবে কি? আমি ভাবি, কে জানে, দেখা যাক।

বাড়ির ভেতর থেকে চা আসছে। খাচ্ছি। কথা বলছি। সিগারেট টানছি একটার পর একটা। একটা অস্থির অপেক্ষা ওদের জন্য। যদি বাড়াবাড়ি কিছু করে বসে ওরা, মোতালেবকে বলা আছে, গুলি করে যেরে ফেলবি। তারপর টেনে নিয়ে যাবি মৃতদেহগুলোকে বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে। তারপর পুঁতে ফেলবি মাটির নিচে। গুম করে দিবি চিরদিনের জন্য। দেখা যাবে কী হয়!

রাত ন'টার পর একটা মোটর গাড়ির হেড লাইটের উজ্জ্বল আলো দেখা গেলো। বেঁকুবাড়ির দিক থেকে ধীরে ধীরে গাড়িটা এগিয়ে এলো। এসে থামলো প্রায় তিন শ' গজ দূরে জেলা বোর্ডের সড়কের ওপর। এ সময় হেড লাইটের আলোটা নিভিয়ে ফেলা হলো। ফলে চারপাশের অক্কার পরিবেশটা কিছুটা ভীতিকর হয়ে উঠলো। যেখানে গাড়িটা থেমেছে, সেখান থেকে এ বাড়িতে আসবার পথটা অপ্রশন্ত। জিপগাড়ি আসবে না এ পথে। ওরা রাস্তার মোড়ে গাড়ি থামিয়েছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। এরপর ওদের গাড়ি থেকে নামার শব্দ পাওয়া গেলো। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সলাপরামর্শ সেরে ওরা এগিয়ে আসতে লাগলো। একজনের হাতে টর্চ জুলছে-নিবছে। সবার মুখেই সিগারেট। মোট স্বচ্ছজন। পাঁচটা আগুনের কণা জুলজুল করে এগিয়ে আসছে। বাতাসে ছিসে আসছে ওদের মৃদু কথাবার্তা। অহসরমান ছায়াগুলো ধীরে ধীরে মানুষের উজ্জ্বলতায়ের ধারণ করে। আমরা তখন অপেক্ষা করছি ওদের জন্য। গাছের গুড়িতে চেন্সেয়ে ভেজামাটি ঘাসের ওপর বসে থেকে।

রাস্তাটা সোজা এসে পুরুরুশ পুশ ঘেষে বাড়ির দহলিজে এসে ঠেকেছে। এটা গোলজার সাহেবের নিজস্ব বাড়িতে আসবার রাস্তা। বাড়ির দহলিজে একটা গুরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে সামনের দিকে মুখ ঠেকিয়ে। ওরা এসে থেমেই টর্চের আলো ফেললো গুরুর গাড়িটার ওপর। এরপর টর্চের আলো ঘুরলো বাড়ির দিকে। বৈঠক ঘরের দিকে।

ঠিক সেই সময়ই মোতালেবের কর্কশ গলা রাতের অক্কারের নিষ্ঠক্তাকে কাঁপিয়ে বেজে উঠলো, শুয়োরের বাচ্চা টর্চ নেতো। হাত তুলে দাঁড়া। কোনো শালা নড়বি না। বুক ঝাঁঝরা করে দেবো কুস্তার বাচ্চার দল। অক্কারের ছায়ায় শুকিয়ে থাকা শরীরগুলো এগিয়ে আসতে থাকে। ওদের চারদিক থেকে দ্রুত ঘিরে বৃত্ত রচনা করে ফেলে সবার হাতের উদ্যত রাইফেল, এস.এল.আর এবং স্টেনগানগুলো। ট্রিপারে আঙুল। এ্যাসোট ভঙ্গিতে পরিকল্পনা মতো ওদের ঘিরে ধরা হলো।

মোট ১৫ জন ওরা। আমি এখন কিছুই জানি না। কেননা এ-অপারেশনের দায়িত্ব মোতালেবের ওপর। মোতালেব পরিকল্পনা মতো সবকিছু করবে। আমরা গা ঢাকা দিয়ে থাকবো। আমাদের পরিচয়টা স্ট্র্যাটেজিক কারণে হামলাকারী লোকগুলোর কাছে যাতে প্রকাশ না পায়, সে জন্যই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

— কে আপনারা? কাঁপা গলায় প্রশ্ন ওদের দলপত্রির।

— হীরালাল বাবু, আহিদার ফিসফিসিয়ে বললো, শুকলাল বাবুর এক নম্বর চামচা।

— তোর বাপ, মোতালেবের একই গ্রামে কর্কশ গলায় উন্নত !

ওদের চারদিকে বৃক্ষাকারে উদ্যান অঙ্গ হাতে দাঁড়িয়ে ছেলেরা । মোতালেব এগিয়ে গিয়ে টট্টা ওদের একজনের হাত থেকে কেড়ে নেয় । এরপর শুরু হয় প্রত্যেকের শরীরের সার্চ পর্ব ।

— না কিছু নেই, শালারা খালি হাতে আসছো বাঘের গুহায় ? কী জন্য এখানে আসছিস শালা- বা... বল ? এরপর শোনা যায় ধাম করে রাইফেলের বাঁটের বাড়ি মারার শব্দ । বোৰা গেলো, শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলেই আঘাতটা করেছে মোতালেব । আর সেই আঘাতে ধ্পাস করে মাটিতে ধরাশায়ী হয় হীরালাল । একটা গৌৎ শব্দের পর, বাবারে মরে গেলুম ধরনের একটা আর্তনাদ রাতের পরিবেশকে বিদীর্ণ করে তোলে । তার তেতুরেই টেনে-ইচড়ে দাঁড় করানো হয় ধরাশায়ী হীরালালকে । তারপর অস্ত্রের মুখে ঠেলতে ঠেলতে ওদের ওরা নিয়ে যায় গাড়ির কাছে । সেখানে আগ থেকে করা পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে থাকে ধোলাই । মুরতি ক্যাম্প থেকে শিখে আসা জুড়ের মারপ্যাচ অর্থাৎ খালি হাতে শক্তির মোকাবিলা করার জন্য যে কসরত শেখানো হয়েছিলো, ঢালাওভাবে শেষজো চলতে থাকে রাতের ওই পাঁচ অতিথির ওপর ।

হীরালাল মোতালেবের পা জড়িয়ে ধরে । অন্য চারজনেও তাদের ভূমিশয়্যা থেকে মাফ চাইতে থাকে । জানাতে আসে প্রাণভিক্ষার জন্য কাকুতি-মিনতি । একসময় থেমে যায় মোতালেবের ধেকেছির পর্ব । কিন্তু সে হীরালালের চুলের শুষ্ঠি ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে বলতে থাকে, কে তোকে পাঠিয়েছে, শুকলাল ?

— জি ।

— আর কে ?

— ঠিক জানি না ।

— আর আসবি এদিকে ?

— না জীবনেও না ।

— ঠিক ?

— ঠিক ।

— ও, কে কান ধরে ওঠবস কর সবাই । নির্দেশ মতো ওরা তাই করে । মোতালেব এবার তার স্টেনটার নল ঠেসে ধরে হীরালালের বুকের ওপর । এবার তোমাদের ছেড়ে দিলাম, কিন্তু পরের বার যদি আসিস তাহলে... । হীরালাল, কাতর গলায় বলে, আর আসবো না সত্যি বলছি বিশ্বাস করেন... ।

— ঠিক ?

— জি, ঠিক ।

— ও, কে গাড়িতে ওঠ শালারা । তোদের ওস্তাদকে গিয়ে বলবি, এদিকে আর একবার আসলেই জীবন নিয়ে আর ফিরতে হবে না ।

— ঠিক হ্যায়, জি আচ্ছা, ঠিক হ্যায়।

— তাহলে দোষ্ট এবার মোক তুমহারালা সিগারেট খিলাও।

ওরা মোতালেবসহ অন্যদের সিগারেট দেয়। সিগারেটে আগুনও ধরিয়ে দেয়। দোষ্টির নয়নাথরূপ মোতালেব মিয়াকে পুরো এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দেয়। এরপর মোতালেব হীরালাল-শুকলালের বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত কবুল করিয়ে ওদের ছেড়ে দেয়। অঙ্ককারে গাড়ি স্টার্ট দেয়। দ্রুত পলায়নপর গাড়িটা টালমাটাল অবস্থায় ফিরে যেতে থাকে আবার বেরবাড়ির দিকে। যে রাস্তা ধরে এসেছিলো, সেই রাস্তা ধরেই।

মোতালেব এবার তার দলবল নিয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে অপেক্ষমাণ আমাদের দিকে ফিরে আসতে থাকে। আমাদের সবারই প্রিয় মোতালেব। ম্যাট্রিক পর্যন্ত তার পড়াশোনার দৌড়। ঠাকুরগাঁও শহর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে একটা ছিমছাম নিবিড় গ্রামের ছেলে সে। ওদের থামের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে রেললাইন। দিনে-রাতে দুটো টেন যায়, দুটো টেন আসে—পঞ্চগড় থেকে ঠাকুরগাঁও-দিনাজপুর। রেললাইনের মতোই সোজা আর সরল ছেলে ও। কিন্তু বিশ্বস্ততা আর সাহসিকতা তার তুলনা মেলা ভার। অক্ষম্বব কঠোর আর নির্মম ও শক্তির মুখ্যমুখ্য দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ আগেই হয়তো জুন্নার গল্প করছিলো একজনের সাথে, অস্তরঙ্গ বন্ধুর মতো। তখন হয়তো বলা হয়েছে, মোতালেব, লোকটা একটা দালাল, ওকে বেঁধে ফেল গাছের সাথে আম প্রকৃকবাহিনীর খবর বের কর খোলাই দিয়ে। ব্যাস, আর কোনো কথা নেই, মুঝে সুন্দেহে ফিরে যাবে মোতালেব। আমাদের মোতালেব মিয়া। পাকড়াও করা লেকচারেক কিছু বলার অবকাশ দেয়ার আগেই তার চুলের গোছা ধরে কাঁধে বসিয়ে দেখে নিজস্ব স্টাইলের রন্ধা। এরপর চলবে কিছুক্ষণ ফ্রি স্টাইলের মার। শেষে প্রিয়ভাঙ্গ করে বেঁধে নিয়ে আসবে আমার সামনে, মুখে তার দোহাতি খিপ্পি, শালা তেরে বাপ ইনি, কহেক শালা, পঞ্চগড় বিজের দুই পাশোত কতোটা বাক্সার বানাইছে খানের বাচ্চারা, কহেক শালা...।

তো, আমাদের এহেন সেই মোতালেব ওদের গাড়িতে তুল দিয়ে ওদের কাছ থেকে বেরবাড়িতে খাবার দাওয়াত নিয়ে শিস বাজাতে বাজাতে ফিরে এলো। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, ওয়েল ডান মোতালেব, খুব ভালো হয়েছে।

— ব্যাটারা আগোত সারেন্ডার করছিলে। মারা গ্যালোনাগে বেশি। শালা হারামির দল, ভীতু চামচিকার বাচ্চা, না মাইরতে মুতে দিল গে!

ওর কথায় আমরা হেসে ফেলি।

— নেন মাহবুব ভাই সিগারেট ধরান। পিন্টু ভাই, আহিদার ভাই, আপনারাও নেন।

মোতালেব সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দেয়। পানামা। ভারতের বর্তমান সময়ের সবচাইতে ভালো সিগারেট। মুহূর্তে সবারই ঠোটে সিগারেট জুলে ওঠে। আর সুখ টান দিতে দিতে পিন্টু ঠ্যালা মারে আহিদারকে, দোষ্ট বাড়ির ভেতর যাও, খালাম্বাক কও, গরম চা পাঠাবার জাইন্য।

ওরা ফিরে গেছে। কিন্তু রাতের বেলা আবার আসতে পারে, এরকম একটা শঙ্কা থেকেই গেলো। সূতৰাং নিচিন্ত হওয়ার উপায় নেই। জেলা বোর্ডের রাস্তায় পেট্টেল পার্টির টহল পাঠিয়ে বাড়িটার চারদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে পুরোপুরি সতর্কতা নিয়ে সারারাত সজাগ থাকতে হলো। আহিদার নিচিন্ত হতে চায়, এরপর কী হবে?

— তুই ভাবিস না। এখানে একটা সশন্ত দল আমরা রেখে যাবো। দিনরাত চবিশ ঘণ্টা এরা সমস্ত পরিবারের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে। এছাড়া আমরা তো কাছাকাছি থাকছি সীমান্তের ওপারেই। তেমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে হাজির হয়ে যাবো।

রাত শেষ হয়ে আসে। হিমালয়ের কালো শরীর জেগে উঠতে থাকে। আমরা ফেরার প্রস্তুতি নিই। জয়নালের নেতৃত্বে ছয় এক-এর একটি দল আপাতত এখানে থাকবে সশন্ত অবস্থায়। দিনরাত পালা করে পাহারা দেবে এরা। হাইড আউট থেকে নিয়মিত রেশন আসবে ওদের জন্য। এমনিতে এদের দিন কাটছে নিদারণ কষ্ট আর কৃত্তুতার ডেতে। ৭ জনের তিন বেলা খাবার জোটানো এদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়বে। জয়নালকে ডেকে ঠিকভাবে ব্রিফিং দেয়া হয়। অতিরিক্ত গোলাগুলি এবং হ্যান্ড গ্রেনেড দেয়া হয়, যাতে প্রয়োজনে ঘাটতি না পড়ে। ফ্রন্টের বাইরে এভাবে একটা সশন্ত দলকে একটা সাধারণ শরণার্থী পরিবারের প্রহরায় নিষ্পত্তি করাটা সম্পূর্ণ বিধি-বহির্ভূত ব্যাপার জানি। এর জন্য হয়তো ভবিষ্যতে কৃতন জবাবদিহি হওয়াটাও বিচির কিন্তু নয়। কোর্ট মার্শালও হতে পারে। কিন্তু এখন এ পরিস্থিতিতে তৎক্ষণিকভাবে এধরনের একক সিঙ্কান্স দেয়া ছাড়া গভৰ্নেন্স নেই। ব্যাপারটা যে যেভাবেই নিক, যুদ্ধটা এখন জনযুক্তের পর্যায়ে পেশে গেছে। ডেতের-বার সব ফ্রন্টেই আমাদের তৎপরতা চালাতে হবে। তা না হল প্রেনেককেই বাঁচানো যাবে না। আর যাদের জন্য এ যুদ্ধ, তাদেরই যদি বাঁচানো না হয়, তাহলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ফিরবার সময় আহিদার কেমন যেনো আবেগময় হয়ে ওঠে। আপনাদের এ কষ্ট, এ সাহায্যের কথা মনে থাকবে। গোলজারেরও একই বজ্রব্য। হাত জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন, আপনাদের এ ঝগ জীবনেও শোধ দেয়া যাবে না।

ঠিক আছে, ঘাবড়াবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে—এ ধরনের সাত্ত্বনা বাক্য উচ্চারণ করে আমরা রওনা দিই হাইড আউটের দিকে। সোজা পুবমুখো যাত্রা। ভোরের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে আসছে।

হাইড আউটে ফেরার পর একরামুল রিপোর্ট দেয়, পেট্টেল পার্টি ফিরে এসেছে। পাকবাহিনীর মূভমেন্টের খবর পাওয়া গেছে হাড়িভাসার দিকে। একাবারের দল গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে নকিয়া প্রেসিডেন্টের আর অজি আবদুলের বাড়িতে। ওদের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৩ জন মারাও গেছে এই হামলায়।

নিজের মতো করে সাজিয়ে নেয়া

বেরবাড়ি বি.এস.এফ ক্যাম্পে মেজর দরজির কাছে গত ক দিনের অ্যাকশনের রিপোর্ট করা হলো। মন দিয়ে শুনলেন তিনি। পাকবাহিনীর বড়ো দালাল ভূইয়ার খতম হওয়ার

খবরটা তাকে উৎফুল্ল করে তুললো। সর্বশেষ পাক আর্মির অবস্থান এবং তাদের মুভমেন্ট খবরাখবর নিলেন বিস্তারিতভাবে। মোটবুকে টুকে নিলেন সবকিছু।

দরজি আজ অত্যন্ত ভালো মুড়ে আছেন। কড়া কথা বলছেন না, ধমক দিচ্ছেন না একটাও। অথচ এ ব্যাপারটাতেই আমরা অভ্যন্ত হয়ে পড়েছিলাম। দরজির খোশ-মেজাজের সুবাদে আমাদেরও মন ভালো হয়ে গেলো। চা-পান পর্বের অবসরে তিনি যুক্তের কথা, তার দেশের কথা আর পরিবারের কথা বলে চললেন। পাহাড়ি মানুষ দরজি। সেনাবাহিনীতে নন-কমিশন হয়ে চুকে পরবর্তীকালে কমিশন পেয়েছেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে এ ধরনের সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানালেন। এরপর আন্তর্জাতিক পরিষ্ঠিতি, শরণার্থী সমস্যাসহ নানাবিধি কথা বলে চললেন, তার মতো করেই। শেষে তিনি পরবর্তী প্রোগ্রাম দিলেন। টুকে নিতে বললেন তিনি। তার সর্বশেষ নির্দেশ :

সারণি-৬

হাড়ভাসার দিকে পাকবাহিনীকে ঠেকাবার জন্য ১ নম্বর কোয়াড হাইড আউট নেবে কাজলদিঘিতে।

২ নম্বর কোয়াড হাইড আউট নেবে অমরখানাম গ্রামতাতে আক্ষণনের সাথে সাথে পাক বাহিনীর অবস্থান ও চলাচলের খবর সংজ্ঞহ করতে হবে। যে খবরগুলো জরুরিভাবে সংযুক্ত করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে—

— পাকবাহিনীর পরিচয়পত্র। তাঙ্গো পাকড়াও করে কিংবা হত্যা করে তাদের কাছ থেকে পরিচয়পত্র যোগাড় করাতে হবে এবং জানতে হবে তারা কোন ইউনিটের, তাদের র্যাঙ্ক কি, ইত্যাদি।

— পাকবাহিনীর যতেক স্বত্ত্ববেশ ক্ষতি এবং তাদের হতিয়ার সংযুক্ত করতে হবে।

— ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগঙ্গাজগন্ডল মেইন রোড অর্থাৎ পাকা সড়কের ওপর দিয়ে তাদের চলাচল কিংবা গতিবিধির সঠিক খবরাখবর নিতে এবং কী ধরনের অন্তর্শক্তি তারা বহন করছে, সেটা জানতে হবে।

(সূত্র : ডায়েরী)

যুদ্ধের পতি পাল্টাছে দ্রুত। পাকবাহিনী সংজ্ঞান বিস্তারিত তথ্য এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। মেজর দরজি একটু থেমে আবার বললেন, তোমাদের ওপর এ তার দেয়া হলো। তবে সংগৃহীত খবরাখবর বা তথ্য অবশ্যই জেনুইন হতে হবে। আমার বিষ্ণুস, তোমরা মিথ্যে রিপোর্ট বা বাসেয়াট কিছু বলবে না। যনে রাখবে, এর ওপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতের অনেক কিছু। যা তোমাদের প্রয়োজনে আসবে এবং যৌথভাবে আমাদের কাজে লাগবে।

মেজর সাহেব এরপর উঠলেন। আমরা তাকে আশ্বস্ত করি এই বলে, তার নির্দেশ পালিত হবে যথাযথভাবে। তবে এই মুহূর্তে কিছু কথা তার কাছে আমরা ফাঁস করি না। আর সেটা হচ্ছে, গোলজার সাহেবের বাড়িতে গত রাতের অপারেশন এবং

সেখানে প্রোটেকশন পার্টির নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারটি। আর অন্যটি হচ্ছে, বর্তমানে ১ নম্বর ও ২ নম্বর ক্ষোয়াড়ের আলাদাভাবে কোনো অস্তিত্ব নেই। দুটো ক্ষোয়াড় এখন একত্রে মিলিত হয়ে একটা একক ইউনিটে পরিণত হয়েছে। আমি এর কমান্ডার আর পিন্টু আমার টোয়াইস-ই অর্থাৎ সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। সীমান্তের ওপারে ব্যস্ত যুদ্ধের জীবন্ত ফ্রন্টে আমাদের এভাবে আপনা আপনিই এক হয়ে যেতে হয়েছে। এখন দুটো ক্ষোয়াড়ের অস্তিত্ব কেবল কাগজপত্রে দরজির নথিতে লেখা রয়েছে, যুদ্ধের বাস্তব ফ্রন্টে নেই। দরজিকে এটা জানিয়ে কোনো লাভ যে নেই এটা এখন আমরা বুঝে গেছি। যুদ্ধের মাঠ থেকে অনেক দূরে নিরাপদ তাঁবুতে বসে সীমান্তের ভেতরে যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা পরিচালনাকারী কমান্ডারের জানা সঙ্গত নয়। আর কমান্ডার যদি সেটা বুঝতে না চান, কেবল নিরাপদ দূরত্বে থেকে তৎস্মতভাবে যুদ্ধের গতিধারা তাঁর মতো করে নিয়ন্ত্রণ করতে চান, সে ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় সত্যিকারের বিপদ। আস্তা ও বিশ্বাসে ধরে চিড়। মাঝখান থেকে ওয়ার ফ্রন্টে নিয়োজিত সৈনিকদের অনেকেই জীবন চলে যায়। যুদ্ধের বর্তমান ধারাটা আমরা বুঝে গেছি। বাংলাদেশটা আমাদের। একে স্বাধীন আর শক্তিমূল্য করতে হলে আমাদেরই তা করতে হবে শক্ত পাকবাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধ করার ভেতর দিয়ে। এদের কাছ থেকে সার্টেট পাওয়া যাবে শুধু এপার থেকে। পাকবাহিনীর মোকাবিলা করতে এরা সীমান্তের সাথে যুদ্ধের হবে না, এটা আমরা ইতোমধ্যেই জেনে গেছি। আর এজনাই দেশের ভেতরে অবস্থান নিয়ে শক্তির সাথে মোকাবিলা করতে হলে, সবকিছু সাজিয়ে নিয়ে হবে আমাদের নিজেদেরই নিজেদের মতো করে। আর এই উপলক্ষ থেকেই আমেরা এই সেটারে আমাদের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। আহিদারদের দু' ক্ষোয়াড় ফ্রন্ট সেভাবেই পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তারাও একই প্রক্রিয়ায় তাদের নিজেদের প্রস্তুত নিয়েছে। এখন আমরা যা করছি, তা হচ্ছে, কমান্ডিং অফিসার মেজর দরজির আদেশ-নির্দেশ শুনছি ঠিকই, তবে তা পালন করাই নিজেদের মতো করে। যুদ্ধ প্রারম্ভালনা করছি নিজেদের তৈরি করা পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে, স্বাধীনভাবে। অতএব, আজ মেজর দরজি যে নির্দেশ দিলেন, তা অবশ্যই পালন করা হবে, তবে তার নির্দেশিত স্থান কাজলাদিঘি কিংবা অমরবানা কোথাও আমাদের হাইড আউট হবে না। হাইড আউট হবে সেখানে, যেখানে আমাদের নিরাপত্তাসহ সেটা করা যাবে বলে আমরা মনে করবো।

মেজর দরজি চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি চাহিদা নিলেন রেশন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সামগ্ৰী সম্পর্কে। সব ছেলের মাস্টার বোল নিয়ে গেলেন। প্রতিমাসে আমাদের প্রাপ্ত বেতন ৫০ ভাৱতীয় রূপি। টেনিং সেন্টারের পৰ থেকে কোনো বেতন বা ভাতা পাওয়া যায় নি। এবাবে এক সাথে দু'মাসের ভাতা শিশ্বগিরই পাওয়া যাবে বলে জানালেন। টেনিং সেন্টারে এনৱোলমেন্ট হওয়ার পৰ আমাদের প্রত্যেকের বেতন বা ভাতা ধৰ্য কৰা হয়েছে ১১০ ভাৱতীয় রূপি। এর মধ্যে ৬০ রূপি তাৰা কেটে রাখেন রেশন বাবদ। আর ৫০ রূপি দেয়া হয় নগদ হাতখৰচের জন্য। কোথা থেকে কীভাবে এসব অর্থ আসছে, আমরা জানি না। প্ৰবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্ভবত এ ব্যাপারে ভাৱত সৱকাৰের কোনোৱকম চুক্তি হয়ে থাকবে। তবে, বেতন-ভাতা, পৰ্যাণ

রেশন সরবরাহ, গোলাবারদ ও অন্ত সরবরাহসহ চিকিৎসা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরবরাহের বর্তমানে কোনো কমতি নেই, এক কথায় খুবই সন্তোষজনক। ব্যাপারটা মুক্তরত সৈনিকদের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোস্তফা ও আনোয়ার প্রফেসর

এর মধ্যে বেরুবাড়ি বাজারে নুরু ভাইয়ের দোকানে হামলা চালাই আমরা ক'জন। রেশন এবং আনুষঙ্গিক মালামাল নিয়ে ছেলেরা হাইড আউটের দিকে রওনা দিয়েছে। বিকেল পর্যন্ত আমরা মোটামুটি স্বাধীন। সেনাবাহিনীর ভাষায় যাকে 'নিজস্ব সময়' বা 'ওন টাইম' বলে। গোলজার সাহেবের বাড়ির অপারেশনের পর বেরুবাড়িতে আসার ব্যাপারে মনে কিছুটা শক্ত বিরাজ করছিলো। সে অপারেশনটার সঙ্গে আমরা জড়িত ছিলাম, এটা শুকলাল বাবু বা তার শিষ্য বা চেলাদের জনবার কথা নয়। এ জন্য কায়দা করে মোতালেবকে দিয়ে অপারেশনটা চালানো হয়। আর মোতালেব এদের কাছে মোটেই পরিচিত ছিলো না। সে বেরুবাড়িতে কথনোই আসে নি।

যাই হোক, ঢাকাইয়া নুরু তার দোকানের চৌকিতে জায়গা করে দেয়। চায়ের অর্ডার হয়। চা আসে। নুরু ভাই বলেন, তোমরা আজ খাইয়া যাইবা আমার বাসা থন। লও যাইগা, ম্যালা কথা আছে কণের। তেমন্তোম্বুজ্বারা একেবারে কেয়ামত বানাইয়া ফলাইছো। ব্যাটোরা ফাল পারতে অভিজ্ঞ খুব। কিন্তু আর মনে লয় ওদিক পানে যাইবো না। ভালা শিক্ষা পাইছে খুবই মিয়া ভাইয়ের।

একটা প্রশংসন্ত আভিন্না যিরে বেশ কৃত্তি সর। পুরনো ঢঙের। তবে পাকা। তারই একটি খুপরির মতো ঘরে নুরু মিয়ার সংসার। সেখানেই চৌকির ওপর বসতে হয় আমাদের। তার পোষ্য অনেকেন দুর জড়ে বিছানা-বালিশ-বাস্ত্র-পেট্রায় ঠাসাঠাসি অবস্থা। দুপুরের খাবার সমস্তে শরণার্থী শিবিরের কার্ডে পাওয়া গুরুত্ব আতপ চালের ভাত। কিছু ভাজিভুজি। সেই সাথে আমাদের প্রাণ রেশন থেকে আগে থেকেই পাঠিয়ে দেয়া কিছু ছাগলের মাংস। ইচ্ছে থাকলেও সবসময় উপায় থাকে না। তার মধ্যেই নুরু মিয়াকে আমাদের বরাদ্দ থেকে কিছু পাঠিয়ে দিয়ে তার শরণার্থী সংসারে কিছুটা সাহায্য করার এই প্রয়াস। বেরুবাড়িতে নুরু মিয়ার অবস্থান এবং তার মাধ্যমে বিভিন্নজনের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নুরু মিয়াও হয়ে দাঁড়িয়েছেন আমাদের জন্য একজন দরকারি মানুষ। ফলে বর্তমানে তিনি আমাদের একজন খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর 'নুরু ভাই' হয়ে গেছেন। সেই নুরু ভাইয়ের সংসারেই আমাদের দুপুরের আহার হলো। পিন্টু আর মজিব আমার সাথে। তার স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গেও পরিচয় হলো। নুরু ভাইয়ের স্ত্রী বর্তমানে সন্তানসংক্রান্ত। খুবই এ্যাডভাল্স স্টেজ। এ নিয়ে তাকে খুব চিন্তাপ্রস্তুত মনে হলো। তারা চান, তাদের সন্তান স্বাধীন দেশের মাটিতে জন্ম নিক। কিন্তু সেটা আদো সম্ভব হবে কি? দেশটা দ্রুত স্বাধীন হওয়া প্রয়োজন। কতো ধরনের সমস্যা শরণার্থী মানুষজনের। এক একজন এক এক ধরনের সমস্যার ভাবে জর্জরিত। এদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এজন্য শুধু কাগজে

বিবৃতি দিয়ে কাজ হবে না। যুদ্ধ করে দখলদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশটা প্রথমে দখলে আনতে হবে। ফলে যুদ্ধ করছি আমরা। দায়িত্ব সরাসরি চেপেছে আমাদের ওপর। খুবই গুরুদায়িত্ব। জানি না, এ দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত কীভাবে এবং কতোখানি পালন করতে পারবো।

বিকেলে বেরুবাড়ি বাজারে পরিচয় হয় এক সুস্থামদেহী বলিষ্ঠ যুবকের সাথে। পঞ্চগড়ের তালমা ত্রিভের এপারে তাদের বাড়ি। নাম মোস্তফা। পঞ্চগড় চিনিকলের ক্যাশিয়ার ছিলেন। ছাত্রজীবনে ছিলেন একজন ছাত্রলীগ নেতা। আওয়ামী লীগের একজন প্রথম সারির কর্মী। মোস্তফাদের এলাকাতেই আমরা যুদ্ধে লিঙ্গ। অত্যন্ত আগ্রহ ভরে আমাদের গ্রহণ করলেন মোস্তফা। মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে তার আন্তরিকতার ব্যাপারটি আমাদের ভালো লাগে। তাকে পেলে তালমা-পঞ্চগড় এলাকায় আমাদের যুদ্ধ পরিচালনার কাজ কিছুটা সহজ হবে। তার পরিচিত এলাকা এবং চেনা-জানা মানুষজনের সাহায্য-সহযোগিতায় তার মারফত পাওয়া যাবে বলে ধারণা হলো। সিরাজুল এমপির সহযোগী হিসেবে মোস্তফা এ এলাকায় তাদের রাজনৈতিক ফৌরামে কাজ করছেন। বেরুবাড়ি থেকে কিছুটা দূরে জলপাইগুড়ি পাকা সড়কের পাশে একজন দূর সম্পর্কের আঞ্চলিক বাড়িতে তিনি তার প্রতিবারপরিজন নিয়ে শরণার্থী হয়ে আছেন। তো সেই মোস্তফার কাছে সরাসরি অঙ্গুষ্ঠাখি, আমাদের সাথে কাজ করবেন, সরাসরি যুদ্ধ! মোস্তফা রাজি হয়ে যান এবং কথায়।

— ঠিক আছে চলে আসবেন যতো তারিখের পারেন।

মোস্তফা সায় দেন তাতে।

ঠিক সেই সময় একটা লাল রক্তে ১০ সি-সি হোস্টায় ফটফটিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক নুরুল ভাইয়ের আড়তায়। একদিন দুবলা-পাতলা শরীর। কিন্তু ব্যবহারে খুবই চৌকস। পরিচয় হয় তার প্রকৃতি প্রফেসর আনন্দের। পঞ্চগড় কলেজে শিক্ষকতা করতেন। সেখানেই তার বাড়ি। বেশ ছটফটে স্বভাবের মনে হলো তাকে। যেনে চোখে-মুখে কথা বলেন। এ এলাকায় পলিটিক্যাল লিয়াজোঁ রক্ষার কাজ করছেন তিনি। সাকাতি গিয়েছিলেন বলে জানালেন। আহিদারের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে। আরো জানালেন, আহিদারদের দলকে তিনি হলদিবাড়ি-মানিকগঞ্জ হয়ে পেয়াদাপাড়া অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পরামর্শ দিয়েছেন। সাকাতি এলাকার চেয়ে পেয়াদাপাড়া এলাকা রণকৌশলগত দিক দিয়ে অনেক সুবিধাজনক। সেখান থেকে সরাসরি গলেয়া ডিফেন্স, পঞ্চগড়-বোদা, ময়দান দিঘি, সাকোয়া মারেয়া, শালডাঙ্গা এসব এলাকা কভার করা যাবে। আহিদার মেজর দরজির সাথে আলোচনা করেছে। মেজরও এ ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। তিনি জানালেন, এ খবরটা আপনাদের দেয়ার জন্যই আমার বেরুবাড়ি ছুটে আসা। এখন আহিদার আপনার মতামত চেয়েছে। আপনার কাছে শুনে আমি আবার ফিরে যাবো সাকাতি। সবকিছু ঠিক থাকলে, কাল কিংবা পরশু শিফট করা যেতে পারে।

প্রফেসর আনন্দের কাছ থেকে আহিদারদের পরবর্তী হাইড আউট এবং অপারেশন এলাকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো আলাদাভাবে পিন্টুসহ।

এরপর পিন্টুর ও আমার মধ্যে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ। এই আলোচনা আর বিশ্লেষণের পর আমাদের সিদ্ধান্ত হলো : সাকাতিতে থেকে আহিদার কিছুই করতে পারছে না। বরঞ্চ দুর্নাম কিন্তু চাউলহাটি ইউনিট বেসের জন্য। ওর ইমিডিয়েট সিনিয়র কমান্ডার হিসেবে এ-ব্যাপারে আমার পরামর্শ এবং সিদ্ধান্ত দেয়া প্রয়োজন। যার জন্য প্রফেসর আনোয়ারকে পাঠিয়েছে সে। আসলে আহিদার এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। খুবই সিদ্ধান্তইন্তায় ভোগে সে। তাই ভেবেচিত্তে আনোয়ারকে আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে বললাম, ওকে পেয়াদাপাড়া যেতে বলুন। সবকিছু যেনো ঠিক থাকে। কোনো সমস্যার সৃষ্টি হলে সেটা যেনো সে দ্রুত জানায় আমাদের। আনোয়ার তার ৫০ সিসি হোভা স্টার্ট দিয়ে ফটফট শব্দ তুলে আবার দৌড় দেন সাকাতি অভিযুক্তে। নুরু ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরাও রওনা দিই বাংলাদেশের হাইড আউটের দিকে।

৯.৮.৭৩

পিন্টু ও অন্যরা : শৎকা জাগানিয়া ভয়

হাইড আউট নালাগঞ্জেই রইলো। গত রাতে বেকুবান্তি থেকে ফিরে এসে দুটো পেট্রেল পার্টি পাঠিয়ে দিয়ে আলোচনায় বসা হয়েছিলো। সামাদ অর্থাৎ বয়রা মাস্টারকে নিয়ে কী করা হবে, সে ভাবনায় এখন পেয়ে রয়েল্স আমাদের। বলি অবস্থায় সে এখনো কোনোরকম মুখ খোলে নি। সবাই সৈমান্তিকে চেষ্টা করেছে তার কাছ থেকে সঠিক তথ্য জানবার জন্য। পিন্টু নিষ্পত্তি অবশেষে মোতালেবকে দিয়ে শেষ চেষ্টা নিয়েছিলো। মোতালেব তার নিজস্ব ক্ষমতায় সামাদ মিয়াকে যথেষ্ট বানিয়েছে, কিছু তাতেও কোনো লাভ হয় নি। এখন তার চোখ খুলে দেয়া হয়েছে। বুকে ঠেসে ধরা হয়েছে রাইফেল। বেয়ানেটের রূপ দিয়ে রাখা হয়েছে বুকে-পেটে, তবুও কিছু বের করা যাচ্ছে না। যে-কোনো প্রশ্নই না শোনার ভান করে সে বলে, জে, কি কইলেন? টর্চার চালালেই সে আর্টিলারি করে ওঠে, বাবাগো, আমারে ছাইরা দ্যান, দ্যাশে চইলা যামুগা। এর অতিরিক্ত আর কোনো কথা নয়। অর্থাৎ এই পাক অনুচর আসল ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। এ অবস্থায় তাকে নিয়ে এখন কী করা হবে সবাইরই একই ভাবনা। তাকে ছেড়ে দেয়াও যাচ্ছে না। কেননা, সে আমাদের হাইড আউট এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার দেখে ফেলেছে। ফলে তাকে ছেড়ে দিলে সে হাজির হবে গিয়ে শক্তির ডেরায়। তারপর শক্তি বাহিনীকে সবিস্তারে সবকিছু জানিয়ে ও পথ দেখিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্মসের জন্য তাদের এখানে আমন্ত্রণ করে আনাও তার পক্ষে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।

হাইড আউটের বাইরের চতুরে বসে আছে সবাই। প্রায় সব ছেলেই। সামাদ মিয়ার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে গণবিচারে। সামাদ যে একটা পাকা ঘূঘু, একজন ছান্বেশী এবং পাকবাহিনীর একনিষ্ঠ অনুচর, এ ব্যাপারে সবাই একমত। সুতরাং তাকে ছাড়া যাবে না। কি হবে তাহলে? গণবিচারের রায়ে সাব্যস্ত হলো তার মৃত্যুদণ্ড। সামাদ মিয়াকে হত্যা করা হবে, এ সিদ্ধান্ত নেয়ার ভেতর দিয়েই শেষ হয়

আমাদের রাতের বৈঠক। মোতালেবকেই এ-দায়িত্ব দেয়া হয়। মোতালেব কাল এটা কার্যকর করবে। সামাদকে নিয়ে যাওয়া হবে টোকাপাড়ার দিকে। তার সাথে থাকবে আরো দু'জন- ইত্রাহিম আর হাসান।

সকালে আমরা জলপাইগুড়ি খাবো। একরামুল আর চৌধুরী হাইড আউটের দায়িত্বে থাকবে। জঙ্গল পরিষ্কার করবে। আর মোতালেব সামাদ মিয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য তাকে টোকাপাড়ার দিকে নিয়ে যাবে বিকেলের দিকে। মোটামুটি এধরনের সিদ্ধান্ত মেয়ার পর আমাদের রাতের ছুটি হয়ে যায়।

বড়ো এল প্যাটার্নের প্রথম দিককার দ্বিতীয় রূমটায় আমার আর পিন্টুর আস্তানা। মাটির ওপর শতরঞ্জির বিছানা। মাথার নিচে দুটো ইট দিয়ে বালিশ বানানো।

পিন্টু আমার পাশে শোয় গা ঘেষে। দিনের আলোয় মোটাসোটা ভারি গড়নের বলিষ্ঠ যে পিন্টু রাশভারি ব্যক্তিত্ব আর রাণী ভাব নিয়ে থাকে, রাতের বেলায় একই বিছানায় মাথার নিচে ইটের বালিশে মাথা রেখে শুয়ে সেই পিন্টু অন্যরকম মানুষ হয়ে যায়। একেবারে শিশুর মতো। আমার শরীর ঘেষে শুয়ে সে হয়তো উষ্ণতা খোজে জীবনের, হয়তো নিজের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা কোনো রকম ভয় ইত্যাদি তাড়াতে চায়। চায় আমার কাছে একান্ত নিরাপদ একটোখনি আশ্রয়। মধ্যরাত পর্যন্ত ঘূম আসে না। গুড় গুড়ুম শব্দ তুলে একটানা চলে অস্মৃতি-জগদলহাটের মুদ্র। মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে ভারি কামানের গোলা বিহুকুণ্ডের তাওবে। ঘুম আসে না। টিমটিমে কুপি বাতিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ি ঘরের ভেতরকার দরজাটা পেরিয়ে চলে আসি মাঝখানের বড়ো হলের মচ্ছে কামরাটায়। টিনের দেয়ালের দিকে মাথা দিয়ে দু'সারিতে গভীর ঘুমের কোলে বেঁকে বেয়েসি সব যোক্তা ছেলের দল। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সম্প্রিত শব্দ আর তাদের প্রত্নামা জানান দিছে তাদের জীবন শৰ্পন্দনের। কুপিটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে একের প্রত্যেকের মুখের ওপর আলো ফেলি। হ্যাঁ নিশ্চিত গভীর ঘুমের ঘোরে ওরা। কিট নবীন সব মুখ। এ ক'মাসে কঠোর পরিশ্রম আর অনিশ্চিত জীবনযাপন ওদের সবারই শরীর আর মুখের ওপর ফেলেছে সুগভীর ছাপ। প্রত্যেকের চেহারায় এসেছে কঠিন্য।

কী জানি হয়, এই এখন ঘুমে কাদা হয়ে থাকা আপাতত নিশ্চিত এই সব তরুণ যুবকের শুয়ে থাকার দৃশ্য হঠাতে করেই আমাকে কেমন ভয় পাইয়ে দেয়। এতোগুলো ছেলে! এদের সবারই জীবনের জিয়াদার আমি নিজে। কী ভয়ানক দায়িত্ব! এদের সবাই কি বেঁচে থাকবে? যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত এদের আমি কি বাঁচিয়ে রাখতে পারবো? এরা সবাই কি বাধীন বাংলার মুখ দেখবার সুযোগ পাবে? ফিরতে পারবে কি তারা তাদের স্ব-স্ব নিবাসে, আঘীয়া-পরিজনদের কাছেই নিজ বাসভূমি? ভয়, একটা শিহরিত ভয় এসে ভরে বুকের মাঝখানে। কেমন সম্মুহিতের মতো দাঁড়িয়ে সেভাবে তাদের দেখতে থাকি। হঠাৎ সশ্রিত ফেরে পিন্টুর ডাকে, আসেন, ঘুমান মাহবুব ভাই, অনেক রাত হয়েছে। আসলে পিন্টুরও ঘুম আসে নি। সে কারণে ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে।

জলপাইগুড়ি শহর

সকাল ১০টার মধ্যে এসে পৌছাই জলপাইগুড়ি শহরে। পূরাতন জেলা শহর জলপাইগুড়ি। ঠিক যেনো রংপুর-দিনাজপুর জেলা শহরের আদলে গড়া। রাস্তাঘাট আর বাড়িঘরের প্যাটার্নও একই রকম। শুধু মানুষ আর তাদের কালচার বা সংস্কৃতি ভিন্ন। বহুদিন পর শহরে আসা। পিন্টু এবং আমার, দু'জনেরই জন্ম জেলা শহর রংপুরে। আমাদের বাড়বাড়ত্তও সেখানে। স্বভাবতই শহরকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যন্তর বলে যে-কোনো শহরই বেশি টানে আমাকে। তাই জলপাইগুড়ি শহরে লুঙ্গি পরা আর খালি পায়ে আমাদের উপস্থিতি নিজেদের কাছেই বড়ে বেমানান ঠেকে। আবার ভাবি, দুর এখানে কে চেনে আমাদের। এছাড়া শহরের মানুষজনের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহ থেকে এই ঠাসাঠাসি শরণার্থী শিবিরের জীবন অর্থাৎ 'জয় বাংলা'র মানুষজনের স্বীকৃত থেকে কেইবা আমাদের আলাদা করে দেখবার সুযোগ পাবে। তাই অস্বাচ্ছন্দের ভাবটা কেটে যায় কিছুক্ষণের ভেতরেই। মফুল শহর সাধারণত যে রকমের হয়, জলপাইগুড়ি শহর তার থেকে আলাদা কিছু নয়। রিকশা আর ঠ্যালাগাড়ির যানজট। দোকানের সারি রাস্তার দু' ধারে, সিনেমা হলের সামনে ঢাউস বাবে ফিল্মের পোস্টার, চা-মিষ্টির দোকানে ভিড়, অলস মানুষের আড়ডা, ফুটপাতে ফুটপাতে অস্থায়ী দোকানপাট, হকার, ভিকিরি—সবসব কু মিলিয়ে জেলা শহর তার আপন মহিমায় সমৃজ্ঞ। এর ভেতরেই একোক মনুষের মিছিল। দু'সারিতে। বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে। সেই সাথে ঝোগান ওঠে ওঠে মিছিল থেকে, মানি না-মা-ন-ছি না...। রেস্টুরেন্টে বসে চা-মিষ্টি খেতে খেতে মিছিল দেখি আমরা। পিন্টু বলে, দেখছেন মাহবুব ভাই, এদের মিছিলটা কেমন আমাদের মার্কা। গলায় যেনো জোর নাই। কেমন যেয়ে মানুষের মতো বলছে, মানি সব, মানছি না। এভাবে কি দাবি আদায় হয়? ওর কথা শুনে আমার নিজেরও জ্বালা পায় মিছিলকরীদের 'মানি না মানছি না ঝোগান' শুনে। আসলে জঙ্গি ঝোগান-মিছিলে অভ্যন্তর আমরা। তাই এ ধরনের মিছিল আর ঝোগান নিতান্তই পান্সে লাগা-ই স্বাভাবিক।

দুলু আমাদের জলপাইগুড়ি শহরের গাইড। সেও অনেকদিন পর এসেছে এখানে। এতোদিন আসে নি ভয়ে। নকশালিঙ্গ হিসেবে ধরা পড়বার ভয়ে। আজ আমরা সাথে রয়েছি, তাই আজ আর ওর সে ভয় নেই। খুবই ভালো গাইড হিসেবে ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে ও চেনাতে লাগলো আমাদের জলপাইগুড়ি শহর। আমরা যখন টেলিস্কোপ কিনতে একটা দোকানে ঢুকি, তখন সেলস্ম্যান আমাদের চেহারা আর পরনের পোশাক-আশাক এবং খালি পায়ের দিকে বারবার দৃষ্টি দিতে থাকে। কেমন যেনো একটা সন্দেহ-সন্দেহ ভাব তার দৃষ্টিতে। দোকানটা বেশ বড়ো, জিনিসপত্রে ঠাসা। চমৎকার সাজানো দোকান। এরকম জায়গায় আমাদের উপস্থিতি এবং একটা দামি টেলিস্কোপ কেনার প্রস্তাৱ দোকনির মনে স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। এ সময় ওপাশের কাউন্টার থেকে একজন সুন্ধী যুবক এগিয়ে আসে। যিত হাস্যে জিগ্যেস করে, জয়বাংলা? মুক্তিফৌজ? — কেমন করে বুঝালেন, নিজেকে গোপন না করে, হেসে পাল্টা জিগ্যেস করি।

- চেহারা আর খালি পা দেখে, টেলিক্ষোপ খুব দরকার?
 — জি।
 — খুব দামি বা শক্তিশালী তো হবে না, যাবারি ধরনের হবে, চলবে?

— চলতে পারে।
 — নিয়ে যান। ওদের হত্যা করার আগে দূর থেকে ভালো করে দেখে নেয়া দরকার। বড়ো বেশি বাড়ি বেড়েছে ওরা—কথা বলতে বলতে আমাদের চাহিদামতো জিমিস্টা এগিয়ে দেয় সে।

টেলিক্ষোপটা পছন্দ হয়ে যায়। দুলু দরদাম ঠিক করতে থাকে, এমন সময় আর একটা কম বয়সী ছেলে এগিয়ে আসে, আপনারা কোন্ সেটেরে যুক্ত করছেন?

- কেনো, এটা জানা কি খুব দরকার?
 — না, আমিও তো জয়বাংলার, আমার বাড়ি ময়মনসিংহে। এখানে এসে দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে উঠেছি। এখানে সেলস্ম্যানের চাকরি জুটিয়ে কোনোরকমে টিকে আছি। কবে যে জয়বাংলা হবে, কে জানে?

— যুক্তে যাচ্ছেন না কেনো, পিন্টু সরাসরি ঠাণ্ডাগলায় তাকে যেন চার্জ করে বসে।

- জি একটু অসুবিধা রয়েছে। তা না হলে যেতে পারে।
 — আর গেছেন? এসেছেন কাকার বাড়ি মেডিনত। বেড়াতে বেড়াতেই একদিন যুক্ত শেষ হয়ে যাবে। তখন ফিরবেন স্বাধীনপুরেশ, তাই না? পিন্টুর কথায় ছেলেটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। আমি পেছনে পেছনে পিন্টুর হাত চেপে ধরি। হঠাৎ রেগে গেলে পিন্টুর কোনোরকম মানসিক ব্যাকাস থাকে না। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে যায়। শক্ত শক্ত উচিত কথা শুনিয়ে দেয়। প্রেকেবারে মুখের ওপরেই।

টেলিক্ষোপ কেনা হয়, সাথে পিন্টু আর আমার জন্য দুটো কালো রঙের সামনে চার পকেটেলা শাঢ়িতেরি করতে দেয়া হয়। তারপর ভাতের দোকানে চুকে পাঁঠার মাংস দিয়ে খাওয়া হয় ভাত। এখানে ভাতের দোকানের খাওয়ার নিয়মটা একটু অন্তর ধরনের। এক একটা টেবিলের এক একটা নম্বর। হোটেলের ম্যানেজার একটা লাঘ খেরো খাতা নিয়ে বসে আছেন। বয় বা ম্যাসিয়ার ভাত-তরকারি ইত্যাদি পরিবেশন করতে করতে চিংকার করে উঠেছে। যেমন, এক নম্বর টেবিলে এক প্রেট এক পাঁঠা বা মুরগি বা মাছ, এক ভাজা ইত্যাদি। এরপর অতিরিক্ত ভাত নেয়ার সময় ঘটতে দেখা গেলো আর একটা কাও। বয়-ম্যাসিয়ার দু' চামুচ, ২ নম্বর তিন চামুচ, তিন নম্বর ৪ চামুচ ইত্যাদি...। আর সেই চিংকার ধৰণি ম্যানেজার অনুসরণ করে নিবিট মনে লিখতে থাকে। আহারপর্ব শেষে বিল দেয়ার সময় দেখা গেলো, ম্যানেজার সবার হিসেবে আলাদা করে কষে রেখেছেন আর সে অনুযায়ীই পয়সা দাবি করছেন। আমাদের দেশের হোটেল বা খাবার দোকানে এ ধরনের নিয়ম নেই। সেখানে বয় বা ম্যাসিয়ারই খাবার দেয়, হিসেবে রাখে এবং বিল পরিশোধ করার সময় চিংকার করে ক্যাশিয়ারের উদ্দেশে জানায়, সামনের জন এতো টাকা; পেছনের জন এতো। আর

তার পরের জন্মের এতো টাকা। আমাদের দেশের হোটেল রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারাদের ওপর মালিকরা বেশি বিশ্বাস রাখে বোধ হয়। এখানকার এ ধরনের নিয়ম দেখে মনে হয়, মালিক-মহাজনদের বয়-বেয়ারাদের ওপর যেনো কোনোরকম বিশ্বাস নেই। কিংবা আমাদের ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। হয়তো সুষ্ঠুভাবে হিসেবপত্র রাখবার জন্যই এখানে এধরনের সিসটেম গড়ে উঠেছে। যাই হোক, ব্যাপারটা কিছুটা অস্তুত মনে হয় আর মনে দাগও কেটে যায় অভিজ্ঞতাটা।

জমিদার সোনাউল্লার বাড়ি সোনাউল্লাহ হাউস দেখা হলো। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন সেখানে। আশ্রিত সবাই মোটাঘুটি বামপন্থী রাজনীতির মানুষ। পরিচিত কাউকে পাওয়া গেলো না। সোনাউল্লাহ হাউস থেকে বের হয়ে দুর্দলী, যাবেন?

— কোথায়?

— চলেন না, গেলেই আসর বসানো যাবে। আমার এক পরিচিত ওস্তাদ আছেন, চমৎকার রবীনুসঙ্গীত গান।

— ঠিক আছে চলেন।

বড়ো রাস্তা থেকে নেমেই গলি। তারপর আরো একটা গলি। এই রকম গলির পর কয়েকটা গলি পেরিয়ে পাওয়া গেলো একটা খুপচিম্পতো জাহাগায় একটা দালান ঘর। ঘরের ভেতরটা দিনের বেলাতেও ম্যাড্রেডে জুকামের ছাওয়া। মাঝ বয়সী গায়ক ভদ্রলোক আমাদের সমাদের বসান মেঝের পেতে রাখা মাদুরের ওপর। দুর্দলী, ওস্তাদ গান শুনবো, এনাদের ধরে অনেক সুয়াসির যুক্তের মাঠ থেকে।

শ্রিত হাসেন ওস্তাদ। একটা ছোট ছেঁজু কেতলিতে করে চা নিয়ে আসে। ওস্তাদ চা পরিবেশন করেন। বলেন, আপনার মুক্তিকৌজ, লড়ছেন, ভালো করে লড়েন। দেশটা স্বাধীন করা চাই। বড়ে ছিলেই জাগে, জয়বাংলা হলে একবার ঢাকা যাবো। সেই ছেলেবেলায় একবার হিমেছিলাম ঢাকায়। এখন শুন ঢাকা নাকি অনেক বড়ো হয়ে গেছে। একদমে কথাগুলো বলেই এরপর তিনি আমাদের দিকে তাকান, বলুন কি শুনবেন?

সঙ্গীতরসিক পিন্টু বাটপট বলে, রবীনুসঙ্গীত, আপনার যা খুশি। ওস্তাদ তার তানপুরাটা অতিয়তে টেনে নেন কোলের ওপর। তারপর তাঁর ভরাট সুরেলা গলায় গান ধরেন, ‘তুই ফেলে এসেছিস কারে মন মনরে আমার...।’

পড়ত বিকলে ওস্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার বাসা ছেড়ে চলে আসি। ফিরতি পথে ওস্তাদের সেই ভরাট কষ্টে গাওয়া গানের কলিগুলো মনের গভীরে কেবলি উথাল-পাতাল করতে থাকে, ‘তুই ফেলে এসেছিস কারে মন...।’

রাজাকার সামাদ মষ্টার পালিয়ে গেল

হাইড আউটে ফিরতে ফিরতে রাত নটা হয়ে গেলো। আর ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পাই সেই দৃংশ্ববাদটা। চৌধুরী রিপোর্ট দেয়, সামাদ মষ্টার পালিয়েছে।

— কি! কীভাবে পালালো?

— কেউ জানে না।

— তার মানে! কখন পালিয়েছে? কে ডিউটি তে ছিলো?
— বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা র দিকে। আমরা তখন জঙ্গলে ছিলাম।
— রউফকে ডাক। মাথায় আগুন চড়ে যায়।

রউফ আসে: মাথা নিচু করে দাঁড়ায়। মুখ খিস্তি করে প্রচণ্ড ধমক দিই, শালা সেন্ট্রি সাজছো, কীভাবে পালালো। গাধার ডিউটি করতে করতে নিজে শালা গাধা সেজে গেছে। বল কীভাবে পালালো?

মাথা নিচু করে পিনপিনে সুরে এবাব জবাব দেয় রউফ, মুই ঝাড়া ফিরবাব গেইছো, ফিরি আসি দেখং নাই। বড়ো হতাশ লাগে।

মুহূর্তে জলপাইগুড়ি সফরের পুরো আনন্দটা বিস্তাদ হয়ে ওঠে। একরামুল আব মোতালেবকে ডেকে চারদিকে কড়া সেন্ট্রি লাগাতে বলি। বলি শক্তিশালী একটা পেট্রোল পার্টি দ্রুত তৈরি করতেও। আজ রাতে কারুরই ঘুমানো চলবে না। বিখ্যাম নেয়ার অবকাশ নেই কারো। সামাদ মাটোর পালিয়েছে কম ভয়ের কথা নয়। সে তার পাক প্রভুদের নিয়ে এখানে চলে আসতে পারে। তাই রাতের সভাব্য হামলা মোকাবিলার জন্য সর্তর্ক আব সুদৃঢ় প্রস্তুতি দরকার। এরি মধ্যে আকাবৰ তার একক মিশন নিয়ে ঠাকুরপাড়া হাটে পাক আর্মির ওপর হেনেড হামলার অভিযান শেষে ফিরে এসেছে। পাকবাহিনীর ৭ জন সদস্য ঠাকুরপাড়াস্টেশনে এসেছিলো। নিহত ১ জন আহত ৩ জন বলে জানতে পেরেছে। যাক, আকাবৰ তাহলে ঠাকুরপাড়াহাট রেকি করে এসেছে এবং সেই সাথে পাক সেনামুছি জেপের সফল হেনেড হামলা চালিয়ে আসতে পেরেছে। এটা খুবই ভালো আছে। ওর অভিজ্ঞতা পরে কাজে লাগবে। সামাদ মাটোরের পালানোর ফলে মন্তব্য ভেততে জমে থাকা রাগ আকাবৰের সফল অভিযানের ঘটনায় আপাতত কিছু লাঘব করতে সাহায্য করলো।

১০.৮.৭১

পাক ঘাঁটিতে প্রথম আঘাত

সিন্দ্বাত নেয়া হলো শক্ত পাকবাহিনীর ঘাঁটি 'পানিমাছ ডিফেন্স' আক্রমণের। সামাদ মাটোরের পালানোর পরিপ্রেক্ষিতে এ সিন্দ্বাতটা নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। পানিমাছে পাকবাহিনী ঘাঁটি গড়ে তোলার পর এলাকাটা খুবই অশ্বস্ত আব অনিবার্পদ হয়ে পড়েছে। অসংব হুমকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে ওদের ঘাঁটি স্থাপনা আমাদের জন্যও। পানিমাছ ঘাঁটি থেকে পাকবাহিনী নিয়মিত হাড়িভাসাসহ আশপাশের এলাকায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। সমভাবে হামলাও চালাচ্ছে তাদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন সন্দেহযুক্ত এলাকায়। জুলিয়ে দিচ্ছে বাড়িবর। ধরে নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহভাজন লোকদের। অকথ্য নির্যাতন চালিয়ে হত্যাও করছে তাদের। তয়ে হোক বা স্বার্থের তাড়নাতেই হোক এক শ্রেণীর মানুষ এরই ভেতরে তাদের পক্ষে চলে গেছে। আব তারাই মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান, সেই সাথে তাদের গতিবিধি ও তৎপরতাসহ স্বাধীনতার পক্ষের লোকজনের খবরাখবর সরবরাহ করছে, তাদের পাকড়াও করবাব জন্য সহযোগিতা করছে। এছাড়াও বাক্সার ও টেক্স ঝোড়াখুড়ির কাজ থেকে শুরু করে

গ্রাম এলাকা থেকে পাকসেনাদের জন্য গুরু-বক্রি-হাঁস-মুরগিসহ অন্যান্য উপকরণ সরবরাহের কাজে-কর্মে তারা সাহায্য করছে। গাইড হয়ে পাকসেনাদের নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। আর সে কারণেই পানিমাছে অবস্থানরত পাকসেনাদের উৎক্ষেত করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে তাদের সাথে আমাদের দু' দু'বার সরাসরি ঘোকাবিলা হয়েছে মধুপাড়া এলাকায়। এবার তাই নালাগঞ্জ এলাকার দিকে তাদের এগিয়ে আসার সঙ্গবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। তাদের খাস বান্দা ভুইয়াকে চিরতরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। ভুইয়ার বাড়িতে তাদের ক্যাপ্স করার কথা ছিলো; কিন্তু তারা তা করতে পারে নি। তাই ভুইয়ার হত্যার ঘটনায় তারা নাড়া খেয়েছে প্রচঙ্গভাবে। আর সে কারণেই এ-অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের সদর্প উপস্থিতি তাদের প্রবল মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এখন মুক্তিযোদ্ধাদের নির্মূল করা। এ-জন্য তারা আবার অভিযানে বেরুবে। এবার হয়তো সামাদ মাট্টার তাদের গাইড করে আনবে। সামাদ মাট্টার ক'দিন আমাদের হাইড আউটে বন্দি থেকে আমাদের অনেক কিছুই দেখে-শুনে গেছে। ব্যাটা পালিয়ে যাওয়ার পর থেকে এ সঙ্গবনাটা খুবই জোরালোভাবে দেখা দিয়েছে। আর এ পরিস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, পানিমাছ পাক ঘাঁটি আক্রমণের। এবার আমরা ওদের আক্রমণ করে নির্মূল করার প্রচেষ্টা নেবো।

মোট চারটি মিশনে পাঠানো রাতের পেট্রল পার্ক ফিরে এসেছে। আকাক্রার তার একক মিশনে গিয়েছিলো পানিমাছ ঘাঁটির কাঁচকাঁচ। খুব কাছ থেকে পাকবাহিনীর অবস্থান রেকি করে আসবার দায়িত্ব ছিলো তার। আকাক্রার ইদানীং খুব ভালোভাবেই তার দায়িত্ব পালন করছে। রাতের হ্যাঙ্কারে ভূতের মতো মিশে থেকে সে তার দৃঢ়সাহসী চলাফেরা এবং তার প্রথম এককভাবে অর্পিত দায়দায়িত্ব নিখুতভাবে পালন করে যাচ্ছে। লিকলিকে লম্বা স্থানে আর শরীরের ময়লা কালো রঙের অধিকারী রংপুর মিঠাপুরুরের ছেলে ঝাঁকাক্রার অনেক পেছন থেকে হঠাতে করেই যেনো সামনে এগিয়ে এসেছে। এমনিতে, ওঠাণ মেজাজ আর মৌন স্বভাবের ছেলে। গাঁও-গোরামের এবং সাধারণ ছেলেটির বাইরের চেহারা দেখলে বুঁবুরার উপায় নেই, সে মুক্তিফৌজের একজন গর্বিত সদস্য। গ্রামের রাস্তা ধরে হেঁটে গেলে গ্রামের দেহাতি মানুষ ছাড়া তাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করবার উপায় নেই। বুকের গভীরে তার অমিত সাহস। গতরাতে সে পানিমাছ পুরুরিতে পাকবাহিনীর ঘাঁটি খুবই নিকট থেকে দেখে এসেছে। মাটির ওপর কেঁকে এঁকে সে পাক সৈনিকদের সেখানকার অবস্থান নিখুতভাবে বুঝিয়ে দেয়। বদলুপাড়া, হাড়িভাসা এবং অন্য সব পেট্রল পার্টির রিপোর্টও মিলিয়ে দেখা হয়। আর তার থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে: পাকবাহিনী পানিমাছে তাদের ঘাঁটি খুবই দৃঢ় করেছে। ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা পাকবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য যে সব তথ্য পাওয়া দরকার, তার সবই পেট্রল পার্টির মারফত পাওয়া যায়। আর সেইসব তথ্যের ভিত্তিতে পরিকল্পনা তৈরি করে আমরা এখন পাকবাহিনীকে আক্রমণ করতে যাচ্ছি। যুদ্ধের শুরু থেকে শুরু পাক বাহিনীর অবস্থানের ওপর এটাই হবে আমাদের প্রথম সরাসরি আক্রমণের ঘটনা। সুতরাং যুদ্ধ পরিকল্পনা অত্যন্ত

বিস্তারিত এবং নিখুঁত করা প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজন থেকে রাতের দীর্ঘ ক্লান্তিকর পেট্টেল পার্টি নিয়ে পদচারণার ক্লান্তি মুছে ফেলে পিন্টুকে সঙ্গে নিয়ে পুরুর পাড়ের আম গাছের ছায়ায় বসে যাই। নতুন টেলিকোপ নিয়ে মালেক-মনজু সোংসাহে তাদের চিহ্নিত গাছের মগডালে পাতার আড়ালে চলে যায়। গাছের উচু মাথার অবজারভেশন পোস্ট থেকে টেলি লেনে চোখ লাগিয়ে তারা সামনের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পায়। একরামুল ও চৌধুরী ছেলেদের স্ব-স্ব হাতিয়ার পরিকার করার কাজের তদারকিতে লেগে থাকে। আজকের রাতের অপারেশনটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সব ধরনের হাতিয়ার আর গোলাবাকুদের ব্যাপক ব্যবহার হবে আজ রাতে। তাই হাতিয়ারগুলো পরিকার ঝকঝকে তকতকে করে নেয়া প্রয়োজন। একরামুল আর চৌধুরী এখন সে কাজেই ব্যস্ত।

বর্ষার মেঘশূন্য আকাশে প্রচও তাপ ছড়িয়ে গনগনে সূর্য উঠেছে। কেমন যেনো একটা চিরচিরে ভ্যাপসা গরম। দূরে দেখা যায় দুলু মিয়া তার ফসলের মাঠ নিয়ে ব্যস্ত। এখন আর পাহারা লাগে না। দুলুর দেখাদেখি, অন্যরাও ফসলের মাঠে নেমেছে। নালাগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতি আশপাশের মানুষজনের মনে একটা নিরূপদ্রব আর ভয়হীন জীবনের নিশ্চয়তা আর একটা নিরাপত্তা এনে দিয়েছে। আউশের ক্ষেত্রে কাটা হচ্ছে। জমি তৈরি হচ্ছে আসন্নে জন্য। পাটও কাটা হচ্ছে। ওপারে ভারত, এপারে বাংলাদেশ। দু'পাশে একইভাবে কৃষকরা তাদের ফসলের মাঠে আপনাপন কাজেকর্মে ব্যস্ত। বেলা একাত্তোটা সাড়ে এগারোটার মতো সময় তখন। মজিবকে দেখা যায় পুরুরের ওপারের কলাগাছের ঝোপ থেকে উকি দিতে। হঠাৎ যুদ্ধ-পরিকল্পনা রচনা কাজের একজুতায় বাধা পড়ে।

— কী ব্যাপার মজিব, কেনে? কথা আছে?

— না, মানে এদিক দিকে আম বাথরুম করতে যাচ্ছি ...।

— আচ্ছা, ঠিক আছে, ধীন।

ফিক করে হেসে ওঠে পিন্টু। বলে, দেখছেন, এই যুক্তের ময়দানে উনি বাথরুম খুঁজছেন। আরে জঙ্গলে যেয়ে বসে পড়লেইতো হয় আমাদের মতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উনি, এখানে হলের বাথরুম কই পাবেন? ব্যাটা স্পাই নয়তো মাহবুর ভাইঃ

— আরে না, বেচারার হয়তো সত্যিই বাথরুম চেপেছে। এদিক এসেছিলো নির্বিঘ্ন জঙ্গল-বোপাবাড়ের খোজে। নাও শুরু করা যাক।

— দাঁড়ান বিড়ি ধরাই আগে, ধোয়া না খেলে ব্রেন খুলছে না।

পিন্টু বিড়ি বের করে। দুঁজনের মুখেই বিড়ি জুলতে থাকে। আবার আমরা নিবিট হয়ে পড়ি যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা আর প্রতিটি বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণে। আমাদের আজকের পরিকল্পনায় আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু পালিমাছ পাক সেনাবাহিনীর ঘাঁটি, পাশাপাশি আর একটা দল যাবে সর্দারপাড়া হয়ে জগদলহাট-অমরখানা রাস্তার দিকে। পাকবাহিনীর শক্ত ঘাঁটি জগদল-অমরখানা থেকে কোনো দল পেছন দিক দিয়ে এলে তাদের ঠেকানোর দায়িত্ব থাকবে তাদের। সেই সাথে সর্দারপাড়াসহ অমরখানা-জগদলহাট এলাকা রেকি করেও আসবে তারা। ওদের গাইড হিসেবে যাবে মজিব।

আজ রাতেই সত্যিকারভাবে ছেলেটার বিশ্বস্ততার চরম পরীক্ষা হয়ে যাবে।

যুক্ত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে দুপুর গড়িয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম। বিকেল এগিয়ে আসে যেনো চট করেই। ছেলেরা যুক্তসাজের প্রস্তুতি নিতে থাকে। মূল অপারেশনের অঙ্গ হিসেবে পানিমাছ আক্রমণের জন্য ৪টা দল আর সর্দারপাড়া, জগদলহাট-অমরখানার জন্য অন্য একটি দল। প্রথমোক্ত দল ৪টির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য যেহেতু এক ও অভিন্ন, সুতরাং তাদের নির্বাচন, দল গঠন ও তার বিন্যাস এবং অন্তসজ্জার ব্যাপারটি করা হয়েছে সেভাবেই। অপর দলটিকেও সাজানো হয়েছে তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখেই। পিন্টু ও একরামুলের তত্ত্বাবধানে ছেলেরা তৈরি হতে থাকে। মিনহাজের চা-পর্ব সমাধা করতে করতে বিকেলটা ফুরিয়ে যায় দ্রুত। সক্ষায় ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে সমস্ত ছেলে বাইরের যাসে ছাওয়া সরুজ চতুরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াতে থাকে এক এক করে। মোট পাঁচটি দলে সার বেঁধে দাঁড়ায় তারা।

প্রতিটা দলের সামনে তাদের কমান্ডার। প্রথম দলের সামনে শামসুল চৌধুরী, তার সাথে ৯ জন। পরের দল মোতালেবের সাথে ১০ জন। এরপর মধুসূন্দন। তার সাথে ৫ জন। চতুর্থ দল একরামুলের সাথে ৯ জন। এই চারটি দল একসাথে রওনা দিলেও থ-থ লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশ্যে একটু পরেই স্বতন্ত্রে আলাদা হয়ে যাবে। ৫ম দলটিও একইসাথে রওনা দেবে। তবে হাঁটুট অডিট থেকে বের হয়েই তারা আলাদাভাবে তাদের লক্ষ্যস্থলের দিকে চলে যাবে। এ দলটির নেতৃত্ব দেবে মিনহাজ। তাদের গাইড হিসেবে যাবে মজিব। আজকের অপারেশনে কাটআপ পার্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে একরামুল আবেক্ষণ্যবুরী। মধুসূন্দন দায়িত্ব পালন করবে কভার পার্টি হিসেবে মর্টারসহ। মোতালেব-চূল এসোল্ট বা আক্রমণকারী দল হিসেবে কাজ করবে তার এল.এম.জিসহ। পিন্টু থাকবে মধুসূন্দনের সাথে। মোতালেবের দলে আমি নিজে।

আজকের অপারেশনের প্রয়োজনে জয়নালসহ ৪ জনকে তুলে আনা হয়েছে বেলতলা গোলজার সাহেবের বাড়ি থেকে। ৩ জন রয়ে গেছে সেখানে। গোলজার সাহেবের বাড়িতে নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত ৭ জনের দলটি চমৎকারভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রতিদিন সকালে ২ জন এসে রিপোর্ট করে ওদিককার পরিস্থিতি সম্পর্কে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কোনো অঘটন নেই। ওপক্ষ থেকে আবারো হামলার সংজ্ঞানা থাকলেও, এ পর্যন্ত কোনোরকম বিপজ্জনক তৎপরতা নেই। তবে নিরাপত্তা প্রহরী তোলা যাবে না। একবার যখন তাদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, কিছুদিন তো সেটা রাখতেই হবে। তাছাড়া গোলজার সাহেবের বাড়িতে আশ্রিত মানুষজনের ধারণা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে নিলেই ওরা আবার আসবে। এ-ভয় থেকেই সদা শক্তি মানুষগুলো বারবার করে অনুরোধ আর তাগিদ, তাদের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত প্রহরী দলটির সবাইকে আমরা যেনো সহসাই তুলে না নেই। প্রতিদিনই তাদের খবর পাওয়া যায়। দলনেতা জয়নাল জানিয়ে যায় খুঁটিলাটি সবকিছু। রিপোর্ট দেয়া শেষ হলে আমাদের নিজেদের ভাগ থেকে কিছুটা

ରେଶନ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠିକ ଅନ୍ୟ କିଛୁ ନିଯେ ଯାଏ । ଓରା କଟୋର ମଧ୍ୟେ ଦିନଯାପନ କରାଛେ । ଏମନ ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବାରେର କାହିଁ ଥେକେ କିଛୁ ନେଯା ବା ଆଶା କରା ଉଚିତ ନାହିଁ । ତରୁ ତାଦେର ଚେଷ୍ଟା ଥାକେ ଛେଲେଦେର ଏଟା-ଓଟା କରେ ସାଓୟାନୋର ଦିକେ । ଛେଲେରାଓ ଚେଷ୍ଟା ନେଯ ତାଦେର ରେଶନେର ଭାଗ ଥେକେ ସତୋଦୂର ସଞ୍ଚବ ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରାତେ । ଏକଟା ପାରିବାରିକ ପରିବେଶର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ସରଛାଡ଼ା ଛେଲେଗୁଲୋ । ତାରା ଓ ଦେଖଚନ ତାଦେର ନିଜେର ବାଡ଼ିର ଛେଲେର ମତୋ ମମତା ଆବ ଆନୁଷ୍ଠିକତା ନିଯେ ।

ଆଜକେର ରାତରେ ଯୁଦ୍ଧକେ ଜୟନାଳାକେ ନିଯେ ଆସା ହେଯେ ଆର ଓ ଜନସହ । ଯୁଦ୍ଧଶୈଖେ କାଳ ଆବାର ଫିରେ ଯାବେ ତାରା ତାଦେର ନିରାପତ୍ତାମୂଳକ ପ୍ରହରାର କାଜେ । ବ୍ରିଫିଂ ନେଯାର ଜନ୍ୟ ହାଜିର ହେଯେ ଓରା । ଓଦେରକେ ଶାମିଲ କରେ ନେଯା ହୟ ମୋତାଲେବେର ଦଲେ ।

ସଙ୍କ୍ଷ୍ୟ ଘନିଯେ ଆମେ । ୫ ସାରିତେ ଦାଁଡିଯେ ଥେକେ ଚୁପଚାପ ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ବ୍ରିଫିଂ ଶୋନେ ଓରା । ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶେ ତାରାର ମହିଳ । କୃଷ୍ଣପଙ୍କ ଚଲାଛେ । ସଙ୍କ୍ଷ୍ୟ ହତେଇ ଅନ୍ଧକାର ଯେନୋ ଝାପିଯେ ପଡ଼େ । ଆର ତଥନ ଚାରଦିକେର ପରିବେଶ କେମନ ନିର୍ମୂପ ଆବ ସୁନ୍ମାନ ହେଯେ ଯାଏ । ଏର ମଧ୍ୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜଭାବେ ସବାର ବୁଝିବାର ଉପଯୋଗୀ କରେ ସାରାଦିନେ ତୈରି କରା ଆମାଦେର ଯୁଦ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନାର ସବଗୁଲୋ ଧାପ ତାଦେର ସାମନେ ତୁଲେ ଧରି ।

ଏ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳ କମାନ୍ଦାର ଆମି । ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନାର ପରିଷକ୍ତ ଦାୟାଦାୟିତ୍ୱ ଆମାର । ଏହି ଅପାରେଶନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାକବାହିନୀର ଘାଁଟିତେ ଏସୋଲି କାହାର ଆଗାତକାରୀ ମୂଳ ଦଲଟାକେ ନିଯେ ଯେତେ ହେବେ ଆମାକେଇ । ଅନ୍ୟ ଦଲଗୁଲୋର ମହିମାତୋ ସାପୋଟ ଏବଂ ତାଦେର ଓପର ଆରୋପିତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାରା ପାଲନ ନା କରିଲୁ ହେବାକାରୀ ଦଲଟା ଭୟବହ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମଧ୍ୟେ ପଡ଼ିତେ ପାରେ । ସୁତରାଂ ସବାର କାଜ ହେବାକାରୀବାବେ କରାର ଭେତରେଇ ରଯେଛେ ଆଜକେର ଯୁଦ୍ଧର ସାମାଜିକ ସଫଳତା । ତାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିକଳ୍ପନାର ପ୍ରତିଟା ଦିକ ତୁଲେ ଧରାଇ ବିନ୍ଦୁରିତଭାବେ ଓଦେର ସାମନେ ।

ପିନ୍ତୁ ଛାଯାର ମତୋ ପାଣେ ଦାଁଡିଯେ ଥାକେ । ଚୁପଚାପ ଦାଁଡିଯେ ଥାକା ଛାଯା ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଲୋର ଉଦ୍ଦେଶେ ଆମାର ବ୍ରିଫିଂ ଚଲାତେ ଥାକେ ଏଭାବେ— ଆର କିଛୁକଣେର ଭେତରେଇ ଆମରା ରଓୟାନା ଦେବୋ । ଅନେକ ଦୂର ଆମାଦେର ଯେତେ ହେବେ । ନିରାପଦ ରାତ୍ରା ଛେଡେ ଆମରା ସରାସରି ହେତେ ଯାବେ ସତୋଦୂର ସଞ୍ଚବ ମାନୁଷେର ଚାଲାଲେର ରାତ୍ରା ଏଡିଯେ । ଫସଲେର ମାଠ, ଚର୍ବା କ୍ଷେତ୍ର ଆବ ପାନି-କାଦା ଭେତେ ଆମାଦେର ଏଗୁତେ ହେବେ । ଏକ ନସର ଦଲ ଗିଯେ ଉଠିବେ ହାଡିଭାସା-ପଞ୍ଚଗଢ଼େର ରାତ୍ରାୟ । ମେଖାନ ଥେକେ ତାରା ରାତ୍ରା ଧରେ ଏଗୁବେ ପାନିମାଛ ଘାଁଟିର ଦିକେ । ସତୋଦୂର ସଞ୍ଚବ ଶକ୍ତ୍ୟାଟିର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗିଯେ ତାରା ଡି-ସମୟେର ଜନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରାବେ । ଚୌଧୁରୀ ଏ-ଦଲେର ନେତା । ଚୌଧୁରୀ ଦ୍ଵୀ ଇଉ ଆନ୍ଦାର ଷ୍ଟ୍ୟାନ୍ ।

— ଇଯେସ ବଲେ ଚୌଧୁରୀ ସାଡା ଦେଯ ।

ଚାର ନସର ଦଲ ନିଯେ ଯାବେ ଏକରାମୁଲ । ବଦଲୁପାଡ଼ା, ଆମାଦେର ସେଇ ପରିଚିତ ଗ୍ରାମ ପେରିଯେ ବିସମନି ଥାମେର କାହିଁ ତାରା ହାଡିଭାସାର ରାତ୍ରାୟ ଗିଯେ ଉଠିବେ । ସତୋଦୂର ସଞ୍ଚବ ଏଗିଯେ ଯାବେ ରାତ୍ରା ଧରେ ପାକବାହିନୀର ଅବଦ୍ଧାନେର ଅବଦ୍ଧାନେର ଦିକେ । ଏରପର ଅପେକ୍ଷା କରାବେ ଡି-ସମୟେର ଜନ୍ୟ । ଏକରାମୁଲ, ତୁଇ ବୁଝାତେ ପେରେଛିସଃ?

— ଜି ବଲେ ସାରା ଦେଯ ଏକରାମୁଲ ।

মোতালেব মূল স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে আমার সাথে যাবে কামারপাড়া হয়ে সরাসরি পানিমাছ শক্রান্তির ওপর। পিন্টু থাকবে মর্টার নিয়ে ঠিক আমাদের ৩০০ গজ পেছনে। রাত ১টা হচ্ছে ডি-টাইম। পিন্টু তার ২ ইঞ্জি মর্টার দিয়ে শুরু করবে প্রথমে। তার ওই মর্টারের শেল বিশ্বেরণের সাথে সাথে চৌধুরী আর একরামুল পাকবাহিনীর উভয় দিকের অবস্থান থেকে ফায়ার ওপেন করবে। একনাগাড়ে কিছুক্ষণ গুলিবর্ষণ চালিয়ে থামবে ওরা। ওরা থামলে শুরু করবে মোতালেব। তার এল.এম.জি-এস.এল.আর বাহিনী নিয়ে সরাসরি শক্রবাহিনীর পেটের ভেতরে আঘাত করা শুরু করবে সে। পিন্টু পাঠাতে থাকবে শেল। মোতালেব থামবে। ইতিমধ্যে শক্রবাহিনী রিএক্ট করবে। তারা প্রাথমিকভাবে অবশ্যই তিমুরী আক্রমণের সামনে ভ্যাবাচ্যাক খেয়ে যাবে। জাত সৈনিক পাকবাহিনী কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেদের সামলে নিয়ে আমাদের আক্রমণের প্রতিজবাব দেবে। তারা কীভাবে প্রতিজবাব দেবে সেটা দেখতে হবে কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একরামুল-চৌধুরী-পিন্টু একসাথে শুরু করবে এবং চালিয়ে যাবে একটানা। এর মধ্যে মোতালেবসহ আমরা আমাদের অবস্থান বদলে এগিয়ে যাবো যতোন্দুর সংব। আক্রমণের তোড়ে শক্র ছত্রভঙ্গ হয়ে ঘাঁটি ছেড়ে দিলে, আমরা ঘাঁটির দখল নেবো এবং ওদের বাকার-ট্রেন এসব ধ্রংস করে দিয়ে গোলাবারুন্দ হাতিয়ার যা-কিছু পাওয়া যাবে, তা যতেও কিছু সংব হাতিয়ে নিয়ে ফিরে আসবো। সবার জন্য আরপি, অর্থাৎ রিটার্ন পোর্ট হচ্ছে কামারপাড়া। আমাদের যুদ্ধের ডি-টাইম জানিয়ে মেজর দরজিকে গড়ালবাতি প্রিস্পেস ওয়ারলেসের মাধ্যমে ম্যাসেজ পাঠানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। হানী নিচে আবে ম্যাসেজটা গড়ালবাড়ির বি.এস.এফ সুবেদারের কাছে। দরজি ম্যাসেজটা দুলে সাকাতিতে তাদের আর্টিলারি ইউনিটের মাধ্যমে পানিমাছ পাক ঘাঁটির ওপর সরাসরি কামানের গোলা নিক্ষেপ করে আমাদের সাপোর্ট দেবেন। মিনহাজ যান্তে আদারপাড়া হয়ে জগদলহাট-অমরখানা রাস্তার দিকে। শক্ররা সেদিক থেকে পানিমাছ অভিমুখে সাহায্যের জন্য এগুতে চাইলে, তারা তাদের থামিয়ে দেবে। গাইড হিসেবে কোশ্চানি মুক্তি যাবে চৌধুরীর সাথে হাড়িভাসার দিকে। সজিমউদ্দিন যাবে বদলুপাড়া অভিমুখী দল একরামুলের সাথে। দুল থাকবে পিন্টুর সাথে আর আকাকুর থাকবে মোতালেবের সাথে। মজিব যাবে মিনহাজের সাথে সর্দারপাড়া-জগদলহাট-অমরখানা রুটে। সবাই চেষ্টা করবে নিজেদের রক্ষা করতে। অপয়োজনীয় রিস্ক কেউ নেবে না। প্রয়োজনে কমাত্তারূপ তাদের স্ব-স্ব দল সম্পর্কে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেবে। কোনো হাতিয়ার কেউ ফেলে আসবে না। ত্রিফিং অনুযায়ী সর্বতোভাবে সবাই চেষ্টা করবে। ইনশাল্লাহ আমাদের কাজ শেষ করে আমরা সবাই ভালোভাবেই ফিরে আসবো।

কারো কোনো রকম প্রশ্ন আছে? একটানা ত্রিফিং শেষ করে আমি সামনে দাঁড়ানো ছেলেদের জিগোস করি। আমার প্রশ্নের মুখে তাদের মধ্যে শুরু হয় ফিসফাস, কথার গুঞ্জনও। আবার জিগোস করি, কোনো প্রশ্ন?

না কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন নেই শুনে তাদের সবাইকে ডিসমিস করে দিই। মিনহাজ তাদেরকে চটজলদি রাতের থাবার পরিবেশনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে।

পিন্টুসহ আমি নিজের ঘরে চলে আসি। হারিকেনের মৃদু আলোয়ে মেজের দরজির উদ্দেশে একটা মেসেজ তৈরি করি : উই আর গোয়িং টু এ্যাটক পাক আর্মিজ পানিমাছ ডিফেন্স এ্যাট নাইট ওয়ান আওয়ার। প্রিজ সেন্ট সাপোর্ট আর্টিলারি ফায়ার ফ্রম সাকতি।' তারপর হাদিকে ডেকে বুঝিয়ে দিই, কীভাবে মেসেজটা পাঠাতে হবে। হাদি রওনা হয়ে যায় গড়ালবাড়ির উদ্দেশে।

রাত আটটায় হাইড আউট ত্যাগ করে সবগুলো দল।

৩৩. ৮. ৭১

সম্মুখ্যুক্তি

যুক্তের মাঠে সব সময় হিসেব অনুযায়ী কাজ হয় না। আজও সে রকম হিসেব মেলানো গেলো না। একরামুল তার পজিশন থেকে বেঁধে-দেয়া ডি-টাইম অর্থাৎ রাত একটার আগেই ফায়ার ওপেন করলো। আমরা সবেমাত্র আমাদের সঞ্চাব্য জায়গায় গিয়ে পজিশন নিয়েছি। এখান থেকে পানিমাছ পাকবাহিনীর অবস্থান সরাসরি ১০০ গজ সামনে। অঙ্ককারে ঘন হয়ে থাকা গাছগাছালি ঘেরা উচু মতো এই জায়গাটা শক্ত বাহিনীর অবস্থানের একেবারে লাগোয়া। একটা এবড়োখেবড়ো ঘাসে ছাওয়া জমিতে আমাদের অবস্থান। আর সেই জমির উচু আলোর পেছনে নিজেদের আড়াল করে লম্বা লম্বা ঘাসের ভেতরে নিজেদের ঢেকেচুকে রেখে থাকে আছি আমরা। প্রাইমারি স্কুল মাস্টার রাজ্জাক মিয়া একজন সাহসী মানুষ। তিনিই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের এ পর্যন্ত। পথ চলতে এক স্থানে এখানে এসে থককে দাঁড়িয়ে বলেছেন, সামনের দিকে আঙুল প্রসারিত করে তা যে দেখছেন ওখানেই পাকবাহিনীর ঘাঁটি। এখান থেকে একশ' গজের মতো উন।

এখন মাত্র একশ' গজ দূরে আমাদের জাত শক্ত পাকবাহিনী। আজ তার সঙ্গেই মুখোমুখি মোকাবিলা হবে। আর সেই মোকাবিলার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে নিজেদের সহজাত চেতনায় ঘটপট শোয়া পজিশনে চলে গিয়ে অবস্থান নিয়ে ফেলি।

নিকষ কালো অঙ্ককার রাত। মেঘবিহীন পরিষ্কার আকাশে তারার মেলা। চারদিকে জোনাকিরা তাদের হাট বসিয়েছে। নিজেদের স্বাধীনতা নিয়ে উড়েঘুরে বেড়াচ্ছে আলো জুলিয়ে, আলো নিভিয়ে। মোতালেব সামনে আড়াল নিয়ে তার এল.এম.জি সেট করে ফেলে। অন্যদের আক্রমণাত্মক অবস্থানে রাখা হয়। নিজেদের অবস্থান ঠিক করে নিতে বেশি সময় লাগে না। সকলের মধ্যে দাঁকুণ এক উত্তেজনা এসে ভিড় করে। নিজের বুকের ভেতর কামারের হাঁপরের ওঠানামা চলতে থাকে। নার্ট টান টান হয়ে যায়। মনে হয়, বুঝি নিষ্পাস কর্ম হয়ে আসবে। শক্তর একেবারে হাতের মুঠোর ভেতরে রয়েছি আমরা। এ অবস্থায় নিজের সঁজিত ঠিক রাখা আসলেই মুশকিল।

কিছুক্ষণের ভেতরেই ব্যাপারটা কিছুটা থিভিয়ে আসে। উত্তেজনা ভয় সরকিছু দূর হয়ে যায়। আকাবর আর মালেককে পাশে টেনে আনি। ফিসফিসিয়ে বলি, কিরে পারবি?

— হ্যা, ওরা নির্বিজ্ঞ সম্ভতি দেয়।

— গ্রেনেডগুলো নিয়েছিস তো?

— হ্যা।

— তাহলে যা। খুব আন্তে আন্তে এগিয়ে যাবি। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে থেকে। মাথা মোটেও তুলবি না। দুদিক থেকে আক্রমণ শুরু হওয়ার পর তোরা ওদের ঘাঁটির যতোদূর সভব ভেতরে গ্রেনেড ছুঁড়বি যে কটা পারিস। তোদের গ্রেনেড ছেঁড়ার সাথে সাথে মোতালেব এল.এম.জি ফায়ার ওপেন করবে। সেই সাথে অন্যান্য হাতিয়ারও। এর ভেতরেই তোরা ঝলিং করে ব্যাক করে আসবি দ্রুত। তোদের ওপর দিয়ে গুলি যাবে কভার ফায়ার হিসেবে। কটা গ্রেনেড আছে দুজনের কাছে।

— আটটা।

— ঠিক আছে, রওনা হয়ে যা, খোদা হাফেজ। জয়বাংলা।

প্রতিউত্তরে তারাও জয়বাংলা বলে এগুতে থাকে সামনের দিকে। ঠিক সাপের মতো বুকে হেঁটে হেঁটে ওরা এগিয়ে যায়। পলকের ভেতরেই মিশে যায় অঙ্ককারের মধ্যে। একটা জলাভূমির মতো জায়গা পার হতে হবে ওদের। জলাভূমিটার ওপারেই পাকসেনাদের ঘাঁটি। বাক্সার-ট্রেকে ওদের অবস্থান ছুক্টা সাঙ্গাহিক হাট বসতো জায়গাটায়, এখন হাট নেই। জায়গাটার চারদিকে বাক্সার-ট্রেকে করে পাকসেনারা নিরাপদ ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে। কে জানে ওরা ঘাঁটির চারদিকে মাইন বসিয়ে রেখেছে কি না। যদি তাই হয়, তাহলে স্টেশনে পাঠানো দুজনকে আর ফিরতে হবে না। মাইনট্র্যাপে পড়লে ওরা বিস্ফেচে মাইনের সাথে উড়ে যাবে। ওদের অভ্যন্তরিক্ষের মধ্যে পাঠানো হয়েছে। পাকসেনারা একদম চুপচাপ। আমাদের আগমন বার্তা আগাম পেয়ে থাকলে ওরা ব্যাকে প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকবে। নয়তো সেক্সিকে দাঁড় করিয়ে রেখে পুরো দল বিশ্রাম রয়েছে। দ্বিতীয় সংঘাবনা অর্থাৎ তারা বিশ্রামে থাকলে, আকার্বন-মালেক তাদের সেক্সির চোখ এড়িয়ে একেবারে ওদের ঘাঁটির ভেতরে ধমাধম গ্রেনেড ছুঁড়ে চলে আসতে পারবে।

ওদের অপসৃষ্টমান শরীরগুলোর দিকে তাকিয়ে এক থরোথরো অপেক্ষায় সময় পার হতে থাকে। চারদিকে বিবি পোকার একটানা রব। এই সময় হঠাতে ডান দিক থেকে ফায়ার ওপেন হয়। রাত তখন পৌনে একটার মতো সময়। একরামুলের দলই ফায়ার ওপেন করেছে। ওদের হাতের ছুঁড়ে দেয়া অন্তরে গোলাগুলির শব্দতরঙ্গ রাতের সমস্ত শুরুতা ভেঙে চৌচির করে দেয়। হিসেব মতো একরামুলের সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীরও ফায়ার ওপেন করার কথা। কিন্তু সেদিক থেকে গুলিবর্ষণের শব্দ আসে না। তবে পিন্টুর দল পেছন থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করে। শিস বাজিয়ে গুলির বাক ছুটে যায় সম্মুখপানে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। পিন্টুর অবস্থান আমাদের ঠিক পেছনে ৩০০ গজ দূরত্বে। প্রথমে ওদের মার্টার থেকে গোলাবর্ষণের কথা। কিন্তু কথামতো কাজ হয় না। পিন্টুর দল এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ করতে থাকে। মোতালেবের উত্তেজিত ঝর ভেসে আসে, মুই শুরু করিম নাকি গে, কহেক?

— না, এখন না। আমি বলার পর শুরু করবি। হারামজাদারা আগেই এভাবে শুরু করে দিলো, সব পও হয়ে যাবে।

বুকের মধ্যে আমার অসম্ভব তোলপাড় পিন্টুর ২ ইঞ্জিং মার্টারের শব্দ শোনার জন্য। এইরকম মুহূর্তে হঠাৎ একটা টাপ শব্দ আসে পেছন থেকে। মনে হয়, একটা প্রচণ্ড ইচ্ছাখণ্ডির ওপর ভর করে পিন্টুর মার্টার সত্ত্বে হয়ে উঠেছে। একটা পৌঁ-ও ধৰনি তুলে মার্টারের শেল উড়ে আসে পেছন থেকে। উজ্জ্বল আলোর বিজ্ঞুরণ ঘটিয়ে শক্রঘাটির ভান দিকে প্রায় ৫০ গজ দূরে বশদে বিস্ফেরিত হয় মার্টারের গোলা। বুকের নিচেকার মাটি কেঁপে ওঠে। আবার উড়ে আসে মার্টারের শেল। তখন শক্র সেনারা সজাগ হয়ে ওঠে। প্রথমে ভান ও পরে বামদিকে প্রায় একই সাথে সক্রিয় হয়ে ওঠে তাদের মেশিনগান। ধাম-ধাম শব্দে শুরু হয়ে যায় তাদের গুলিবর্ষণ। তাদের অন্যান্য হাতিয়ারও সরব হয়ে ওঠে প্রচণ্ডভাবে। চৌধুরী তখনও নীরব। আকাবর-মালেক সামনে, আর অপেক্ষা করা যায় না। মোতালেবকে চিৎকার করে তার এল.এম.জি চালানোর নির্দেশ দিই। মোতালেব শুরু করে শক্র ঘাঁটির দিকে নল ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে তার গুলিবর্ষণ। অন্য ছলেদেরও শুরু করতে বলে, নিজের হাতিয়ারের ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরি। একপশলা গুলি বেরিয়ে যায়। টনগানের আগুনের ফুলকি তুলে। একটা পুরোপুরি যুক্ত শুরু হয়ে যায়। চৌধুরী ক্ষেত্রমধ্যে তার পজিশনে এসে গুলিবর্ষণ শুরু করেছে।

এখন মাঝাখানে শক্র রেখে তিনদিক থেকে তাদের দিকে গুলি ছুটে যাচ্ছে। শক্র পক্ষও জবাব দিয়ে যাচ্ছে এলোপাতাঙ্গিজাবি। পরিকল্পনাটা চমৎকারভাবে কাজে লেগেছে। শক্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে সাক্ষণ্যভাবে। একযোগে তিনদিক থেকে আক্রমণ। তিনদিক ঠেকাতে গিয়ে কোনো দিকেই মন দিতে পারছে না তারা। ঘাঁটি ছেড়ে রাস্তার ওপারের ঢালতে ঢলে গেছে সম্ভবত ওদের দলের কিছু অংশ। এগিয়ে এসে আমাদের ওপর ওদের চড়াও হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু তারা তা করছে না। রাতের অন্ধকারে ঘাঁটি কামড়ে পড়ে থেকে একটানা গুলিবর্ষণ করে তারা আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করছে। এমন সময় ওদের ঘাঁটির মধ্যে পরপর ৪টা বিস্ফেরণ। তার মানে দুই যুবক সফল গ্রেনেড হামলা চালিয়েছে। গড়িয়ে আসি দ্রুত মোতালেবের কাছে। বলি, মোতালেব জোরে ফায়ার দে, জোর ফায়ার দে। তা না হলে ওরা আসতে পারবে না। এল.এম.জিটার ওপর মোতালেব যেনো হামলে পড়ে আর ফায়ার দিতে থাকে একটানা। এখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিটা হাতিয়ারই সরব, সচল। একটানা অবিভ্রান্ত গুলিবর্ষণে ব্যস্ত। নিজস্ব কায়দায় অবস্থান বদল করে করে শক্র দিকে মৃত্যুবাণ পাঠিয়ে চলেছে। শক্রপক্ষও বিরামহীনভাবে তার জবাব দিতে ব্যস্ত। মাথা তুলবার উপায় নেই। চারদিক থেকে গোলাগুলির দৌড়াদৌড়ি। অনেকটা ফাঁদের মধ্যে আটকেপড়া শক্র পাকসেনারা তাদের অবস্থানে টিকে থাকবার জন্য লড়ছে। এটা তাদের প্রাণে বেঁচে থাকবার জন্য লড়াই। তাই বিরামহীনভাবে গুলি ছুঁড়ে তারা পাগলপারা হয়ে উঠেছে। এটা তারা বুঝেছে যে, একবার গোলাগুলিতে ক্ষান্ত দিলে তাদের নিচিত হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের

উদ্বারকারী দল এসে পৌছাবার উপায় নেই। একবার যদি তারা গুলিবর্ষণে বিরতি টানে, তাহলে মুক্তিবাহিনী তাদের ওপর চড়াও হয়ে তাদের পিষে ফেলতে পারে। নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারে। বাঁচাবার তাপিদ থেকে লড়ছে ওরা— জাত ঘোংশা পাক সৈনিকের দল।

সাকাতির দিক থেকে উড়ে আসে সিক্স পাউভারের গোলা। প্রচও শব্দ তুলে বিস্ফোরিত হয় ঘাঁটির পেছনের দিককার রাস্তার ওপারে। গগনবিদারী শব্দের তরঙ্গ ধাক্কা দিয়ে যায়। মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। কিছুটা বিরতি দিয়ে আবার সাকাতি থেকে ভারতীয় আর্টিলারি ইউনিটের গোলা উড়ে আসে। যা হোক মেজের দরজি তাহলে ঠিকঠাকভাবেই তাদের সাথে সংযোগ করতে পেরেছেন। পাকবাহিনী উঠে এসে আমাদের ওপর চড়াও হবে, সে সংজ্ঞানটা ক্ষীণ হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের গুলিবর্ষণ চলতে থাকে একইভাবে। এই সময় হঠাতে করে হাদি দৌড়ে আসে ডান দিক থেকে। যেভাবে মাথা তুলে দৌড়ে এসেছে, তাতে যে-কোনো সময় বুলেট বিন্দ হওয়ার সংজ্ঞান তার। তাই হ্যাঁচকা টানে শুইয়ে দিই তাকে। উদ্বেজনায় ছটফট করছে সে। উদ্ব্রান্তের মতোই অবস্থা। কী হয়েছে? কড়া গলায় জানতে চাই। মাজেদের হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে একটানা গুলিবর্ষণে যোগ দিয়েছি। টেনগানটা ওর হাতে। গুলিবর্ষণের তোড়ে গরম হয়ে উঠেছে রাইফেলের মুক্তোকে পোড়া বারংদের গুঁক। হাদি ফিসফিসিয়ে বলে, বাক্সার!

— বাক্সার?

— হ্যাঁ।

— কাদের? কোথায়?

— এদিকে ওদের।

কাপছে গীতিমত্তে হাদি আম নিজেও প্রায় নিশ্চল হয়ে পড়ি হাদির পরিবেশিত উদ্বেজক খবরে। ডান দিকে পেছন দিককার ফসলবিহীন ন্যাড়া জমিটায় ছিল হাদিসহ জয়নালদের অবস্থান। সেখানে শক্রপক্ষের বাক্সার। মানে শক্র বাক্সার পেছনে রেখে আমরা অবস্থান নিয়েছি!

— সর্বনাশ! বাক্সারের ভেতরে কি ওরা আছে?

— মুই কবার পাওনা।

— একটা ঙাঁচা তিবি দেবি মুই হাত দিনু, দেখৎ বাক্সার। কথা বলতে বলতে কেঁপে ওঠে হাদি।

সময় নেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। শক্রের বাক্সার পেছনে। ওরা বাক্সারে ঘাপটি মেরে থাকলে অবস্থা খারাপ। মোতালেবকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলে, মাজেদের হাত থেকে টেনগানটা টেনে নিই। মাজেদকে আসতে বলি সাথে। এরপর কশ্মান শরীরের হাদিকে নিয়ে দৌড়ে আসি ডানে কিছুটা পেছনে ওদের অবস্থানের দিকে। হাদি আঙুল দিয়ে ইশারা করে দেখায় একটা উচু মতো মাটির তিবি। জয়নাল আর মাজেদকে নিয়ে ক্রলিং করে দ্রুত এগিয়ে যাই সেই তিবির দিকে। এরপর মাথা তুলে সহসা বলে উঠি, চার্জ!

দোড়ে আসি ঢিবিটার কাছে। হাঁা, বাক্সার। দ্রুত বাক্সারের মুখে গিয়ে দাঁড়াই। মাজেদকে বলি, তোক। শেয়ালের মতো চুকে পড়ে মাজেদ বাক্সারের ভেতরে। তারপর কিছু নাই গে, বলে চিৎকার দিয়ে ওঠে মাজেদ মিয়া।

— ঠিক আছে বের হ।

মাজেদ বের হয়ে আসে। কাঁচা মাটি চাপা দিয়ে মজবুত করে তৈরি বাক্সার। মন বলে ওঠে, পানিমাছ ঘাঁটি ঠেকাবার জন্য শক্তর অস্ববর্তী বাক্সার।

শুধু একটাই থাকতে পারে না। আরো আছে ওদের বাক্সার। হানি আর মাজেদ মিয়াকে বাক্সারের লাইন ধরে এগিয়ে যেতে বলি। পাক সৈনিকের তৈরি বাক্সারের দখল নিয়ে তাদের অবস্থানের দিকে মুখ করে শুয়ে থেকে যুদ্ধ দেখি। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। একটা পুরোপুরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে জায়গাটা। গুলিগোলা-গ্রেনেড-বোম-শেল একসাথে বর্ষিত হতে থাকে। ডানে একরামুল, বাঁয়ে চৌধুরী। মাঝখানে অবস্থান নিয়ে মোতালেবের একটানা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। খেমে খেমে দ্রুতগতিতে। পেছন থেকে পিণ্ড যুদ্ধের মদন পাঠায়। দরজির সাহায্য আসে ওপার থেকে। ইন্দুরের কলে পড়বার মতো অবস্থা নিয়ে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদে মরিয়া হয়ে লড়ে যায় পাক সৈনিকের দল।

হঠাৎ ভূতের মতো উদয় হয় দুই কিশোর যোদ্ধা স্টার্ট ও মাজেদ। বলে আরো দুটো আছে। মোট তিনটা বাক্সার তৈরি করেছে স্টার্ট এখানে। তারা মানে তাদের বড় ধরনের ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তুতি চলছিলো। কাজগুলো উড়িয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে চলে আসি মোতালেবের কাছে। স্টার্ট আপারটা বুঝিয়ে দিই। ও থাকবে নিজের অবস্থানে মাটি কামড়ে। এ বিশ্বাস নেবে ফিরে আসি রেমার চার্জগুলোসহ। এরপর রেমার চার্জ বাক্সারে ঢুকিয়ে সেমাই-ফিউজে আগ্নন দিয়ে দোড়ে সরে যাই। বিপুল আলোর ঝলকানি তুলে বাক্সার তেজেরে উড়ে যায় রেমার চার্জের বিক্ষেপণে। কাদা-পানি এসে পিঠের ওপর পড়ত থাকে। একটা দুটো তিনটা বাক্সার উড়িয়ে দেয়া হয়। কাদাপানিতে শরীর লেপটালেপটি হয়ে যায়। ওদের এদিকে এসে ঘাঁটি গাড়বার সাথ মিটিয়ে দেয়ার তাগিদে আছেন্নের মতো কাজগুলো শেষ করি ধীরাহিনভাবে। একটা করে বাক্সার বিক্ষেপিত হয়। প্রচণ্ড শব্দ ধৰনি দিগন্তকে প্রকশ্পিত করে তোলে। এ ধাকা পাকবাহিনীকেও আলোড়িত করে। ওদের ফায়ার পাওয়ার প্রচণ্ডভাবে বাড়তে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে আমাদের আক্রমণের চাপ। ক্লান্ট-বিক্রিত অবস্থায় ফিরে আসি মোতালেবের কাছে। দেখি, গুটিসুটি মেরে আধাশোয়া অবস্থায় বসে আছে মালেক-আকাবর।

— তোরা এসেছিস? আসতে পেরেছিস?

— জ্ঞে।

বুকের ভেতরে একরাশ ঝরনার কল্লোল ধৰনি শুনতে পাই। স্বত্ত্ব আর আনন্দের।

— কোনো ক্ষতি হয় নি তো?

— না।

— ঠিক আছে, পেছনে গিয়ে রেষ্ট নে। প্রায় দু'ঘণ্টা গড়িয়ে গেছে। বাতাস ভারি

হয়ে এসেছে ধোয়া আর বারুদের গক্ষে। এ সময় মোতালেব ফিসফিসিয়ে বলে, গুলি
শেষ হয়া অসিছে গে, এখন কি করিবেন?

— রিট্রিট! একটু থেমে মোতালেবের কথার জবাব দিই। এখন রিট্রিট করতে
হবে। পেছনে যাবো। তুই চালিয়ে যা, জয়নাল রিট্রিটের ব্যবস্থা করবে। আজ
এখানেই শেষ। পাকবাহিনীর ঘাঁটি দখল নেয়ার রিক্ষ নেয়া যাবে না। রাত ফুরিয়ে
আসবে। অনেক দূর ফিরতে হবে।

ফায়ার এড মুড ভঙ্গিতে পেছনে ফেরা চলতে থাকে। পিন্টু চুপ করে গেছে।
একরামুলও ধীরে ধীরে একেবারেই থেমে গেছে। চৌধুরী তখনও চালিয়ে যাচ্ছে।
এদিককার থেমে যাওয়া অবস্থা দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো চৌধুরীও থামিয়ে
দেবে।

রিটার্ন পোস্ট বা আরপি কামারপাড়ায় সবারই ফিরে আসবার কথা। যুদ্ধ থেমে
গেছে। হয়তো ওরা ফিরছে। ওদের ফিরবার অপেক্ষা নিয়ে রাজ্ঞাক মাটারের বাড়ির
সামনের উঠোনে বসে থাকি। যুদ্ধের শেষে শক্তির কাছাকাছি থাকা নিরাপদ নয়।
ওদের ফিরবার অপেক্ষা এক সহয় ঔরৈয়ে এবং শক্তি করে তোলে। রাত ৪টা বেজে
যায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের আলো ফুটে উঠতে শুরু করবে। আর অপেক্ষা
নয়। যে যার মতো রাস্তা দিয়ে হয়তো ফিরে চলেছে রাজ্ঞাক মাটারের কাছ থেকে
বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

— বলি, আবার দেখা হবে। ভালো থাকবেন। সাবধানে থাকবেন।

— জি, আপনারা আমাদের বৌজুড়ির রাখবেন, কে জানে কী হয়, সেটা
আল্লাহই জানেন।

রাজ্ঞাক মাটারের শেষে কথগুলো দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায়। দেখা যাক আমরা
তো আছি। এটুকুই মাঝ বলতে সারি। এরপর রওনা দিই পা টেনে টেনে। একরাশ
ক্লান্তি এসে শরীরে ঝাপিয়ে পড়ে। ঢোকের পাতা ভারি হয়ে আসতে চায়। পায়ের
ওজন বেড়ে যায়। ক্লান্তির চরম সীমানায় পৌছে গেছে শরীর। প্রায় ৮ মাইল দূরে
নালাগঞ্জ, আমাদের হাইড আউট। সেখানে পৌছুতে হবে দ্রুত। সেখানে নিরাপত্তা
আছে। আশ্রয় আছে, আছে জীবনের রসদ। আমরা হাঁটতে থাকি আমাদের সেই প্রিয়
আস্তানা অভিমুখে।

আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় দুয়ায় ঐ

মরা ঘূম ভাঙে বেলা এগারোটার দিকে সজিমউদ্দিনের ডাকাডাকিতে। উদ্দীপ্ত মুখ
সজিমের। উজ্জ্বল সকালের মতোই আলোয় উত্তৃসিত তার মুখ। গড়গড় করে রিপোর্ট
পেশ করে সে রাতের যুদ্ধের। সে থেকে শিয়েছিলো বদলুপাড়ায় তার নিজের বাড়িতে
যুদ্ধের ফলাফল অর্থাৎ শক্তপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহ করে আনার জন্য।
সজিমের মাত্রাতিরিক্ত উচ্চাসময় বিবরণের সাথে শক্তপক্ষের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির যে
বিবাট ব্যবধান ফলে সজির দেয়া বিবরণ বিশ্বাস করতে মন চায় না। রাজ্ঞাক
মাটারের দৃত আসে কিছুক্ষণের মধ্যে। শক্তির বিবরণ দিয়ে তিনি তার নিজস্ব

অনুচর পাঠিয়েছেন। সজিমউদ্দিনের রিপোর্টের সাথে রাজাক মাটারের প্রতিনিধির রিপোর্ট মিলিয়ে নিয়ে, দু'পক্ষের রিপোর্ট যাচাই ও পর্যালোচনা করে গতরাতের মুক্তে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের ওপর যে তথ্য দাঁড় করানো গেলো কর্তৃপক্ষের জন্য, সেটা এই রকমের : শক্রপক্ষের মোট ৭ জন মারা গেছে। এর মধ্যে পাকসেনা ৩ জন, রাজাকার ৪ জন। সেই সাথে ২০ জন আহত। কিংবা তার চাইতেও বেশি। সকাল ৭টায় ২টা ৬ × ৩ টনী ট্রাকের আগমন। একটা ফিরে গেছে ৭টা ৩০ মিনিটের সময় আহত ও নিহতদের নিয়ে। অন্যটি ৯টায় ফিরে গেছে আহত অবস্থায় যারা বেঁচে ছিলো তাদের নিয়ে। একটি নতুন নিয়মিত পাক সৈনিকের প্লাটুন এসেছে পুরাতনদের জায়গায় তাদের রিপ্রেসমেন্ট হিসেবে ঐ ট্রাক দুটোতে করে। তারা তাদের ঘাঁটির চারদিকে আধ মাইল এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা বেঁটনী তৈরি করে সশস্ত্র প্রহরা বসিয়েছে। তারা আতিপাতি করে মুক্তিযোদ্ধাদের খৌজার্বুজি করছে। দরজিকে অত্যন্ত সজীব দেখায়। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে একটা বর্ষাতি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে তিনি ভ্যান থেকে নেমে আসেন। পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে পেছনে দু'হাত নিয়ে বুকটান করে আমরা তাঁকে সশান্ম জানাই। সহাস্য মুখে তিনি হাত মেলাবার সময় জিগ্যেস করেন, গট মাই সাপোর্ট?

— ইয়েস স্যার, মনের সম্পূর্ণ উৎসুকতা কঠে ঝুলে জবাব দিই তার কথায়। মনের ভেতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রচণ্ড তাগিদ।

— ওয়াজ ইট ইন টাইম?

— ইয়েস স্যার, এক্সার্টিল ইট ওয়াজ ইন টাইম এন্ড ভেরি মাচ ইফেকটিভ।

মেজর বসেন। মুখে ঝুলে থাকেন্টেমর হাসি। ঠোঁটের সেই হাসি নিয়ে তিনি জানতে চান, নাউ টেল মি, হাউ ইট? ওয়াজ ওয়ার? ডিড ইউ এনজয় ইট? হাউ দে এক্সপ্রেসড দেয়ার লাভ, হেন্ডেড উনহোনে এ্যাটাক কিয়া?

— স্যার হামনে জবর ফাইট দিয়া, শালে লোগ হামনে সে নেহি পারা হায় ...।

— ঠিক হ্যায়, মি. পিস্টু, বলে পিস্টুর গড়গড় করে বলে যেতে থাকা মুক্তের বিবরণ মেজর থামিয়ে দেন। আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, মেহবুব এ্যানি ক্যাজুলেটিজ ফরম আওয়ার সাইড?

— নো স্যার।

— দেন টেল মি, পাক আর্মি ডিফেন্স এ্যাটাক তোমনে ক্যায়সা লাগা?

— স্যার, ইট ওয়াজ আওয়ার ফার্স্ট ওর্গানাইজড এ্যাটাক। উই ফট দেম ফেস টু ফেস। ইট ওয়াজ টেরিফিক। দে অলসো ফট ফর দেয়ার সারভাইভাল। হামারা রাউন্ড ব্যতম হো শিয়া থা, নেহি তো হামলোগ, পাক ডিফেন্স কা দখল লেনে সাকতা।

— ঠিক হ্যায় বয়েজ। ইয়ে তোমহারা পহেলা এ্যাচিভমেন্ট। উই গট ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট ফ্রম বি.এস.এফ সোর্স। তোমনে বহুত জোর ফাইট কিয়া। আই এ্যাম রিয়েলি প্রাউড অব ইউ।

রাতের মুক্তের রিপোর্ট এগিয়ে দিই। মেজর পড়েন গভীর মনোযোগের সাথে।

হঠাতে করে লাফ দিয়ে উঠেন,—তুমনে তিনি পাক আর্মি মারা!

- ইয়েস স্যার,
- তুমনে আঙ্গু করকে চেক কিয়া?
- ইয়েস স্যার,
- কোই গাল্টি তো নেই হ্যায়?
- নো স্যার।

ভবেন তিনি কিছুক্ষণ। তারপর নিজের নোটবইয়ে টুকে মেন সমস্ত রিপোর্ট। ও,কে বয়েজ, আই এম কনভিনস্ড এন্ড টেকিং ইউর রিপোর্ট। আই উইল পাস ইট টু মাই সিও, এন্ড হি উইল পাস ইট টু আওয়ার হেড কোয়ার্টার। খ্যাক ইউ ভেরি মাচ ফর হ্যাভিং দিজ এ্যাচিভমেন্ট।

বি.এস.এফ কমান্ডার সেই প্রবীণ নেপালি মানুষ। আমরা তাকে সুবেদার দানু বলে ডাকি। রিপোর্টশেষে সুবেদার দানু মুচমুচে ভাজা ব্যাসনের পিয়াজিসহ সুবাদু চা পরিবেশন করেন। চা নাস্তা খাবার সময় দরজি উদাস হয়ে যান কিছুটা। বলেন, আই এ্যাম লিভিং ইউ ভেরি সুন।

— আপ যায়গা স্যার? কাঁহা যায়গা? কিউ? মেজের চৰু যাবেন, আমাদের ছেড়ে, কথাটা যেনে অনেকটা হাহাকারের মতো হঠাতে করেই ভুলের মধ্যে বেজে উঠে।

— মেরা খোদ ইউনিট মে। কেয়ারে হামদে মুল নেই লাগানে চাহিয়ে। অর্থাৎ মেজের তার নিজ ইউনিটে যোগ দেবেন এবং প্রিমিয়ামে গেলে যুদ্ধের পুরক্ষারস্বরূপ তার পদোন্নতি হবে। তার ইউনিফর্ম কান্ট্ৰু প্রিমিয়াম ফুল লাগবে। একথাটাই তিনি সহজভাবে বলতে চাইছেন। কিন্তু হেস্টি সাথে তার বিদায়ের বার্তার মধ্যে একটা বেদনৰ সুর। আসলেই ভদ্রলোক সুবেদারের আন্তরিকভাবে তালোবেসেছিলেন।

পাকা সড়কের ওপর ২৫ কিমির একটা দল দাঁড়িয়ে। তাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেজের বলেন। এরা আজকে তোমাদের দলে যোগ দেবে। সদ্য মুরতি থেকে ট্রেনিং শেষ করে এসেছে এরা। তোমরা তো এর মধ্যেই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছো। এবার এদের প্রকৃত যুদ্ধের মাঠে দ্রুত আপ করে তোলো। এরা তোমাদের দল বৃদ্ধি করবে এবং তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে। তোমাদের জন্য রেশন আৰ ঘথেষ গোলাবারুদ এনেছি। এগুলো রিসিভ কৰো।

— আমার নাম মুসা, প্রাইন কমান্ডার। নিজের পরিচয় নিজে দিয়ে নতুন দলের কমান্ডার একটু ফ্যাকাসে লাজুক হেসে এগিয়ে এসে হাত মেলায়। বলি, ওয়েলকাম মি. মুসা।

তার দলের ছেলেরা বুক টান করে সশ্রান্ত জানায়। সবার চেহারার মধ্যে অবশ্যি আর ভীতচকিত ভাব। অজনা যুদ্ধের মাঠে যেতে হচ্ছে তাদের। প্রথম দিন এধৱনের মানসিকতা আবশ্যিকভাবে সবার ওপরেই ভর করে থাকে।

— ঠিক আছে সব ঠিক হয়ে যাবে, ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখন কাজে লেগে পড়ো সকলে। গাড়ি থেকে মালসামানা নামাও।

পিন্টু মুসাকে নিয়ে গাড়ি থেকে অন্ত-গোলাবারুদ-রেশন এগুলো নামানোর দায়িত্ব

দিয়ে ফিরে আসে। মেজরের কাছ থেকে প্রাণ গোলাবারুদের হিসেব টুকে নিছি আমি। পিন্টু কানে কানে বলে, পনেরোটা বকরি মাহবুব ভাই। সবগুলো আধমরা। ওর কথায় আমার হাসি পায়।

মেজর জিগ্যেস করেন, হাসতা হ্যায় কিউ?

— নেহি স্যার, বকরি কা বাত বোলতা হ্যায়, হি ইজ টেলিং এবাউট গোট, সাপ্লাইড এ্যাজ আওয়ার রেশন।

— ইয়েস গোট, মেজর দিলখোলাভাবে হাসেন। তোরি পুওর হেলথ ইজ নট? বহুত দূর সে আতা হ্যায় উহ বকরি। রাজস্থান সে। আতে আতে বকরি শুকা যাতা হ্যায়। হাউএভার, হাউ ইউ আর এনজিয়িং আওয়ার গোট?

— তোরি টাফ স্যার। প্লাস্টিক কা মাফিক, পিন্টু বলে।

— ও! ইয়েস, মগার কুছ করনা নেহি। ইয়ে হামারা আর্মি রেশন।

বিকেলের আলো পড়ে আসে। মেজর বিদায় নিয়ে চলে যান। মুসার নেতৃত্বে গোলাবারুদ, মালসামানা, রেশন বকরির পাল নিয়ে ছেলেরা হাইটে থাকে সামনের দিকে, যেদিকে আমাদের হাইড আউট। ওদের পেছনে পেছনে আমরা হেঁটে চলি ধীরমন্ত্র পদে সূর্যকে পেছনে রেখে। হিমালয় তাৰ বিশাল কালো দেহ নিয়ে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পিন্টু স্মার্টক আমার দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলে, দেখেছেন মাহবুব ভাই?

— কি? জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাই তার দিন্দি টেকে হিমালয়ের বিশালত্বের দিকে। উদার কঠে তখন পিন্টু গান ধরে, 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই . . . '

১২৮.৭১

জনযুক্ত

ক'দিন থেকেই মজিব তাড়া দিছিল, তাদের প্রাম সর্দারপাড়া যেতে হবে। তার বড় ভাই শফিকুল ইসলাম দুদু, চাচাতো ভাই আবদুল জব্বারসহ অন্য উঠ'তি বয়সী জ্ঞাতি ভাইদের উদ্ধার করে আনতে হবে। তাদের বাঁচাতে হবে। বিশেষত দুদু ও জব্বারকে পাকবাহিনীর হাত থেকে উদ্ধার করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মজিব প্রথম দিনই জানিয়েছিলো, পাক কর্তৃপক্ষ তার বাবা হালিম মাস্টারকে এই মর্মে আলটিমেটাম দিয়েছে যে, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া দু'ছেলেসহ অন্যদের পাকবাহিনীর পঞ্জগড় ঘাঁটিতে রিপোর্ট করতে হবে। এর অন্যথা হলে তারা সর্দারপাড়ায় হামলা চালিয়ে তাদের ধরে নিয়ে যাবে। হালিম মাস্টার এতোদিন বলে এসেছেন, তার ছেলেরা বাড়িতে আসে নি। ঢাকাতেই রয়ে গেছে। কিন্তু এখন পাক কর্তৃপক্ষ সেটা বিশ্বাস করছে না। তাদের কাছে গোপন স্তুতে খবর পৌছেছে যে, মজিব, দুদু আর জব্বার— এরা সর্দারপাড়াতেই আছে। সম্ভবত তারা এটাও জেনে গেছে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। মজিবের মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি অর্ধাং আমাদের হাইড আউটে অবস্থান এবং মাঝে-মধ্যে সর্দারপাড়া যাতায়াতের ব্যাপারটা গোপন থাকে নি। ওদের এলাকার কোনো পাক অনুচর সম্ভবত খবরটা পঞ্জগড়ে শান্তি কমিটির

কাছে পৌছে দিয়ে থাকবে। মজিব এজন্য অস্থির হয়ে আছে। প্রতিদিনই তার একান্ত অনুরোধ, সর্দারপাড়া মিশনে যেতে হবে। অন্যথায় তাদের পরিবারের জন্য সীমাহীন দুর্ভিতি নেমে আসবে। সফিক-জবরার এদের হয় তারা ধরে নিয়ে যাবে, নয় তাদের গুলি করে মেরে ফেলবে। তারা যদি কোনো রকমে পালিয়েও বাঁচে, তবে সমস্ত সর্দারপাড়া গ্রামটা ওরা তচনছ করবে, নয়তো লুটপাট করে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

মজিবের এটা পারিবারিক সমস্যা। সে বর্তমানে আমাদের সাথে থাকছে। রাতের অপারেশনে গাইড হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে। হাইড আউটোরও এটাওটা বিভিন্ন কাজ দেখছে। একটা শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া প্রগতিবাদী আর পরিমার্জিত ছেলে মজিব। একদিনে আমাদের ক্যাম্প জীবনে তার অবস্থান এবং কাজের ভেতর দিয়ে সে আমাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে। তার ভাইদের উদ্ধার এবং তার পরিবারসহ প্রৱে সর্দারপাড়া গ্রাম রক্ষা করার ব্যাপারটা এখন একটা মানবিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনযুক্তের প্রস্তুতি হিসেবে মজিব এবং তার কম্যুনিটির পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন। মজিব, সফিক, জবরাসহ সর্দারপাড়া গ্রামটা রক্ষা করতে পারলে যুক্তের এ পর্যায়ে সেটা হবে অনেক বড় অর্জন। ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঘূরছে এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অপেক্ষায় প্রহর গুনছি।

গড়ালবাড়ি বি.ও.পি থেকে ফিরতেই উৎকৃষ্ট মজিব এগিয়ে আসে। দুশ্চিন্তা আর উৎকৃষ্টার ছাপ তার সারা অবয়বে খেজবাবে ভেঙে পড়েছে। আর সে অবস্থায় সে জনায়, কাল তারা আসছে সর্দারপাড়ার আমাদের ধরার জন্য। ভাঙা গলায় মজিব কথাটা পাড়ে।

— কে জানালো?

— সর্দারপাড়া থেকে যাবা লোক মারফত খবর পাঠিয়েছেন। কাল সকালেই ওরা আসবে হামলা করতে, সরাসরি পঞ্চগড় আর তালমা থেকে।

— খবর সঠিক?

— জি, পঞ্চগড় শান্তি কমিটির প্রধানের কাছ থেকে খবরটা জানা গেছে। তিনিই খবরটা পাঠিয়েছেন বাবার কাছে। কিছু করলে আজ রাতের ভেতরেই করতে হবে।

— সফিক আর জবরার বাড়িতে আছে?

— জি।

— ওরা আসতে চায়?

— জি, ওরা আসার জন্য তৈরি, কিন্তু আসতে পারছে না। সারাদিন লুকিয়ে থাকে বাড়ির ভেতরে। বের হওয়ার উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে, তাই।

— ঠিক আছে, ডেট ওয়ারি। তৈরি হন। আজ রাতেই মিশন যাবে।

পিচুকে মিশন তৈরি করতে বলি। আজ রাতে মুসাও দলে থাকবে। নতুন আগম্বুক রঙ রুটের মধ্য থেকে বাছাই করে ক'জনকে নিতে হবে। একরামুল-মোতালেব-নাদেরসহ পুরাতন সহযোগীদেরও সঙ্গে নিতে হবে। দলের শক্তি হিসেবে

২০ জন নতুন-পুরাতন আধা-আধি মিলিয়ে। সব ধরনের হাতিয়ার ঘেনেড় আর রেমার চার্জ সঙ্গে নিতে হবে। রাত নটায় যাত্রার সময়। পিন্টু মুসাকে নিয়ে দল তৈরিতে লেগে যায়।

মজিবকে নিয়ে আমি বাইরের চতুরে আসি। শ্রাবণ মাসের মেঘলা আকাশ। সক্ষ্য ঘনিয়ে শূট্যুটে রাত নেমেছে। এলোমেলো পাগল হাওয়ার মাতামাতি। হঠাৎ-হঠাৎ করে খুপুবুপিয়ে বৃষ্টি নামে। আবার চলে যায়। বিকেলে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন নেই। চারদিকে ভিজে বাতাসের ছোয়া। পায়ের নিচে ভেজা ঘাস। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে উত্তর-পশ্চিমের হিমালয়, দাঙ্জিলিং আর তিনধারিয়া থেকে জোনাকির আলো জ্বলিয়ে গাড়ির ওঠানামার চমৎকার দৃশ্য হারিয়ে গেছে। বোপৰাড় ও বাড়ির আনাচেকানাচে ঝিঝি পোকারদের ঐকতান। জঙ্গল থেকে ভেসে আসা তক্ষকের খকখক করে থেমে থেমে ডেকে ওঠা। মাথার ওপর দিয়ে হুতোম পেঁচা উড়ে গিয়ে কোনো গাছে বসে ডাক জুড়ে দেয়। সামনে দিয়ে দুটো ধাঢ়ি শেয়াল সর্সুর করে চলে যায়। ভিজে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা একটা গাছের গুড়িতে বসে মজিবসহ রাতের অপারেশনের পরিকল্পনার চূড়ান্ত কাজ চলতে থাকে। এমন সময় থপাস থপাস শব্দ তুলে বেরিয়ে আসে ভারি শরীরের পিন্টু।

— মাহবুব ভাই ধরাবেন? ব্রেনে ধোঁয়া লাগলে প্রস্তুতি সরিষ্ঠার হবে।

— দাও।

— মোরঠে তো ম্যাচ, বলে পিন্টু তার প্রস্তুতি থেকে ম্যাচ বের করে। অঙ্ককারে হেসে ফেলি আমি। পিন্টুর এই এক অঙ্কটা পকেটে তার কখনোই সিগারেট থাকে না। তার থাকে শুধু ম্যাচ বাক্স। মিথ্যাটুকু খাওয়ার কথা উঠলেই সে অগ্নান বদনে ম্যাচ বের করে দেয়। ওকে বসন্ত বাল। পাশে বসে ও। পকেট থেকে চার মিনার সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দেই ওকে। ও ধরিয়ে দেয় আমাকে। তারপর নিজে ধরায়। মজিবকে উদ্দেশ করে বলে, কি মজিব মিয়া চলবে নাকি? আরে ধরান, আইজ রাইতে আপনার বাড়িতে তো হামার পোলাও-কোর্মার দাওয়াত।

মজিব ইতস্তত করে সিগারেট নেয়, কি যেনো বলতে চায় অস্পষ্টভাবে। বলা হয় না। হয়তো বলতে চায়, দিন ভালো হোক, দেশের স্বাধীনতা আসুক। তারপর আপনাদের সকলকে নিম্নগ্রাম করে চমৎকার এক খাবার আয়োজন করবো।

অপারেশন সর্দারপাড়া

যাতার সময় ঘনিয়ে আসে। বাড়ির আঙ্গিনায় ছেলেরা ফল-ইন-এ দাঁড়িয়েছে তিনি সারিতে। রাতের মিশন সংযুক্তে তাদের চূড়ান্ত ত্রিফিংয়ের সময় এখন। আজকের দলে নতুন সংযোজন কর্মসূল মুসা এবং তার দলবল। ঘরের ভেতর থেকে এক ব্যাডের রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারে চরমপ্রত চলছে, ফটাস কি অইলো কি অইলো! না, বিচ্ছুরা ঢাকায় বোমা ফাটাইছে...। মুসা তার দলের সামনে দাঁড়িয়েছিলো। সে মুন্দু আপত্তি তোলে। আমি সামনে দাঁড়াই। অর্থাৎ সে সামনে এসে আমার আর পিন্টুর পাশে দাঁড়াতে চাইছে। একজন প্লাটুন কর্মসূল হিসেবে নিয়োগ করে তাকে ট্রেনিং

সেটার থেকে পাঠানো হয়েছে। সুতরাং সাধারণ ছেলেদের সাথে দাঁড়াতে গিয়ে তার অহমিকায় বাধছে। তাই সে প্লাটুন কমান্ডারের মর্যাদা নিয়ে পিটুর পাশে এসে দাঁড়াতে চায় ছেলেদের সামনে। ত্রিফিংয়ের শুরুতে মুসার এই ভ্যানিটি মনকে খিঁড়ে দেয়। একটা প্রচণ্ড ধমক দেয়া থেকে অসভ্য কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করি। শীতল গলায় তাকে কেবল বলি, আজ তোমার যুক্তে যাওয়ার প্রথম দিন। বাস্তব যুক্তের হাতেখড়ি হতে যাচ্ছে আজ তোমাদের প্রথম। পরে অনেক সময় পাবে সামনে দাঁড়াবার। আজ তোমরা অনুগত সৈনিকের মতো শুধু শুনবে। দেখবে এবং ফলো করবে, দিস মাচ। ও, কেঁ?

টিমটিমে ল্যাস্পের আলোয় তার বিব্রত ফ্যাকাসে মুখ দেখা যায়। মাথা নেড়ে সায় দেয় সে। আজকের তোমাদের জন্য ত্রিফিংটা এককম বলে, আমি আমার ত্রিফিং শুরু করি। আমরা আজ রাতে সর্দারপাড়া যাচ্ছি। সেখানে পাকবাহিনী ও রাজাকার থাকতে পারে, নাও পারে। ব্যাপারটা আমরা রেকি করে দেখবো প্রথমে। পাকবাহিনী সর্দারপাড়ায় অবস্থান নিয়ে থাকলে তাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে মজিবের ভাই সফিকুল ইসলাম এবং জব্বারকে উদ্ধার করে আনবো। তবে পাকবাহিনী সর্দারপাড়ায় না থাকলে ব্যাপারটা অনেক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে তুমল গোলাগুলি এবং বিকেোপ স্টেটে দারুণ একটা প্যানিক সৃষ্টি করতে হবে। অবশ্য ব্যাপারটা হবে আপেক্ষের মধ্যে একটা সাজানো ঘটনার মতো। আমরা সফিক আর জব্বারকে সাথে ক্ষেত্ৰসন্ধি আসবো। শক্ত ধারণা করবে, মুক্তিযোদ্ধারা সর্দারপাড়া গ্রামে হামলা চালু কোর করে হালিম মাটীরের ছেলেদের ধরে নিয়ে গেছে। আজ রাতের অপারেশনের পর কাল অবশ্যই সর্দারপাড়ায় পাকসেনারা আসবে। হালিম মাটীর তাদের সামনে হাউমাউ করে কেঁদে-কেঁটে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ এবং তাদের তাঙ্গুলীলার বিবরণ দেবেন অতিরিক্ত করে। তিনি তাদের জানাবেন, মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের ছেলেদের ধরার জন্য হামলা করছে, অত্যাচার করছে। এদিকে আপনারাও তাদের জন্য চাপ সৃষ্টি করছেন। তার আর ধমকধামক দিছেন। এখন আমরা কোথায় যাবো? তিনি পাকবাহিনীর কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাকুতিমিনতি করবেন এবং তাদের এই ধারণাও দেবেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা অগ্রশঙ্কে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং দুর্বর্ধ। ব্যাস এটাই আজ রাতের অপারেশন। সবাই সজাগ থাকবে। হাতিয়ার সামলে রাখবে। অর্ডার না পেলে কেউ ফায়ার ওপেন করবে না। এই বলে আমার ত্রিফিং শেষ করি। এরপর মুভ করার আদেশ। আজকের রাতের গাইড মজিব। সে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তার বাড়িতে।

রাত এগারোটার মধ্যে সর্দারপাড়া গ্রামের উত্তরের প্রান্তীয়ায় এসে পৌছানো গেলো।

হাইড আউট থেকে বেরিয়ে মাইলখানেক মতো পথ হেঁটে এসে নেমে পড়তে হয়েছে আমন চারা লাগানো ক্ষেতে। সেখান থেকে টানা প্রায় ৬/৭ মাইলের পথ। সারাটা পথ জলাভূমি, হাঁটু সমান ফসলের ক্ষেত। তুসভূসে কাদাপাকে ভরা প্রান্তৰ

পেরিয়ে আসতে হয়েছে। নতুন ধান লাগানো ফসলের মাঠে হাঁটার ব্যাপার কষ্টকর, পা ডুবে যায় গোড়ালি পর্যন্ত। টেনে তুলতে হয় পা। পায়ের পাতা গোড়ালিতে লেন্টে থাকে এঁটেল মাটি। ফলে পায়ের ওজন বেড়ে যায়। প্রতিটি পদক্ষেপে শরীরের সংক্ষিত শক্তি ক্ষয় হয়। এমনিতে কাঁধে অস্ত্র, পকেটে কিংবা কোমরে ছেনেডসহ বিভিন্ন ধরনের গোলাবারুদ বইতে হয় সবাইকে। যেগুলোর ওজনও ৮/১০ সেরের কম নয়। তার ওপর হাঁটু পর্যন্ত এঁটেল মাটির মোটা আস্তরণ নিয়ে দু'পায়ের ওজন বেড়ে যাওয়ায় তা টেনে টেনে তুলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আসলেই কষ্টকর। যুক্তের সময় ছাড়া এ ধরনের কষ্টের মধ্যে মানুষকে নিয়ে আসা অসম্ভব বলে মনে হয়। শরীর ঘামে ভিজে জবজবে, হাঁকিয়ে ওঠায় সবাই জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। এর ভেতর দিয়েই যতোদূর সভ্ব সন্তর্পণে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে এগিয়ে চলতে হয়েছে। মজিব সবসময় পাশে রয়েছে। তারি শরীরের পিন্টু কিছুক্ষণ পরপর জিগ্যেস করে চলেছে, মজিব মিয়া আর কতোদূর? হাত ইশারায় মজিব সামনের দিকটা দেখিয়ে তাকে আশ্চর্ষ করার চেষ্টায় ব্যস্ত।

ছেলেরা হাঁটছে। তাদের পথ চলার একটা থপথপ সপসপ রিদমিক শব্দ। চারদিকে ঘূটঘূটে অঙ্ককার। দূরে অঙ্ককারে ঘনকালো ছায়ার মতো ছাড়া ছাড়া হ্রাম জনবসতির অতিক্রম। এর মধ্যে এক পশলা বৃষ্টি মাথার পেঁপর দিয়ে চলে যায়। একখণ্ড কালো মেঘ মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিলো। অঙ্ককারে ছায়ার মতো আগুয়ান একগুচ্ছ ঘূবকের সাথে যেনো ইয়ার্কি মেঝে চলে যায় মেঘের খণ্টি তার আপন বেয়ালে। ঘিরিবিবে বৃষ্টিতে গা-মাথা জ্বালায়। কিন্তু এতে কোনো ক্ষতি হয় না, যাত্রায় কোনো বিহু ঘটে না। সব সবৰ রকম হয়, ক্লান্তি শেষ সীমায় যখন পৌছে যায়, শরীর তখন পৌছে যায় দীর্ঘিত লক্ষ্যে। এখানেও তাই হলো। মজিব ইশারা দেয় এসে গেছি।

একেবারে হালিম মাটাটের বাড়ির সামনে এসে গাছের ঘন ছায়ায় ঘটপট অবস্থান নেয়া হয়। মোতালেবকে একটা দল নিয়ে পঞ্চগড়-তালমা রাস্তা কভার করার জন্য নিয়োগ করা হয়। সর্দারপাড়ামুখী রাস্তাটার একটা ঘনকের মাথায় বাঁশবাড়ের তলায় ওরা অবস্থান নেয়। বাড়ির বাইরে চতুরে ঘড়ের গাদার ওপারে পানিমাছ পাক ঘাঁটি বরাবর মুসার দলকে অবস্থানে রাখা হয়। একরামুল থাকে মুসার সাথে। মজিব চলে যায় ভেতরবাড়িতে।

গ্রামটা নিঃশব্দ, চুপচাপ নয়। ভেতর থেকে কিছু রাত জাগা মানুষের সাড়াশব্দ ভেসে আসে। পাকবাহিনীর উপস্থিতি নেই। সেটা সর্দারপাড়ায় ঢুকবার মুখেই যাচাই করে নেয়া হয়েছে। মজিব বিশ্বাসঘাতকতা করবে না; কিন্তু এ-হামটা এবং গ্রামের লোকজন একসময় আমাদের শক্রপক্ষ ছিলো। বরাবরই এ গ্রামের লোকদের আমরা শক্র ভেবে এদিকে অপারেশন চালাবার সময় গ্রামটাকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছি। পকিস্তানি কর্তৃপক্ষের শান্তি কমিটির দালাল এবং এ গ্রামের লোকজনের ওটা-বসা আর ঘনিষ্ঠতা ছিলো। পাকবাহিনী তাদের অনুচর নিয়ে দু'একবার এদিকে এসেছেও। ইপিআর বাহিনীর একজন সদস্য আছেন এ বসতিতে। তিনি পালিয়ে এসে এদের

মধ্যেই লুকিয়ে আছেন। সঙ্গে রয়েছে তার অন্ত আর গোলাবারুদ। তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন নি। কেনো যোগ দেন নি, আমাদের কাছে সেটা একটা জিজ্ঞাসা হয়েই রয়েছে। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে কি তাহলে যোগাযোগ করে তিনি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাদের পক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুক্তে তৎপরতার ফন্দি খুঁজছেন? শক্র তালিকাভুক্ত একজন মানুষ, একটা বৈরী পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা।

মজিব ভেতরে গেছে, এখনো ফিরে আসে নি। এই ঝাঁকে খড়ের গাদার পাশে মাথার ওপর ঝাঁকড়া গাছটার অক্কারের ছায়ায় প্রথর দৃষ্টি মেলে সর্ব ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে দাঁড়িয়ে আছি আমি পিন্টুকে পাশে নিয়ে। কাঁধে ফিতে বাঁধা টেনগান। বুক সোজাসূজি করে সেটা দৃঢ় হাতে ধরা। ডান হাতের তজনী টিগারের ওপর রাখা। কোনোখান থেকে টু মাত্র ইঙ্গিত পাওয়া গেলেই তজনী আপনাআপনি চলে যাবে টিগারে। বাঁ হাত জামার নিচের পকেটের ভেতরে ঢেকানো।

সেখানে প্রেনেডের পিনের সাথে অবচেতনভাবে খেলা করে হাতের আঙ্গুলগুলো।

এভাবে বেশিক্ষণ থাকতে হয় না। মজিব বেরিয়ে আসে। হাতে একটা জ্বালানো হারিকেন। তার সঙ্গে একজন শুকনো-পাতলা প্রৌঢ় মানুষ। মুখে লম্বা হালকা দাঢ়ি। মাথায় সাদা টুপি। এগিয়ে যাই তাদের দিকে। প্রেনেড দোড়ে এগিয়ে আসেন। জড়িয়ে ধরেন তিনি আমাকে। আর প্রবল উচ্ছব এবং কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে থাকেন, বাবারা আইচুন। আইচুন তাহলে। শীঘ্ৰে আপনাদের জন্য অপেক্ষায় বসে আছি।

এমন সময় ভেতর থেকে কে যেনে উচ্চ জালিয়ে বাইরে আসে। প্রচণ্ডভাবে ধমকে উঠে পিন্টু 'উচ্চ টর্চলাইট' বলে। টর্চলাইট নিতে যায়। মুখের হয়ে উচ্চ পরিবেশটা হঠাৎ করেই যেনো থমথমে হারাগুঠাগুঠে। মজিব বলে, আসেন ভেতরে আসেন।

— ভেতরে যাবো?

— হ্যাঁ চলেন, ভেতরে বসার আয়োজন হয়েছে।

সামান্য ইতস্তত ভাবের উদয় হয়, সেটা মুহূর্তে কাটিয়ে উঠে বলি, ঠিক আছে চলেন। জয়নাল-বসারত থাকে সঙ্গে। শক্ত করে দোচালা-চারচালা ছনের তৈরি ঘর। প্রশংসন্ত আঙিনা। হালিম মাস্টার চেয়ারে বসার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। হারিকেনের আলোয় ভদ্রলোককে ভালো করে দেখি। সফেদ দাঢ়ি, সৌম্য দর্শন আর আমায়িক ব্যবহার। চেহারায় শিক্ষার সুমার্জিত ছাপ। ইনিই আমাদের শক্র বলে অন্যতম টার্গেট ছিলেন। জুলাইয়ের প্রথম দিকে এঁকে ধরার জন্য অভিযানে বের হয়ে আমরা মত পরিবর্তন করে ওসমানকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম। এ গ্রাম আক্রমণ করবো বলে মক্তু যিয়াকে নিয়ে মালেক এসে গ্রামটা রেকি করে গিয়েছিলো। কিন্তু সেদিন আসা হয় নি, আসলে . . . ।

হঠাৎ কেমন যেনো অবিশ্বাস্য লাগে সবকিছু। ক'দিনের মাত্র পার্দক্য। ঘৃণা শক্র বলে যারা ক'দিন আগেও আমাদের টার্গেট হিসেবে বিবেচ্য ছিলো, সিদ্ধান্ত ছিলো যে লোকটাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, কিংবা হত্যা করা হবে এবং সমস্ত গ্রামটা উড়িয়ে

দেয়া হবে বলে যেখানে আমাদের একটা পরিকল্পনা ছিলো আর যে পরিকল্পনা এখনে বাতিল করা হয় নি, সেখানে, সেই লোকটার সামনে, সেই গ্রামেই তার বাড়ির ভেতরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সময় একটা বড়ো জিনিস। সময় একজন শক্তকে মিত্র বানিয়ে দেয়। আবার একজন পরম মিত্রকে নিয়ে যায় প্রবলতম শক্তির দিকে। মনে পড়ে যায় ভিয়েতনাম সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল গিয়াপের গেরিলা যুদ্ধের সেই তত্ত্বের, তোমরা একটা গ্রামকে জয় করো, তাহলে তোমরা একটা শক্তি ব্যাটেলিয়ন বা ব্রিগেডকে পরাজিত করার চেয়ে সফলতা লাভ করবে, কারণ সেই গ্রামবাসী তোমাদের মিত্র হবে, তারা তোমাদের আক্ষয় দেবে, আহার যোগাবে। আর শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য মদন যোগাবে সর্বভোভাবে। জেনারেল গিয়াপের তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা সর্দারপাড়ার বন্ধুত্ব পেলে তা হবে আমাদের জন্য একটা বিরাট পাওয়া। এ এলাকাটা আমাদের হাতে এসে গেলে পরবর্তীকালে সামনের শক্তি তালমা এবং পঞ্জগড়কে আঘাত করা আমাদের পক্ষে অনেক সহজতর হয়ে উঠবে।

উৎস আলিঙ্গনে হালিম মাস্টার টেনে নিয়ে চেয়ারে বসান আমাদের। সশঙ্খ প্রহর্যায় থাকে জয়নাল ও বসারত। একজন মহিলা হঠাত করে এগিয়ে আসেন। ‘আমার বাবা আইছে’ বলে মহিলা গায়ে-মাথায় হাত বুলোতে থাকেন। তার হাতের স্পর্শে আর আদর-স্নেহ-অন্তরিক্তভাবে মা-মা অনুভূতি হঠাত করে খোরার শিহরিত করে তোলে। পরিবেশটা আপন হয়ে ওঠে, অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে স্বচ্ছত। পুরাতন শক্তির জের বারেশ মন থেকে উবে যায়। মন বলে ওঠে, এই তোমাদের আপনজন। এই পরিবেশ, এই মানুষজন, এই বাড়িঘর—ওপুরুষ সব আমাদের অতি পরিচিত, আঘাতীয়স্বজনদের। মজিব পরিচয় করিবেন দেয়, আমার মা।

— মা বলেন, বাবারা কী হচ্ছিবেন? পিন্টু বলে ওঠে, চাচি, যা দেবেন তাই থাবো। কাদাপানি ভেঙে অনেকসূর পথ হেঁটে এসেছি। ভীষণ খিদে লেগেছে।

মহিলা নাকের নোলক ছুলিয়ে ছুটে যান খাবার যোগাড়ে। মুখে লাজুক হাসি নিয়ে তখন দু'জন যুবক এগিয়ে আসেন। নিজেদের পরিচয় দেন এই বলে, আমার নাম সফিক, সফিকুল ইসলাম।

— ও আপনি দুদু ভাই?

— জি।

— পেছন থেকে আরেকজন যুবক এগিয়ে এসে পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম জুবার।

— ঠিক আছে, আপনারা যাবেন তো, নাকি?

— জি।

— তাহলে তৈরি হয়ে নেন কটপট।

— জি, আমরা তৈরি হয়েই আছি।

— ঠিক আছে বলে উঠে দাঁড়াই। সেই সাথে বলি, আসুন আপনাদের গ্রামটা দেখি।

ওরা পাশে পাশে থাকে। পেছনে থাকে গার্ড। দু'পাশে সারি সারি ঘর। মাঝখানে

প্রশ়স্ত আঙিনা। সীমানাসূচক দু'একটা বেড়া তুলে বাড়ির মালিকানা পৃথক করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। বেশ বড়ো বসতি। একই পরিবারভুক্ত মানুষ এরা। কয়েক ঘর মানুষ এ-বাড়ির সীমানার বাইরেও বসতি গড়েছে। সঙ্গত তারা এ পরিবারের বাইরের মানুষ। কিন্তু একই এলাকার। হালিম মাটোর ভাগ্যাভ্যন্তে তার ময়মনসিংহ সদরের বিদ্যাগঞ্জের সহায়সম্পত্তি বেচে দিয়ে এসে এখানে এই জঙ্গলে পরিবেশে সন্তান জমি কিনে ১৫/২০ বছর আগে চলে আসেন। বেছে নেন এখানকার প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার জীবন। পরবর্তীকালে তার আজ্ঞায়দের নিয়ে আসেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই অজানা বিদেশ-বিভুইয়ে স্থানীয় মানুষজনদের সাথে মিলেমিশে সাথে টিকে থাকতে হলে তার লোকবল দরকার। তাই নিয়ে এসেছেন এখানে তার অন্য আজ্ঞায়-স্বজনদেরও। অনেছেন কিছু গরিব ভূমিহীন মানুষকেও, যারা জমিজিরোত চাষ করে এখানে তাদের অনন্নসংস্থান করতে পারবে। সেই সাথে সর্দারপাড়ায় বসতকারী ময়মনসিংহের মানুষজনের সাথে এককাণ্ঠা হয়ে লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে। লড়াই ছাড়া তো টিকে থাকা যায় না। আর লড়াইয়ের জন্য লোকবল তো অপরিহার্য। তবে এখনও তাদের ফেলে আসা জন্মভূমির সাথে তারা সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন নিয়মিত। এখানে তারা এখনও বিদেশী। 'ময়মনসিংহ' বলে পরিচিত। দিনাজপুরিয়া হতে সময় লাগবে তাদের।

সমস্ত গ্রামটা ঘুরে দেখা হয়। ঘুরে দেখবার এক পর্যায়ে গ্রামের একেবারে প্রান্তসীমার ঘরটা থেকে বেরিয়ে আসেন ইপিআর-এর হাবিলদার মোহাম্মদ আলী নামে সেই ভদ্রলোক। ভাত চকিত মেজের গাটাগোট্টা শরীর। অনেকটা যেনো দিশেহারা ভাব তার সারা অবয়বে।

— কী ভাই, আপনি বসে আছেন কেনো? যুদ্ধ করতে হবে না? পাকিস্তানি বাহিনী আপনাকে পেলে তো সাথে সাথে মেরে ফেলবে। ওদের দিকে একেবারেই যাবেন না। এমনিতেই আপনি পলাতক সৈনিক। ইপিআরদের ওপর খান সাহেবদের রাগ সব থেকে বেশি। আমরা এ অঞ্চলে আসবার আগে, ভেতরগড়-মহারাজহাটে শহীদ নামে একজন ইপিআরকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে। শুনেছেন নিশ্চয়ই?

— জি, শুনেছি।

— তাহলে যান। ইপিআর বাহিনী ভজনপুরে মেজর নজরুল্লের নেতৃত্বে ডিফেন্স গেড়ে অমরখানায় পাকবাহিনীর অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিয়েছে। আপনি সেখানে গিয়ে সুবেদার মেজর কাজে উদ্দিনের কাছে রিপোর্ট করেন।

— জি, যাবো ঠিক করেছি।

— যাব বললেই হবে না, আজ রাতেই রওনা দেবেন। কাল সকালেই এখানে খান সেনারা আসবে। তার আগেই আপনাকে চলে যেতে হবে। হাতিয়ারটা আছে তো?

— জি, হ্যাঁ।

— ওটা নিয়ে যাবেন।

সম্পূর্ণ বসতিটা দেখা শেষ করে ফিরে আসি মাটোর সাহেবের আঙিনায়।

এসে দেখি, চা-চিড়াভাজা আর মুড়ি ইতোমধ্যে এসে উপস্থিত। মজিব দৌড়বাপ করছে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের ঘূম ভেঙে যাওয়ায় প্রবল ঝৎসুক্য নিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখবার জন্য ভিড় জমিয়েছে। বসতির সব পুরুষ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছেন। বৌবিরা উকি মারছেন বেড়ার আড়াল-আবড়াল থেকে। এই অবস্থায় চা-পর্ব শেষ করে মাট্টার সাহেবের ঘরে আসি। চার চালা ঘরের ছাউনি। মজিব আর মাট্টার সাহেবের থাকেন সঙ্গে। প্রথমেই জিগ্গেস করি, আপনাদের বসতির সব লোক বিশ্বাসী এবং একতাৰুচি তো?

— জি, হ্যাঁ। কেউ কোনো কথা ফাঁস করবে না। আমার কথা ছাড়া, মাট্টার সাহেবের তার দৃঢ় আঞ্চলিক বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন। মজিব-দুলু-জববার এদেরকে তো আর এমনি এমনি নিয়ে যাওয়া যাবে না। তার জন্য আমাদের রীতিমতো একটা যুদ্ধ করতে হবে। কিছু ধৰ্ম চিহ্ন রেখে যেতে হবে, কিছু মানুষের ওপর টর্চার দেখাতে হবে।

— ঠিক আছে বাবা, আপনাদের প্র্যাণ মাফিক আপনারা কাজ করেন।

— একটা ঘর উড়িয়ে দিতে হবে। কোন্ ঘরটা ওড়াবো বলেন?

— এটাই ওড়াবেন।

— এটা? এটাতো ভালো ঘর। আপনার নিজের ধৰ্ম কি?

— হ্যাঁ বাবা, ঘর আমার, ছেলেৱাৰ তো আমার। ওদের বাঁচানোর জন্য নিজের ঘরটাই তো ওড়াতে হবে, নইলে ওৱা বিশ্বাস কিম্বুবে কেনো?

মাট্টার সাহেবের হিসেব ও যুক্তি ঠিক।

তাহলে ঘরের জৰুৰি মালামাল খালিয়ে নিন, বলে বাইরে আসি। এসেই মজিব আর পিন্টুকে বলি, কিছু পুরাতন দীপশঙ্খ আৰ কাগজপত্র আঙিনায় নিয়ে এসে আগুন জুলিয়ে দিতে। খান সাতেক্ষণ্যের জন্য প্রমাণ রেখে যেতে হবে, আমৰা এদের প্রয়োজনীয় সবকিছু জুলিয়ে দিয়েছি। কথামতো মজিব আৰ জববার লেগে যাই পুরনো অব্যবহৃত জিনিসপত্র, কাপড়চোপড় আৰ কাগজপত্র আঙিনায় জমা কৰার কাজে। মোতালেব, মুসা ও একৰামুলকে তাদেৱ অবস্থান থেকে তুলে আনি। সফিককে বলি, বাচা শিশু আৰ মেয়েমানুষদেৱ সরিয়ে একেবাৱে বাড়িৰ বাইৱেৰ সীমায় নিয়ে যান। এখন যে কাজ হতে যাচ্ছে, তাৰ সবকিছু তারা সইতে পাৰবে না। কয়েকজন ছাড়া অন্য লোকজনদেৱ চলে যেতে বলি। আমৰা যেটা কৰছি, সেটা একটা সাজানো খেলা। কোনোক্ষমে ব্যাপারটা কেউ বাইৱে ফাঁস কৰে দিলে, পুরো বসতিটাৰ ওপৰ চৰম আঘাত নেমে আসবে পৰবৰ্তীকালে।

ওৱা বাইৱে থেকে পুৱনো জিনিসপত্রেৰ স্তুপ এনে জড়ো কৰে। তাৰপৰ সেগুলোকে আগুন জুলিয়ে দেয়া হয়। দুদু, জববার, মজিবকে বাঁশতলায় আমাদেৱ ছেলেদেৱ অবস্থানে যেতে বলি। মালেকেৱ কাঁধে ঝোলানো রেমার চাঞ্চিটা নিয়ে মাট্টার সাহেবেৰ ঘৰেৱ ভেতৱ ঢুকি। এ বাড়িৰ লোকদেৱ ওপৰ মারধোৱেৱ কিছু চিহ্ন রেখে যাওয়া দৱকাৰ। মজিবেৱ প্ৰস্তাৱ ছিলো এটা। এজন্য মোতালেব, মুসা আৰ একৰামুলকে তাদেৱ অবস্থান থেকে তুলে আনা হয়েছে। মোতালেব একটা বাঁশেৱ

কঞ্চি যোগাড় করেছে। একরামুল মুসার হাতেও লাঠি। তখনও ৮/১০ জন মানুষ জড়ো হয়ে দাঢ়িয়ে আছে বাড়ির অভিনায় আগুনের একটু দূরে। পিন্টু জিগ্যেস করে মজিবকে, বলেন মজিব মিয়া, আমরা কাকে কাকে মারবো, তাদের আসতে বলেন।

কথাটা সে বেশ জোর দিয়ে এবং কড়া গলায় উচ্চারণ করে। মজিব নির্বিধায় সামনে দাঁড়ানো তার লোকদের দেখিয়ে দেয়। মোতালেব তার গোফে হাত বুলিয়ে বলে, আসেন হে, তোমহরালা কারা মার খাবেন। আগুনের আলোতে মোতালেব, একরামুল ও মুসার হাতের লাঠি মানুষদের মারার জন্য উদ্যত হয়। মজিবদের তৈরি করে রাখা মার খাবার ফুপের লোকজন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। কেউ কেউ পিঠটান দিয়ে পাশের ঘরের কোণের দিকে সরে পড়ে।

মালেকের কাঁধে ঝোলানো ব্যাপ থেকে রেমার চার্জ বের করে তখন আমি চার্জের তার ফিউজ এগুলো তৈরি করতে করতে মার খাবার ভয়ে ভীত মানুষদের দেখি। ব্যাপারটা আমার কাছে বুবই অমানবিক মনে হয়। কেউ কি ব্রেঙ্গায় তার শরীরের অত্যাচারের চিহ্ন বসানোর জন্য এভাবে মার থেকে চায়? মোতালেব চেঁচিয়ে বলে, কই গে, কেহ তো আসে না। এগিয়ে যাই ওদের দিকে। পিন্টুকে বলি, বাদ দাও এসব মারামারি। মজিব তুমি ওদের বলো নিজেরাই গম্ভীর কালিকুলি কাদামাটি কিছু মেখে নেবে এবং খানেরা এলে সেগুলো দেখিয়ে দেবে আমার কথা শুনে লোকগুলো যেনো হাঙ্ক ছেড়ে বেঁচে যায়। আমি তাদের সরে ব্যক্তি বলি।

পিন্টুকে নির্দেশ দিই মুসার দলের সাথে প্রতিযোগ নিতে। চার্জে আগুন দেয়ার সাথে সাথে আমি ওদের সাথে গিয়ে মিশাবো। কিন্তু চলবে দু'দলের দু'দিক থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ। চার্জ বিস্কোরণের পরও জলবে গুলিবর্ষণ সবগুলো হাতিয়ার থেকে একসাথে থামবার অর্ডার না দেয়া প্রয়োগ। মাস্টার সাহেবকে তার পরিবার-পরিজনসহ বাড়ির সামনেকার ক্ষেত্রবিস্তৃত শয়ে শুয়ে থাকতে বলি। একরামুল সবাইকে বাড়ির ভেতর থেকে বের করতে থাকে। আমি মালেককে নিয়ে মাস্টার সাহেবের ঘরের মধ্যে ঢুকে এদিকওদিক চেয়ে ঘরের মেঝেতে গোলাকৃতি ৪ পাউন্ডের হলুদ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ দিয়ে তৈরি রেমার চার্জটি বসিয়ে দিই। মালেককে বলি বাড়ির অভিনায় বা আশপাশে কেউ আছে কি না সেটা দেখাব জন্য। মালেক দৌড়ে গিয়ে দেখে আসে, নেই। তখন ওকে সেফ্টি ম্যাচ বের করতে বলি। ও সেটা আমাদের হাতে দেয়। একরামুল দরজার বাইরে দাঁড়ানো। তাকে ইশারা দিই দৌড়ে গিয়ে ফায়ার ওপেন করার জন্য।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির সামনে দু'দিক থেকে পানিমাছ আর তালমার দিকে একমোগে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে যায়, ঠাস -ঠাস ঠা-ঠা ধাম-ধাম...। মুহূর্তখানেকের ভেতরে জায়গাটা যেনো যুক্ত ক্ষেত্রে পরিণত হয়। বসতির মানুষজন হঠাৎ করে এ ধরনের গুলিবর্ষণের শোরগোল শুরু করে। বাচ্চা শিশুদের তারপ্রবরে কান্নাও শুরু হয়। মহিলাদের আতঙ্কিত চিঙ্কার ভেসে আসে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে সবাই। বাইরে গুলিগালা চলে সমানে। আমি মাস্টার সাহেবের ঘরের মেঝেতে বসে, একাগ্র মনোযোগের সাথে সেফ্টি ফিউজের ভিজে মাথায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করি। বিশ্বস্ত

মালেক উপুড় হয়ে বসে সেটা দেখতে থাকে। ব্যষ্টিতে ভেজা সেফ্টি ফিউজের বারুদ
জুলতে চায় না। কয়েকবারের চেষ্টায় তা জুলে ওঠে। ফরফর করে আগুন দৌড়ে
এগুতে থাকে সবুজাভ আলো জুলিয়ে। মালেকের হাত ধরে হ্যাচকা টান দিয়ে বের
হয়ে আসি ঘর থেকে। উর্ধ্বস্থাসে দৌড়ে এসে একবায়ুলের পাশে পজিশন নিই। এরা
তখন দূরের অদৃশ্য শক্তির দিকে একনাগাড়ে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। শক্ত যাঁটি দুটো
থেকেও গুলির জবাব ভেসে আসে। সফিককে দেখি সে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।
হাত ধরে তাকে শুইয়ে দিই। নিজের টেনগানটার ট্রিপার দাবিয়ে ম্যাগজিনটা খালি
করে দিই এক ত্রাশে।

এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে একটা লাল সবুজাভ তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে
এবং তারপরেই এক ভয়াবহ প্রচণ্ড শব্দ ভুলে বিক্ষেপিত হয় রেমার চার্জ। পেছনে
তাকিয়ে দেখি, বিক্ষেপণের দমকে প্রচণ্ড এক আগুনের গোলা ঘরের চারটা চালাকে
উড়িয়ে নিয়ে ওপরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। একটা লেলিহান আগুন গ্রাস করেছে সমস্ত
ঘরটাকে এবং সেটা পাশের ঘরের দিকে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত। মুহূর্তখানেকের
ভেতরেই পাশের ঘরটাও জুলে ওঠে। বিক্ষেপণটা যে এতো বড়ো এবং ব্যাপক
ধূস্মযজ্ঞ বয়ে আনবে, সেটা বুঝতে পারি নি। সবকিছি এলোমেলো হয়ে যায়।
মুসাসহ সব মনুন ছেলে হত্যকিত আর তত্ত্ব পেয়ে ছেড়ে আসে।

তখন সবাইকে চিন্কার করে উঠতে বলি। মজিব, দুলু আর জবাবার আগে আগে
ছুটতে থাকে। এলোমেলোভাবে অন্যরা মৈলুকশুরু করে। পেছন ফিরে তাকাই
আগুনের লেলিহান শিখার দিকে। পোড়া রাত্তদের গাজে বাতাস ভারি হয়ে এসেছে।
বগতোভিত্তির মতো পিটুকে বলি, পরহঞ্চমাতাই বুঝি জুলে যাবে পিন্টু! এতোটা হবে
আগে ভাবি নি। দৌড়তে দেমুক্তে পিন্টু বলে, কি আর করা যাবে প্র্যানটা তো
ওদেরই। তা হোক, কিন্তু গেইম গেইম খেলতে এসে আসল গেইমই বুঝি খেলে
গেলাম। আসলে এমনিই বুঝি হয়, যাক, এরা তো বেঁচে গেলো।

১২৮.৭১

অন্তর উদ্ধার অভিযান

মোস্তফা এসে হাজির। বেরুবাড়িতে তার সাথে আলোচনা হয়েছিলো। নেতাদের
সাথে ঘোরাঘুরি, শরণার্থী শিবিরের ঝামেলা, পারিবারিক সমস্যা এসব থেকে যেনো
পালিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। তালমার এক ধৰ্মী পরিবারের ছেলে। পঞ্জগড় সুগার
মিলের সাবেক চাকুরে। বর্তমানে আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী মোস্তফা সরাসরি
মুক্তিযুদ্ধে জড়িত হয়েছেন। তার নিজের ধারণা, শুধু রাজনৈতিক নেতাদের সাথে
লিয়াজোঁ রক্ষা করা, শরণার্থী হয়ে আসা মানবুজনের সমস্যা মেটানো, যুব ক্যাম্প
বসিয়ে শিক্ষিত ছেলেদের রেশন খাওয়ানো, রাজনীতির আলোচনা-সমালোচনা,
নিজেদের মধ্যে কাদা ছেঁড়াছেঁড়ি- এসব করে দ্রুত জয়বাংলা কায়েম করা যাবে না।
মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের আকৃতি নিয়ে তিনি নালাগঞ্জে এসে হাজির হয়েছেন।
মোস্তফা আমাদের চাইতে বছর কয়েকের বড়ো। শক্ত সুঠাম শরীরের অধিকারী।

ব্যবহারও অমায়িক। দুর্দলি তাকে নিয়ে আসে হাইড আউটে।

— ইনি আমাদের মোস্তফা মামা। তাকে দেখে ভালো লাগে। উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরি।

— আসেন, দুর্দলির মামা তো? আমাদেরও মামা আপনি, কি বলেন?

পিন্টু তার পিঠ চাপড়ে প্রায় জড়িয়ে ধরে, মোস্তফা মামা কী খাবেন বলেন? আপাতত উড়োজাহাজ বিড়ি থান। পরে চা, বলে পিন্টু সহজভাবে তার পকেট থেকে ম্যাচ বাস্কেট বের করে। তার কাছে বিড়ি বা সিগারেট নেই, এটাই স্বাভাবিক। মিনহাজকে ডেকে বিড়ির প্যাকেট চেয়ে নেয় সে। এরপর বিড়ি বস্টনের পালা। সবার মুখে মুখে জুলতে থাকে উড়োজাহাজ বিড়ি। কথাবার্তা শুরু হয়। একটুক্ষণের ভেতরেই আসরে এসে যোগ দেয় মজিব, দুর্দলি, জব্বার, একরামুল আর মুসা। মিনহাজের চা আসলে ধূম আড়ডা শুরু হয়।

মোস্তফা এক ফাঁকে কানে কানে বলে, আমার খোজে দুটো রাইফেল আছে, যাবেন, উদ্ধার করতে? প্রস্তাবটা মনে ধরে যায়। পিন্টুসহ মোস্তফাকে নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা স্থান আমগাছের তলায় আসি। মোস্তফা বলে, দুজন আনসার কমান্ডার আমির ওরফে চিকু এবং বাঘার কাছে গোলাবারুদসহ রাইফেল রায়েছে। ওরা পঞ্চগড়ে প্রথম দিকে প্রতিরোধ যুদ্ধে শরিক ছিল, পঞ্চগড়ের পতন হওয়ার পর হারামজাদারা পালিয়ে এসেছে রাইফেলসহ। বাস্টনেই আছে। মুক্তিযুদ্ধে যায়নি। সম্ভবত এরা পাকিস্তানের পক্ষে রাজাকার বার্মিটে যোগ দেয়ার প্রস্তুতি নিছে। তার আগেই রাইফেল দুটো উদ্ধার করা দরকার। এবং ওদের এমন শিক্ষা দেয়া দরকার, যাতে শালারা পাকবাহিনীতে যোগ দেবেন কথা চিরদিনের জন্য ভুলে যায়। এ ছাড়া সংবাদ রয়েছে, বাঘা মিয়া কাঁকা প্রায়ে শাস্তি কর্মিটি গঠন করছে এবং স্থানীয় লোকজনদের নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করার প্রস্তুতি নিছে।

— মোস্তফা, আপনার প্রবর কি সঠিক?

— জি, একশো ভাগ। আপনারা তো জানেন, আমি এ এলাকারই ছেলে। ওদের দুজনকেই আমি ভালো করে চিনি। ওরা ওপরগামী শরণার্থীদের রাইফেল দেখিয়ে লুটপাটও করছে। কয়েকটা ডাকাতিও হয়েছে যুদ্ধের প্রথম দিকে, সম্ভবত তা ওদেরই কাজ।

মোস্তফার প্রস্তাব নিয়ে বিশ্লেষণ চলে কিছুক্ষণ। তারপর সিন্ধান্ত নেয়া হয়, রাইফেল দুটো উদ্ধার করতে হবে যেভাবেই হোক। ওদের অশুভ তৎপরতা বঙ্গ করতে হবে। বাঘার শাস্তি কর্মিটি তথা প্রতিরোধ বাহিনীকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে। পিন্টুকে আয়োজন করতে বলি রাতের অভিযানের। দুটো দল যাবে আজ রাতে। একটা দল চিকু বাঘার বাড়িতে, অন্যটি ঠাকুরপাড়া হাটের কাছে মকবুল মেঝারের বাড়িতে। মকবুল মেঝার তার নিজের সিভিলগান নিয়ে স্থানীয় ষেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরি করেছে পাকবাহিনীর নির্দেশে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে। নিয়মিত পাকবাহিনীর সাথে যোগাযোগও রাখছে। মকবুল মেঝার সম্পর্কে ইতোমধ্যেই বিশ্বাসযাতকতার রিপোর্ট পাওয়া গেছে। টোকাপাড়া ম্যাসাকারের

ব্যাপারে পাকবাহিনীকে বিস্তারিত তথ্য দেয়াসহ তাদের অভিযানের আয়োজনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকার খবর পাওয়া গেছে। সুতরাং তাকেও ধরতে হবে। তার সিভিলগানটাও উদ্ধার করতে হবে। এ তিনটা লোককে অকেজো করে দিতে পারলে হাড়িভাসা থেকে অমরখানা পর্যন্ত বিশ্রীণ এলাকা বিপদমুক্ত হয়ে যাবে। স্বাধীনতা-বিরোধী আর কেউ থাকবে না। এর আগে সোনারবানের সোনা মিয়া আমাদের দলে এসেছে। যদিও সে এখন লাপাতা। গতরাতে সর্দারপাড়ার হালিম মাট্টোরসহ অন্য সবাইকে দলে আনা গেছে। ভুইয়াকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। এখন এই তিন পাকবাহিনীর বিপজ্জনক অনুচর কেবল বেঁচে রয়েছে। সুতরাং এদের রাখা যাবে না। আজ রাতেই এদের নিক্রিয় করার অভিযান চালানো হবে। নির্ভরশীল গাইড রয়েছে, মোস্তফা আর দুলু। খুব একটা অসুবিধে হবে না। রাতের পরিকল্পনা শেষ হয়। তিনজনের মুখে উড়োজাহাজ বিড়ি আবার জুলে ওঠে। দুপুরের খবার সময় হয়ে এসেছে। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে আমরা আস্তানায় ফিরে আসি।

রাত নটার দিকে দুটো প্রোটেক্টিভ পেট্রল বের হয়। একটার নেতৃত্ব আমার হাতে। ছায়াসঙ্গী হিসেবে থাকে পিন্টু। গাইড মোস্তফা আর দুলু। অন্য পেট্রলটি নিয়ে যায় মুসা আর একরামুল। তাদের গাইড হিসেবে যায় মাজিব আর সজিম উদ্দিন। প্রত্যেক দলে ১৫ জন করে। সব ধরনের হাতিয়ার প্রস্তুত গোলাবারুদ আর প্রেনেড দেয়া হয় প্রত্যেক দলকে। আমার আর পিন্টুর কাছে রাতের চার পকেটওয়ালা শার্ট। জলপাইগুড়ি থেকে এসে যাওয়ায় সেটা গার্মেন্টসেডে নিয়েছি। নিচের পকেট দুটো বেশ বড়ো। দুটো করে চারটা প্রেনেড সন্তুষ্ট রাখা যায় তাতে।

কিছুদূর এগুবার পর দল দুটো ভেঙ্গে হয়ে যায়। ওরা চলে যায় বদলুপাড়ার গ্রাম্য রাস্তা ধরে ঠাকুরপাড়া হাটের নিকটে। আমরা বাঁ দিকে মোড় নিয়ে এগিয়ে যাই বাধা চিকুদের ঘামের দিকে। আজ আস্তা ধরে স্বচ্ছ গতিতে এগিয়ে চলা। শক্রের অবস্থান দূরে। কাছেপিঠে কোনো ঝুঁধা নেই। চমৎকার রোদেলা দুপুরের ঝকঝকে আলো ছিল। দিনের বেলা। বৃষ্টি হয়নি আজ। অমাবস্যার রাত সঞ্চবত আজ কিংবা গতরাতে পার হয়ে গেছে। ঘুটঘুটে অঙ্ককার রাত। এমন ঘন অঙ্ককার যে, একজন আর একজনকে প্রায় ধৰে হাটতে হয়। চারদিকে জোনাকির মেলা ঝিঁঝি পোকার ঝঁক্যাতান, ব্যাঙের কোরাস জলাভূমিতে। চারদিকে নিখর-নীরের জনবসতি।

রাত ১১টার দিকে চিকুর বাড়ি ধিরে ফেলা হলো। মোস্তফা ও দুলু বাইরে থাকে সেন্ট্রিদের সাথে। চিকুর সামনে তাদের উপস্থিতি তারা প্রকাশ করতে চায় না। বাড়ির ভেতরকার আঙিনায় ঢেকা যায় বিনা বাধায়। কয়েকটা ঘর নিয়ে বাড়ি। মোটামুটি আঙিনা। বড়ো টিমের ঘরটা যে চিকুর এটা মোস্তফা আপেই বলে দিয়েছে। বাড়ির লোকজন সব ঘুমে বিভোর। তাই এই এখন সে তাদের আঙিনায় ভ্যানক সব আগত্যকের আগমন সেটা তারা জানতে পারে না। চিকুর নাম ধরে ক'বাৰ ডাক দেয় মোতালেব। ঘরের ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর সাড়া মেলে ঘুম জড়ানো গলা পুরুষ কঠে।

— কারা ডাকেন? কী জন্য ডাকেন? এতো রাইতে তুমহারালা কারা বাহে?

- চিকু মিয়া, আমরা মুক্তিফৌজ, আপনার সাথে কথা আছে, বাহির হন।
- দিনের বেলা কথা কহিলে হয় না, মোর শরীরভাড়া ভালো নাই।
- না দিনের বেলা অসুবিধা হবে। সামান্য কথা। আপনি বাহির হন। আমাদের কমান্ডার সাহেব নিজে আইসছেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর ঘরের ভেতরে হারিকেনের আলো জলে ওঠে। কাঠের দরোজার ঝুড়কা ঝুলে গায়ে গামছা জড়িয়ে বের হয়ে আসে আনসার কমান্ডার আমির আলী অর্থাৎ চিকু। দরজার দু'পাশে মোতালেব আর নাদের ওত পেতে ছিলো। দরোজার সোজাসুজি স্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আমি আর পিন্টু। আমাদের পেছনে বাসারত, মালেক আর মঙ্গ একই পজিশনে।

চিকু দরোজার বাইরে হাতে ধরা হারিকেন নিয়ে বের হতেই মোতালেব ও নাদের খপ করে ধরে ফেলে ওকে। চিকুর হাত থেকে হারিকেনটা পড়ে যায়। মালেক এগিয়ে এসে কুড়িয়ে নেয় সেটা। ঝটপট পিছমোড়া করে হাত বেঁধে ফেলে মোতালেব। চিকু একটা ভয়ার্ট চিংকার দিয়ে ওঠে, বাগে মোক মারে ফ্যালালগে! তার চিংকারে বাড়ির লোকজন জেগে ওঠে। একটা চিংকার শোরগোল শুরু হয়ে যায়। প্রচও বেগে ধরকে ওঠে পিন্টু, চোপ, কেউ শব্দ করবে না। আমরা মুক্তিফৌজ, ডাকাত না। চিংকার করলে বোম মেরে উড়িয়ে দেবে কৃত্ব সবাইকে। পিন্টুর কথায় শোরগোল যেমন উঠেছিলো, তেমনি থেমে যায়।

চিকু বলির পাঠার মতো কাঁপছে। তার পাঠারে বেশ কটা রাইফেল-স্টেনগানের নল। ঠাণ্ডা গলায় আমি তাকে জিগদেস্ট কর, রাইফেলটা কোথায়, চিকু মিয়া? ভীতচকিত দৃষ্টি মেলে চিকু উত্তর দেন্ত মোরঠে নাই। ওটা জমা দিছি, পালাবার সময়।

- মিথ্যা কথা, আবার পাঠক উঠি! বল কোথায় রাইফেল?
- নাইগে, মোরঠে নাই।
- কের মিথ্যা কথা! পিন্টু, সোজা কথায় যি উঠবে না, বানাও।

পিন্টু এগিয়ে গিয়ে তার ভারি পায়ে প্রচও এক লাথি কষে তার পশ্চাদ্দেশে।

বাগে, বলে কাত হয়ে পড়ে সে। মোতালেব এগিয়ে এসে চুলের মুঠো ধরে দাঁড় করায় তাকে, কহেক সুমন্দির পৃত, কুনঠে রাখিছিস রাইফেল? বলেই তার নিজৰ স্টাইলে একনাগাড়ে কিছুক্ষণ বানিয়ে যায় ওকে। চিকু তখন মাটিতে পড়ে কেবল গড়াগড়ি থাক্ষে।

- বলে, মোক পানি দেনগে।
- পানি দেয়া হবে, আগে বল, রাইফেল কোথায়?
- কহছি কহছি, মোক আর মারেন না, রাইফেল আছে। ঘরের ভিতর মাটির তলে।
- ঠিক আছে চল দেখি।
- টেনেছিচড়ে ওকে তুলে ধরে মোতালেব।
- মোক আগে পানি দেন।

এক বদলা পানি এনে দিলে, সে ঢকচক করে তা এক নিষ্পাসে খেয়ে ফেলে। এরপর তাকে ঠেলতে ঠেলতে ঘরের ভেতর নেয়া হয়। দেখিয়ে দেয় ঘরের কাঁচা মেঝের সেই কোণটা, যেখানে তার অন্তর্টা লুকিয়ে রাখা আছে। তার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলি নাদেরকে। ক্ষেপণাটা তার পেটে লাগিয়ে বলি, বের কর। ঘরের চৌকির নিচে রাখা কোদালটা সে হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনে। তারপর খুড়তে থাকে সমান করে লেপা মেঝের মাটি। চৌকির ওপর উপবিষ্ট তার স্তৰী এবং বাচ্চারা। তারা নির্বাক বড়ো বড়ো দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখতে থাকে ভূতুড়ে কাওকারখানা। কিছুদূর মাটি খুড়তেই পলিথিনে মোড়া রাইফেলটা বের হয়ে আসে। সেটা পিণ্ডুকে নিতে বলি। তারপর চিকুকে উদ্দেশ করে বলি, এবার গুলি বের কর। ঘরের অন্য কোণায় একটা বাক্স থেকে বের করে আনে সে কাপড়ের পুট্টিতে জড়িয়ে রাখা বুলেটগুলো। একটা রাইফেল নিয়ে টেনিংপ্রাণ্ড একটা মানুষ বাড়িতে লুকিয়ে আছে। ডাকাতি করছে। হারামজাদা-বদমাশ মুক্তিবাহিনীতে যাও নি কেনো?

চিকু কোনো কথা বলে না।

— হারামজাদাকে বের কর, বলেই বেরিয়ে আসি আঙ্গিনায়। মোতালেব-নাদেরকে ইশারা দিই, আচ্ছ করে বানাবার জন্য। পিণ্ডুসহ রাইফেলটা নিয়ে বের হয়ে আসি। মোস্তফা-দলু এগিয়ে আসে, পাওয়া গেছে।

— হ্যা, দেখেন, বলে মোস্তফার হাতে মার্ক প্রিমিয়েলটা ধরিয়ে দিই।

বাড়ির ভেতর থেকে তখন 'বাগে মনুগে' শিরীস মনুগে, তোমহারালা মোড় বাপহন গে, আর করিমনি গে' চিৎকার ভেসে ঝোঁপতে থাকে। আমরা ঘন অঙ্ককারে দাঁড়িয়ে একজন বিশ্বাসযাতকের মার খাওয়াই উৎকোর শুনতে থাকি অনুভূতিশূন্যভাবে। বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা বেরিয়ে আসে দুটির আঙিনা থেকে। হাঁপাতে হাঁপাতে মোতালেব বলে, শালা আর একমাসেও দুর্বিশ্বার পারহিবেনি।

— বাঁচবে তো?

— মনে হয়তো বাঁচিবে। শালা বাহি...।

স্ক্রতম রাজাকার বাঘা বাহিনী

এরপর বাধার বাড়ি। চিকুর বাড়ি থেকে বাধার বাড়ির দূরত্ব প্রায় মাইল থানেক। চিকুর মতো বাধাকে কিন্তু সহজে আয়তে আনা যায় না। তার স্বৰ্ধেরিত 'বাঘা প্রতিরোধ বাহিনী'র সাথে রীতিমতো গোলাগুলি করতে হয়। তার বাড়ির কাছাকাছি আসতেই কিছু জেগে থাকা মানুষের সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। সঙ্গত তারা প্রহরার উহলদার প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য। তাদের গতিবিধি এবং উদ্দেশ্য রেকি না করে এগুনো উচিত নয়। বাধার নিজের রাইফেল রয়েছে। সে প্রশিক্ষণপ্রাণ্ড আনসার কমান্ডার। এছাড়া তাদের দলের কাছে কী পরিমাণ হাতিয়ার আছে তাও ঠিক বোৱা যাচ্ছে না। এভাবে এগিয়ে গেলে তারা সরাসরি গুলি করে বসতে পারে এবং এতে দলের সম্মু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই সবাইকে শোয়া পজিশনে যাওয়ার নির্দেশ দিই। রাস্তার পাশের ঢালু মতো জায়গায় মোস্তফাকে ডেকে নিয়ে বসি।

কিছুটা পরামর্শ করা দরকার। এভাবে জেনেশুনে অন্তরের সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। মোস্তফাকে জিগ্যেস করি, কী মামা, অবস্থা কী? বাধা তো রাতে বীতিমত্তো পাহারা বসিয়েছে আমাদের বিবরণে। আমরা যে আসবো, এরা আগাম জানে নাকি?

মোস্তফা প্রথমে হতকিত হয়ে যান। সম্ভবত তিনি ভাবছেন, আমরা তাকে সন্দেহ করে বসেছি এবং আমরা যে আজ রাতে এখানে আসবো, এটা তিনি তাদের জানিয়ে রেখেছেন। মোস্তফা সামলে নিয়ে বলেন, না-না এরা জানবে কি করে? আমরা যে আজ রাতে আসবো, এটা ওদের পক্ষে কিছুই জানা সম্ভব নয়। এরা নিজেদের থেকেই এ পাহারা বসিয়েছে, এটা তো আমি আগেই বলেছি। এদের সম্পর্কে আমি আর কিছুই জানি না, বিশ্বাস করেন।

— বিশ্বাস করা কঠিন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে এধরনের অনেক বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস রয়েছে।

— দুলু এগিয়ে আসে গুটিসুটি মেরে।

— কি দুলু ভাই, খবর কি, এগনো যাবে?

পিন্টু চাপা হবে জিগ্যেস করে তাকে।

— মনে হয় না। এরা বড়ো সাংঘাতিক মানুষ, বহু লুটপাট আর ডাকাতি করেছে। এদের কাছে হাতিয়ার আছে।

কটা হাতিয়ার আছে, দেখে আসবেন নাকি। পিন্টু হালকা হবে খৌচা মারে দুলুকে। অঙ্ককারে মলিন হাসে দুলু মিয়া পিন্টু কী করে সম্ভব পিন্টু ভাই! দুলুর ফ্যাসফ্যাসে গলার উত্তর।

— তাহলে একটা কিছু করতে হবে হবে, রেকি বিশেষজ্ঞ বিশ্বস্ত মালেক-মজুকে অনুচ্ছবের ডাক দিই। সাপের মজো-বুকে হেঁটে ওরা এগিয়ে আসে। ওদের বুবিয়ে দিই ব্যাপারটা। সন্তর্পণে ছিঁড়ে ওরা রেকি করে আসবে প্রতিরোধ বাহিনীর প্রকৃত অবস্থা।

নীরবে মাথা নেড়ে ওরা আগুপিছু করে ভূতের ছায়ার মতো দু'জনে রাস্তার দু'ধার দিয়ে এগিয়ে যায়। চারদিকে বিবি পোকাদের ঝান্তিইন একবেয়ে ডাক। অমরখানা-জগদল থেকে ভেসে আসা ভারি কামানের গুড়গুড় গর্জন। আকাশে উজ্জ্বল তারার মেলা। নিজেদের আলো জুলিয়ে-নিবিয়ে জোনাকিদের এক বোপ থেকে আর এক বোপে উড়ে যাওয়া। এর মধ্যে নিশাচর প্রাণীর মতো আমরা ক'জন যুবক বসে থাকি। ক্যাম্বন জানি একটা মন খারাপ করা ভাব এসে ভর করে চেতনায়। উদাস করা একটা হা-হা অনুভূতি কোথা থেকে যেনো পাগলা হাওয়ার মতো ছুটে আসে। এ কেমন দিন আর সময়ের ঘেরে বন্দি আমরা! কোথায় আমাদের বাড়িয়ার আর আঞ্চলিকজন! তাদের সাথে কি কথনো দেখা হবে আর? বাড়িতে কি ফেরা যাবে? এভাবে যুদ্ধ করে কি আদৌ কোনোদিন দেশটা শক্রমুক্ত আর স্বাধীন করা যাবে? জয়বাল্লা কি আর হবে কথনো?

— ধরাবেন নাকি একটা বিড়ি? পিন্টু পাশ থেকে বলে ওঠে ফিসফিসিয়ে। ওর কথায় নিজের ভাবনার অতল থেকে ফিরে আসি বাস্তবে। সামনে শক্র, আর পিন্টুর

এখন বিড়ি খাবার শখ জেগেছে? কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মাথা নেড়ে ইশারায় না করি। মঙ্গু-মালেক দু'যুবক ফিরে আসে। ক্লাসিতে ইসফান্স করতে করতে বলে, ওরা ৮/১০ জন হবে। সবার হাতে লাঠি-সড়কি। তবে দুটো অস্ত্রের মতো দেখা গেছে।

— দুটো অস্ত্র?

— তাই তো মনে হলো।

ঠিক আছে তোদের পজিশনে যা বলে ওদের ছেড়ে দিই। এদের বেকি যদি ঠিক হয়, তা হলে তাদের হাতে আগ্নেয়স্তু রয়েছে দুটো। আমাদের হাতে এতোগুলো অস্ত্র থাকতে ওদের প্রতিরোধ ভাঙা যাবে না, এটা হয় নাকি!

সিন্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়াই। পিটুকে ৪ জনসহ কভারে থাকতে বলি। মোস্তফা ও দুলু থাকবে তার সাথে। মোতালেবকে ডেকে বুঝিয়ে দিই, কীভাবে কাজ করতে হবে। দলটাকে নিয়ে আরো ২০/৩০ গজ এগিয়ে যাই রাস্তার দু'পাশ দিয়ে। এরপর মোতালেবকে রাস্তার ঠিক মাঝখানে শোয়া পজিশনে রেখে পরপর তিনটা গুলি ছুঁড়তে বলি। রাতের সমস্ত নৈশঙ্কৰ ভেঙে ধামধাম করে ছুটে যায় তিন এস.এল.আর-এর গুলি প্রতিরোধ বাহিনীর দিকে। হঠাৎ একটা শোরগোল আর হৈ-হস্তা পড়ে যায় লোকগুলোর মধ্যে। এর মধ্যে ফটাস ফটাস দুটো সিভিলগানের আওয়াজও ভেসে আসে। এবার সবগুলো হাতিয়ার থেকে একযোগে প্রতি শুরু করতে বলি। নির্দেশ পাওয়া মাত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে হাতিয়ারগুলো। অপূর্বের ফুলকি তুলে ছুটে যেতে থাকে গুলির ঝাঁক বাঘার বাড়ির দিকে সেই লোকস্থানের উদ্দেশে, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করবে বলে প্রহরার ছিলো। এসেই দিক থেকে আরো কটা কার্তুজের গুলি বর্ষিত হয় এলোপাতাড়িভাবে। তখনইসবাইকে নির্দেশ দিই, চার্জ! আর সেই সাথে গুলি করতে করতে দৌড়ে এসিয়ে পিয়ে যেতে থাকি দলটাকে রাস্তার ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে, দু'পাশের চৰা ছেতে দিয়ে। আমাদের আকর্ষিক আক্রমণের প্রচণ্ডতায় লোকগুলোর প্রতিরোধ গুড়িয়ে যায়। দুড়দাঢ় করে তারা পালিয়ে যেতে থাকে যার যেদিকে যাওয়া সম্ভব। আমরা পৌছে যাই বাঘার বাড়ির সামনে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় বাড়িটা। বাঘার বাড়ি এসে যায় আমাদের দখলে।

অবাক ব্যাপার, বাঘা যিয়াকে তার ঘরের ভেতরেই পাওয়া গেলো রাইফেলসহ। রাস্তায় সিভিলগানসহ পাহারা বসিয়ে বাঘা প্রায় নির্বিকার ঘরের ভেতরে শুমিয়ে ছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম আকর্ষিক আক্রমণে সে ভ্যাবাচ্যাকা বেয়ে যায় এবং ঘর থেকে বের হবে কি না, গুলি ছুঁড়বে কি না তার রাইফেল থেকে, এসব ভাবতে ভাবতেই সে ঘেরাও হয়ে যায়। এরপর তার সরাসরি সারেভার। রাইফেলটা কোথায়, বলার সাথে সাথে সে ঘর থেকে রাইফেল আর ২১ রাউন্ড গুলি এনে দেয়। টর্চের আলোতে দেখা যায়, একেবারে ঝকঝকে ব্যবহার উপযোগী রাইফেল। নাদের হঠাৎ করে ক্ষেপে গিয়ে তার চুল ধরে শুইয়ে ফেলে। তারপর চালাতে থাকে পুলিশ মার। নাদের পুলিশ বাহিনীতে থাকবার সময় খানায় ধরে আনা বহু চোর-ডাক্তাত পিটিয়েছে। সুযোগ পেয়ে অনেকদিন পর সে আজ তার পুলিশ হাতখানা ঝালিয়ে নিতে থাকে।

বাধার 'বাপগে-মাগে' চিঠকার রাতের অঙ্ককার বিদীর্ণ করে দিতে থাকে। সমস্ত বাড়িটায় তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু কিছু পা ওয়া যায় না। নাদের থামলে মোতালেব এগিয়ে যায়। এরপর পিন্টু গিয়ে ফিনিশিং টাচ দেয়। তখন বাধা আর বাধা থাকে না, একটা আহত ক্ষত-বিক্ষত পতিত মানুষে পরিণত হয়। তার রক্তাক্ত মুখের ওপর টর্ট জ্বালিয়ে জিগ্যেস করি, কী বাধা মিয়া, আর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা হবে?

- নাগে বাপ বলে সে গড়িয়ে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে।
- সিভিলগান দুটোর কী হবে?
- কাল ও দুটা আপনাদের ক্যাম্পে জমা দিমগে, খোদার কসম লাগে, মোক বিশ্বাস করেন। মোতালেব তাকে শোয়া অবস্থাতেই গুলি করবে বলে তার হাতিয়ার তাক করে ফেলে। আমি বাধা দিই।
- নারে মোতালেব থাক। আমরা ওকে একটা সুযোগ দিলাম। এরপরও ও যদি আমাদের পক্ষে না আসে, তখন অনেক সুযোগ করে নেয়া যাবে এই কুন্তার বাচ্চাকে শেষ করার।

বাধা মিয়া শুয়ে শুয়ে কাতরাতে থাকে। আমরা বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি। পিন্টুর হাতে তিন ব্যাটারির টর্চলাইট জুলে ওঠে। এবার আর অঙ্ককার হাতড়ে হাতড়ে নয়। সীতিমতো টর্চের উজ্জ্বল আলোয় পথ চিনে চালু করো।

- একটা লাজ হইছে মাহবুব ভাই, পিন্টুর ক্ষেত্রে কষ্ট।
- কী? জিগ্যেস করি তাকে।
- এই তিন ব্যাটারির টর্চ।
- আর রাইফেল দুটো?
- ও দুটোতো অপারেশনের স্টেটেট। টচটা তো আর টার্গেট ছিলো না।
- ঠিকই তো, চলমান দ্রুতত হেসে ফেলে।
- নেন এবার উড়োজ্বাজ ধরাই বলে পিন্টু ম্যাচ বের করে। দুর্দু বের করে বিড়ি। আশপাশের জোনাকির দলের সাথে আরো ১৫ জন ক্লান্ত যুবকের মুখে ঘোগ হয় ১৫টি জোনাকির আলো।

সক্ষ্যা ৭টা থেকে সাকাতির দিকে প্রচও গোলাগুলি শুরু হয়েছিলো। রাত ১১টা পর্যন্ত চলেছিলো যুদ্ধের এই তাওবলী। সম্ভবত পেয়াদাপাড়ার হাইড আউট থেকে আহিদারের দল গলেয়া কিংবা টুনিরহাট পাকবাহিনীর ধাঁটি আক্রমণ করেছে। পাকবাহিনীর সাথে তাদের শুরু হয়েছিলো প্রচও আক্রমণ, সাকাতিতে অবস্থিত ভারতীয় বাহিনীর আর্টিলারি ইউনিট দিয়ে চলেছিলো সমভাবে তাদের সাপোর্ট। চিকুর বাড়িতে হামলার আগেই অবশ্য উভয় পক্ষের গোলাগুলি থেমে গিয়েছিলো। জানবার উপায় নেই, আজ রাতে আহিদারদের সফলতা কতোদূর, তাদের কোনো ক্ষতি হলো কি না। হয়তো জান যাবে, আগামীকাল কিংবা পরশু। ফেরার পথে বারবার মনের ভেতর থেকে একটা আশাবাদের বিশ্বাস বাজতে থাকে, হয়নি, ওদের কোনো ক্ষতি হয় নি। ওরা সবাই তালো আছে।

জয়বাংলার অর্বেষণ

পানিমাছ ঘাঁটিতে নতুন আগত দলটি খুব বাড়াবাঢ়ি শুরু করেছে। অত্যাচারের তাওবলীলা চালিয়ে যাচ্ছে আশপাশের গ্রাম ও বসতিগুলোর ওপর। দুরাত আগে সংঘটিত যুক্তে তাদের পুরনো সহকর্মীদের প্রচও মার খাওয়ার ব্যাপারটা তারা সহজে নিতে পারে নি। প্রতিশোধ স্পৃহায় তারা ধরে নিয়ে গেছে বেশ ক'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে। এদের ক'জনকে অত্যাচার চালিয়ে তারা হত্যাও করেছে। ক'জনকে পাঠিয়েছে পঞ্চগড়ে তাদের বন্দিশালায়। মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকারী সন্দেহে বেশ ক'টা বাড়িয়ার লুটপাট করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়েও দিয়েছে তারা। কামারপাড়া রাজ্ঞাক মাস্টারের গ্রামেও তারা হামলা করেছে। প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মানুষ সীমান্তের ওপারে। রাজ্ঞাক মাস্টারও তার পরিবারের লোকজন নিয়ে বেরুবাঢ়ি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। আগের দলটির তুলনায় এ দলটির নিষ্ঠুরতা আর নৃশংসতার খবর ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে পাকবাহিনীর ট্রাচেজিই এটা, যারা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেবে, তাদের খত্ম করে দাও। যে বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আস্তানা গাড়বে, সে বাড়িসহ পুরো গ্রামটাই জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দাও। মুক্তিযুক্তের পক্ষের বা জয়বাংলার লোক হিসেবে যারা সন্দেহভাজন, তাদের ধরে এনে হত্যা করো, কিংবা তাদের বন্দি করে রাখো, তাদের ওপর অত্যাচারের চরকর্মীদ্বাৰা বাড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি, তাদের গতিবিধি এবং আস্তানার হস্তিস্থানে করো। দখলকারী পাকবাহিনী বর্তমানে এটা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে যে, অস্তিদিয়ে তারা পুরো দেশটাকে দখল করতে পারে নি। ভারতীয় চর এবং ধর্মসম্বন্ধ বাহিনী হিসেবে যারা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথমদিকে অভিহিত করে তাদের সন্তুষ্টি দিনাশ করার লক্ষ্য নিয়ে চৱম নৃশংসতা আর হত্যার যে তাওবলীলা নিয়ে বৈশ্বেশ্বর পড়েছিলো, তাতে তারা সফলকাম হতে পারে নি। মুক্তিযোদ্ধারা দিনে দিনে উত্তোলিত হচ্ছে। তারা এখন পাল্টা আঘাত হানছে। তাদের সংখ্যা এবং শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। এটা তারা এতোদিনে বুঝে গেছে। ফলে তারা সীমান্তের দিকে যতোদূর সংস্করণ এগিয়ে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে। ঘাঁটিগুলোর অবস্থান মজবুত করে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক যুক্তের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে এবং তাদের ঘাঁটি অবস্থানের আশপাশে নিপীড়নমূলক তৎপরতা চালিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রা ঝুঁক্তে চাইছে। এটা তারা স্থানীয় গ্রামবাসীদের বুবিয়ে দিচ্ছে, জয়বাংলার পক্ষের মানুষের শান্তি হচ্ছে মৃত্যু। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকা মানে নৃশংসতা, অত্যাচার, লুটপাট ও নারীর ইজ্জত হরণ, বসতির পর বসতি জ্বালিয়ে দিয়ে সবকিছু ধ্রংস করা, ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেয়া ঠাণ্ডা মাথায়। তাদের বক্তব্য: আদমি নেহি চাহিয়ে সেরেফ মিটি চাহিয়ে। আর এই মতবাদ থেকেই তারা পোড়ামাটি মীতি অনুসরণ করতে তাদের সেনাদলকে লেলিয়ে দিয়েছে।

প্রতিদিন দলে দলে মানুষ তাদের বাড়িয়ার ছেড়ে পালিয়ে আসছে। তারা সীমান্ত পেরিয়ে বেরুবাঢ়ি অথবা সাকাতি শরণার্থী শিবিরে গিয়ে মানবেতের জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাপারটা দারকণভাবে আলোড়িত করে আমাদের। এসবের জন্য নিজেদের ভীষণ অপরাধী মনে হয়। আমাদের এখানে উপস্থিত গেরিলা যুক্তের নামে রাতের

বেলা শক্তির ওপর আঘাত করে অর্থাৎ প্রশিক্ষণের সময় শেখা 'হিট এ্যড রান' পদ্ধতিতে যুদ্ধ পরিচালনা করতে গিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষদের যে ব্যাপকহারে সর্বনাশ ডেকে আনছি আমরা, তার প্রতিকার বিষয়ে আমাদের কিছু জানা নেই। এর প্রতিবিধান আমাদের কাছে নেই। বড়ো অসহায় লাগে এ অবস্থায়। মানুষের এ দুর্গতি কুরে কুরে খায় বুকের ভেতরটা। পাকিস্তান বাহিনীর সাথে সরাসরি সর্বাত্মক যুদ্ধ চালিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে অসহায় মানুষগুলোকে রক্ষা করার মতো লোকবল, অন্তর্বল, কোনোটাই আমাদের নেই। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, সীমান্তের ওপারে কেবল শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কাজ কি করছি না আমরা? আবার মনে হয়, যুদ্ধের নিয়মই তো এটা। একটা দেশের মুক্তির জন্য, একটা জাতির স্বাধীনতার জন্য লড়ছি আমরা। এতে তো কিছু মানুষকে কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। একটা স্বাধীন দেশের অভূত্য তো এমনিতেই হবে না। এর জন্য দিতে হবে শত-সহস্র মানুষকে বলি, গৃহহীন হতে হবে অসংখ্যক মানুষকে, শহর-বন্দর-জনবসতি ধ্রংস হয়ে যাবে, জনবিরল হয়ে যাবে সবকিছু। সুরী গৃহকোণে নিজ আঘায়পরিজন নিয়ে রচিত শান্তির নীড়গুলো ছেড়ে পালাতে হবে। সবকিছু ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। অনেক রক্ত ঝরাতে হবে। অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং এধারা চলতেই থাকবে ততোদিন, যতোদিন না আমাদের চিরলালিত জাতীয়ত্বাল্পা পাওয়া না যাবে।

আজ এরা পালাচ্ছে, এভাবে আমরাও তো পালাব্যে এসেছি। আমি, পিন্টু, মুসা, জয়নাল, একরামুল, মোতালেব এবং এ ধরনের সেঞ্চ্যাক সজীব তরুণ-মুবকের দল। আমাদের অন্ত-গোলাবারুদ স্বল্প। লোকজনের কথা : কিন্তু তাতে কি, তারপর ও তো লড়ে যাচ্ছি তাদের সাথে। এ যুদ্ধ যতেও স্বীকৃত্যাগী হবে, আমরা আরো সংঘটিত হবো। আমাদের অন্ত-গোলাবারুদ বাস্তুর নতুন নতুন ছেলেরা এসে দল বৃদ্ধি করবে। এদেশ আমাদের, এ মাটি আমাদের। দখলদার পাকবাহিনী কতোদিন ধরে রাখবে আমাদের মাটি, আমাদের দেশ? পারবে না, জনবিরোধী, দখলদার একটা বিজাতীয় বাহিনী এভাবে পারে না কোনো একটা দেশ ও জাতিকে দখলে রাখতে।

পিন্টু আসে পেছন থেকে দলবল নিয়ে। তার সাথে মজিব, দুলু, মোস্তফা, জবরার ও দুর্দণ্ড পেছনে পেছনে আসে। রাউফ হাতে বয়ে আনে চায়ের পাত্র। নালাগঞ্জের খালের পাশে একাকী বসে সীমান্তের ওপারে ধাবমান মানুষের চলমান ঢল দেখে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলে মন। পিন্টুর উদাত্ত গলায় গান, আজি বাংলাদেশের জন্ম হতে কখন আপনি, তুমি এ অপরূপ জীবে বাহির হলে জননী, ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁধি না ফেরে...।' ওরা দলবলে এসে বসে ঘাসের ওপর। রাউফ মিয়া চা পরিবেশন করে। উড়োজাহাজ বিড়ি জুলতে থাকে সকলের ঠোটে ঠোটে। পিন্টুর গান আশপাশের বাতাসে ভেসে বেড়ায়। দুলু গলা মেলায় তার সাথে। মন ভালো হয়ে আসে মুহূর্তের ভেতরে। মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের বাইরে প্রগতিশীল বেশ ক'জন মুবক এখন আমাদের সাথে থাকছে। একটা নিবিড় বক্সের ভাব গড়ে উঠেছে ওদের সাথে। যুদ্ধ-শরণার্থী, ভারতের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাপোর্ট, আমেরিকার

বিরোধিতা, কমিউনিস্ট দেশ চীনের পাকিস্তানের পক্ষে মদদ প্রদান, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ; মতবিনিময় হয় ।

এখন উঠতে হয় । ওঠার সময় আমার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই, আমরা আজ রাতে আবার যাচ্ছি ওদের আক্রমণ করতে ।

— কাদের ! উচ্চল পিন্টু তখন তার হাসি, গান আর রসিকতা ছেড়ে মুহূর্তে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হয়ে যায় । সিরিয়াস গলায় জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছি আমরা আজ মাহবুব ভাই !

— পানিমাছ ! নতুন আগত পাকবাহিনীর ওপর হামলা হবে আজ রাতে । ওদের ওপর একটা আঘাত হানা দরকার । তা না হলে ওরা ঠাণ্ডা হবে না ।

— ঠিক আছে, পিন্টু সায় দেয় । অন্যরা তখন চৃপচাপ বসে থাকে । সম্ভবত তাদের মনের মধ্যে তোলপাড় করে চলে রাতের যুদ্ধে যাওয়ার কথা ।

বেলুচ রেজিমেন্টের ক্যাপ

রাত আটটার পর দুটো দল রওনা দেয় । পিন্টু নিয়ে যাবে একটা দল হাড়িভাসা হয়ে পানিমাছের দিকে । অন্যটি নিয়ে যাবো আমি নিজে ঠাকুরপাড়া হাট হয়ে বদলুপাড়ার ওপর দিয়ে পানিমাছ অভিযুক্ত । গত আক্রমণে একটা আঘাত হানা হয়েছিলো কামারপাড়ার দিক থেকে । আজকের অপারেশনে কামারপাড়া দিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়েছে । পাকবাহিনী এখন মূল লক্ষ্য থাকবে কামারপাড়া উদ্দেশ্য করে । আমরা তাদের অতিরিক্ত আক্রমণ করবো বদলুপাড়া আর হাড়িভাসার দিক থেকে । যতোটা সম্ভব শক্তিপূর্ণ জৰুত করতে হবে । আর আক্রমণ করতে হবে এমনভাবে যাতে করে তারা ডিম্বলাইজল্ড হয়ে যায় এবং তাদের ঘাঁটির অবস্থান ছেড়ে পরবর্তীকালে বের হওয়ার আর সাহস করতে না পারে । বিদায়ের সময় পিন্টু আবেগগুরুত হয়ে গলা জড়িতে ধরে । এরপর দুঁজনের ছাড়াভাড়ি । পিন্টুর সাথে রয়েছে একরামুল আর মোতালেবের মতো সাহসী দু' কমান্ডার । ওদের গাইড করছে দুলু । আমার দলে রয়েছে মুসা, জয়নাল আর মধুসূদন । গাইড মজিব আর জব্বার । দুইলের শক্তি ১৫ জন করে । সব ধরনের অস্ত্র আর গোলাবারুদ আছে আমাদের সঙ্গে । আর আছে প্রত্যেকের কাছে দুটো করে ছেনেডে । হঠাৎ করেই আজকের রাতের এ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি । নতুন আগত পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে মোকাবিলার ব্যাপারটা আজ কেমন হবে, কীভাবে হবে, তার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা নেই । আমরা যাচ্ছি । পরিস্থিতিই বলে দেবে, যুক্তটা কেমন হবে, কিভাবে হবে ? রাত ১২টা আক্রমণের সময় পিন্টুকে শুধু একথাটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে । পরিস্থিতি বুঝে সে উপস্থিতি সিদ্ধান্ত নিয়ে তার দিক থেকে আক্রমণ রচনা করবে । আমার নেতৃত্বে পরিচালিত দলও সেভাবেই কাজ করবে ।

ঠাকুরপাড়া হাট পার হয়ে বদলুপাড়ার রাস্তায় টহলদারি পাকবাহিনীর দলটির সাথে, বলা যায়, যুদ্ধ লেগে যায় অক্ষমাংশ । অক্ষকারে আগুয়ান আমাদের দলটিকে দেখার সাথে সাথে ওরাই প্রথম গুলি ছোড়া শুরু করে । প্রায় কানের কাছ যেমে শিস

বাজিয়ে চলে যায় প্রথম গুলি। নিরাপত্তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে মুহূর্তের ভেতরে শোয়া অবস্থানে চলে যাই। দলের অন্যরাও দ্রুত অবস্থান নিয়ে নেয়। গড়িয়ে চলে আসি রাস্তার পার্শ্ববর্তী ঢালে। কোমরের নিচ থেকে পা পর্যন্ত খাদের পানিতে। এরপর শুরু হয় পাটা গুলিবর্ষণ। ওরা আসছিলো রাতের বেলাকার টহলদারিতে। আমরা যাচ্ছিলাম ওদের আক্রমণে। রাস্তার ওপর সাক্ষাৎ উভয় দলের। ওরা ঝুঁজছে আমাদের আর আমরা ঝুঁজছি ওদের। শক্ত কখনো শক্তকে ছাড়ে না। দু' দল সৈন্য সামনাসামনি হলে একে অপরকে পরাজিত এবং ধ্বংস না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। মরণপণ লড়াই চলতে থাকে উভয়ের মধ্যে। যুদ্ধের এটাই স্বাভাবিক ধর্ম। যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ চলে এসেছে এভাবেই। সুত্রাং আমাদের যুদ্ধও চলতে থাকে। রাতের ঘনায়মান নিকষ কালো অক্ষকারে দু' পক্ষই তাদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে গুলি ছুঁড়ে চলেছে। কেউ কাউকে দেখেছে না। দু' দলের মধ্যে ব্যবধান-দ্রুত ৪০/৫০ গজের মতো। সশ্র্ম্ম অনুমানের ওপর নির্ভর করেই শক্রের অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি চালাতে হচ্ছে। সবগুলো হাতিয়ারই সমানভাবে গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। তাদের জবাবও আসছে সমানভাবে। বিরতিহীন গোলাগুলির ঘটনা একটা ছোটখাটো যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করে জায়গাটাকে। একসময় ম্যাগজিন খালি হয়। আবার গুলি ভরা হয়। হাতিয়ারের নল গরম হয়ে ওঠে। শক্র এগোয় না আবার পেছনে হটে হাতিয়ার তাগিদও নেই তাদের। গুলির বৃষ্টি আসে। মাথার ওপর দিয়ে হইনেকে বাজিয়ে চলে যায়। আমাদের অগ্নিবাণগুলোও ছুটে যায় তাদের দিকে একইভাবে। একপশলা বৃষ্টি হয়ে যায় এরই মধ্যে। কাদামাটিতে শরীর মাখামাখি স্কুল আয়। রাত ১১টার দিকে শুরু হয়ে যুদ্ধ প্রায় ঘট্টাখানেক ধরে চলেছে একইভাবে। এতোক্ষণ পর হাড়িভাসার রাস্তার দিক থেকে গোলাগুলি শুরু হয়। অথবা ছেতোক্ষণে পিন্টু তার দিকীয় ফ্রন্ট চালু করেছে। এ পরিস্থিতিতে সম্মুখবর্তী শক্রের দল কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। চিৎকার করে আকাক্রম, মজিদ ও মধুকে ছেনেড চার্জ করার নির্দেশ দিই। রাস্তার পাশ দিয়ে জঙ্গুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে ওরা ধমাধম ৪টা ছেনেড ছুঁড়ে ছুটে আসে। আগুনের ফুলকি তুলে ছেনেডগুলো বিক্ষেপিত হয় তাদের সমন্ত শক্তির তরঙ্গ তোলে। পানিমাছ ধাঁচিতে অবস্থানরত পাকবাহিনীর মূল দল এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে দেয় তখন। পিন্টুর দলের গোলাগুলি তাদের দিকটা মুখরিত করে রাখে। আমাদের দলের সবগুলো ছেলে বিরতিহীন গুলি চালিয়ে যেতে থাকে। সামনের জায়গাটা ছেনেডের বিক্ষেপণের ধোয়ায় ধোয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে যায়। বারবন্দের গন্ধ নাকে জুলা ধরিয়ে দেয়। অমরখানা-জগদলহাটের ওপর ভারতীয় বাহিনীর কামানের গোলা এসে পড়তে থাকে। তালমায় অবস্থানরত পাকসেনারাও এ সময় অদৃশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের উপস্থিতির সংস্থানয়া আরো জোর গোলাগুলি শুরু করে। এখন চারদিকে শুধু গোলাগুলি আর কামানের গর্জন। বৃষ্টি ভেজা কাদামাটিতে মাখামাখি আমরা। আমাদের সামনে শক্ত প্রায় হাতের নাগালে। আরো অনেকটা সময় কেটে যায় এ অবস্থা। এরপর হঠাৎ করে ওরা থেমে যায়। কিন্তু আমরা থামি না। একনাগাড়ে আরো প্রায় মিনিট পনের গুলি ছুঁড়ে সবাইকে থামবার এবং সবাইকে যে

যার অবস্থানে থাকার নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঢ়াই। রাস্তার ওপর উঠে আসি। প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, এই বৃক্ষ শক্রপক্ষের এক বাঁক গুলি এসে ঝাঁজরা করে দেবে শরীর-বুক। কিন্তু তা হয় না। তাহলে কি শক্ররা পিছু হটে পালিয়েছে? হ্যাঁ তাই। এবং নিচিত হতেই আকাকর আর মালেককে এগিয়ে যেতে বলি। হাতে ধরা উদ্যত রাইফেল নিয়ে ওরা এগিয়ে যায়। প্রায় ২০ মিনিট পর ওরা সাড়া দেয়।

— শালারা নাই ভাগছে, আমেন আপনারা।

এগিয়ে যাই সদলবলে শক্র অবস্থান অভিযুক্ত। শক্র অবস্থান অবশ্যে দখলে আসে। কিন্তু ওদের পাওয়া যায় না। পিঠাটান দিয়েছে ওরা।

— দেবেন তো এটা কি ঘোর পাওর নিচোত কুড়িয়া পানু।

ভেজে যাওয়া ম্যাচের কাঠি টুকে টুকে জুলায় মধুসূদন। সে আলোতে দেখা যায় মালেকের পায়ের নিচ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা, একজন পাকসৈনিকের মাথার ক্যাপ। ক্যাপের সামনে ভুলভুলে তামার অক্ষরে লেখা, বেলুচ রেজিমেন্ট। ম্যাচের কাঠি জুলিয়ে জায়গাটা ভালো করে দেখা হয়। ভেজ মাটি আর কাদার সাথে এক জায়গায় বেশ কিছু জমাট বাঁধা রক্তের থোক। তার মানে তাদের একজন গুরুতর আহত হয়েছে এবং এখানেই সে পড়ে ছিলো। উদ্ধার করা এই ক্যাপ হয়তো সেই আহত সৈনিকের। আহত সৈনিকটিকে ওরা যাওয়ার সময় নিচ্ছাই বয়ে নিয়ে গেছে। না আর এখানে আর সময় কাটানো ঠিক নয়। প্রচল করে শক্র মুখোযুথি হওয়ার মতো শক্তি বা অবস্থাও দলের নেই। রাত প্রায় তিনটের কাছাকাছি। ছেলেদের রিট্রিটের নির্দেশ দিই। পিন্টুরও এখন কেন্দ্ৰীয় সাড়া নেই। সম্ভবত সেও তার দল নিয়ে রিট্রিট করছে। প্রতিবারের মতো অয়জন যুদ্ধশ্যে প্রচণ্ড ক্লান্তি এসে ভিড় করে। নালাগঞ্জ হাইড আউট আমাদের প্রতিশ্রুতিনি দিয়ে থাকে। কিন্তু মনে হয়, আমাদের সেই নিরাপদ আহত অর্থাৎ প্রতিশ্রুতিহাইড আউটের অবস্থান বহুদূরে।

১৪.৮.৭১

জয় বাংলাদেশ-মুক্তিযুদ্ধের ছবি

রিপোর্টের দিন আজ। মেজর দরজি আগেই এসে পৌছেছেন। বিওপির ভেতর তিনি আমাদের অপেক্ষায় বসে। আমাদের সাক্ষাতের আগভাগে তিনি মেপালি সুবেদার ও বিওপি কমান্ডারের সাথে নিজেদের ভাষায় গল্প জামিয়েছেন। সকাল ১০টার মতো বেলা তখন। ঝকঝকে সূর্য উঠেছে। পরিষ্কার দিন। চারদিকে সবুজাত নয়নাভিরাম মন ভোলানো প্রকৃতি। গাছপালা, বনবাদাদু আর ফসলের প্রাস্তর সব সবুজে সবুজে একাকার। রোদের সোনালি আলো গাছগাছলির সবুজ পত্রগুচ্ছের ওপর এক নয়নাভিরাম ঝলমলে দৃশ্যের অবতারণা করেছে।

রাতের সফল অপারেশন শেষে ভালো লাগার ফুরফুরে অনুভূতি নিয়ে গড়ালবাড়ির দিকে ইঁটছি বর্ষার সবুজ শ্যামল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভেতর দিয়ে। রাত জাগার ক্লান্তি শরীর-মন থেকে উভে গেছে। মনের মধ্যে একটা অজানা আনন্দ ধৰনি বেজে চলে আর সেই শব্দ শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি সীমান্ত পেছনে ফেলে ভারতীয় সীমান্ত

ফাঁড়ির দিকে। রাতের যুদ্ধের পর সজিম উদ্দিন থেকে গিয়েছিলো তার নিজস্ব এলাকায়। সকালবেলা সে রাতে সংঘটিত শক্রপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নিয়ে এসেছে। সজিম তার রিপোর্ট পেশ করে :

একজন পাক সৈনিক মৃত। বেলুচ রেজিমেন্টের সদস্য সে। আরো বেশ ক'জন আহত হয়েছে তাদের। মৃত সৈনিককে তারা পাঠিয়ে দিয়েছে পঞ্চগড়ে। সকালে ওদের দুটো গাড়ি এসেছিলো। কিছু সৈনিকও এসেছে। একজন বড়ো অফিসারও আছে দলে। তারা আজ হাড়িভাসার দিকে মার্চ করতে পারে।

একজন বেলুচ সৈন্য ঘায়েল। এটা একটা বড়ো ধরনের সফলতা। তার ক্যাপটা প্রমাণ হিসেবে হাজির করা যাবে মেজরের সামনে। শক্র নিধনের রিপোর্টের সাথে সাথে এর সত্যতা সম্পর্কে তারা প্রমাণও চান। প্রমাণ সব সময় আনা সম্ভব হয় না। ফলে অফিসার ইনচার্জ মেজর দরজিকে শক্র নিধন এবং অপারেশনের সফলতা সম্পর্কে বিশ্বাস করানো কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকভাবে বলতে হয়। বোঝাতে হয়। যুদ্ধের মাঠের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে হয়। শক্রের বৃহৎ থেকে নিহত বা আহত শক্রের নির্দর্শন বয়ে আনার ব্যাপারটা যে কতো বড় একটা অসম্ভব ব্যাপার, সেটা বুঝতে চান না মেজর। তার এক কথা, প্রমাণ দেখাও। হোয়ার ইজ ইয়োর প্রক্ষ? শক্রের ব্যাচ বা তাদের দখলকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ, কিংবা সরাসরি শক্রকে ধরে আনো জীবিত, আহত বা মৃত। যুদ্ধ করলেই হবে না; যুদ্ধের সম্ভাবনার প্রমাণও বয়ে আনতে হবে। তাহলেই কর্তৃপক্ষ সত্যিকারভাবে ধরে নেবেন অমরা যুদ্ধ করছি। শক্রের মোকাবিলা করছি। যুদ্ধে শক্রপক্ষের ক্ষতি করতে পারেই। মেজর দরজিক দোষ নেই। বাস্তব যুদ্ধে তার সৈনিকদের এগিয়ে দিয়ে দেখাই থেকে পরিচালনাকারী অফিসার অবশ্যই চাইবেন, যুদ্ধে তার সৈনিকরা ক্ষতিলুক্ষ্য সফল হয়েছে এবং শক্র নিধনের প্রমাণস্বরূপ তারা কি আনতে পেরেছে?

দুরজি অলস ভঙ্গিতে ঢেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তাকে স্যালুট দিয়ে এগিয়ে যাই। তার সামনে পেতে রাখা টেবিলের ওপর পিন্টু ও মুসা এগিয়ে এসে রাখে দুটো রাইফেল আর ৫৪ রাউন্ড গুলি, সেই সাথে বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকের রক্ত মাখানো কাপ, পাকসেনাদের ব্যবহৃত গোলাগুলির কিছু খোসা। মেজর প্রথমে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন জিনিসগুলোর দিকে। তারপর তার যেনো সঁর্বিং ফেরে। তড়ক করে লাফিয়ে উঠে বলেন তিনি, ইয়ে তোমনে রিকোভার কিয়া?

— ইয়েস স্যার।

— ইয়ে ক্যাপ, ইয়েতো বেলুচ রেজিমেন্ট কা হ্যায়, কিধার মিলা? ক্যায়সে মিলা?

— লাস্ট নাইট স্যার। উই ফট ফেইস টু ফেইস উইথ দেম এন্ড উই কিল ওয়ান অব দেম।

— ইজ ইট? ওয়াজ হি দা বেলুচ সোলজার!

— ক্যাপ আওর ব্যাজ তো উহি বলতে হ্যায় সাব। বেলুচ সৈনিক না হলে এ ক্যাপ আসবে কোথা থেকে?

— ইয়ে তো ঠিকই হ্যায়। তোমরা ঠিকই বলেছো। দেন বয়েজ, তোমনে তো

কামাল কিয়া। তোমরা একজন বেলুচ সৈনিককে হত্যা করতে পেরেছো এটা তো আমার জন্য এক বিরাট গর্বের ব্যাপার। মাই কমান্ডার উইল টেইক দ্য ম্যাটার ভেরি হাইলি। থ্যাঙ্ক ইউ বয়েজ— আওর ইয়ে রাইফেল? রাইফেল দুটো হাতে নিয়ে তিনি পরীক্ষা করতে থাকেন।

আমি বলি, দু'জন রাজাকার আর শাস্তি কমিটির প্রতিরোধ বাহিনীর হাত থেকে।

— বলেন মেজর, ভেরি গুড! এরপর এগিয়ে এসে কাঁধের ওপর চাপড় মারেন। অত্যন্ত আনন্দিত আর সুবৰ্ণ মানুষের মতো দেখায় তাকে। আমাদের অর্জিত সফলতা তো তাঁরই কৃতিত্ব। যিনি তাঁর অধীনস্থ বাহিনীকে পরিচালিত করেন। যুদ্ধের শুরু থেকে এই প্রথম আমরা একটা বড় ধরনের সফলতা প্রাপ্তসহ আমাদের অফিসারের সামনে উপস্থাপিত করতে পেরেছি। তাই স্বাভাবিক কারণেই অফিসার খুশি হয়েছেন। গর্বিতও হয়েছেন এবং তার সন্তুষ্টির ব্যাপারটা তিনি প্রকাশ করছেন তার আচরণ, কথাবার্তা আর মুখে আভাসিত হাসির ভেতর দিয়ে।

গাড়িতে উঠবার সময় মেজর জিগ্যেস করেন, কিছু বলবে, দু ইউ ওয়াট সাম থিক? পিন্টুকে খোঁচা মারি। পিন্টু গড়গড় করে বলে ফেলে, স্যার হাম ছুটি চা- তা হ্যায় ছয় ঘটা কি লিয়ে, জলপাইগুড়ি জায়েগা।

— ও,কে, মঞ্জুর, বাট কিউ জায়েগা?

— সিনেমা দেখেগো স্যার, জয় বাংলাদেশ।

— আচ্ছা যাও, মাগার ইভেনিং মে আ মীমসে

— ও কে স্যার।

মেজর চলে গেলে আমরা স্বাক্ষরভূত পাই একেবারে নিজেদের হাতের মুঠোয়। রেশন ও মালসামানসহ ছেলেবেল হাইড আউটোর দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে জলপাইগুড়ি অভিযুক্তে রওনা কর আমরা একটা ভাড়া করা ট্যাঙ্গিতে চেপে। সাথে থাকে দুল ও মজিব। দ্রুত ঢলমান গাড়ির ভেতর হু-হু করে বাতাস ঢোকে। সবাইকে গ্রাস করে এক গতিময় উদ্বামতা। আর সেই অবস্থায় পিন্টু গলা ছেড়ে গান ধরে, কোথায়ও আমার হারিয়ে যেতে নেই মান। আমরাও গলা মেলাই ওর সাথে।

‘জয় বাংলাদেশ’ ছবি বোঝে থেকে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের কবরী এ ছবির নায়িকা। যতো অগ্রহভরে এসেছিলাম ছবিটা দেখতে, ছবির কাহিনী আর ঘটনা বিন্যাস এবং মুক্তিযুদ্ধের উপস্থাপনা ছবিতে যেভাবে আনা হয়েছে, তা ভালো লাগলো না। আবেগ, দেশপ্রেম আর যুদ্ধ এসব ব্যাপার যেভাবে আনা হয়েছে, তার সাথে আমাদের বাস্তব যুদ্ধের কোনো মিল থেঁজে পাওয়া গেলো না। কোনো সমাধান ছাড়াই ছবিটা শেষ করা হয়েছে। খুব তড়িঘড়ি করে যে ছবিটা বানানো ‘জয়বাংলাদেশ’ নামের ছবিটা দেখলে সেটা সহজেই বোঝা যায়। তবে ছবিটা বাজার পাবে ভালো। সম্ভবত এ কারণেই দায়সারাভাবে ছবিটি তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হয়। প্রচুর দর্শক টানছে। অনেকেরই হয়তো ভালো লাগছে। মুক্তিযুদ্ধটা যারা দূর থেকে দেখছে, যারা যুদ্ধের মাঠের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাদের কাছেই ছবিটা সম্ভবত ভালো লাগছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থী মানুষ, যারা

জয়বাংলার স্বপ্ন দেখছে, 'জয় বাংলাদেশ' নামের এই ছবিটা তাদের সম্মোহনের মতো সিনেমা হলের দিকে ঢেনে আমবে, এটাই তো স্থাভাবিক।

ফেরার পথে বেরুবাড়িতে ঢাকাইয়া নুরুর দোকানে একটা সংক্ষিপ্ত আড়ডা জমে। নুরু ভাই তার স্টকে জমিয়ে রাখা খবরাখবর পরিবেশন করেন। শরণার্থীদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে। শিবিরটা ধীরে ধীরে একটা স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। প্রথম দিককার সেই রাস্তাঘাট আর গাছের তলে পরিবারপরিজন নিয়ে খোলা আকাশের নিচে শরণার্থী মানুষদের অসহায় অবস্থান আর চোখে পড়ে না। তবে মানুষজনের অস্ত্রিভৱতা ভয়ানকভাবে চোখে লাগে। দিন দিন জয়বাংলার জন্য অপেক্ষমাণ মানুষেরা হতাশার অতল গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

— আর মতি বিড়ি-উড়োজাহাজ বিড়ি ভালো লাগে না মাহবুব ভাই, ভালো সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। ফেরবার পথে পিন্টুর কিছুটা বিলাসিতার সাধ জাগে।

— ঠিক আছে, দু'প্যাকেট নাও।

— ওকে বস, বলে পিন্টু মজিবকে নিয়ে দোকানের দিকে যায়। দুলু তার ফ্যামিলির জন্য কিছু কেনাকাটা করে। এরপর হাইড আউটের পথে নামতেই সন্ধ্যা হয়ে আসে। আকাশে মেঘের হালকা আন্তরণ। সেটা ভেদ করে উকি দেয় বাঁকা টাঁদ। হিতীয় কিংবা ততীয়ার টাঁদ সম্ভবত। পানামা স্লারেট জুলতে থাকে চার মুবকের ঠোঁটে। শরণার্থী শিবিরের চারদিক থেকে চুপ্তে আসা প্রবল দুর্গন্ধি পানামা সিগারেটের সুগন্ধি ধোয়া তার কিছুটা ঢেকে ঝুঁক্তো করতে সাহায্য করে।

হাড়িভাসা আক্রমণ

হাইড আউটে ফিরতে রাতে ছটা বেজে যায়। ফিরতেই মুসা উত্তেজিত খবর পরিবেশন করে, পাকসেনায় হাড়িভাসা এসেছে!

— কখন?

— সকালের দিকে। তাদের সম্ভবত হাড়িভাসায় স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

— ভালোভাবে খবর নিয়েছো?

— জি।

— আচ্ছ। ঠিক আছে, রেডি হয়ে নাও। আমরা হাড়িভাসা যাচ্ছি। স্থির এবং ঠাণ্ডা মাথায় সিন্দ্রান্ত নিয়ে নিই তখনি।

২০ জনের শক্তিশালী একটা দল তৈরি করে মুসা। রাত দশটায় হাইড আউট ত্যাগ করে প্রায় বারোটার দিকে হাড়িভাসার উপকঠে পৌছে যাই আমরা। আজকের গাইড মোস্তফা আর দুলু। দু'জনের হাতেই রাইফেল ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। দুলু ইতোমধ্যে অভ্যন্ত হয়ে পড়েছে রাইফেল চালাবার কাজে। মোস্তফার জন্য এটাই প্রথম।

— জিগ্যেস করি, রাইফেল চালিয়েছেন কখনও মোস্তফা?

— না, তবে সিভিলগান দিয়ে পাখি শিকার করেছি।

— ওতেই চলবে ।

— গুলি চালাবার সময় আমার পাশে থাকবেন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে ।

আকাশ ভরা মেঘ / বৃষ্টি নেই ; বাতাসও বক হয়ে গেছে । একটা গুমোটি গরম ভাব ছিলো সঙ্ক্ষার পর থেকে । এখন সেটা শীতল হয়ে এসেছে । রাত গভীর হওয়ার কারণেই সন্ধিবত এমনটা হয়েছে । হাড়িভাসা বাজারের লাগোয়া ছেট লোহার ব্রিজটা পার হয়ে একটা ঝাঁকবাঁধা ঘন অঙ্ককারে অল রাউন্ড পজিশন আমাদের । একরামুল ২ জনকে নিয়ে রেকি করতে এগিয়ে গেছে । মোস্তফা আমার পাশে শোয়া । বীতিমতো কাঁপছে থরথরিয়ে । উত্তেজনা আর ভয়ে । বারবার তাকে ফিসফিসিয়ে বলছি, ভয় পাবেন না, ঘাবড়ে যাবেন না । শক করে রাইফেল ধরে রাখেন । অর্ডার দেয়া মাত্র টিগার টিপবেন । দুলু ততোটা নাৰ্তস হয় নি । তবে দারুণ অস্থিরতায় ভুগছে সেও । মিনিটখানেকের ভেতরেই ফিরে আসে রেকি পার্টি । হাড়িভাসা বাজার এলাকায় চুক্তে পারে নি ওরা । পাকসেনাদের দল অবস্থানে আছে কি না, বোৰা যাচ্ছে না । তবে কিছু মানুষের আলাপচারিতা ওরা শুনেছে ।

তাহলে কি খানের দল আছে! ওরা থাকলে বীতিমতো যুদ্ধ করতে হবে হাড়িভাসা দখল নিতে । এছাড়া আর কিছুই করার নেই এখন । একেন্দুর অর্ধাং হাড়িভাসা পর্যন্ত এসে ফিরে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । পিন্টুকে ভক্তি আনি পাশে । বলি, যুদ্ধ করতে হবে পিন্টু । তৈরি হয়ে নাও । যুদ্ধ মানে একেনাগড়ে কিছুক্ষণ গুলি চালিয়ে একসাথে সবাইকে ঝাপিয়ে পড়তে হবে সম্মিলিত শক্তি থাকলে প্রচুর ক্যাঞ্জেলচিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । লেট আস টেক্স দ্য রিক্স এ্যান্ড হোপ ফর দ্য বেস্ট । ভূমি এখানে ৭ জনকে নিয়ে থাকবে । আমাদের বিপদ দেখলে তোমরা কভারিং ফায়ার দিয়ে এগিয়ে যাবে । মনে রাখবে, ডু ওল ভাই । আজকের ব্যাপারটা এ রকমের । কথা শেষে ছড়িয়েছিটো থাকা পজিশনটা প্রক করে নেয়া হয় । এরপর অর্ডার দিই, ফায়ার!

হাতে ধরা টেলগান থেকে নিজে প্রথমে দুটো ব্রাশ দিই । এটাই সিগন্যাল হিসেবে কাজ করে । সাথে সাথে সবগুলো আগ্নেয়ান্ত্র থেকে একযোগে শুরু হয়ে যায় গুলিবর্ষণ । মুহূর্তখানেকের ভেতরে জায়গাটা আমাদের হাতিয়ারের সম্বিলিত গুলিবর্ষণের আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে । রাতের যাবতীয় শান্তি আর নৈংশব ভেঙে খান খান হয়ে যায় ।

পাশে শায়িত মোস্তফা গুলি করতে পারছে না । কাঁপছে সে থরথরিয়ে । মোস্তফা ফায়ার দেন, গুলি শুরু করেন, আমি যতেই বলি, ততেই ভ্যাবাচ্যাকা থেকে থাকে । গুলি শুরু করতে পারে না । তখন হিসহিসিয়ে ধমক লাগাই কড়া গলায়, ইউ মি. মোস্তফা, ওপেন ফায়ার । ইট ইজ মট প্লে এ্যান্ড জেটেলম্যান, দিস ইজ ওয়্যার । আই সে ইউ স্টারট ফায়ারিং । তার কেঁপে ওঠা শরীরে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিই, গো অন ম্যান, গো অন । মোস্তফার শরীরে হাত দিয়েই বুরুলায়, কি পরিমাণে কাঁপছেন তিনি । দুরদরিয়ে ঘাম ঝরছে তার শরীর থেকে । মনে হলো, ভদ্রলোক বুঝি সদ্য নেয়ে এসে ভেজা কাপড়চোপড়সহই শুয়ে আছেন মাটিতে । ঠিক এই রকম অবস্থায় অবশ্যে মোস্তফা ফায়ার করেন । তার ভাষায়, সিভিলগানে পার্থি মারার অভ্যন্ত

ভঙ্গিতে তিনি সম্ভবত গুলি ছোঁড়েন। সাড়ে সাত সের ওজনের মার্ক প্রি রাইফেলের গুলি ছোঁড়ার এ্যাফেন্ট সম্পর্কে তার জানা থাকবার কথা নয়। হালকাভাবে রাইফেল ধরে রাইফেলের বাঁট শক্ত করে কাঁধে না লাগিয়ে গুলি ছোঁড়ার ফল তিনি সাথে সাথে পেয়ে যান। ধাম করে আগুনের ফুলকি দিয়ে গুলি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে সজোরে রাইফেল তাকে পেছনে ধাক্কা দেয়। ফলে গলা থেকে কোৎ জাতীয় একটা শব্দ করে পেছনের দিকে কিছুটা ছিটকে পড়ে যান তিনি। রাইফেলের বাঁট প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শক্ত হাতে ধরে থাকি তাকে। তার কথা আর হাঁসফাঁস করে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়ার ভেতরেই আবার তাকে অর্ডার করি, শক্ত হাতে রাইফেল ধরেন। আবার গুলি করেন, ঘাবড়াবেন না। মোস্তফা তখন আবার গুলি লোড করে। ফায়ার করে এবং এভাবে সে গুলি ঝুঁত্বে থাকে একটার পর একটা।

প্রায় ১৫ মিনিট ধরে গুলি চললেও ওধার থেকে কোনোরকম উত্তর নেই। কেবল কিছু মানুষের তারবৰে চিংকার আর দুড়দাঢ় করে ছোটাছুটি করে পালানোর শব্দ পাওয়া যায়। তারপর আর শব্দ নেই কোনো। আরো মিনিট পাঁচেক গুলি চালিয়ে সবাইকে থামার নির্দেশ দিই। এক সাথে সবগুলো শব্দিত হাতিয়ার থেমে যায়। ফলে ডয়াবহ এক নীরবতা রাতের ঘন অঙ্ককারকে ঝুঁড়ে করে তোলে। বাতাসে ডেসে বেড়ায় শুধু বারংবারের গাঙ।

তখন টেলগানটায় নতুন ম্যাগজিন ভরে উঠে ছাড়াই। মুসা, একরামুল, জয়নাল এবং আরো দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে মুক্তিবাজারের দিকে। এ কাজটা করি অনেকটা চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি প্রক্রিয়া অবস্থার ঘোরের ভেতরে। বাজার এলাকায় এসে দুটো চালাযুক্ত দোকানের ফাক গলিয়ে আর একটু এগিয়ে যাই বোর্ড অফিস অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ অফিসটার দিকে। খানসেনাদের এখানে থাকবার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সামনে এক সার দোকাটা। তার পেছনে রাস্তা, রাস্তার ওপর বোর্ড অফিস। একটা দোকানের আড়াল নিয়ে পকেট থেকে ঘেনেড়ে বের করি। একরামুল আর মুসাকেও ঘেনেডের পিন খুলতে বলি। তারপর দাঁত কামড়ে ঘেনেডের পিন খুলে ঝুঁড়ে দিই বোর্ড অফিসের দিকে। মুসা-একরামুলও তাই করে। উড়ে যায় তিনটা ডিম্বাকৃতি খারাটি সিঁজ হ্যান্ড ঘেনেড। মাত্র ১৫/২০ সেকেন্ড সময়। লাল সবুজাত আলোর তীব্র ঝলকানি তুলে বিকট শব্দে বিক্ষেপিত হয় ঘেনেডগুলো। সাথে সাথে চিংকার করে উঠি, চার্জ! পেছন থেকে ওরা ছুটে আসে। আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই সামনে। মুহূর্ত কয়েকের ভেতরেই বোর্ড অফিসটা আমাদের দখলে এসে যায়। ছেলেরা চারদিকে ছুটে যায় চার্জের ভঙ্গিতে। শক্ত পক্ষ যদি এখন দৈবাং উপস্থিত হয়। তাহলে এখন আর গোলাগুলি নয়, হাতাহাতি লড়াই বেঁধে যাওয়ার কথা। না, শক্ত নেই। বাজার এলাকা একেবারে জনবিরল। শক্তমুক্ত। বোর্ড অফিস, সেও শক্তমুক্ত।

বোর্ড অফিসের হলরুমটা খোলা পাওয়া যায়। সেখানে ঝুড়মুড়িয়ে চুকে পড়ে ক'জন। চুকেই চলে খোজাখুজির পালা। কয়েকটা টিনের বাক্স, আর কিছু ব্যবহৃত কাপড়চোপড় পাওয়া যায়। কিছু লাঠিসেঁটা আর লাল কালিতে 'রাজাকার' লেখা

২/৩টা ‘আরম্ভ ব্যাজ’ বের করে আনে একরামুল। তার মানে, এখানে কিছুক্ষণ আগেও একটা রাজাকারের দল ছিলো। পাকবাহিনী সকালের দিকে হাড়িভাসা এসে সম্ভবত রাজাকারের এই দলটিকে রেখে চলে গেছে। রাজাকারের দলটি এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের থিতু হয়ে বসবার আগেই আমাদের অতর্কিং আক্রমণের ধাক্কায় তারা পালিয়ে গেছে যে যেদিকে পেরেছে। তাদের হাতিয়ারগুলো থেকে এক রাউন্ড গুলি কিংবা খরচ করবার মতো সাহস তারা পায় নি। মাত্র ৭ দিনের ট্রেনিং দিয়ে গড়ে তোলা রাজাকারের দল আসলে চাষাভ্যো শ্রেণীর অশিক্ষিত মানুষ। লোডের বশবর্তী হয়ে প্রাণের দায়ে ঠেকে তারা রাজাকার দলে নাম লিখিয়েছে। মনের জোর, সাহস, অঙ্গীকার কিংবা রাজনৈতিক জ্ঞান কোনোটাই তাদের মধ্যে নেই। তাদের যা বলা হয়েছে, শেখানো হয়েছে এবং করতে বাধ্য করা হয়েছে বা হচ্ছে, কেবল স্টেটাই তারা করছে। অর্থাৎ আশপাশের জনবসতিতে দেদার লুটপাট চালানো, সদেহভাজন লোকজনদের ধরে এনে তাদের মারধোর করা ও অত্যাচার চালানো, পাকবাহিনীকে গাইড করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া, টেক্ষণ ঝোঁড়া ও বাঙ্কার তৈরি করা—এইসব। রাজাকার মানে সাহায্যকারী বাহিনী। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্য করার জন্য এদেশের কিছু মানুষকে দিয়ে গড়ে তুলেছে এই বাহিনী। ইতিমধ্যে পাকবাহিনীকে সাহায্য করার নামে গ্রামের মানুষদের ওপর তারা অত্যাচারের সীমাছাড়া অভিযান চালিয়ে আছে। ফলে জনমনে নিরাকৃশ মৃণা জমে উঠেছে তাদের ব্যাপারে। সাধারণ মনের ‘রাজাকার’— এই নাম শুনলেই হয়ে উঠেছে ভীতসন্ত্রস্ত।

বুঝতে অসুবিধে হয় না, হাড়িভাস ভোর্ড অফিসে রাজাকার বাহিনীকে পাকবাহিনী রেখে শিয়েছিলো মুক্তিবাহিনীকে প্রকল্পার জন্য এবং এখানে একটা স্থায়ী ঘাঁটি গড়ে তোলার জন্য, যাতে প্রয়োজন হলে পাকবাহিনী নিরাপদে এখানে তাদের ছড়ায়ায় একটা স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে। কিন্তু রাজাকার দলের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হলো না। আমাদের প্রথম আক্রমণের ধাক্কাতেই তারা বিনা প্রতিরোধে অঙ্ককারে গাঢ়া দিয়ে যে যেদিকে পেরেছে, প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছে। বোর্ড অফিসের কাছাকাছি রাস্তার পাশে গাছের নিচে তিনটা বাঙ্কার অবশ্য আজকের দিনের মধ্যেই তারা তৈরি করেছে বোৰা গোলো, সেগুলোর তকতকে অবস্থা দেখে। বাঙ্কার তিনটা উড়িয়ে দেয়া প্রয়োজন। মালেকের কাঁধে খোলানো থলিতে রেমার চার্জ। ওকে নিয়ে বাঙ্কারগুলোর দিকে এগিয়ে যাই। পিটুকে বলি, রাজাকার বাহিনীর সমস্ত মালামাল স্কুপ করে আগুন ধরিয়ে জুলিয়ে দিতে। মোতালেব তার সেকশন নিয়ে রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে পানিমাছ-পঞ্চপত্তের দিকে মুখ করে অবস্থান নেয়। রাতে পাকদেশীরা হাড়িভাসায় তাদের সহযোগী দোসর রাজাকার ভাইদের রক্ষা করার জন্য ছুটে আসবে না জানি, কিন্তু তবুও যদি ওরা আসে সেই আশঙ্কা থেকে এই অবস্থান নেয়া।

এদিকে রাজাকারদের সম্পত্তির বহুৎসব চলতে থাকে। পিটু আর মুসাই তার আয়োজক। একরামুল ও মালেককে নিয়ে ধীরস্থিরভাবে আমি বাঙ্কার তিনটিতে রেমার চার্জ লাগাতে থাকি। একসময় কাজ শেষ হয়। সবাইকে কালভার্টের ওপারে

ফলব্যাক করতে বলি। ভুতুড়ে ছায়ার মতো ছেলেরা এক এক করে উঠে আসে ও-ও
অবস্থান থেকে। সেফটি ফিউজগুলোতে আগুন দিয়ে একরামুল-মালেককে নিয়ে দৌড়
দিই কালভার্টের দিকে।

লোহার কালভার্টের এপারে এসে অবস্থান নেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই চোক করে
বিজলির আলো জলে উঠতে দেখি। সেই সাথে যেনো প্রচও শক্তিতে বজ্রপাত ঘটে
পরপর তিনবার। পোড়া বারুদের গুরুত্বে হাড়িয়ে পড়ে বাতাসে। রাজাকারদের দিয়ে
হাড়িভাসায় ক্যাম্প করার পাকবাহিনীর আশা গুড়িয়ে যায় বাঞ্ছারগুলো ধ্বংস হওয়ার
সাথে সাথে। ফেরবার পথে মোস্তফা বলে, মায়া, মোর ডান হাতটা বুঝি ভাঙে
গেলো গে।

— আরে না, ভাঙে নাই! দুদিনই দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে। এখন ক্যাম্প
লাগছে!

— ব্যথা করেছে খুব।

— যুদ্ধ ক্যাম্প লাগলো মোস্তফা মামা!

— কহেন না আর, মনে হয় নতুন জীবন পাওয়া গেলো।

— তাহলে বুবেন, দূর থেকে যারা যুদ্ধের গল্প শোনেন, জয়বাংলার জন্য
রাজনীতি করেন, যুক্তির বাস্তবতা কি জিনিস, সেটা কালভার্টের পান না। আপনি তো
দেখলেন—বুবেনে, মুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা কি করছে—কি কাছে, কিভাবে আছে। এই
ম্যাসেজগুলো আপনি পৌছে দেবেন নেতাদের কাছে। জয়বাংলার জন্য যুদ্ধটাই যখন
মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, একে তখন অবহেল্য হিসার কোনো উপায় নেই। নতুন ছেলেদের
রিক্রুট করা দরকার, আরো অস্ত্র হস্তানাবারুদ দরকার, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে
নেতাদের আসা দরকার, এসব আপনি বলবেন তাদের।

যুদ্ধ থেকে ফিরবার পথে এই এখন অত্যন্ত নির্ভার লাগছে। পিণ্টু তার পকেট
থেকে ম্যাচ বের করে বাল্পুর আসেন সিগারেট ধরাই। ওর কাছে আজো শুধু ম্যাচ
বাল্পুর। দুলু বের করে ধরে সিগারেট। মুখে সিগারেটের আগুনের ফুলকি তুলে আমরা
ফিরে চলি আমাদের আশ্রয়ের দিকে।

১৫.৮.৭১

আবার অশান্ত ভেতরগড়, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ

আগের দিন মেজের কিছু গোলাবারুদ পাঠিয়ে দিয়েছেন গড়ালবাড়ি বিওপিতে।
নেপালি সুবেদার বিওপি থেকে ব্ববর পাঠিয়েছেন সেগুলো আনতে যাওয়ার জন্য।
ভেতরগড় থেকে মতিন, মকতু মিয়াসহ ক'জন পুরাতন পরিচিত মানুষ এসেছে।
তাদের অনেক অভিযোগ আর সমস্যা। প্রথমত তারা চিহ্নিত হয়ে গেছে
মুক্তিযোদ্ধাদের গাইড হিসেবে। এখবর পঞ্জগড়ে শান্তি কমিটির কাছে পৌছেছে।
তাদের আশঙ্কা, যে কোনোদিন পাকসেনার দল হঠাতে করে এসে তাদের ধরে নিয়ে
যেতে পারে। অমরখানা থেকে পাক টিহলদারি দলও আসছে মাঝে মাঝে; তবে
সোনারবানসহ ভেতরগড় এলাকার সমস্ত মানুষ এখন পুরোপুরি মুক্তিযোদ্ধা ও

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রয়েছে। গুটিকয়েক মানুষ, যারা পঞ্চগড় পাকবাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে বসবাস করে, পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী হয়ে তাদের পক্ষে কাজ করে চলেছে, তারা মাঝে মাঝে এলাকায় এসে ভয়ঙ্গিতি দেখিয়ে যায়। এছাড়া এলাকায় ডাকাতি হচ্ছে মাঝে মাঝে। এলাকার কিছু দৃঢ়ত্বকারী সীমান্তের ওপারে ডাকাতদলের সাথে মিলে যৌথভাবে এ ডাকাতিগুলো করছে। যুদ্ধের প্রথম দিককার দুঃসময় আর নিরাপত্তাহীন দিনগুলো যেনে আবার ফিরে আসছে ভেতরগড় এলাকার জনবসতিগুলোতে। এছাড়া গ্রামে এখন প্রচণ্ড অভাব। কাজ নেই মানুষজনের। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যভাবে খেটে-খাওয়ার উপায়গুলো বন্ধ। পাকিস্তানি অধিকৃত এলাকায় যাওয়া যাচ্ছে না। আবার ইতিয়া গেলেও কোনো কাজের ব্যবস্থা নেই। অতি বৃষ্টির জন্য আউশের ফসল মরে গেছে। আমন ধান আসতে এখন অনেক দেরি। একদিকে প্রচণ্ড অভাব, প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা, অন্যদিকে ডাকাতদের অত্যাচার। লোকজনের না থেকে থাকার অবস্থা। এ অবস্থায় ভেতরগড়ের লোকজন মিলিতভাবে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। একটা কিছু করেন আমাদের জন্য—বলে মকতু মিয়া হুহু করে কেঁদে ফেলে। জোনাব আলীর সমস্যা আরো মারাত্মক। বি.এস.এফরা তাকে হন্তে হয়ে ঝুঁজছে ধরার জন্য। সে এজন্য স্থায়ীভাবেই ছল এসেছে আমাদের হাইড আউটে থাকতে। সেও কেঁদে ফেলে পা জড়িয়ে ধরে।

ভেতরগড় আবার অশান্ত হয়ে উঠেছে। একদিকে পাকবাহিনী, অন্যদিকে ডাকাত। সেই সাথে খাদ্যাভাব। এরা এসেছে আমাদের কাছে এগুলোর প্রতিবিধান চাইতে। বিস্তীর্ণ এ এলাকায় পাকিস্তানি প্রশাসন ভেঙ্গে গেছে। স্বাধীন বাংলার সরকার এ মুক্তাঞ্চলের জন্য কোনো প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারে নি। শুব সহসা তারা পারবে, এটাও আশা করা যাচ্ছে না। তাই এখন এ অঞ্চলের মানুষজনের কাছে দ্রুত খাদ্য পৌছানোর দায়িত্বসংস্কর সকল ধরনের সমস্যার তাঙ্কর্তা হিসেবে আমরাই একমাত্র ভরসাহুল হয়ে দাঁড়িয়েছি। এদের খালি হাতে ফেরাবো কী করে? একটা জনযুদ্ধে যা ঘটে থাকে, গৃহযুক্তে যা হয়, এখানেও সে অবস্থা চলছে। শুধু পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধই করতে হচ্ছে না প্রতিনিয়ত, সেই সাথে স্থানীয়ভাবে প্রায় সব সমস্যাই দেখতে হচ্ছে, মোকাবিলা করতে হচ্ছে, তার সমাধানও দিতে হচ্ছে। ধীরে ধীরে যুদ্ধের পাশাপাশি অনেক কিছুর সাথেই জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে আমাদের।

ভেতরগড়ের অতিথিদের দুপুরে খাইয়ে বিদায় দেয়া হয়। দু' একদিনের মধ্যেই আমরা ভেতরগড় এলাকায় যাবো, মতিনকে বলি। আমাদের পক্ষে সমস্ত মানুষদের তুই একথাটা পৌছে দিবি। কোনো ভয় নেই, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ।

মকতু আর মতিন তার সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে ফিরে যায়। থেকে যায় জোনাব আলী। গোলাম গাউসের মৃত্যুর পর জোনাব আলীর সাথে আর দেখা হয় নি। শুরুনো পাতলা শরীরের জোনাব আলী আরো রোগাটে হয়ে গেছে। তবে বল্ল হাড়াছাড়া দায়িত্বক তার মুখের-চোখের উজ্জ্বলতা আগের মতোই অস্থান। চেহারায় এবং কথাবার্তায় রয়েছে তার

আগের সেই একনিষ্ঠতা আর বিশ্বাসীতার ভাব। সেই সাথে চতুর মুখাবয়। প্রথমদিকে জোনাব আলী ভাটপাড়া থেকে পরিচালিত অপারেশনগুলোয় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো। অবেকদিন পর তাকে দেখে ভালো লাগে।

ভেতরগড়ের সমস্যাগুলো গভীরভাবে ভাবিত করে তোলে। পিন্টুকে সাথে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুরুর পারে আমগাছ তলায় যাই। জায়গাটা এখন আমাদের পরামর্শ আর পরিকল্পনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছের মাটির কাছাকাছি বাঁকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাওয়া মোটা কাউটার সাথে হেলন দিয়ে দাঁড়াই। আমার মতোই পিন্টুকে উহেলিত করে ভেতরগড়ের সমস্যা। 'মাহবুব ভাই' আর 'পিন্টু ভাই' নাম এ দুটো এখন জেনে গেছে সবাই। তাদের কাছে আমাদের দু'জনের অটুট সম্পর্কের ব্যাপারটা খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পিন্টুর সাথে আমার সম্পর্ক এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমি ছায়া হলে সে কায়া। একজন ছাড়া আরেকজনের চলে না। পিন্টুও আমার প্রতি তার প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা যাই বলি না কেনো, এসব দেখিয়ে নিজের আপন ছেট ভাইয়ের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন একজন আরেকজন ছেড়ে থাকার চিন্তা করাটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার।

পিন্টু পকেট হাতড়ে ম্যাচ বের করে। পকেট থেকে বের করি আমি বিড়ি। পিন্টু আমাকে বিড়ি ধরিয়ে দেয়। ও নিজে ধরায়। দু'জনে মিলিষ্টমনে বিড়ি টেনে চলি। দু'জনের ভাবনাতেই উথালপাতাল করে ভেতরগড়ের সমস্যা। যুক্তের প্রথম দিন আমরা ভেতরগড় চুকেছিলাম। ভেতরগড় মিলিষ্ট আমাদের যুক্ত ক্ষেত্রে যাত্রার শুরু। ভেতরগড়ের মানুষজনের মতোই আমরা তাদের ভালোবেসে ফেলেছি। ভেতরগড় আমাদের জন্য অন্যতম নিরাপদ ক্ষেত্র। সেখানকার মানুষেরা শত কষ্টে থাকলেও আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। বিপদের দিনে ওরা ছুটে এসেছে। আমরাই এখন ওদের বড়ো ভরসামূলক ওদের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু খালি হাতে তো যাওয়া যাবে না!

— পিন্টু ডাকাতি করতে হবে।

— ডাকাতি? পিন্টু অবাক বিস্মিত চোখে আমার দিকে তাকায়।

— হ্যাঁ ডাকাতি। দালাল শান্তি কমিটির বাড়ি থেকে ঝাজুদ খাদ্য ডাকাতি বা লুট যাই বল না কেনো, নিয়ে এসে ভেতরগড়ের অভাবী গরিব মানুষদের মধ্যে বন্টন করে ওদের বাঁচাতে হবে। ছাড়া গড়ালবাড়ি বাজারে লোক পাঠাও টাকা দিয়ে। আপাতত চার বস্তা আটা কিনে নিয়ে গিয়ে ওরা একেবারে নিডি মানুষদের মধ্যে বিতরণ করতে থাকুক। একরামুলকে দাও এ দায়িত্ব। সে আজ বিকেলেই আটা নিয়ে গিয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করবে। ৭ জনের একটা দল নিয়ে যাবে ও একাজে।

— ঠিক আছে বলে পিন্টু সায় দেয়।

দুপুরে খাওয়ার পর একরামুলকে রওনা করিয়ে দেয়া হয় গড়ালবাড়ি বাজারে আটা যোগাড় করার জন্য। আমাদের রেশনের বরাদ্দ থেকে ভেতরগড়ের মানুষদের সাহায্য করার উপায় নেই। মাথাপিছু প্রত্যেকের রেশনের বরাদ্দ সীমিত। এর ওপর হাইড আউটে আশ্রয়গ্রহণকারী মজিব, দুলু, জব্বার এবং স্থানীয় আরো ৪/৫ জন

স্থায়ীভাবে থাকছে। প্রতিবেলা আমাদের রেশনের বরাদ্দ থেকে তাদেরকে খাওয়াতে হয়। আজ এসে জুটেছে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য জোনাব আলী। তাছাড়া প্রতিদিনই ৮/১০ জন অতিরিক্ত মানুষ আসে বিভিন্ন দিক থেকে। পাকবাহিনীর গভিভিধির অবস্থান এগুলোসহ শান্তিবাহিনী-দালাল-রাজাকারদের ঘরের বয়ে আনে তারা। এর সাথে থাকে তাদের নিজস্ব নানা সমস্যা। তারা এলে আহারের সময় তাদের অভূক্ত রাখা যায় না। সীমিত রেশনের সরবরাহের মধ্যে চলতে হয় কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজকে। সে মাঝে মাঝে গজগজ করে, বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত রেশন খরচ হচ্ছে বলে, কিন্তু কিছুই করার নেই। জনগণের মধ্যে থেকে জনগণের সাহায্যে যুদ্ধ করতে হলে সাহায্যকারী বিশ্বস্ত মানুষদের উপেস রেখে বিদায় দেয়া যায় না। জনযুদ্ধে এ বোৰা আমাদের টানতেই হবে।

জিনের আছুর

রাতের বেলা পেট্রল নিয়ে বের হই। দূর থেকে অমরখানা, জগদল আর পঞ্জগড়ের দিকে গুড়ম গুড়ম কামানের গর্জনের সাথে নিয়মিত যুদ্ধের শব্দ ভেসে আসে। আজ কোনো অপারেশন নেই। নিরুদ্ধে পেট্রল। রাস্তার দুপুর দিয়ে নিরাপদে ইঁটতে অসুবিধা নেই। এলাকাটা ধোয় শক্রমুক্ত হয়ে গেছে। মানুষজনের ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভাব ভালোভাবে পড়েছে। অন্যে-তাদের নিজেদের মানুষ বলেই তারা গ্রহণ করেছে। তাদের কোনো রকম স্বীকৃতি হতে পারে আমাদের তৎপরতার ভেতরে তারা এমন কোনো কিছু পায় নি। তাদের বিশ্বাস ও আস্থা আমরা অর্জন করতে পেরেছি। আমাদের উপস্থিতি তাদের মন অর্বাচীন আনন্দে ভরে ওঠে। তাদের ভালোবাসা আর বস্তুতের উত্তীর্ণ অনুভব করি। কোনো গ্রামবসতি লোকালয়ে গেলে, যতো রাতই হোক, তার আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর কিছু না হলেও তাদের দেয়া পান-খিড়ি অন্তত থেকে হয়। কেউ চাল ভেজে দেয়, কেউ এনে দেয় মুড়ি কিংবা চিড়া। গ্রামের বড়-বিরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে উকিলীক মেরে দেখে আমাদের। এটা একটা বিশ্বাস আর আস্থার ব্যাপার। আমাদের উপস্থিতি তাদের জীবনযাত্রাকে নিরাপদ আর নিশ্চিত করে তোলে। বেশ কয়েকটা গ্রাম বসতি এলাকা টহল দিয়ে নুরুন্দিনের গ্রামে আসি। নুরুন্দিন তার পরিবারের সদস্যদের ভারতীয় শরণার্থী শিবির থেকে ফিরিয়ে এনেছে। গ্রামের অনেকেই ফিরে এসেছে। একটা মৃতপ্রায় গ্রামে তাদের উপস্থিতিতে গ্রাম জুড়ে আবার প্রাণচাপ্পল্য ফিরে এসেছে। মুক্তিযোদ্ধারা হাইড আউট স্থাপন করে তাদের গ্রামে দু'দিন ছিলো, এ বার্তাটা দারুণভাবে কাজে লেগেছে। এছাড়া আমরা, মুক্তিযোদ্ধারা কাছেপিছেই আছে, আর ভয় নেই, এ বিশ্বে আস্থা রেখে পাকসেনাদের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া গ্রামের লোকজন ফিরে এসেছে। ফলে নুরুন্দিনের প্রভাবও বেড়ে গেছে।

নুরুন্দিনের গ্রামের প্রবেশমুখে একটা বাড়ির ভেতর থেকে হঠাৎ নাকিস্বরে এক মহিলার কান্না শোনা যায়। শোনা যায় সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষের কর্কশ কঠুসুর, ধমক। আরো দু' চারজন লোকের উঁচু গলায় উত্তেজিত কথাবার্তা বাড়ির ভেতর

থেকে ভেসে আসে। কী ব্যাপার। ডাকাতি হচ্ছে নাকি? থমকে দাঁড়াই। দলের সবাইকে দাঁড়াতে বলি। মহিলাটির কান্না থামে। অল্পক্ষণ পর আবার তার নাকিগলার কান্না শোনা যায়। কর্কশ গলার ধমকধামকও আবার শুনুন হয়, সেই সঙ্গে।

— ব্যাপারটা দেখা দরকার পিন্টু, একটা কিছু ঘটেছে।

পিন্টু সায় দেয় তাতে। আর সায় দেয়ার পরপরই আমরা সরাসরি বাড়ির আঙ্গিনায় চুকে পড়ি অনেকটা নিঃশব্দে। হাতিয়ারগুলো উদ্যত সবার হাতে। তিন দিকে ছনের তিনটা ঘর নিয়ে বাড়িটার অবস্থান। মাঝের আঙ্গিনায় সবাই গিয়ে দাঁড়াই। বাঁ-দিকের বড়ো ঘর থেকে ভেসে আসছে মহিলাটির নাকিসুরে কান্নার শব্দ। লোকগুলো সব ঘরের ভেতরে। একটা টিমটিমে হারিকেনেন জুলছে ঘরটার ভেতর। দরোজাটা খোলা। অন্য ঘরগুলোয় কোনো আলো নেই। কে যেনো এবার একটা প্রচণ্ড ধমক মারে মেয়েলোকটার উদ্দেশ্যে। আর সেই ধমকের মুখে একটা ভয়ার্ত আর্তস্বর বেরিয়ে আসে মহিলার কষ্ট থেকে। সহ্য হয় না ব্যাপারটা। আসলে হচ্ছেটা কি? ত্রুটে এবার দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। জানতে চাই কী হচ্ছে এখানে? আমাদের গলার স্বরে হঠাতে করে লোকগুলো সচকিত হয়ে ফিরে তাকায়। হারিকেনের অনুজ্ঞাল আলোতে উদ্যত অস্ত্র হাতে হঠাতে করে আবির্ভূত কালো পোশাকের আমাকে, আমার পাশের পিন্টুকে এবং আমাদের পেছনে অস্ত্র হাতে কমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে লোকগুলো যেনো চুপসে যায় মুহূর্তে। কেউ কষ্ট করে না। মহিলার থেমে থেমে হেচকি তুলে কান্না চলছে তখনো। একজন পুরুষ উঠে আসে তখন। হারিকেনের আবছা আলোয় প্রথমে তাকে চেনা যায়, যারের মেঝেতে জমাট হয়ে বসে থাকা লোকগুলোর মাঝাখানে সে বসেছিলেন প্রাণিয়ে আসতেই তাকে চিনে ফেলি, আমাদের নুরুন্দিন মিয়া। মুখে কাঁচমাচ জুব পরিনীত ভঙ্গি। হঠাতে আমাদের উপস্থিতিতে সেও অস্বস্তিতে পড়ে গেছে।

— কী হচ্ছে এখানে, নুরুন্দিন মিয়া, ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাই।

— না, না, কিছু না। আসেন বাইরে আসেন।

— না বলেন, কী হচ্ছে এখানে? আপনারা করছেনটা কি, আর মেয়েটাই-বা কাঁদছে কেনো?

— না, মানে, আমতা আমতা করতে থাকে নুরুন্দিন। বউটাকে জিনে ধরেছে, ওখা জিন তাড়াচ্ছে।

— জিন ধরেছে, আমি কখনও জিনে ধরা মানুষ দেখি নাই, বলে পিন্টু উৎসাহিত হয়ে উঠে।

— ঠিক আছে, তাড়ান আপনারা জিন আমরা দেখি।

নুরুন্দিন মিয়া বিপাকে পড়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে বেঝ-মাদুর ইত্যাদি যোগাড় করে আমাদের বসার আয়োজন করে।

— ঠিক আছে, আমরা বসি, দেখি কীভাবে আপনারা জিন তাড়ান।

— ঘরের ভেতর থেকে অন্যান্য লোকজন বেরিয়ে আসে। জিন তাড়ানো ওস্তাদ তাদের পেছনে।

— কই তাড়ান, বলে পিন্টু ধমকে উঠে !

— না, মানে, জিন না, আমরা ওতাদকে ডেকেছিলাম জানার জন্য, মেয়েটাকে জিনে ধরেছে কি না ।

— কথা ঘোরাবেন না, পিন্টু এবার রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়ায় । এতোক্ষণ আপনারা জিনের আছর করেছে বলে মেয়েটার ওপর অভ্যাচর করছিলেন । এখন বলছেন জিন না । জিন কী তাহলে আমাদের রাইফেলের ব্যারেল দেখে পালিয়ে গেলো ?

পিন্টুকে শাস্ত হয়ে বসতে বলে এবার ওতাদকে সামনে আসতে বলি । ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ওতাদ সামনে এসে দাঁড়ায় । হাঁটু সমান আলখাল্লা, মুখে কাঁচাপাকা লম্বা দাঢ়ি । মাথায় একটা পাগড়ির মতো কাপড় জড়ানো । ঠাঁদের ফিকে অঙ্ককারে লোকটাকে আস্ত একটা শয়তানের চেলার মতোই মনে হয় ।

— কি হজুর, জিন পেলেন ?

— জি না ! কাঁপা গলায় উত্তর দেয় লোকটা ।

— তাহলে মেয়েটার ওপর অভ্যাচর করছেন কেনো ?

— জিন তাড়ানো জানেন ? দেখেছেন কখনও জিন ?

লোকটা নিরুত্তর । মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ।

— এটা ঠিক না । মেয়েটার কোনো অসম্ভব করতে পারে । কোনো কারণে মেয়েটার জীবন বিষময় হয়ে উঠতে পারে । হাঁকে ডাকার দেখানো উচিত । চিকিৎসা করানো উচিত । ভগ্নামো দেখাতে এসেছেন, আমাদের দেখে জিন পালিয়ে গেলো । এতোক্ষণ ধরে মেয়েটাকে ঝাঁটাপেটে করছেন, মরিচ পোড়া নাকে দিছেন, এগুলো কি ? চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করি । ততোক্ষণে ঘরের ভেতরে মেয়েটার কান্না খেমে গেছে । পিন্টু হাঁটু দাঁড়ায় আবার । স্টেনগান্টা তাক করে এগিয়ে যায় আলখাল্লাধারী লোকটার দিকে । তারপর তার বুকে স্টেনগান্টা ঠিকিয়ে বলে, শালা বদমাশ, শয়তানের বাচ্চা । বুকে গুলি চালিয়ে তোর জিন তাড়ানো বের করে দেবো । লোকটা তখন হঠাতে করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে । পিন্টুর পা জড়িয়ে ধরে । আর বলতে থাকে, মোক ছাড়ে দ্যান গে বা । আর এগুলো কাজ করিবা নহ । ধরাম করে পিন্টু তার ভারি পায়ে লোকটার বুকে একটা লাখি মারে । সেই লাখির আঘাতে লোকটা উল্টে পড়ে যায় আর চিকিৎসা করে উঠে, বাগে মনু গে বা বলে ।

পিন্টু ফিরে আসে তার জায়গায় । আলখেল্লাধারী পড়ে থাকে মাটিতে । নুরুদ্দিনের কাছে এবার জানতে চাই, আসলে কী হয়েছে ? নুরুদ্দিন নিজেও তয় পেয়েছে, ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলে, মেয়েটা তার স্বামীর সাথে থাকতে চায় না । বাপের বাড়ি যেতে চায় । শুধু কাঁদে । এরা বলছে, তাকে জিন ধরেছে । আর এ জন্যই ওতাদ ডেকে এনেছে । আমাকেও ডেকেছে তারা । নুরুদ্দিনের কথা শেষ হলে মেয়েটার স্বামীকে ডাক দিই । একটা শুকনো হ্যাংলা-পাতলা লোক এগিয়ে আসে । মুখে ছাগল দাঢ়ি । অনেকটা জোনাব আলীর মতোই দেখতে ।

— কতোদিন হলো বিয়ে হয়েছে ? জানতে চাই আমি ।

- জে, ছয় মাস।
- প্রথম পক্ষ, না দ্বিতীয়? আগের বউ আছে?
- জে আছে।
- নতুন বউয়ের বয়স কতো?
- ১৪/১৫ হবে।

ব্যাপারটা বোঝা যায়। এক বউ থাকতে মধ্য বয়সে আর একটা কচি মেয়েকে বিশে করে এনেছে লোকটা। মেয়েটা সম্ভবত এটা গ্রহণ করতে পারে নি। তাকে বশে আনার জন্য এই জিনের গল্লের অবতারণা। জিন তাড়ানোর নামে তার ওপর চালানো হচ্ছে অত্যাচার। গ্রামবাংলার পচন ধরা সমাজ ব্যবস্থার শিকার হয়েছে এই কিশোরী মেয়েটি। এধরনের ঘটনা অহরহ চলে আসছে অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বেড়াজালে আবক্ষ আমাদের গ্রামীণ সমাজে। জিন-ভূতের আছুর লাগার গল্ল তুলে কতোভাবে যে নির্যাতন করা হচ্ছে গ্রামের অবলা, সহজ-সরল মা-বোনদের ওপর তার ইয়ত্তা নেই।

— আর কখনো বউয়ের ওপর অত্যাচার করবেন? ধমকে উঠি ছাগলদাঢ়িমুখো মানুষটাকে। ভয়ে কেঁপে ওঠে লোকটা। তারপর হাত জোর করে মাপ চায়, এবারের মতো মাপ করে দ্যান, আর হবে নাই এই কাজ।

- ঠিক তো?

— জি ঠিক। আল্লাহর কসম, খোদার কসম মনে পা জড়িয়ে ধরতে চায়। আমি পা সরিয়ে নিই। মোতালেব তার চুলের বাকি শুরে টেনে তোলে, শালা বাহি . . . মনে থাকিবে তো?

- জি থাকিবে, থাকিবে বলে যান্তিকে কেন্দে ওঠে সে।

আমরা উঠে দাঢ়াই। জিন উপরও দেখা হয় নি। জিনের গল্ল বহু শুনেছি। মানুষের ওপর, বিশেষ করে যে মানুষের ওপর আম দেশে হরহামেশাই ভর করে জিন। এখানে প্রটোলে এটে সেই জিনের সক্ষান পেয়ে দেখার সুযোগ হলো না। মুরুদ্দীনের কাছ থেকে এসব লোকার খবরাখবর নিয়ে আবার পথে নামি। পিন্টুর রাগ তখনও পড়েনি। গড়গড় করতে করতে বলে সে, সব ভগো, শালা কচি মেয়ে বিয়া করে সামলাবার পারে না, এখন কয় বলে জিন ধরেছে, শালা বদমাইশ, বুবালেন। পিন্টুর রাগ থামাবার জন্য বলি, দাও ম্যাচ দাও, বিড়ি ধরাই। পিন্টু তার চিরাচরিত ভঙিতে পকেট হাতড়ে ম্যাচ বের করে। নিজে ধরাই। পিন্টুকে দিই। মতি বিড়ির ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে আমরা এগিয়ে চলি। ফিরতি পথ ধরে।

১৬.৮.৭১

শুধু যুদ্ধ নয়, পাশাপাশি অন্য কাজ

যুগিপাড়ায় হাইড আউট স্থাপন করা হয়। মূল হাইড আউট থেকে যায় নালাগঞ্জে। কেবল অপারেশনের জন্য নির্বাচিত ২৫ জনের দল নিয়ে এ অঙ্গুয়া হাইড আউট। মুসা তার প্লাটুন নিয়ে দলে যোগ দেয়ার পর চৌধুরীর নেতৃত্বে একটা ১০ জনের ছোট দল মধুপাড়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। চৌধুরী বসির মেঘারের বাড়ির সেই পুরনো

জায়গায় তার অস্থায়ী হাইড আউট স্থাপন করেছে এবং মধুপাড়া এলাকাসহ হাড়ভাসা-বেরুবাড়িগামী রাস্তার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখছে। যুগিপাড়ায় অস্থায়ী হাইড আউট করার উদ্দেশ্যটাও তেমনি। অশান্ত হয়ে ওঠা ভেতরগড় এলাকাটার ওপর আবারো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

যুগিপাড়া গ্রামের মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা শূন্য একটা বাড়িতে হাইড আউট নেয়া হয়। মজিব ও দুলু সাথে থাকে। মতিন-মক্তু মিয়া আর জয়নালরাও খবর পেয়ে ছুটে আসে। সন্ধ্যার পর মোটামুটি একটা আড়ডার আসর জমে ওঠে। ক'জন খয়ের খাঁ ধরনের মানুষ এসে তাদের চাটুকারিতা আর তোষামোদি কথা বলে আমাদের প্রায় ফেরেশতার কাছাকাছি নিয়ে যায়। এ লোকগুলোর উপস্থিতিতে আলাপচারিতায় ব্যাপার ঘটে। তাছাড়া এ-ধরনের মানুষ হচ্ছে বিষধর সাপের মতোই। কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না এদের মন ভেলানো কথায়। যুক্তের মাঠে চাটুকারী দলের কথায় মেতে উঠলে তাকে আর যুদ্ধ করতে হবে না। শক্র অনুচর হয়ে এরা প্রথমে চাটুকার-খেদমতগার ও বিশ্বাসী মানুষ হয়ে দলের ভেতরে অবস্থান নেবে এবং একদিন সুযোগ বুঝে গাইড করে নিয়ে সোজাসুজি শিয়ে তুলে দেবে খানসেনাদের ডেরায়। নতুবা শক্রপক্ষকে ডেকে এনে চুকিয়ে নেবে আমাদের অবস্থানে। টোকাপাড়ার ম্যাসাকার আমাদের জন্য একটা বড় খেদনের শিক্ষা হয়ে রয়েছে। চাটুকার, চামচা আর তেলমারার দল থাকে রাজা খন্দশাদের দরবারে। বর্তমানে তারা ভর করেছে রাজনীতিবিদ, চেয়ারম্যান ও মেরিটের কাঁধে। তারা এ-ধরনের শ্বাবকের দল পৃষ্ঠতে ভালোবাসেন। তাদের নিচে ছাপতে ভালোবাসেন। মুসাকে ডেকে নিয়ে তাদের কথাগুলো শুনতে বলি এবং যন্ত্রসজ্জব দ্রুত তাদের বিদায় করতে বলি। কে জানে, মুসার কাছ থেকে বিদ্যমান এরা সোজা রাস্তা ধরবে কিনা, যাবে কিনা পঞ্চগড় পাকবাহিনীর শিবিরের স্ফটকে।

আগেই অপারেশন পঞ্জিকলনা ঠিক করা ছিল। রাত ৮টার দিকে গুড়ের চা পরিবেশনের ভেতর দিয়ে আসর শেষ হয়। ন'টার দিকে বের হয় নির্ধারিত অপারেশনের জন্য দুটো দল। মুসা নিয়ে যাবে একটা দল। সে যাবে কামারপাড়া ফইমুদ্দিন মুসির বাড়িতে। ফইমুদ্দিন মুসি বর্তমানে শান্তিবাহিনীর লিডার হিসেবে পাকবাহিনীকে সরাসরি মদন যুগিয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত যাচ্ছে পঞ্চগড়। সেখানে শান্তি কমিটির নেতাদের সাথে বৈঠক করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের খবরাখবর পৌছে দিচ্ছে। জয়বাংলার পক্ষের লোকদের তালিকা তুলে দিয়ে তাদের খতম করার পরিকল্পনা করছে। স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। নিয়মিত পাকসেনাদের ধাঁটিতে হাজিরা দিয়ে এলাকার হালহাকিত সম্পর্কে রিপোর্ট করছে। তাদের ধাঁটি স্থাপনের সুযোগ অর্থাৎ লোকজন নিয়ে শিয়ে বাকার, ট্রেঞ্চ এসব তৈরি করে দিচ্ছে। স্থানীয় ছেলেদের রাজাকার বাহিনীতে যোগদানের জন্য প্রলুক্ত করছে। পাকবাহিনীর খাই মেটানোর জন্য গ্রাম থেকে হাঁস-মুরগি, ছাগল, ডিম ইত্যাদি বিনে পয়সায় সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে ভয় দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে পাক ধাঁটিতে পৌছে দিয়ে তাদের প্রতি গভীর আনুগত্যের প্রমাণ দিচ্ছে। শুধু তাই নয়,

পানিমাছ ঘাঁটি আক্রমণের পর থেকে সে পাকসেনাদের গাইড করে এনে তার কামারপাড়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী এবং স্বাধীনতার পক্ষের লোকদের ধরিয়ে দেয়ার আগ্রাগ চেষ্টা নিয়েছে। তার এই তৎপরতার ফলে রাজ্ঞাক মাষ্টারসহ কামারপাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ভারতে পালিয়ে গিয়ে বেরুবাড়িতে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। চিহ্নিত বাড়িগুলো সে পাকসেনাদের সাহায্যে পুড়িয়ে দিয়েছে। আগভয়ে ভীত সীমান্তের ওপারে যারা পালিয়ে গেছে তাদের বাড়িগুল, সহায় সম্প্র ফেলে সেগুলো সে নিজে এবং তার লোকজনকে দিয়ে লুটপাট করিয়েছে। কামারপাড়া, বদলুপাড়া, ঠাকুরপাড়া ও বিশমনি এলাকায় সে বর্তমানে শান্তিবাহিনীর নেতা সেজে সাধারণ মানুষদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। মুসিং এখন এসব অঞ্চলের একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তি হয়ে উঠেছে। মুসিংকে ঠাণ্ডা করা দরকার। এজন্য আজকের রাতের টাগেটি হচ্ছে ফইমুন্দিন মুসিং।

মুসাকে অপারেশন পরিকল্পনা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিই। ফইমুন্দিন মুসিংর বাড়ি ঘেরাও করে তাকে ধরতে হবে। ধরতে পারা গেলে তাকে বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। তার বাড়িটা রেমার চার্জ দিয়ে উড়িয়ে দিতে হবে। তার লুট করা মালামাল থেকে যতো পরিমাণ সংজ্ঞ ধান-চাল ও গমসহ অন্যান্য খাদ্যবস্তু যা পাওয়া যায়, নিয়ে আসতে হবে। ভেতরগড়ের নিরন্তর মানুষদের বাঁচাতে মুসিংর বাড়ি থেকে আনা ওইসব সামগ্রী দিয়ে। এজন্য আমাদের দরকার প্রচুর খাদ্যসামগ্রী। তাই শান্তি বাহিনীর দালাল ফইমুন্দিন মুসিংর সঞ্চিত প্রক্ষেপ ভাণ্ডার লুট করতে হবে। মুসা পরিকল্পনা বুঝে নেয়। ওর সাথে থাকে আলালেবসহ বাছাই করা ১৫ জন অভিজ্ঞ এবং সাহসী যোদ্ধা। ওদের রওনা কর্তৃত দিয়ে মতিন, জয়নাল আর মকতুকে নিয়ে রওনা দিই ভেতরগড়ের দিকে।

কিংবদন্তীর রাজকল্প

অনেকদিন পর এ এলাকায় আসা হলো। প্রতিটা বন্তি আর গ্রামের লোকজন জেগে রয়েছে সেই প্রথম দিককার দিনগুলোর মতো। 'বন্তি জাগে' 'বন্তি জাগে' এই সশব্দ ধর্মি উচ্চারণ করে আজও তারা সতর্ক আর সজাগ করে দিচ্ছে সবাইকে। চলার পথের দু' ধারের বন্তির পরিচিত মানুষজন আমাদের উপস্থিতিতে তাদের আনন্দ আর উচ্ছ্বলতা প্রকাশ করে নিজেদের কায়দায়। অভ্যর্থনা জানিয়ে আপ্যায়ন করে মুড়ি, চাল ভাজা, গুড়ের চা, বিড়ি আর পান দিয়ে। সাধ্যমতো চেষ্টা করে অতিথি আপ্যায়নের। আর সেই সাথে নিজেদের সুখ-দুঃখ আর নানা সমস্যার কথা বলে চলে মন খোলসা করে। তারা জানায়, পাকসেনার দল অমরখানা ঘাঁটি থেকে আবারো এ অঞ্চলে আসা শুরু করেছে। তাদের মতিগতি ভালো নয়, কথন কি করে বসে তার ঠিকঠিকানা নেই। এছাড়া ডাকাতির ঘটনা আর খাদ্যাভাব তাদের অস্ত্র করে তুলেছে। বৃক্ষ হাজী সাহেব অত্যন্ত খুশি হন আমাদের পেয়ে। স্থানীয় নেতা হিসেবে তিনি সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানান। উঠেতেই দেবেন না চা-নাস্তা না খাইয়ে। একসময় তার এলাকা পার হয়ে মহারাজ হাটে আসি। এখানে পৌছুতেই অমরখানার

সেই নিয়মিত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। চলে একটানা মেশিনগানের গুলি। শোনা যায় কামানের একটানা গর্জন। যুদ্ধটা বড় স্পষ্টভাবে অনুভব করি তখন। মনে হয় যুব কাছাকাছি, রণাঙ্গনের খুবই কাছাকাছি এসে গেছি। মহারাজ দিঘিরপাড়ে, বটগাছটার নিচে একরামুলকে তার দলবলসহ পাওয়া যায়। গড়ালবাড়ি বাজার থেকে চার বন্ডা আটা এনে সে সঙ্গে থেকে গরিব মানুষদের ভেতরে বিতরণের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তখনও সে কাজ চলছে। দুষ্ট মানুষেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একরামুল প্রত্যেকের ঘোলায়, কাপড়ে কিংবা মেলে ধরা গামছায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা জেনে নিয়ে দুই মগ-তিন মগ করে আটা দিয়ে যাচ্ছে। কারো কোনো উচ্চবাচ্য নেই, নেই হৈ-হল্লা। অসম্ভব ছিমছাম আর শৃঙ্খলার সঙ্গে চলছে বিতরণের কাজ। একরামুলের যা টক, তা দিয়ে সে বিতরণের কাজ বেশিক্ষণ চালাতে পারবে না ঠিকই, তবে মুসা আর মোতালেবরা যদি ফাইমুদ্দিন মুসির বাড়ি কিংবা গোলা খালি করে আনতে পারে, তাহলে হয়তো আরো অনেককেই সাহায্য দেয়া হবে।

আজ আকাশে বৃষ্টি নেই। ফ্যাকাশে ঢাঁদের আলোয় আশপাশের সবকিছু দৃশ্যমান। পিন্টুসহ মহারাজ দিঘির পাশে পানির কাছ যেঁসা ঘাসের ওপর বসি। মতিন আর মকতু অনুগত ভক্তের মতো আমাদের আশপাশেই থাকে। ভেতরগড়ের মহারাজার তৈরি এটা একটা বিরাট দিঘি। চারদিকে কুঁচকড়ের মতো পাড়। পুরুরে অঁথে পানি। এর নাকি গভীরতা এতো বেশি যে তলদেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। অবশ্য মকতুর মতামত এটা। জয়নাল বলে, কিংবিদন্তি আছে, পূর্ণিমার গভীর রাতে নাকি অসম্ভব চোখ-ঝলসানো ঝুলপবতী প্রকৃত পানির তল থেকে উঠে আসে। তার ঝলপের চমকে ঝলসে যায় চোখ। অন্ত হাতে থাকে সোনার থালা। সেই সোনার থালায় থাকে নানা উপচার। একটু ছোট নৌকোয় চড়ে সেই ঝুলপবতী নারী নাকি সমস্ত পুরুর ঘুরে বেড়ায় সম্মুখীন। রাত ফুরোবার আগেই আবার চলে যায় সে পানির তলদেশে। বেশ মজার গল্প। এই পরিবেশে শুনতে ভালোই লাগে, বিশেষ করে আমাদের জীবনে যখন রোমান্টিকতার বিনুমাত্র লেশ নেই। জয়নাল, মতিন আর মকতুকে জিগ্যেস করি, দেখেছো কেউ তোমরা কথনো?

— না, সে সৌভাগ্য কি আমাগো আছে? দাঁত বের করে হাসে মকতু। জয়নাল বলে, সেই ঝুলপবতীর দেখা না পেলেও পুরুরের ওপারে পানির বেশ গভীরে একটা কাঠ খোদাই মূর্তির মতো আছে। সেটাকে পুজো দেয়ার জন্য হিন্দুরা বছরের একটা দিন সমবেত হয়। সীমান্তের ওপার থেকেও হিন্দুরা আসে পুজো দিতে। তারা পুরুরের জলে স্নান করে। মনের বাসনা পূরণ করবার জন্য তারা পানির গভীরে নিমজ্জিত সেই কাঠ খোদাই জগত দেবতার উদ্দেশে মানতও করে। কাকুতি-মিনতি করে দেবতার দয়া ভিক্ষা চায়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের মহারাজ দিঘির এই তীর্থে আসতে বি.এস.এফ বা ইপিআররা বাধা দেয় না। এটা এপার-ওপার মিলিয়ে দু'পারেরই একটা অলিখিত চুক্তির মতো ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। পাকিস্তান-ভারত সীমান্তরক্ষিদের কাছে। দুটো দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে প্রচণ্ড বৈরিতা থাকলেও সীমান্ত এলাকার অনেক জায়গাতেই তার কোনো প্রভাবই পড়ে নি। স্থানীয়

ব্যবস্থাপনায় এপার-ওপারের মানুষদের মধ্যে কিছু অলিখিত চুক্তি রয়েছে। এর আওতায় ওপারের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষেরা ভেতরগড়ের এই মহারাজ দিঘির তলদেশে রক্ষিত কাঠ খোদাই দেবতার উদ্দেশে তাদের অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য ছুটে আসে। স্থানীয় মানুষজন তাদের স্বাগত জানায়, আতিথেয়তা প্রদর্শন করে। এ ব্যাপারে দু'পারের সীমান্ত প্রহরীরা বাধা দেয় না বললেই চলে।

একসময় পঞ্চগড়ের এই ভেতরগড় এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিলো, তখন কিছু কিছু হিংস্র পশুর সাথে বুনো শুয়োরের পাল তাদের হামলা করতো ফসলের ক্ষেত্রখামারে। তচনছ করে ফেলতো বন কেটে বসত করা মানুষদের অপরিসীম কষ্টে বোনা সোনালি ফসল। দেশভাগের আগে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকজন সেইসব বুনো শুয়োরের শিকারে মেতে থাকতো। ফলে, এতে করে একদিকে যেমন বুনো শুয়োর এবং অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে বসতকারী মানুষজনের জীবন রক্ষা পেতো, তেমনি তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতো ফসলের মাঠগুলোও। ১৯৪৭ সালের পর এপার-ওপারের মানুষজনের মধ্যে সীমান্তের বিভাজন রেখা কঠিন দেয়াল খাড়া করে দেয়। এপার-ওপারের মধ্যে যাতায়াতের ব্যাপারটি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বুনো শুয়োরের পাল থেমে থাকে না। তারা তাদের বৃক্ষ বৃক্ষ করার পাশাপাশি মানুষজনের প্রাণ সংহার এবং ফসলহানির কাজ করিজ্জীরে চালিয়ে মেতে থাকে। স্থানীয় মানুষজন প্রশাসনের কাছে তখন এর প্রত্যক্ষকার চেয়ে আবেদন জানান। তখনকার দিনের প্রশাসনের পক্ষে বন্য প্রাণী আক্রমণের হাত থেকে এ এলাকার মানুষজনকে রক্ষা করার মতো কোনোরুচি অন্তর্ভুক্ত বা ব্যবস্থা ছিলো না। তখন নাকি দিনাজপুর জেলার ডিপ্রিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি ডিপ্রিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের উচ্চত্বের মাঝেক্ষে ডিপ্রিস্ট্রিক্টে বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় সীমান্তের ওপার থেকে বুনো শুয়োরের শিকারের জন্য সাঁওতাল সম্প্রদায়কে এ অঞ্চলে অবাধে আসতে দিতে উচ্চেই সম্মত হন।

সেটা দেশ ভাগের পরের কথা। বর্তমানে এ অঞ্চলে জনবসতি বেশ ঘন। ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা অঞ্চলের ভাগ্যাবেষী মানুষের দল জঙ্গলাকীর্ণ আর মনুষ্য বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এ এলাকায় আসছেন দলের পর দলে স্থানীয় অধিবাসীদের নামারকম বাধা-বিপত্তি সন্তোষ। পরিশ্রমী সেইসব মানুষ বন-জঙ্গল সাফ-সুতরো করে তাদের বসতি গড়ে তুলেছে। সন্তায় কিনে কিংবা জবরদস্থল করে নিয়ে অনুর্বর জঙ্গলাকীর্ণ মাঠঘাট পয়ঃপ্রবিক্ষার করে ফসলের আবাদযোগ্য করে গড়ে তুলেছে। এখন আর এখানে তেমন কোনো গহিন জঙ্গল বা বনভূমি নেই। নেই মানুষের রক্তকুল হিংস্র প্রাণিকুলের অন্তিত্ব কিংবা বন্য শুয়োরের পালের ফসল ক্ষেতে সংঘবন্ধ আক্রমণ। দু'চারটে বুনো শুয়োর জঙ্গল-বোপাড়ের ভেতরে দেখা গেলেও তারা আর আগের মতো বর্তমান দিনের মানুষজনের মধ্যে কোনোরকম ভৌতিক উদ্রেক করে না। কিন্তু বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এখনও সাঁওতালের দল চলে আসে এপারে। তাই দুই ডি.এম.-এর সেই চুক্তিটি পরিণত হয়েছে এখন একটা কাটমে। বনবাদাড় উজাড় হয়ে যাওয়ায় এখন আর তেমন শিকার মেলে না কিন্তু শিকারির দল

ওপার থেকে ঠিকই আসে বছরের সেই নির্দিষ্ট সময়টাতে। অবশ্য তাদের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। তবু যা রীতিতে দাঢ়িয়ে গেছে, সেই রীতি বা নিয়ম রক্ষার জন্যই যেনো তারা এসে থাকে। এখনও এ অঞ্চলে অবশিষ্ট বনবাদাড় চষে বেড়াবার সময় তারা দুচারটা শুয়োর পেয়ে থাকে। সেই সাথে খরগোস বা এই জাতীয় ছেটখাটো প্রাণী কিংবা পাখি ইত্যাদি শিকার করে তারা ফিরে যায় ওপারে। পরে আবার আসবে বলে স্থানীয় মানুষজনের কাছে এ কথা দিয়ে। স্থানীয় অধিবাসীদের আতিথেয়তার প্রশংসা করে তারা প্রাণভরে। যাওয়ার সময় দাওয়াত দিয়ে যায় ওপারে। তাদের বসতিতে আতিথ্য প্রহণের জন্য। এপারে যাদের সঙ্গে বস্তুত্ব বা মিতালি গড়ে উঠে, তারা সীমান্ত পেরিয়ে সেই আমন্ত্রণ অনুযায়ী আতিথ্য প্রহণ করে, মৌসুমি শিকারে আসা মানুষগুলোর বসতি ঘুরে আসে। ফলে চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে ১ বৈশাখ থেকে শুরু করে প্রথম চারদিন সীমান্তের দরোজা এপার-ওপারের মানুষজনের জন্য একেবারেই খোলা থাকে। পাসপোর্ট ছাড়া, ভিসা ছাড়া এপার থেকে দলে দলে মানুষ যায় ওপারে, ওপার থেকে মানুষ আসে এপারে একইভাবে। দেখা হয় আঞ্চলিক বন্দু-বাক্সবেদের সাথে। ওপারের মানুষ টোকেন হিসেবে কিনে নিয়ে যায় পাকিস্তানি জিনিসপত্র, বিশেষ সৌখিন দ্রব্যাদি। ওপার থেকেও তেমনি এ দেশী মানুষ অবাধে বাজার করে নিষ্কাশাসে।

জয়নাল, মকতু আর মতিনের মুখ থেকে শেখে সীমান্ত এলাকার এপার-ওপারের মানুষের সহজাত সম্পর্কের গল্পগুলো অত্যন্ত আকৃতিক কারণে সৃষ্টি দেশ ভাগের রেখা এপার-ওপারের একটি অল্প অল্প ভারভুক্ত মানুষজনের ভেতরে একটা তৌগোলিক সীমারেখা টেনে দিয়ে আসের আলাদা করে দিলেও, সীমান্ত এলাকার উভয় পাশের মানুষজন কী চমৎকার সমরোহ আর নিজেদের মধ্যে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আর লেনদেন এখনে স্থাপন রেখেছে। যেনে চলছে সেই প্রাচীন আচারগুলো। এসব শুনতে বেশ ভালো লাগে। অনুকরণীয়ও বটে। সীমান্তের এপারের মানুষ পরস্পরের শক্তি, ছেটবেলা থেকেই এ কথা শুনে আসছি বিশ্বাসও করে আসছি। কিন্তু এখানকার ঘটনার কথা। যদি রাজনীতি ক্ষেত্রেও এইসব দৃষ্টিতে প্রাপ্তি হয়ে চলা যেতো, তাহলে হয়তো অনেক কিছুই সমাধান করা যেতে পারতো। আজ এই মুহূর্তে বাড়িঘর, আঞ্চলিক ছেড়ে অস্ত হাতে নিয়ে আঁকে মহারাজ দিঘির পাড়ে ভিজে ঘাসের ওপর নিশ্চুতি রাতে বসে আছি, হয়তো তার দরকার হতো না। পিন্টু তার নিজের বাড়িতে শুয়ে নিবিড় শুমে লেপটে থাকতো আর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে আমার কুম মেটের সাথে গভীর শুমের ঘোরে চমৎকার সব স্বপ্নের রাজ্য ঘোরাফেরা করতে পারতাম।

ফস করে পিন্টুর ম্যাচের কাঠি জলে উঠে, দে মতিন, বিড়ি বাইর কর। মতিন তার কোমরের ঝুঁট থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে। একটা আমার দিকে এগিয়ে

দিয়ে ধরিয়ে দিতে দিতে বলে, মেন মাহবুব ভাই ভূতি জ্বালান, শালা বিড়ি তো নয়, যেনো পলের (খড়) ভূতি। মতি বিড়ির সাইজটা আসলেও বেচপ। মোটা চোঙার মতো আকার। কড়া রিফাইন ছাড়া তামাক। তেতো বিশ্বাদযুক্ত। পিন্টু তার ভাষায় ভূতিতে টান দিয়েই ধমকে ওঠে মতিনকে, শালা ত্রিপুরার বাঢ়া, ভালো বিড়ি রাখতে পারিস না?

ধমক খেয়ে মতিন কাইকুই করে। মতিনের ভগ্নিপতি মকতু মিয়া হে হে করে হাসে। অক্কারেও তার কালো মুখের উজ্জ্বল দুখেল সাদা দাঁতের সারি ঝকমকিয়ে ওঠে। একরামুল পেছনে এসে দাঁড়ায়। নিরাসক গলায় জানায়, তার কাজ শেষ। এখন যাওয়া যেতে পারে।

মকবুল মেঘারের দৌড় ও মধুর খেমটা নাচ

শেষ রাতে যুগিপাড়া হাইড আউটে ফিরে এসে দেখা যায়, মুসা ফিরে এসেছে। তড়বড়িয়ে রিপোর্ট দিতে থাকে সে, বস্তা হিসেব, ক' বস্তা চাল, ক' বস্তা ধান আৱ ক' বস্তা ডালসহ অন্য আৱ কী কী এনেছে, তারা।

— রাখো তোমার বস্তা হিসেব। বলো, আপারেশনেৰ খবৰ কি?

ধমক খেয়ে কিছুটা চুপসে যায় মুসা। তারপৰ বলে, মুসিৰ বাড়ি রেমার চার্জ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

— আৱ মুসি?

— ধৰা যায় নি। পালিয়ে গেছে।

— আসল কাজটাই কৰতে পাৱে নন। এখন তুমি বস্তা হিসেব দিছো। ধৰার চেষ্টা কৰেছিলো? সামনে দাঁড়ান্মে উভুড়ে অক্কারে অধন্তন কমাডারের কাছে হিসেব চাই কাজেৰ, কেনো মূল কাজ কৰে কৰতে পাৱলো না?

মোতালেৰ এগিয়ে আয়ে পেছন থেকে। সে-ই এৰাৰ বলতে থাকে। ধৰিবাৰ চেষ্টা কৰিছো। বাড়ি ঘৰাও দেবাৰ কালে শালা মুসি যে কুষ্টে দি ভাগিল টেৱ পানো নি। তবে ফিরিবাৰ সময় মকবুল মেঘারোক ধৰে ফেলেছিলো। শালার হাতোত বন্দুক ছিলো। খালি গায়ে লুঙ্গি পৱে ছিলো। শালাকে ধৰতেই হারামজাদা পিছলে গৈল, লুঙ্গি ধৰিনুতো লুঙ্গি খুলে ল্যাংটা হয়ে দৌড়ে পালাল। মোতালেৰে নিৱাবৱণ আঞ্চলিক উচ্চারণেৰ বৰ্ণনা হাসিৰ উদ্বেক কৰে।

— কি বললি, কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়েই দৌড় মারলো? হাসতে হাসতে মোতালেৰকে জিগ্যেস কৰি।

— জে হয় গে, বলে মোতালেৰও হাসিতে যোগ দেয়। আমাদেৰ সঙ্গে হাইড আউটেৰ অন্য সবাই হেসে ওঠে। এৱকম অবস্থায় মুসাও সহজ হয়ে আসে। পিন্টু তখন তার নিজস্ব স্টাইলে মজিব আৱ দুলুদেৱ শুনিয়ে শুনিয়ে জোৱে জোৱে বলতে থাকে, শুনছেন মজিব মিয়া, দুলু ভাই, আপনি শুনছেন, আপনাদেৱ মকবুল মেঘার দিগন্বন্ত অবস্থায় এখন পাগলেৰ মতো দৌড়ে চলছেন পঞ্চগড়েৰ তাৱ বাপজানদেৱ কাছে। অবস্থাটা চিন্তা কৰেন, একটা লম্বা মোটাসোটা লোক দৌড়াছে পাগলেৰ মতো

দিগন্থের অবস্থায়। পিন্টুর বর্ণনায় প্রচণ্ড রসের অবতারণা হয়। ও আরো নিচের দিকে নামতে পারে বলে ওকে প্রায় জোর করেই থামিয়ে দিই। তবুও পিন্টু বলে, তাহলে এই ঘটনার উপর একটা গান বাঞ্ছি।

— ঠিক আছে বাঙ্কো।

পিন্টু শুরু করে, শোনেন শোনেন ভাইয়ের দল, শোনেন দিয়া মন, মকবুল মেঘারের দিগন্থের ঘটনা করিব বর্ণন . . .। সবাই হাত তালি দিয়ে ওঠে। এককালে যাত্রায় সৰীর পার্টের অভিমেতা মধু তখন তার যাত্রার ঢঙে নাচ শুরু করে দেয়। হৈচৈ করতে করতে ছেলেরা বসে যায়, পিন্টু আর মধুসূন্দরকে ঘিরে ধরে। চলতে থাকে পিন্টুর জারিগান। মধুর খেমটা নাচ, ছেলেদের হাততালি দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ সমষ্ট হাইড আউটকে উৎসবমূখ্য করে তোলে।

অনুষ্ঠান শেষ হয়। ছেলেরা উৎসবের মাতামাতিতে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তবু তাদের সজীবতা যায় না। একসময় ভোরের আলোর আভাস ক্রমে স্পষ্ট হতে থাকে। একরামুলকে মুসা-মোতালেবের তুলে আনা সব মালামাল বুঝিয়ে দিই। একরামুল দিনের বেলায় সেগুলো মতিন-মকতুকে নিয়ে বটন শেষে ফিরে যাবে নালাগঞ্জে। ভোরের আকাশে আলো ফোটে। হিমালয়ের মৃদুমন্দ ঠাণ্ডা বাতাস শরীর জুড়িয়ে দেয়। মনের মধ্যে একটা অনাবিল প্রশান্তির প্রলেপ, শুধু বৃক্ষসম্পর্ক, গোলাবাকুদ নয়, শুধু হত্যা, মৃত্যু আর রক্ত বরাবে নয়, পাশাপাশি অভয়া ভেতরগড়ের ক্ষুধার্ত নিরন্ম মানুষের জন্য খাবার দিতে পেরেছি, পরিমাণ ছাইয়াই হোক।

এক গুলিতে এক শক্তি-অবাস্তু ঘূর্ণত্ব

প্রতিটি অপারেশন শেষে গোলাগুলির হিসেব মেলাতে হয়। যুক্তে এটা একটা বাধ্যতামূলক কাজ। অপারেশনের যাওয়ার আগে ঠিক করে নেয়া হয়, দলের কার কাছে কী ধরনের অস্ত্র থাকবে। তাকে অস্ত্র দেয়ার পর একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের রাউন্ড বা বুলেট দেয়া হয়। অপারেশনের পুরুত্বের ওপর এই গোলাগুলির অঙ্ক বাড়ে-কমে। যুক্তে লিখ হয়ে পড়লে তার বরাদ করা গুলি খরচ করার ব্যাপারে কোনোরকম বাধা-নিষেধ থাকে না। যুক্তের প্রচণ্ডতা বুঝে সে তার টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনভাবে তার হাতিয়ারের গুলি চালিয়ে যাবে। আবার সীমিত আকারের যুদ্ধ হলে কিংবা যুক্তে তৎপর থাকা অবস্থায় ট্র্যাটেজি অনুযায়ী যুদ্ধ বক্স করতে হলে যুদ্ধৰত যোদ্ধাদের সিগন্যালের মাধ্যমে সেটা জানিয়ে দেয়া হয়। তখন তারা গুলিবর্ষণে ক্ষতি দেয়। যুক্তের সময় এই যে হাতিয়ারগুলো থেকে গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়, সেটাকে যুক্তের ভাষায় ‘খরচ’ বলে। তাই গোলাগুলির হিসেব মেলাতে গিয়ে যুক্ত ফেরত ছেলেদের জিগ্যেস করতে হয়, তোর কতো রাউন্ড খরচ হয়েছে, সে হিসেব দে। অপারেশন থেকে ফিরে এসে গোলাগুলির হিসেব আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়, কতো খরচ হলো, কতো থাকলো। হাতে মজুদ গোলাগুলির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে পরবর্তী যুক্তের পরিকল্পনা। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে হাইড আউট থেকে পরিচালিত অপারেশনগুলোয় গোলাগুলির সুষ্ঠু হিসেব রাখা এতোই জরুরি যে, মজুদ

ফুরিয়ে গেলে শত চেষ্টা করেও তাংকশিকভাবে চাউলহাটি ইউনিট বেসের হেড কোয়ার্টারের কাছ থেকে সরবরাহ পাওয়া যাবে না। ইউনিট বেসে খবর পাঠিয়ে গোলাবাবুদ আনতে গেলে অন্তত ২ দিন সময় লেগে যাবে। যুক্ত ফেরত, শ্রান্ত বিধ্বন্ত শরীর যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চায়, তখন করতে হয় এই ক্লান্তিকর কাজটি, কার কতো খরচ হলো, কতো রাইলো এবং আগেকার মজুদ কতো রয়েছে। হাইড আউটের অবস্থান থেকে ইউনিট বেসের সাথে পুরোপুরি বিভিন্ন থাকা অবস্থায় অত্যন্ত মিতব্যযী হতে হয় আমাদের গোলাগুলি খরচ নিয়ে এবং এর হিসেব রাখতে হয়, মেজরকে রিপোর্টিংয়ের দিন মজুদের ষ্টক সম্পর্কেও জানাতে হয়। সে অনুযায়ী ইউনিট বেস থেকে সরবরাহ আসে।

আজকের হিসেব দাঁড়ায় এ রকম :

রাইফেল ৩০৩-৭৪৫+৪০+২০০+২৬= ১০৫১ রাউন্ড

এস.এল.আর/এল.এম.জি ৭.৬২-১৯৬+১০০= ২৯৬ রাউন্ড।

টেনগান ৯ এম.এম- ৩৬৯+৩৬=৪০৫ রাউন্ড।

হিসেবের অঙ্ক করে গোলাগুলির যে মজুদ মেলানো হয়, তাতে অবস্থা খুব সন্তোষজনক মনে হয় না। এখন প্রতিদিনই কোনো ন্যূ কোনো সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে শক্রের সাথে। দুটি কোয়াড এবং মুসার প্রক্রিয়া মিলিয়ে দলের ট্র্যাঙ্ক এখন প্রায় ১১০ জনের মতো। নিয়মিত বাহিনীর একটা কোশানির সম্পরিমাণ। প্রতিটি ছেলের নামেই বরাদ্দ রয়েছে হাতিয়ার অর্থাৎ একটি বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার। তবে বর্তমানের মজুদকৃত রাউন্ড বা গুলির প্রক্রিয়া মোটেই সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই। একটা সাধারণ মানের যুদ্ধে এ মজুদ সময়ে বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না শক্রের সাথে। সুতরাং গোলাগুলির অন্তর্বর্তক বাড়ানো প্রয়োজন। পিচুকে বলি একটা ডিমাত নোট তৈরি করতে, তার দরাজি গোলাগুলি সরবরাহে কার্পণ্য করেন। তার কথা হচ্ছে, তোমরা পেরিল যোদ্ধা, রেগুলার আর্মি নও। তোমাদের লক্ষ্য হবে এক গুলিতে একজন শক্র হত্যা করা। ভদ্রলোককে কে বোঝাবে যে, এক গুলিতে এক শক্র মারার এই ধারণা একদম বাজে। প্রতিটি যোদ্ধা বা সৈনিককে একথাটা বারবার প্রশিক্ষণ শিবির বা ট্রেনিং একাডেমিতে শেখানো হয়। কিন্তু বাস্তবে যুদ্ধক্ষেত্রে এলে বোঝা যায়, ট্রেনিং একাডেমির সেই শেখানো কথাটা একটা থিউরি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের বর্তমান এ যুদ্ধে, বিশেষ করে যখন রাতের বেলা শক্রের মুখোমুখি হয়ে লড়াই করতে হয়, তখন অদৃশ্য শক্রকে কোনোভাবেই দেখা যায় না, তখন এক গুলিতে এক শক্র মারার কথা বা তত্ত্বটা অনেকটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অপেশাদার সৈনিক হিসেবে যুক্তিযোদ্ধা ছেলেরা যখন শক্রের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়তে থাকে, তখন তাকে কোনো লিমিট বেঁধে দেয়া যায় না। এই দু' মাসের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বোঝা গেছে যে, অপরিণত বয়সের ছেলের দল, গুলিবর্ষণের আদেশ পাওয়া মাত্রই নন-ষ্টপ গুলি চালাতে থাকে, তাদের থায়ার নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত। কারণ হিসেবে দেখা গেছে, উভেজনায় প্রায় হিতাহিতজনশূন্য হয়ে পড়ে ছেলেরা। তাদের টেম্পারমেন্ট ঠিক রাখতে পারে না শক্রের সামনে। শক্রকে গুলি

করে হত্যা করার চেয়েও যেটা বেশি কাজ করে, সেটা হচ্ছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। এ জন্যই ছেলেদের মিতব্যরী হতে বললেও, সেটা তারা পারে না। অবশ্য শক্ত সৈন্যের বেলাতেও একই মনস্তত্ত্ব কাজ করে। ব্যাপারটা অনেকটা এরকমের যে, হত্যা করার জন্য আমি আমার অন্ত থেকে তাদের উদ্দেশ্যে ঠিকই গুলিবর্ষণ করছি, আবার সেই সাথে নিজেকে রক্ষা করার জন্যও এটা করছি। আর তখন নিজেকে রক্ষা করার মানসিক চাপটা এতো বেশি থাকে যে, যুদ্ধের মাঠে শক্তর মুখোমুখি নিজেকে অনেকখানি ফ্যানাটিক মনে হয়। নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদটা তখন সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পায়। যুদ্ধের বাজিতে যেখানে জীবন-মৃত্যুর খেলা, সে ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন তো হবেই।

পানিমাছ ঘাঁটিতে আক্রমণ

রাতে পানিমাছ পাক ঘাঁটিতে মর্টার আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এখন পর্যন্ত শক্তির পানিমাছ ঘাঁটিকে লক্ষ্য করেই আমাদের অপারেশনগুলো চলে আসছে। সেই সাথে রয়েছে হাড়িভাসাতে শক্তির স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের ব্যাপারটি নস্যাং করে দেয়ারও অভিযান। শক্তিপক্ষ এ অঞ্চলের ঘাঁটি পানিমাছ থেকেই তাদের সব ধরনের তৎপরতা চালিয়ে আসছে। ইতোমধ্যে হাড়িভাসায় রাজাকারদের স্থানে তাদের ঘাঁটি স্থাপনের প্রাথমিক প্রয়াস বানচাল করে দেয়া হয়েছে। প্রাচীবাহেও তারা খুব একটা সুস্থির অবস্থায় নেই। ইতোমধ্যে পানিমাছ ঘাঁটিতে স্থানের পরিকল্পিত আঘাত হানা এবং তাদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হচ্ছে। তবু তারা পানিমাছ ঘাঁটি ছেড়ে যায় নি, বরঞ্চ ঘাঁটি কামড়ে পড়ে থাকার নীতিক্রমে তাদের দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং তারি অন্তর্শক্তি নিজেদের সজিত করেছে। এবর এসেছে, তারা সেখানে স্থাপন করেছে গান অর্থাৎ তারি মর্টার। দিনের বেলা একমাত্র অতিবিশ্বাসী শান্তিবাহিনীর অনুচূর ছাড়া তাদের ঘাঁটির আধ মাইলেও ভেতরে সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াত নিষিদ্ধ। আর রাতের বেলায় জারি করেছে সমস্ত এলাকায় কারফিউ। সন্ধ্যার পর একমাত্র ক্যাম্প পাহারায় নিয়োজিত তাদের অনুগত দালাল প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্য ছাড়া কেউই বাড়ি থেকে বের হতে পারবে না। রাতের বেলা তারা তাদের ঘাঁটির চৌহদিতেই নিজেদের অবস্থানে নিজেদের গতিবিধি সীমিত রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। ঠাকুরপাড়া হাটের কাছাকাছি রাতের যুদ্ধে মার খেয়ে এবং নিজেদের একজন নিয়মিত সৈনিককে খুইয়ে তারা এখন এই স্ট্রাটেজি গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। দিনের বেলা তাদের বশ্ববদ অনুচূর দালাল আর রাজাকারদের সামনে রেখে তারা টহলদারিতে বের হলেও রাতে আর বের হচ্ছে না। এর মধ্যে তাদের দুই স্থানীয় শক্তি হিসেবে বিবেচিত দালাল ফাইমুন্ডিন মুস্তির বাড়ি উড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে পঞ্চগড়ের দিকে। মকবুল মেঘার যেভাবে পালিয়েছে, তাতে করে যে সে এতো সহজে এই অঞ্চলে পা মারাবে, সেটা মনে হয় না। পাকবাহিনীর অতিবিশ্বস্ত অনুচূরের দল এভাবে মারা যাওয়ায় কিংবা এলাকা ছেড়ে ভেগে যাওয়ায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং সেই সাথে উত্তরোত্তর তারা ক্ষিণ হয়ে উঠছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। তাদের রাগ আর গালাগালির ভাষা হচ্ছে, শালে মুক্তি বিচ্ছুকা বাস্তা, রাতমে আতা হ্যায় আওর রাতমে ভাগতা হ্যায়, দিনমে আও শালে বাহি... সামনে মে আও দেখ লেঙ্গে শালে...। অর্থাৎ রাতের বেলা অতর্কিত আঘাত হেনে ভেগে আসায় ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখতে পাচ্ছে না, দ্রুত অদৃশ্যমান শক্র বিরুদ্ধে ওরা লড়তে পারছে না নিজেদের ইচ্ছামতো। তাই তাদের রাগ আর ক্ষিণ অভিযোগ, সাহস থাকে তো, দিনের বেলা আসো, বাপের বেটা হওতো দিনের বেলা সামনাসামনি দেখা দাও। এই হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জ।

কিন্তু ওরা চাইলেই তো আর আমরা দিনের বেলা ওদের মুখোযুথি হচ্ছি না। আমাদের রণকৌশলের ভেতর এটা নেই। আমাদের গেরিলা যুদ্ধের মূল কৌশলই হচ্ছে, রাতের বেলা অঙ্ককারে গা ঢাকা দিয়ে অতর্কিত তাদের ওপর ঝাপিয়ে এবং কাজশেষেই ভেগে আসা অর্থাৎ ভোঁ দোড়। এতে তাদের কতোটুকু ক্ষতি করা গেলো, সেটা বড় কথা নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানসিকভাবে ওদের দুর্বল করে দেয়া, ওদের ভয়-ভীতির মধ্যে রাখা আর ওদের শক্তি ক্ষয় করা। ওদের রাতের ঘূম আর ব্রিাম হারাম করে দেয়া। গেরিলা যুদ্ধের সর্বকালীন এই কৌশলের সাহায্যে শক্র সৈন্যেরা যতো শক্তিধরই হোক না কেনো, তারা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। এর সাথে যদি মাটি ও পরিবেশ তাদের অনুকূলে না থাকে এবং সিংহভাগ সময়স্থান থাকে তাদের বিরুদ্ধে, তবে তাদের একদিন পরাত্ত হয়ে যুদ্ধের মাঠ থেকে পিটান দিতেই হবে। বাধ্য হবে দেশ ছেড়ে চলে যেতে।

রাতে মর্টার আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে শুরু হয়। একরামুল ও মুসা একটা দল নিয়ে বদলুপাড়া হয়ে পানিমাছ ধারি অন্তমুখে যতোদূর সঞ্চৰ এগিয়ে গিয়ে অবস্থান নেবে। মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে না দাকে শক্রের পাহারা এড়িয়ে তারা অরাস্তা, বোপঝাড় ও ফসলের চৰা ক্ষেত ধরে কাজশানি ডিঙিয়ে তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছুবে; অবশ্যই তাদের গাইড করবে সজিমউদ্দিন। সজিমউদ্দিনের আগের মতো উদ্দীপনা আর নেই। পাকসেনারা তাদের পরিবার-পরিজন ও বাড়িঘরের ওপর হামলা ও হত্যাকাণ চালাবার পর মানসিকভাবে সে অনেকটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। হাইড আউটে সব সময়ই সে চুপচাপ শুয়ে-বসে সময় কাটায়। প্রথমদিকের তার সেই উচ্চল-উদ্দীপনাময় আর বেপরোয়া ভাব কোথায় যেনো উধাও হয়ে গেছে। তবুও সজিম উদ্দিন কাজ করে যায়। যা বলা হয়, তাই করে। বিশেষ করে তার নিজের গ্রাম বদলুপাড়া, পানিমাছ ও বিসমনি এলাকাগুলোয় অপারেশন পরিচালনার কথা শোনামাত্রই সে উজ্জিবিত হয়ে ওঠে। নিজে গাইড হয়ে, অনুগামী হয়ে মুক্তিযোদ্ধা দলকে নিয়ে যায় শক্রকে কাছাকাছি অবস্থান থেকে আঘাত করবার এমন সুবিধাজনক স্থানে। শক্রের ওপর আক্রমণের ক্ষেত্রে সে অত্যন্ত তৎপরতা দেখিয়ে থাকে এবং অসম্ভব সাহসী ভূমিকা দেখাতে বিনুমাত্র পিছপা হয় না। তার মনের মধ্যে হয়তো তখন কাজ করে খালদের প্রতি এক প্রচও ঘূণা আর প্রতিশোধ নেয়ার অদম্য তাগিদ। খালেরা তাদের বাড়িয়র লুটপাট আর তচ্ছন্দ করার পাশাপাশি তাদের পরিবারের মা-বোনদের সম্ম লুটে নিয়ে গেছে। আর এটা সে স্বাভাবিকভাবেই মন থেকে মেলে

নিতে পারে নি। পারা সম্ভবও নয়। বাতের অপারেশন শেষে সজিমউদ্দিন তাই ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে বনবাদাড়ে, কিংবা তার তছনছ হয়ে যাওয়া বাড়িঘরের আশপাশে। সকালের দিকে শক্র ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিজেই রেকি করে। তারপর হাইড আউটে ফিরে এসে শক্র বাহীর ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দেবার সময় তাকে দেখায় অ্যান্ট ত্ত্ব, সজীব আরও উৎফুল্ল। শক্র আহত হওয়া কিংবা মৃত্যু আর ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা সজিমউদ্দিনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, মনে হয় পাকসেনাদের ক্ষয়ক্ষতি আর তাদের মৃত্যুর ভেতর দিয়ে তার নিজের ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হয়ে যাচ্ছে। তার মনের মনস্ত্ব হয়তো এভাবেই কাজ করে।

আকাশজুড়ে মেঘের কারম্কাজ। চাঁদও আছে। চাঁদের ফ্যাকাশে আলো আছে। সে আলোতে সারিবন্ধ চলমান একদল মানুষকে দূর থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যুদ্ধের ভাষায় যাকে বলে ‘স্পটেড’ করা। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে শক্র দ্বারা স্পটেড হওয়ার এবং সেই সাথে অকস্মাত তাদের ঝাঁক বাঁধা অগ্নিবাণের শিকার হওয়ার সমূহ সংজ্ঞাবনা। আমরা সেই সমূহ সংজ্ঞাবনাকে সামনে রেখে একরকম মরিয়া হয়ে এসে পৌছাই কামারপাড়ায়। শক্র বেটেনী বা পেরিফেরিয়ে মধ্যে এ এলাকায় তারা রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করেছে। চারদিকে একেবারে মৃত্যুপূরী মনে হয়। কামারপাড়াসহ আশপাশের জনবসতিগুলো থেকে ক্ষেত্রে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। চাঁদের আলোয় গাছগাছালি ঘেরা আশপাশের বসতিগুলো কেমন আবছা কালো অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে। কোথাও কোনো সাড়া শোনা নেই।

মুক্তিযোদ্ধার খাতায় নাম লিখিয়ে ক্ষেত্রস্তরে ওপার হতে শক্র দখলকৃত দেশে অনুপবেশের প্রথম দিনটি থেকে অবস্থায়া, প্রকৃতি আর চাঁদ সম্পর্কে শৈশব থেকে গড়ে ওঠা প্রচলিত ধারণাটা একদল শাল্টে গেছে। এখন আকাশে চাঁদের উদ্ভাসিত আলোয় আর মনের মধ্যে ক্ষেত্রস্তরামাটিকভা জেগে ওঠে না। বেজে ওঠে না গানের সেই কলিগুলো। ‘চাঁদের আলোয় বান ডেকেছে, উছলে উঠে আলো’ কিংবা ‘আজি জ্যোত্স্না রাতে সবাই গেছে বনে’। এখন আকাশে চাঁদ তার মুখ উজ্জ্বল করলেই নিজেদের লুকিয়ে ফেলতে হয়, চলে যেতে হয় ক্যামোফ্লেজ, তখন মনে হয়, চাঁদটা সরাসরি আকাশ থেকে আমাদের সাথে শক্রতা করছে। শক্র হাতে আমাদের সে ধরিয়ে দিতে ষড়যন্ত্র আটছে। আবার অঞ্চল ধারায় আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে এলে কিংবা প্রচণ্ড খারাপ আবহাওয়া যখন সাধারণভাবে মনকে বিষণ্ণ কিংবা খিচড়ে তোলে, ঘর থেকে কিংবা কোনো আরামদায়ক অবস্থান থেকে যখন কোনো অবস্থাতেই বাইরে বের হওয়ার কথা নয় এবং স্বাভাবিকভাবেই যা সবারই অপছন্দের, সেই বিপর্যয়কর বিশ্রী আবহাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণমুখের দিন আর রাতগুলোকে এখন দারুণভাবে মিত্র মনে হয়। খারাপ আবহাওয়া আর বৃষ্টি ভেজা দিন, অপারেশনের পক্ষে উত্তম আর নিরাপদ বলে মনে হয়। এদিন শক্র কোনো মূভমেন্ট থাকে না। বর্ষা বাদলের দিন শক্র তাদের বাস্কারের নিরাপত্তা ছেড়ে মোটেই বের হয় না। তখন নিরবেগ শক্র দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়। যুদ্ধের মাঠে এ বাস্তবতা আমাদের খুব ভালো করে শিখিয়েছে যে, বর্ষা-বাদল আর খারাপ আবহাওয়ার রাতে আমাদের যুদ্ধে যেতে

হবে। এটা আমরা সবাই এখন ধরে নিয়েছি যে, বৃষ্টির রাত মানেই অপারেশনের রাত। সারা রাত বৃষ্টি মাথায় বয়ে, ভিজে সপসনে শরীর নিয়ে পিছল রাত্তায় পা টিপে টিপে হেঁটে চলা কিংবা ভুসভুসে কাদামাটি, ফসলের ক্ষেত, বুনো ঝোপঝাড় আর কাঁটালতা ভেঙে পথ চলতে আমরা অনেকখানি অভ্যন্ত হয়ে গেছি। এতে শারীরিক কষ্ট হয়, বৃষ্টি আর হি-হি বাতাসে শরীর হিম ঠাণ্ডা করে প্রচণ্ড কাপুনি ধরিয়ে দেয়। বুনোঘাস, ধানক্ষেত আর কাঁটাময় বন্য লতাপাতার আঁচড়ে শরীরের চামড়া ছড়ে যায়, পায়ের তালুতে ধারালো কোনো কিছু লেগে কেটে যায়, চলার পথে ধপাস করে পিছলে পড়ে কেউ আহত হয়। কিন্তু তবুও শক্তির হাতের নাগালের বাইরে, চোখের নাগালের বাইরে থাকবার মানসিক ব্রহ্মিকু সবাইকে সব বাধা সয়ে নিতে সাহায্য করে।

আমরা কামারপাড়া এসে পৌছুতেই আকাশে চাঁদ ওঠে। তার উপচেপড়া আলোয় আমরা উন্মুক্ত হয়ে পড়ি। তাই দ্রুত একটা ঝোকড়া গাছের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বসা অবস্থানে চলে যাই। ‘শালা’ বলে চাঁদকে গালাগাল দিই। দক্ষিণ দিক থেকে ধেয়ে আসা বড় একখণ্ড মেঘের দিকে সতৰ্ক চোখে তাকিয়ে থাকি। দ্রুত ধাবমান ওই মেঘখণ্ড এসে ঢেকে দেবে চাঁদের হাসিকে, তখন আমরা আবার আচ্ছাদন পাবো, এগিয়ে যাবো আরো সামনে। মেঘ তার আপন গভীরভাবের দিকে ভেসে আসতে থাকে। আমরা সেই অবসরে আমাদের পরিকল্পনা প্রকার করে ফেলি।

পিন্টুকে ডান দিক দিয়ে এগিয়ে প্রায় ৫০০জ্ঞ সামনে পজিশন নিতে বলি। ওর কাজ হবে আমাদের অর্থাৎ মর্টার পার্টির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রের দেয়া। পিন্টুর সাথে দুলু থাকে। আমরা মর্টার পার্টিসহ এগিয়ে যাই সহজেই। পানিমাছ ঘাঁটি আক্রমণের প্রথম দিনের কুট ধরে। সে রাতে গাইড হিসেবে ছিলো রাজ্জাক মাস্টার। আর আজ আমরা নিজেরা নিজেদের গাইড। পিন্টু পার্টির সদস্য ৫ জন। মালেক বহন করছে ২ ইঞ্জি মর্টার। সেটা ওর কাঁধে ঝোলানো। শেলগুলো রয়েছে একাবরের কাছে। মর্টার ছাড়াও প্রত্যেকের কাছে রয়েছে নিজর অন্ত, এস এল আর ও রাইফেলসহ কোমরে জড়ানো ঘোনেড। আকাশের চাঁদ মেঘ ঢেকে দিলেও ফ্যাকাশে আলোটা থেকেই যায়। দূর থেকে শক্তির টাগেটি হওয়া এ পরিস্থিতিতে অসম্ভব কিছুই নয়। একটা শীতল অনুভূতি মনের গভীরে শিরশির করতে থাকে। যে-কোনো মুহূর্তে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, অনুভূতিটা অনেকটা এ ধরনের। তবু একগুয়ে জেদ নিয়ে আমরা হনহন করে এগিয়ে যাই। এখন রেকি করে ক্ষট সামনে রেখে ঢিমেতালে মুক্তের ব্যাকরণ মেনে এগিয়ে যাওয়ার সময় নেই। রাত দুটো বাজতে সামান্য বাকি। ঠিক রাত দুটো বেঁধে দেয়া হয়েছে আক্রমণের সময় অর্থাৎ ডি-টাইম। পিন্টু আর মুসা-একরামুলের দল সে সময়েই তাদের কাজ শুরু করবে।

শক্তি ঘাঁটির প্রায় ৪০০ গজের মধ্যে এসে আমরা থামি। সবাইকে পজিশনে যেতে বলি আমার বায়ে। ডানে মালেক মিয়া থাকে আমার সাথে। শেলের ব্যাগটা একাবর মালেকের কাছে দিয়ে আমার কাছাকাছি ডানে অবস্থান নেয় তার এস.এল.আরসহ। যে জায়গাটাকে আমাদের অবস্থান হিসেবে বেছে নিই, সেটা একটা ডাঙা জমি।

বুনোঘাস আর লজ্জাবতীর কঁটা টের পাইয়ে দেয় তার অবস্থানের অস্তিত্ব। লজ্জাবতীর কঁটার কামড় কিংবা বুনো ঘাসের আঁচড়ে ছড়ে যাওয়া শরীরের চামড়ার অনুভূতি এখন শূন্য। এখন শুধু বুকের ভেতরে ঢাকের বাজনা। মাটিতে ভেজা ঘাস, বুনোলতা, তার সাথে বুক মিলিয়ে নিঃসাড় শুয়ে থেকে এখন কেবল বুকের মধ্যে সেই বাজনাটা শুনতে পাই। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় শুয়ে থেকে পরিবেশটায় ধাতস্থ হয়ে যাই। শক্র অবস্থান হিসেব করে নিই। এরপর টেনগানটা হাঁটুর ওপর উঠিয়ে পিঠ চাপড়ে মালেককে উঠতে বলি। টেনগানটা ডান কাঁধে ঝুলিয়ে নিই। মালেক এগিয়ে দেয় মর্টার। এটা যেনো একটা ধাতব চোঙা। ২ ইঞ্চি ব্যাস। লম্বায় আড়াই তিন ফুটের মতো। চোঙার নিচে বসানোর মতো একটা পাত। একেবারে গোড়ায় নলকূপের হাতলের মতো একটা ছেট লিভার। চোঙার মুখ দিয়ে শেল বা বোম চুকিয়ে দিয়ে লিভারটা চাপ দিলেই একটা টাপ শব্দ করে উড়ে যায় শেলটা লক্ষ্যবস্তুর দিকে। ২০/৩০ সেকেন্ডের মধ্যে তা আঘাত হানে শিয়ে লক্ষ্যবস্তুর ওপর। প্রচও শব্দের বিস্ফেরণ তুলে আয় ১৫/২০ ফুটের মতো জায়গার ক্ষতি করে ফেলে ব্যাপকভাবে।

ডান হাঁটু মাটির সাথে রেখে সমান্তরালভাবে ভাঁজ করা বাঁ পায়ের পাতা মাটির ওপর বসিয়ে নিয়ে মর্টারের গোড়ার পাত সেট করে নিই আঙুলের ওপর। বাঁ হাতে শক্ত করে ধীর মর্টারের এ্যাসেল ৪৫ ডিগ্রি। শক্র স্টেটিসিস্টিকে। মর্টার দিয়ে কখনও সরাসরি আঘাত করা যায় না। এটা ছুড়তে হয় এমসেলের ওপর নির্ভর করে। যে এ্যাসেল করে ছেঁড়া হবে, ঠিক সেই এ্যাসেলে উড়ে গেছে, সঠিকভাবে তা অনুসরণ করে নামতে থাকবে লক্ষ্যবস্তুর ওপর। যুদ্ধের ভাষায় এটা হচ্ছে ইনডাইরেন্ট হিট। এই ইনডাইরেন্ট হিটের জন্ম মূল্যবহুল মর্টার বা কামানের এ্যাকুরেসি নির্ভর করে সম্পূর্ণ অঙ্ক আর জ্যামিতির ওপর। প্রথমে অঙ্ক কম্বে বের করতে হবে শক্রের অবস্থানের দূরত্ব। তার সাথে মিলিয়ে হিসেব করতে হবে এ্যাসেল বা কোণ। দূরত্ব এবং এ্যাসেল অনুযায়ী ডিগ্রি ঠিক করতে পারলে শক্রের ওপর এ মারণাত্মক ধ্রুব আঘাত হানতে সক্ষম। ব্যাপারটা সূচ্চ এবং জটিল, তবে তা নিরপেক্ষের বিভিন্ন পদ্ধতিও রয়েছে। ২ ইঞ্চি মর্টারের বেলায় এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় আন্দাজের ওপর। পায়ের পাতার ওপর মর্টারটি সেট করে তার শরীরের মাঝামাঝি বাঁ হাতে শক্ত করে ধরে হাতটাকে আগুপিচু করে দূরত্ব অনুযায়ী এ্যাসেল ঠিক করে নিতে হয়। হিসেবটা অত্যন্ত সহজ। ৪৫ ডিগ্রি এ্যাসেল করলে আঘাত হানা যাবে ৪০০/৪৫০ গজের দূরত্বের কোনো লক্ষ্যবস্তুর ওপর। এর চেয়ে কম দূরত্বে হলে ৪৫ ডিগ্রির নিচে এ্যাসেল করতে হবে। আবার দূরত্ব বেশি হলে ৪৫-এর ওপরে হবে এ্যাসেল।

মর্টার বসিয়ে নিই ৪৫ ডিগ্রি অনুযায়ী। ইশারা করতেই মালেক মুখের ঢাকনাটা খুলে এগিয়ে দেয় প্রথম শেলটা। ডান হাত দিয়ে চোঙার মুখে ধরতেই সুরং করে চুকে যায়। এরপর আর দেরি নয়, চোখ বক্ষ করে ডান হাতে লিভারে চাপ দিই। টাপ করে একটা শব্দ তুলে, এক ঝলক আগুনের ফুলকি খারিয়ে, পায়ের পাতার ওপর চাপ দিয়ে মুছুর্তের মধ্যে পো-ও শব্দ তুলে উড়ে যায় আকাশে। নাকে এসে লাগে পোড়া বাকুদের গন্ধ।

মালেক এগিয়ে দেয় পরেরটা, বাঁ হাতে ধৰা মৰ্টারখানা সামান্য বাঁয়ে নিয়ে দ্বিতীয় শেলটা ছুঁড়ে দিই, এৰপৰ তৃতীয় শেল ঢুকিয়ে নিই সাথে সাথে। সামান্য অপেক্ষা কৰতেই দেখতে পাই শক্র ঘাঁটিৰ সামান্য ডানে তীব্ৰ আলোৱ বিচূৰণ ঘটিয়ে প্ৰচণ্ড শব্দতৰঙ্গ তুলে বিক্ষেপিত হচ্ছে প্ৰথমটা। দ্বিতীয়টা প্ৰায় ২০/৩০ গজ বাঁয়ে শক্র ঘাঁটিৰ একেবাৰে কাছে গিয়ে বিক্ষেপিত হলো বলে মনে হয়। তৃতীয় বোমটা ছুঁড়ি দ্বিতীয়টাৰ প্ৰাসেলেৰ অনুকৰণে। বোম বা শেল উড়ে যায়। তাৰপৰ পৰ আৱো তিনটা। মৰ্টারেৰ শৰীৰ গৱম হয়ে ওঠে। পোড়া বাৰুদেৰ গুঁড়ে আৱ খোঁয়ায় নাক-মুখ ভৱে যায়। মন বলে ওঠে, আৱ নয়। পালাও। মুহূৰ্তেৰ ইশাৱাৰ সবাই উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে থাকি মাথা নিচু কৰে পেছনেৰ দিকে। পেছনে ছুটতে ছুটতেই দেখতে পাই তীব্ৰ আলোকচ্ছটাৰ বিচূৰণ ঘটিয়ে শেলগুলোৱ বিক্ষেপণ। আৱ তাৰপৰই শক্রপক্ষেৰ তৰফ থেকে শু্ৰু হয়ে যায় বন্যাৰ স্থাতেৰ মতো গুলিবৰ্ষণ। একৰামুল আৱ মুসাও বদলুপাড়াৱ দিক থেকে সৱব হয়ে ওঠে। তবে ওদেৱ গোলাগুলিৰ শব্দতৰঙ্গ থেকে মনে হয়, আজ ওৱা শক্র ঘাঁটিৰ খুব কাছাকাছি পৌছুতে পাৱে নি। এৱ পৰপৱেই শু্ৰু হয়ে যায় পিন্টুৰ দলেৰ গুলিবৰ্ষণেৰ অভিযান। কিন্তু কিছুক্ষণেৰ মধ্যেই হঠাত কৱেই তাৱা থেমে যায়। শক্রৰ অবিৱাম গুলি ধোয়ে আসতে থাকে পেছন থেকে। মুৰে অমৱাখানা, জগদলহাট ও তালমাৰ শক্রঘাঁটিও সঙ্গে সঙ্গে সৱব হয়ে ওঠে। একটুকু সীমান্তেৰ ওপাৰ থেকে ভাৱতীয় কামান বাহিনীও তাদেৱ কাজ শু্ৰু কৰে। শু্ৰুগঞ্জীৰ গৰ্জন তুলে কামানেৰ গোলা পড়তে থাকে অমৱাখানা, জগদল আৱ পিন্টোড়েৰ ওপাৰ। অমৱাখানা-জগদলহাট লাইনেৰ উল্টো দিকে ভজনপুৱ-দেবনগুৱালাইনে সুৱাঙ্গিত ঘাঁটি থেকে নিয়মিত মুক্তিফোঁজ বাহিনীও গৰ্জে ওঠে। মধ্যমাঞ্চলৰ শান্ত সমাহিত রূপ কিছুক্ষণেৰ মধ্যে সম্পূৰ্ণ পাল্টে যায়। এলাকাজুড়ে শু্ৰু হয় দৈৰেৰ প্ৰবল তাওলীলা। এৱ ভেতৱ দিয়েই আমৱা ছুটতে থাকি যতোদূৰ সংস্কৰণ কৰিবলৈৰ সঙ্গে।

আমাদেৱ একসাথে মিষ্টান্নৰ জায়গা অৰ্থাৎ রিটাৰ্ন পোষ্টে পৌছে পিন্টুকে পাওয়া যায় না। ভেজা ঘাসেৰ ওপৱ পিঠ ঠেকিয়ে শুয়ে আকাশেৰ দিকে মুখ কৰে ঘন ঘন নিষ্পাস নিতে থাকি। আকাশেৰ চাঁদ তখন পচিমে হেলে পড়ে ভুবতে বসেছে। নিষ্ঠেজ হয়ে এসেছে তাৱ আলো দেয়াৰ ক্ষমতা। সাবা শৰীৰ থেকে ঘাম ঝৰতে থাকে দৱদৱিয়ে। অসীম ক্লান্তিতে জড়িয়ে আসতে চায় চোখ। এখানে কিছুক্ষণ থাকলে নিৰ্ধাৎ গভীৰ ঘুমেৰ ঘোৱে চলে পড়তে হবে সবাইকে। এভাৱে সুমতি অবস্থায় থাকা মানে সকালেৰ ভেতৱেই শক্রৰ হাতে বন্দি হয়ে যাওয়া। না, পিন্টুৰ জন্য আৱ অপেক্ষায় থাকা যায় না। গা-বাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই।

— নে, ওঠ, সবাই চল বলে ওদেৱ প্ৰায় টেনে টেনে ভুলি। এৱপৰ হাইড আউট অভিযুক্তে যাবো। চলতে চলতে একটা দুশ্চিন্তা মনেৰ মধ্যে কঁটাৰ মতো কেবলি বিধতে থাকে, পিন্টু তাৱ দলবল নিয়ে সেফলি ফিৰবে তো? এমনিতেই পিন্টু তাৱ ভাৱি শৰীৰ নিয়ে কিপ্পতাৰ সঙ্গে দোজুতে পাৱে না। ফল ব্যাক কৰে অৰ্থাৎ মুক্ত ক্ষান্ত দিয়ে ফিৰবাৰ পথে ওকে নিয়েই আমাৰ দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশি।

ভাবি কি কইয়াম

কাক-ডাকা ভোরে হাইড আউটে ফিরে আসি। তার আগেই ফিরে এসেছে মুসা ও একরামুলের দল। হাইড আউটে ফিরে ছেলেদের ভূমিশ্যায় বিছানায় যাওয়া ছাড়া আর কোনো দিকে খেয়াল থাকে না। কোনোরকম শরীরের কাদা মাটি পানিতে ধূমেটুয়ে নিয়ে যে-যার বিছানায় চলে যায়। কারো কারো পায়ের কাদামাটি পরিষ্কার করারও হুঁশ থাকে না। চুলচুলু চোখ নিয়ে নিজেজে নিজীব শরীর এলিয়ে দেয় সরাসরি তাদের নির্ধারিত শোয়ার জায়গায়। আর এলিয়ে দিতেই মুহূর্ত কয়েকের ভেতরে চলে যায় ঘুমের রাজ্য। কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজের তত্ত্ববধানে লঙ্গরখানার কমান্ডার মমতাজ আর ইত্তাহিম তাদের সহযোগীদের নিয়ে দ্রুত হাত চালিয়ে সকালের নাস্তা তৈরি করে সবাইকে খাওয়ার জন্য ডাক দেয়। কিন্তু যুদ্ধ ফেরত ক্লান্ত ছেলেরা সে ডাকে সাড়া দেয় না। তারা ঘুমে কাদা হয়ে পড়ে থাকে। মিনহাজ তাদের ডেকে ডেকে টেনে তোলে নাস্তা খাওয়ানোর জন্য। ঘুমত ছেলেদের এভাবে সহজে নাস্তা খাওয়ানোর তাগিদ-তাগাদার ভেতরে মাঝবয়সী মিনহাজের মধ্যে পিতৃসূলভ মনোভাব কাজ করে। এ ব্যাপারটা যেনো সেই ধরনের একটা কিছু : বাড়ির দূরস্থ ছেলে বকাবকা খেয়ে অভিমানে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আর পিতা যেনো তার সেই অভিমান ভাঙ্গিয়ে তাকে খাবার জন্য বারবার সাধাসাধিক করছেন। মিনহাজের আচার-আচরণ আর কাজকর্মের ভেতরে সত্যিই রয়েছে একটা পিতৃসূলভ আন্তরিকতা আর স্বেচ্ছ-মমতার চিরস্তন নিবিড় পরিশ।

আমরা যখন নাস্তা করতে বসেছি, পিন্টু সহ সময় হৈ-চৈ করে শব্দ তুলে হাইড আউটে ঢোকে পিন্টু আর তার দলকളি। ওদের জন্য আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষার পালা শেষ হয়। কোনোরকমে হাতে মুখ-শানি দিয়ে পিন্টু এসে বসে যায় নাস্তার পাতে। দেখলেই বোঝা যায়, আচত্ত শরীর, কিন্তু মনের সজীবতা আর উৎসুকতা টগবগ করতে থাকে পিন্টুর সারাব্যবহাবে। দুলুকে জিগ্যেস করি, আরপিতে আপনাদের পাওয়া গেলো না, ছিলেন কোথায়?

দুলু পিন্টুর দিকে তাকিয়ে জবাব দিতে যাওয়ার আগেই তার কথা কেড়ে নিয়ে পিন্টু বলতে থাকে, আর কল্না মাহবুব ভাই। হারে গেছনো।

— হারে গেছনো মানে? দুলু তো ছিলো হারালে কেন? দুলু তখন কী যেনো বলতে চায়, পিন্টু হাতের দাবড়ে তাকে খামিয়ে দেয়। তার মুখে বড় একটা চিনি মাখানো রুটির টুকরো। সেটা সাইজ করে নিতে একমুখ হাসি হেসে পিন্টু বলে, আজকের ভাগার ব্যাপারটার একটা চৌরি শোনেন তাহলে, আমাদের ঐতিহাসিক ভাগার চৌরি! নাস্তা-চায়ের পাশাপাশি পিন্টু তার অবস্থান থেকে ভেগে আসার সরস বিবরণ দিতে থাকে, এভাবে :

আপনাদের মর্টারের বাড়ি থেয়ে তো খানের দল পাগলা কুস্তার মতো পাল্টা আক্রমণ শুরু করলো। আমিও দিলাম অর্ডার সকলকে ফায়ার ওপেন করার জন্য। নিজেও দিলাম এক ম্যাগজিন স্টেল্লাগানের ব্রাশ। সবাই গুলি ছেঁড়া শুরু করলো। ওমা, একী দেখি! শক্তির ওদিক থেকে গুলিতো নয়, যেনো লক্ষ কোটি ডিম্বকুল

গুনগুন ভবনেন শব্দ তুলে ছুটে আসছে। এমন সময় দেখি আপনারা ছায়ার মতো দৌড়ে আসছেন জোরে। মনে হলো, খানেরা বুঝি তাড়া করছে পেছন থেকে। তখন করি কি? ভয়ে দিশেহারা হয়ে বললাম, স্টপ ফায়ারিং, ট্রিট। আপনি তো জানেন, গুলির মুখে রিট্রিট মানে কি! একেবাবে হৃড়-মুড় করি উঠিয়া সকলে দৌড়। সে কি এমন-সেমন দৌড়? ভোচলা কাটা দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে রাস্তা হারিয়ে গেলো। এদিক যাই তো জঙ্গল, ওদিক যাই তো পুকুর, জলা, খাল। এরকম এ বাড়ির মধ্য দিয়ে, ও গ্রামের পাশ দিয়ে, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সোজা একটা বাড়ির আভিনায় চুকে গেলাম। বাড়িটা বেশ বড়। অনেকগুলো ঘর। ঘরের ভেতরে একটুখানি যেনো আলোর নিশানা পাওয়া যায়। ঘরটার দরজার একটা পার্ট খোলা। তার মানে মানুষ জেগে আছে। চারদিকে তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই যুদ্ধের মধ্যে মানুষের শান্তির ঘূম আসতে তো পারে না। বাড়ির আভিনায় তখন ভূতের ছায়ার মতো আমরা ১০ জন, দুলু ভাইকে নিয়ে ১১ জন। অলিপ্সিক দৌড় কমপিটিশনের শেষে প্রত্যেকের প্রচণ্ড হাঁপানি আর ফ্যাসর ফ্যাসর করে দম নেয়া। সেই অবস্থাতে খোলা দরজার আলোর নিশানার দিকে মুখ করে হাঁক দিই, বাড়িতে কেউ আছেন? বাহির হন। প্রথমে কেউ সাড়া দেয় না। এরপর হালুম করে ডাক দিয়ে উঠি, কে আছেন বাহির হন, কোনো বিপদ নাই।

১১/১২ বছরের একটি কিশোর ছেলে বেরিয়ে আসে। পরনে লুঙ্গি। খালি গা। ছেলেটার সামনে আমরা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছি। একটুখানি কাছ ঘেঁষে তাকে জিগ্যেস করি, এ্যাই বলতো আমরা কে? জেলটাকে বেশ সপ্রতিভ মনে হয়। সামনে দাঁড়ানো সবার দিকে তাকিয়ে একট হেচে করে হেসে সোজা জবাব দেয়, জে চিনছি, আফনেরা, রাজাকার।

— রাজাকার?

— বলে কিরে ব্যাটা, জাগে সামনে এগিয়ে গিয়ে তার পেটে মারি টেনগামের একটা গুঁতা। সেই বাড়ি থেয়ে আতকে ওঠে ছেলেটা। তার পশ্চাদ্দেশ থেকে বের হয় ভরাত করে এক শব্দ। পিন্টুর গল্প এ পর্যন্ত আসতেই হাসির হল্লা পড়ে যায়। সমবেত সবাই হো-হো করে হেসে ওঠে সশঙ্কে। আমি কোনোমতে হাসির দম চাপতে চাপতে বলি, চালিয়ে যাও পিন্টু, তারপর কি হলো।

পিন্টু আবার শুরু করে: ছেলেটা তো আতকে উঠে ঐ কর্ম করে ঘৃতমত খেয়ে যায়। তখন জোরে ধমক লাগাই, ঠিক করে বল ব্যাটা আমরা কে?

তখন সে বলে, জে আপনেরা মুক্তিফৌজ।

ঠিক করে বল বলে আবার পেটে গুঁতা। আবার তার পশ্চাদ্দেশ থেকে ভরাত শব্দ হয়। এবার সত্যিকারের ভয় পায় ব্যাটা। যেই বলি, বল ঠিক করে, তখন সে বলে আপনেরা রাজাকার। আবার ধমক দিতেই বলে ওঠে, মুক্তিফৌজ। ভালো করে বল বলতেই বলে ওঠে রাজাকার। তার সামনে যমদৃততুল্য অন্তর্শন্ত্র হাতে অর্ধবৃত্তাকারে একদল ছায়া ছায়া মানুষ। এরা রাজাকার, না মুক্তিফৌজ ঠাহর করতে না পেরে সে আমাদের একবার রাজাকার, একবার মুক্তিফৌজ বলতে থাকে, আর

তার পশ্চাদ্দেশ থেকে ক্রমাগত ভরাত ভরাত শব্দ বের হতে এক পর্যায়ে সে তার কাপড় নষ্ট করে ফেলে। আর ওই অবস্থায় সে আর্তস্বরে ঠিকার দিয়ে বলে ওঠে তার অদৃশ্য ভাবিব উদ্দেশে, ভাবি কি কইয়াম?

আলোকিত সেই ঘর থেকে এক নারীর কোমল কষ্ট ভেসে আসে, কও মিয়া তুমি, যা বোৰ, তাই কও। তখন ছেলেটা বলে ওঠে, আপনেরা মুক্তিফৌজ, না, রাজাকার। তার কোনোটাই ঠিক হয় না : বলেই আবার তার ভাবিব উদ্দেশে তার কান্নাজড়িত আকৃতি, ভাবি তুমই কইয়া দাও, আমি কী কইয়াম? ঠিক তখনি দুয়ার ঠেলে হাতে কেরোসিনের ডিবা হাতে লাল শাড়ি পরা এক মহিলা বের হয়ে আসেন। মাথায় তার ঘোমটা টানা, কী বলবো, মাহবুব ভাই চোখকে বিশ্বাস হয় না, অসভ্য সুন্দর সেই নারী মূর্তি। মনে হয় আকাশ থেকে লাল শাড়ি পরে বুঝি কোনো রূপবতী পরী নেমে এলো। মহিলার দিকে তাকিয়ে আমরা হতবাক হয়ে যাই। মহিলা এগিয়ে এসে তার ছেষটা দেবরের উদ্দেশে বলেন, মিয়া সারাদিন গীত ধরো, বড়ো হইলে মুক্তিফৌজে যাইবা, কইতে পারো না, আপনারা মুক্তিফৌজ। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আপনেরা বসেন। একটু জিরাইয়া যান। তখন সর্বিং ফেরে আমাদের। তাকে বলি, দেখেন আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। যাবো মূলাগঞ্জে। আমাদের একটু সাহায্য দরকার।

ঠিক আছে আপনেরা বসেন, একটু ঠাণ্ডা হইয়ে রেন, কাহিল লাগতেছে আপনাদের বলে তিনি তার দেবরকে বলেন, যাও তোমার অপড় বদলাও শিয়া। এনাগো বসতে দাও। তারপর সেই মহিলা পাশের ঘরে ঝুঁক্কা দিয়ে এক বুড়ো মতো লোককে বের করে আনেন। নিয়ে আসেন কামলা হোমস্টেডের আরো ২ জন মানুষকে। তারা দৌড়োৰী করে আমাদের বসতে দেয়। পুরুষের গ্লাসে পানি আসে। ঘরের ভেতর থেকে পান-সুপারি আসে। বুড়ো লোকটা খুঁথা গলায় বলতে থাকেন, থান আর রাজাকারদের অত্যাচারে তার ছেলে আঘ অন্যান্য বাড়ির মুবকেরা ইতিয়া চলে গেছে। তাদের কোনো খবর পাই নাই। কোথায় আছে, কেমন আছে কিছুই জানি না। এদিকে সবসময় চিন্তায় থাকি কখন কী হয়, বাড়িতে ব্যাটার বউ আছে, তাকে নিয়ে চিন্তা। দুটো বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে, তাদের নিয়ে চিন্তা। দেশ যে কবে স্বাধীন হবে? মহিলাটি তখন একটা বেঁটেখাটো শক্ত গড়নের মানুষকে আমাদের সামনে হাজির করে বলেন, এই লোক আপনাদের রাস্তা দেখাইয়া দিয়া আসবে। বিশ্বাস হয়। পানি খাওয়া হয়। পান-সুপারি খাওয়া হয়। তারপর উঠে দাঢ়াই। বিদায় নেয়ার সময় মহিলাকে আমরাও বলি, ভাবি আসি তাইলে?

— আচ্ছ আসেন বলে কেরোসিনের ডিবা হাতে সেই মহিলা দাঁড়িয়ে থাকেন, যার স্বামী পালিয়ে গেছেন পাকসেনাদের ভয়ে সীমান্তের ওপারে। শিয়ে হয়তো কোনো আশ্রয়ে আছেন তিনি, নয়তো যোগ দিয়েছেন মুক্তিবাহিনীতে। যুদ্ধশেষে তিনি আদৌ ফিরবেন কি না, আমরা জানি না; মহিলাও জানেন না; তবু নিষ্ঠয়ই রাতভর হয়তো অপেক্ষা করেন তার জন্য। শক্তর এতো কাছাকাছি শরীরের আগুনের মতো রূপ নিয়ে কী করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন মাংসলোভী শকুন খানসেনাদের

হাত থেকে সেটা ভেবে মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। ফিরবার পথে তাই বৃক্ষ মানুষটিকে বলি, মেয়েদের সরিয়ে দেন, যতো তাড়াতাড়ি পারেন।

— কই পাঠাই বাবা, জায়গা নাই। ময়মনসিংহ পাঠাইতে গেলেই তো ওদের চোখের ওপর দিয়ে পাঠাতে হবে, তখন যদি কিছু হয়? শুধু আঢ়াহ আঢ়াহ করি, আর ওগে লুকাইয়া রাখি ঘরের ভেতরে, জঙ্গলে, বাড়ির পেছনে রাজাকার-খানদের ভয়ে।

পিন্টু এবার তার গল্প থামায় এ পর্যন্ত এসে। তখন গভীর ভাবাবেগে আক্রান্ত। নিজেকে সামলে নিয়ে আবার তারপর বলে, উটোর স্বামীকে খোজা দরকার, সে অন্তত তার স্ত্রীকে নিয়ে বেরুবাড়ি সাকাতি শরণার্থী ক্যাশে চলে যাক। বুড়ো বাড়ি ছাড়বে না, এতো বড় বাড়ি-সংসার বুড়োর পক্ষে ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এভাবে থাকলে ঐ সুন্দরী বউ আর বুড়োর মেয়েরা নিষ্ঠার পাবে না। ঠিক দেখবেন ওরা তুলে নিয়ে গেছে।

— ঠিক আছে পিন্টু, একটা কিছু হবেই। তোমার ভাবির কিছু হবে না দেখো, আমি বলছি।

— ধ্যাং, আমার ভাবি হাতে যাবে কেনো?

— আরে এখনি তো বললে বিদায়ের সময় তাকে ভাবি বলে ডেকে এসেছো। তোমার কি কইয়াম ভাবি অত্যন্ত চালাক এবং সাহসী হচ্ছো। দেখো ঠিকই নিজেকে বাঁচিয়ে নেবেন, আর তা ছাড়া আমরা রয়েছি মনি। পিন্টুকে আস্ত করে মনে মনে ভাবি, মহিলাকে রক্ষা করতে হবে। তার কোর্সী কোত হতে দেয়া যাবে না।

মিশন ঠাকুরপাড়া

ঠাকুরপাড়া হাটে চলছি ও জন মালেক রয়েছে আকাকর আর মালেক। আমার হাতে একটা চটের থলে। মালেকের একহাতে দুটা খালি তেলের বোতল আর এক হাতে একটা ভারি চটের ব্যাগ। আকাকরের কাঁধের দু'পাশে দুটো মুখ-বাঁধা চটের ছালার বোঝা। পথ-গুরুত্বক সর্দারপাড়ার এক চালাক চতুর মধ্যবয়সী মানুষ। তারও হাতে চটের ব্যাগ আর শিশি-বোতল। সকলের আদলে চেহারায় এমন নিরীহভাব আনা হয়েছে যে, পথ-চলতি যে কেউ আমাদের হাটুরে অর্থাৎ হাটবাজার করতে যাওয়া গ্রামের মানুষ ভেবে নেবে। আকাকরের কাঁধের দু'পাশে মুখ বাঁধা ছালায় ভাঁজ করা অবস্থায় রয়েছে তোটা টেনগান। ম্যাগজিনগুলো আলাদা করে খুলে রাখা। মালেকের ব্যাগে রয়েছে ১০টা ভাজা ফ্রেনেড, ২টা রেমার চার্জ। আমার পা-হাত ঝাড়া। কিছু নেই, শুধু হাতে ঝোলানো শূন্য চটের থলে ছাড়া। বেলা তিনিটার দিকে রওনা দিয়েছি আমরা হাতে সময় নিয়ে যাতে করে সাড়ে তৃটার মধ্যে হাটে পৌছানো যায়।

আজকের মিশনটা সাংঘাতিক বুঁকিপূর্ণ। বলা যেতে পারে, একটা সুইসাইড মিশনে চলেছি তিনজনের একটা কমান্ডো দল নিয়ে। দিনের বেলা, ভরা হাটের শত শত মানুষের উপস্থিতিতে পরিচালিত হবে আজকের অপারেশন। অপারেশনের মূল টার্গেট তিনটি। ক. পাকসেনা উপস্থিত থাকলে তাদের হত্যা করা; খ. রাজাকারের দল থাকলে তাদের হত্যা করা এবং গ. এ অঞ্চলের ত্রাস সর্বশেষ শাস্তি কমিটির

লিডার ও প্যাকবাহিনীর প্রধান অনুচর সৈমত আলীকে পেলে তাকেও হত্যা করা। পাকবাহিনী, রাজাকার বাহিনী ও সৈমতের দলবল একযোগে হাটে উপস্থিত থাকলে ও জনের পক্ষে ভরা হাটের মধ্যে তাদের যোকাবিলা করার ব্যাপারটা একরকম দৃঢ়সাধ্য হতে পারে। এছাড়া হাটের লোক তাদের পক্ষ নিয়ে নিলে হাট ভরতি লোকের মাঝখান থেকে বের হয়ে আসাও অসম্ভব হতে পারে। তবুও আমরা সাহস করেছি। রিস্ক নিয়েছি। যদিও এটা একটা পাগলামো ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে এবং সেই সাথে মনে হচ্ছে, যাই হোক না কেনো আমি শুধু একা নই। আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আর বিশ্বস্ত দুই সাথিকে নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটা পথ ধরে নির্ধারিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছি। পথ-প্রদর্শক আমাদের সামনে বেশ কিছুটা দূরত্বে। তারপর আমি, আমার হাত দশেক পেছনে আকাবর আর মালেক। আমাদের সঙ্গে পাল্তা দিয়ে হাঁটছে আগুপিছু করে। আকাবরকে বারবার করে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে, হাটঅভিযুক্তি বা পথচলতি কোনো মানুষ জিগ্যেস করলে সে বলবে, কাঁধের দু' বন্তায় রয়েছে শোলাকচু। মালেক বলবে, তার ব্যাগে রয়েছে গোলাআলু। ঠাকুরপাড়া হাটে নেয়া হচ্ছে বেচবার জন্য। রাস্তায় কেউ দেখতে চাইলে বা কিনতে চাইলে দেখানো চলবে না। দেহাতি গ্রামের মানুষের মতো অত্যন্ত নিরীহ গলায় বলতে হবে, হাটে নাগেলে শাল বেচবো না।

মিশন ঠিকঠাক মতোই চলছে। এখনও ঠাকুরপাড়া উচ্চতর মূল রাস্তা দূরে রয়েছে। ডাবুরডাঙা পার হয়ে আমরা সোজাসুজি আলপুর দ্বরেছি। ভেতরগড়—সর্দারপাড়া হয়ে যে রাস্তাটা ঠাকুরপাড়া হাটের দিকে প্রস্তুত আমরা সরাসরি সে রাস্তায় উঠবো হাটের প্রায় দু' মাইল আগে। এ অঞ্চলে আর সব হাট-বাজার বক হয়ে যাওয়ায় ঠাকুরপাড়া হাট পাকবাহিনীর নিরাপত্তি বেঠনীর ভেতরে বেশ জমজমাট হয়েই বসছে কিছুদিন থেকে। প্রয়োজনে মনুষকে বহুদূর থেকে টেনে নিয়ে যায় সে হাটে। পাকবাহিনী, রাজাকার আর অন্যন্য কমিটির উপস্থিতিতে মানুষ আতঙ্কিত থাকলেও নিজেদের কেনাকাটার জন্য মানুষজনকে সে হাটে যেতেই হয়। ডাবুরডাঙা পার হওয়ার পর থেকে হাটগামী পথচলতি মানুষজনের দেখা মেলে। একটা অস্তিত্বে মেশানো অনুভূতি মনের মধ্যে চেপে বসে। মাঝে মাঝে ফিরে তাকাই দুই অনুগামীর দিকে। না, অত্যন্ত নিরুদ্ধে আর ভাবনাহীন অভিব্যক্তি ওদের। নিশ্চিত পদক্ষেপে এগুচ্ছে তারা।

দিনের বেলা হাট-ভরতি লোকজনের উপস্থিতিতে কমাতো অপারেশনের কথা এতোদিন মনে মনে ছিলো, কল্পনায় ছিলো, চিন্তাভাবনা আর আলাপ-আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো। গত হাটে আকাবর একা এসে রেকি ফ্রেনেড হামলা করে যাওয়ার পর সেই ইচ্ছে-কল্পনা বাস্তবায়নের ব্যাপারটা মনের মধ্যে ভয়ানকভাবে আলোড়িত হতে থাকে। মজিব, দুলু এবং অন্যদের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ক'বাৰ আলোচনা হয়েছে এবং মধ্যে। আলোচনা থেকে দেখা গেলো, মজিবের উৎসাহ বেশি। এটা বাস্তবায়নের জন্য সে তাগিদ দিতে থাকে বারবার। সবার লক্ষ্য দালাল সৈমত। সৈমতকে শেষ করতে পারলেই তালমা পর্যন্ত সমস্ত এলাকা দালালমুক্ত হয়ে যাবে। মোটামুটি অমরখানা থেকে হাড়িভাসা এবং তালমা পর্যন্ত সমস্ত এলাকাটাই মোটামুটি

একটা মুক্তাঙ্গলের রূপ নেবে। এ অঞ্চলের দালাল শান্তি কমিটির প্রায় সব লোকই নির্মূল হয়ে গেছে, শুধু সৈমত ছাড়া। এখন সৈমতকে খতম করতে পারলেই এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর বড়ো ধরনের কোনো দালালের চিহ্ন আর থাকবে না। সব দিক বিবেচনা করে আজকের এই অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সকালের নাস্তা খাবার পর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়ে বেলা এগারোটার দিকে আমরা পরিকল্পনাটা চূড়ান্ত করতে বসে গিয়েছিলাম। সেই আমাদের পুরুরগাড়ের আমগাছের তলায়। একরামুল, মুসা ও চৌধুরীসহ। আকাববারও ছিলো আমাদের আজকের আলোচনার বৈষ্ঠকে। ছিলো দুলু, মজিব আর জববারও। পিন্টু বিড়িতে লম্বা লম্বা টান দিতে দিতে তখন এমনভাবে তার মাথা নেড়ে ছিলো যে, স্পষ্ট বোৰা গিয়েছিলো, এতো বড় ঝুকির ভেতরে যেতে তার মন টানছে না। বারবার সে রিক্ষের কথা, বিপদ-আশঙ্কার কথা বলতে থাকে। মজিব যাবে না, দুলু-জববারও না যাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলো। যুক্তি : ওদের শক্তপক্ষের লোকজন চিনে ফেলবে। ফলে সাথে সাথে ধরা পড়ে যাবে। দুলুর যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ওর পিছুটানের ব্যাপারটা স্পষ্টই বোৰা গিয়েছিলো, বিশেষ করে ওর কথাবার্তা থেকে। ওর ওপর নির্ভর করে আছে সীমান্তের ওপারে শরণার্থী হিসেবে আগ্রিমা ওর মা-ভাই-বোনসহ গোটা একটা পরিবার। দুলু ধরা পড়লে কিংবা ওর কিছু হলে শোটা পরিবারটাই ঝুঁকে হয়ে যাবে, ভেসে যাবে কে কোথায়। তাই এদের কাউকেই নেয়া চলবে না বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। তাছাড়া বড়োসড়ো একটা দল নিয়ে এ অপারেশন স্থিরত যাবে না। তাই শেষতক একটা ছোট দল গঢ়া হয়। মাত্র ৩ জন তার সমন্বয় সিদ্ধান্ত হয় তারি হাতিয়ার নেয়া চলবে না। দলের মধ্যে স্বাস্থ্যবান এবং সম্মত ছেলেদেরও অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। নিতে হবে এমন কাউকে, যাদের চেহারা স্মৃত কোনোমতই মুক্তিযোদ্ধাদের মতো নয়। নেয়া হবে এমন কাউকে ক্রমে দেখলে প্রথম দর্শনেই মনে হবে গ্রামের অতি সাধারণ এক একজন মানুষ। ক্লোজ ফাইট অর্থাৎ সামনাসামনি লড়াইয়ের উপযোগী হাতিয়ার সঙ্গে নিতে হবে, যেমন স্টেনগান, ফ্রেনেড আর রেমার চার্জ। হাট পর্যন্ত গাইড করে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক লাগবে। পথে হাটের কাছাকাছি রাখতে হবে বিশ্বস্ত কাউকে, যারা চলার পথের সর্বশেষ খবরাখবর সরবরাহ করবে। হাটের ভেতরে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য প্রয়োজন হবে একজন বিশ্বস্ত দোকানদার ব্যবসায়ীর। সোজাসুর্জি তার কাছে নিয়ে মালপত্র গচ্ছিয়ে রেখে অবস্থা বুঝে তাৎক্ষণিকভাবে অপারেশনাল প্ল্যান করতে হবে। এ অপারেশন পরিচালিত হওয়ার সময় কেউ ধরা পড়তে পারে। কেউ আহত বা নিহত হতে পারে। আহত-নিহত বা মৃত সহগায়ীর জন্য অন্যের অপেক্ষা করা চলবে না। অপারেশন শেষ করে যেভাবে পারা যায় দ্রুত অপারেশন স্থান ত্যাগ করতে হবে, আর সেটা করতে হবে যার যার মতো করে। পিন্টু, মুসা আর একরামুল একটা শক্তিশালী বাহিনী তৈরি করে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় হাইড আউটে অবস্থান করবে। বিপদ যদি কিছু ঘটেই যায়, তারা যেনেো দ্রুত যেতে পারে তাদের উক্তার কাজে। হাটে পৌছেই নিদিষ্ট দোকানির কাছে মালপত্র গচ্ছিত রেখে দ্রুত পুরো বাজারটা রেকি করে ফেলতে হবে।

পাকবাহিনীর কোনো দল থাকলে তারা হবে আমাদের প্রথম টার্গেট। স্টেনগানের অতর্কিত হামলায় সবকটাকে সাবাড় করে দিতে হবে। পাকবাহিনী যদি না থাকে, থাকে শুধু রাজাকারের দল তবে তাদের বেলায়ও একই ধরনের অ্যাকশন হবে। সৈমত থাকলে তাকে খতম করতে হবে। এদের যৌথ তিন দল, অর্থাৎ পাকসেনা, রাজাকার আর সৈমতের শাস্তি কমিটির প্রতিরোধ বাহিনীর সদস্যরা থাকলে উপস্থিত মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে প্রধান টার্গেট হবে পাকসেনা।

দীর্ঘ আলোচনা হয়। খুঁটিনাটি সবকিছু বিভিন্ন দেখা হয়। এরপর নেয়া হয় আজকের অপারেশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত হবার পরপরই শুরু হয় দল গঠনের পালা। কে কে যাবে আজকের অপারেশনে? কাদের নিয়ে গঠিত হবে দল? কে দেবে আজকের দলের নেতৃত্ব—এসব প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর। মন বলে উঠে, আজকের এই সুইসাইডাল কোয়াডের নেতৃত্ব আর কাউকে দেয়া যাবে না। আজকের এ অপারেশনে আমার নিজেরই যেতে হবে। অন্য কাউকে এ গুরুদায়িত্ব দেয়া যাবে না। কারো ওপর নির্ভর করা যাবে না। দলের সদস্য নির্বাচনের সিদ্ধান্তের সময় উপস্থিত সবাই চুপ হয়ে যায়। প্রত্যেকের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমি ঘোষণা দিই, আজকের দল নিয়ে যাচ্ছি আমি নিজে। আমার সাথে থাকবে আকাবর আর মালেক। কিন্তু কিছু বলতে চায়, মুসা আর একরামুল অঙ্গতির সঙ্গে বিড়বিড় করে ওঁচে দুলু আর মজিব আমার যাওয়ার ব্যাপারটায় যেনে মেনে নিতে পারে না।

তাহলে সিদ্ধান্ত পাকা, বলেই উঠে প্রস্তাব আমি। আকাবরকে বলি তৈরি হয়ে নিতে। মালেককেও ডেকে আনতে রাজন সেই সাথে আলোচনা বৈঠক ভেঙে দিয়ে সবাইকে যেতে বলি হাইড অব্স্ট্রিন দিকে। পিটুকে সাথে রাখি। একাবর আর মালেকের সঙ্গে পরামর্শ করে পরিকল্পনাটা নিজের মতো করে সাজাতে হবে। মজিবও থাকে। আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত সবাই অত্যন্ত চিন্তিত মনে মুখ ভার করে উঠে যায়। এরা কেউই আমার যাবার ব্যাপারটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। কিন্তু এছাড়া উপায়ই-বা কি? এ অপারেশনের দায়িত্ব আমার নিজের কাঁধে তুলে নেয়া ছাড়া অন্য কাউকে এ মৃত্যুগুহায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত আমি দিতে পারি না। এককভাবে এ ধরনের কোনো অপারেশন সফল করবার মতো আস্থা নিয়ে এখনও এরা কেউ গড়ে উঠতে পারে নি। যাদের ওপর আস্থা নেই, তেমন কারো কাঁধে আজকের এ গুরুদায়িত্ব চাপানো যায় না এবং এদের সকলের কমাত্তার হিসেবে আমি সেটা করতেও পারি না।

মজিবকে গাইড যোগাড় করাসহ সর্দারপাড়ার রাস্তায় লোক রাখা এবং নির্ভরযোগ্য দোকানি নির্বাচনের কাজে লাগিয়ে দিই। ও চলে গেলে একাবর আর মালেককে নিয়ে পরিকল্পনাটা চূড়ান্ত করে সাজাতে থাকি। এই দুই অসম সাহসী সদস্য কিশোর আর সদ মুবক বয়সে পা দেয়া কাউকে সহজে কেউই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শনাক্ত করতে পারবে না। হাঁটুর ওপরতক লুঙ্গি গুটিয়ে নিয়ে উক্কেখুক্কে ছুলে এবং কাঁধে গামছা ফেলে আমিও নিজেকে আমের একজন মানুষ বলে চালিয়ে নিতে পারবো।

পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময় পিন্টু চুপচাপ থাকে। এরপর বিকেলে অপারেশনে যাওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ও কোনো সময়ের জন্যই আমার কাছছাড়া হয় নি।

সর্দারপাড়ার কাছে মূল রাস্তায় উঠতেই একজন অপেক্ষমাণ লোককে পাওয়া যায়। অল ক্রিয়ার সিগনাল দিয়ে সে হন্হন্হ করে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। আরো কিছুদূর এগিয়ে একজন হাট-ফিরতি মানুষের দেখা হয়। তার মুখে নিবিড় নীরব হাসি এবং চোখের ইশারা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সামনে এগুবার ব্যাপারে কোনোরকম বাধা নেই। হাটের কাছাকাছি ততোই এগুতে থাকি, হাটমুখো আর হাট-ফেরত মানুষজনের ভিড় ততোই বাড়তে থাকে। পথের পাশে বিড়ি ধরানোর অছিলায় দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষ সামনের গাইড বা পথ-প্রদর্শকের সাথে নীরবে হাঁটতে থাকে। না, কোনো খারাপ খবর নেই, গাইড লোকটা আমাদের ইশারায় সেটা জানিয়ে দেয়। একাব্বর-মালেকের সাথে হাঁটতে থাকা দু'জন পথচারীর একজন একাব্বরের কাছে জানতে চায়, বস্তায় কি আছে? একাব্বর অল্লান বদনে উত্তর দেয়, সোলাকচু আর আলু। জবাব দিয়েই ও জিগ্যেস করে, কিনবেন নাকি? লোকটা মাথা নাড়ে। ওদের সামান্য আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে কান খাড়া করে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখি লোক দুটো আরো কিছু বলে বা জিগ্যেস করে কিনা। ব্যাপের সোলাকচুর সাইজ দেখতে চায় কি না। কিন্তু না, লোক দুটো কোনো কথা বলে না। ভারবাহী একাব্বর ওর মতো করে তার কাঁধের ভৱিত করতে থাকে।

প্রায় হাটের মুখে আর একজন অপেক্ষমাণ মানুষ। প্রচুর অস্থিরতা তার চোখেমুখে। সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে প্রচুর আমার প্রায় শরীর যেঁমে জানিয়ে যায় ফিসফিস করে, কোথাও থামবেন না। একেবারে চুকে যাবেন হাটের ভেতরে। দোকান ঠিক করা আছে। ওখানে দিয়ে যাবে সে আমাদের। কথাগুলো বলেই লোকটা দ্রুত সরে যায়। আমরা এগুতে থাকি। মজিব খবর পাঠিয়েছিলো ঠিকভাবেই। ওর খবর অনুযায়ী হালিম মাঝে সব জায়গায় ঠিকঠাক মতো তার লোক সেট করে রেখেছেন। সব তার সর্দারপাড়ার নিজস্ব লোক। কিছু দূর পরপর তার নিয়োজিত লোকজন চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করে সঠিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে যাচ্ছে। ব্যবস্থাটা অত্যন্ত চমৎকার। ফলে ঠাকুরপাড়া হাট পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে আসার ব্যাপারটা নিরাপদ আর নির্বিঘ্ন হয়ে পড়ে। রেকি করে এগুনোর প্রয়োজন পড়ে না। যা হোক, অনেকটা উদ্বেগশূন্যভাবেই আমরা ঠাকুরপাড়া হাটে পৌছে যাই।

৪তম রাজাকার কমান্ডার সৈমত

বিরাট জমজমাট হাট। মানুষজনে গিজগিজ করছে। বিকেল পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটাৰ মতো সময় তখন। হাটের প্রবেশমুখে সামান্য দিধা মনে জাগলেও, মুহূর্তেই সবকিছু ঘোড়ে ফেলে মানুষের স্নোতে চুকে যাই। গায়ের সাথে প্রায় না লাগিয়ে রেখে পথ প্রদর্শকের পেছন পেছন আমরা এগিয়ে যাই। এখন আর কিছু ভাববার নেই, পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ভাবনাও প্রায় চেতনাহীন এরকম একটা মানসিক অবস্থায়

মানুষের জটলা, ভিড়বাটা আর মাটিতে বিছানো দোকানের সারি পার হয়ে এক জায়গায় এসে আমাদের যাত্রাবিবরতি হয়। কাঁচা বাজারের কেনাবেচার ব্যস্ততার ভেতরেই আমরা তিনজন তার পেছনে দাঁড়াই। পথ-প্রদর্শক দাঁড়ায় তার সামনে। তাকে দেখেই বেচাবিক্রিতে ব্যস্ত লোকটা সচকিত হয়ে ওঠে। আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই আরে বসেন, বসেন বলে তার বসার জায়গাটার পেছনকার একটুখানি জায়গা সামান্য ঝেড়েবুড়ে আবার খরিদ্দারদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সামান্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে নিচু গলায় বলেন, খানের দল বোধ হয় আসে নাই। এখন পর্যন্ত দেখা যায় নাই। রাজাকাররা আসতে পারে।

ঠিক আছে, আপনি ব্যবসা করেন বলে উঠে দাঁড়াই। মালেক এখানে মাল নিয়ে বসে থাক, নড়বি চড়বি না, বলে একাবররকে নিয়ে দোকানের দু'পাশের সারির মাঝখানকার মানুষজনের ভিড়ে মিশে যাই। একাবররকে পশ্চিম দিকে যেতে বলি, আমি যাই পূব দিকে। সমস্ত বাজারটা নিজেদের চোখে দেবা দরকার। তাকে বলি কোথাও থামবি না। জোরে পা চালিয়ে ও-দিকটা দেখে আসবি। আমি দেখছি এদিকটা।

ওর সঙ্গে কথা শেষ করেই আমি পুবের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাই। বিরাট এলাকা জুড়ে দু দিনের সামগ্রিক বাজার। মাছ-মাংস থেকে পুরু করে কাঁচা তরিতরকারি-সবজিআনাজসহ নানা রকমের মনোহারী দুর্বা ও শাড়ি-কাপড়ের দোকানের পাশাপাশি অঙ্গুয়ায়ী চালাঘর আর তার বাইরে প্রাচীনতে নানা পসরা সাজিয়ে ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা বসেছে। বাজারের বাইরের পাইকারে রাস্তা ঘেঁষে অনেক গরুর গাড়ি দাঁড়ানো। গাড়ির পাশে দাঁড়ানো মেছেজার জোড়ায় জোড়ায় গরু-বলদ। চোখে-মুখে তাদের উদাস ভঙ্গি। আর সেই অনন্তর জাবর কাটছে তারা। ধান-চাল-পাট-কলাই ও সরঞ্জের কেনাবেচা চলছে। অসবের বস্তা গাড়ির সামনে রাখা আছে। গাঁটারির পর গাঁটারি পাট গরু গাড়ির ওপর রাখা। দরদাম ঠিক হলেই ক্রেতাকে সেগুলো মেপে দেয়া হবে। ধান হাটি, পাট হাটি, মাছহাটি, মাংস হাটি আর এককোণে পথের পাশে বসা নাপিতের দোকান আর কাঁচা বাজারের একাংশ ঘুরে দ্রুত ফিরে আসি অপেক্ষমাণ মালেকের কাছে। বাজারের পশ্চিম দিকে কয়েকটা স্থায়ী দোকান। চামিটি আর মুদিদের স্থায়ী দোকান ঘর সেগুলো। একাবরর সেদিক থেকে ফিরে আসে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সঙ্গে তার পথ-প্রদর্শক। না, আজ পাকসেনারা বাজারে আসে নি। তবে কয়েকজন রাজাকার এসেছে। হাতিয়ার ছাড়া। তাই ওদের চিহ্নিত করা মুশকিল। তবে সৈমত আছে।

- সৈমত আছে?
- হ্যাঁ আছে।
- কোথায়?
- চায়ের দোকানে।
- চলেন দেখে আসি।

পথ-প্রদর্শককে নিয়ে হনহনিয়ে ভিড়ের ভেতর দিয়ে একেবেঁকে এগিয়ে যাই।

পথ-গ্রদর্শক ফিসফিসিয়ে বলে, চায়ের দোকানের প্রথম বেঁকিতে বসা তিন নম্বর লোকটাই হচ্ছে সৈমত। সে তার দলবল নিয়ে দোকানে বসে আছে। আমি সেখানে যাবো না। আপনি দেখে আসেন। কালোমতো লস্বা যে লোকটাকে দেখবেন, সে-ই সৈমত।

পথ-গ্রদর্শক চায়ের দোকানের একটু আগেই কেটে পড়ে। আমি এগিয়ে যাই সোজা সামনে দিয়ে। যাওয়ার সময় একনজর বুলিয়ে আমাদের টাগেটি চায়ের দোকানের প্রথম বেঁকে বসা কালো চেঙ্গা মতো লোকটাকে দেখে নিই। এরপর একটু এগিয়ে গিয়ে সামান্য ঘোরাপথে দ্রুত চলে আসি অপেক্ষমাণ একাব্বার-মালেকের কাছে। এর ভেতরেই সিন্ধান্ত যা নেয়ার, তা নিয়ে ফেলেছি।

— একাব্বার মালেক গেট রেডি। বস্তা খুলে টেনগান বের কর। ম্যাগজিন লাগিয়ে নাও। বাটপট। ফ্রেনেড নাও দুটো করে।

— মুহূর্তখানেকের ভেতরেই টেনগান বের হয়ে যায়।

— ফলো মি, বলে ডান হাতে টেনগান, বাঁ হাতে একটা ফ্রেনেড নিয়ে এগুতে থাকি। ওরা দ্রুত আমার পিছু নেয়।

মানুষজন প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না। আর বুঝালেও কিছু যায় আসে না। এখন আর দেখবার কোনো কিছুই নেই। একব্বরকম সোজাসুজি আনন্দের ভিড় ঠিলে টেনগান কাঁধে বুলিয়ে অটোমেটিক সুইচ সেট করে সোজা খুলে হাজির হই চায়ের দোকানের সামনে।

একাব্বর আর মালেক চায়ের দোকানের মুখে দাঁড়ায়। আমি সোজা ঢুকে যাই দোকানের ভেতরে। গ্রামের হাটবিহুরের চা-মিষ্টির দোকান। একটা কাঁচের আলমারিতে বিভিন্ন জাতের মিষ্টি সোজানো। দোকানের ডান দিকে উচুমতো লাকড়ির ছুলো। সেখানে চা তৈরি হুন দোকানের ভেতরে দেয়াল যেমে স্কুলের সিটবেঁকে হাইবেঁকের মতো তিন জেন্টাল বেঞ্চ। লোকে ভরতি বেঞ্জগুলো। সবার সামনেই কিছু না কিছু খাবার। চায়ের কাপ বা মিষ্টি জাতীয় কিছু। সবাই মশগুল গল্লেসঞ্চে। একজন বলছে, অন্যরা শুনছে। আমার সোজাসুজি দোকানে শেকার ব্যাপারটা প্রথমে ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু মুহূর্তখানেকের ভেতরেই সমস্ত পরিবেশ পাল্টে যায়। তারি গলায় আমি ঘোষণা করি, কেউ একচুল নড়বেন না জায়গা থেকে, পালাবারও চেষ্টা করবেন না। বাঁ হাতে ধরা ফ্রেনেড উঁচিরে বলি, এটা ফ্রেনেড, বোম, কেউ নড়ার চেষ্টা করলে সমস্ত কিছু উড়িয়ে দেবো। সবাইকে গুলি করে মারবো।

আমার আকস্মিক প্রবেশ এবং চাবানো কঠিন গলায় উচ্চারণ এবং আদেশের ভঙ্গিতে বলা কথাগুলো যেনে চায়ের দোকানে বজ্জপাত ঘটায় উপস্থিত লোকগুলোর ভেতরে। আমার হাতে উদ্যত টেনগান আর ফ্রেনেড। দরোজার মুখে টেনগান উঁচিয়ে আছে আরো দু'জন। লোকগুলো যেনে হঠাৎ করে থেমে যায়; হ্রবির হয়ে যায়। হতবিহুল এবং ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তারা এতেটাই ভীত হয়ে পড়ে যে, কেউ একচুল পরিমাণ নড়বার সাহস পায় না। তবে যে-যা করছিলো, যন্ত্রচালিতের মতো তাই করতে থাকে। যে লোক চা খাচ্ছিলো, সে চা খেতে থাকে। যে অন্য কিছু খাচ্ছিলো,

সে তাই থাকে। যে লোকটা চা বানাছিলো, সে খটখট শব্দ তুলে চায়ের কাপে চিনি গুলতে থাকে। যেনো সেটাই তার একমাত্র সারা জীবনের কাজ। লোকগুলোর মুখের দিকে কয়েকবার দৃষ্টি বুলোই। পেছনে দুই বিষ্ণু অনুগামীর অবস্থান দেখে নিই আরেকবার। তারপর ঠাণ্ডা গলায় জিগ্যেস করি, সৈমত কে? কার নাম সৈমত?

— কথা বলে না কেউ। এবার প্রচণ্ডভাবে ধমকে উঠি। লোকগুলো যেনো সেই ধমকের হারে কেঁপে ওঠে।

— সৈমত কে, বলেন। নইলে সবাইকে গুলি করে মারবো। বোম দিয়ে উড়িয়ে দেবো এই দোকান ঘর আর সমস্ত বাজার। দোকানে উপবিষ্ট লোকজনের চোখে-মুখে যেনো যম দেখার আতঙ্ক। এবার ওরা সবাই দৃষ্টি নিবন্ধ করে প্রথম বেঞ্চে বসা কালো চেসা মতো লোকটার দিকে। কেউ কথা বলে না। শুধু চা বানাচ্ছে যে লোকটা, তার অনবরত চায়ের কাপে চামচ দিয়ে চিনি গলানোর খটখট শব্দ একনাগাড়ে বেজে চলে।

— এবার এগিয়ে যাই সামনেকার প্রথম বেঞ্জির দিকে। বুকের সোজা টেনগান ধরে বলি, আপনি সৈমত মিয়া, দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান।

ফ্যাকাশে মুখে উঠে দাঁড়ায় লোকটা।

— কী নাম আপনার?

— জে সৈমত। কাঁপা এবং ভাঙা গলায় কোনো রকমে উচ্চারণ করে কথাগুলো সে।

— বাহির হন, বাইরে আসেন।

কোনো উপায় নেই তার। জাহাঙ্গীর করে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তার শরীর হাতড়াকে ঘোক। গায়ে একটা পাঞ্জাবি। পরনে লুঙ্গি। না, কোনো হাতিয়ার নেই। তবে পকেটে অনেকগুলো কাগজ পাওয়া গেলো। পাওয়া গেলো একটা সার্টিফিকেটও।

পাক আর্মির মেজরের স্বাক্ষর করা। কাগজগুলো দ্রুত পকেটে পুরে নিই।

— রাইফেলটা কোথায়?

— জি, আনি নাই।

— কোথায় সেটা?

— বাড়িতে।

— কয়জন রাজাকার সাথে এনেছেন?

— জে, ৫ জন।

— কোথায় ওরা?

— জে বাজারে।

— ঠিক আছে, বাহিরে আসেন। যান বাহিরে।

— ইত্তেজত করতে থাকে সৈমত মিয়া।

আবার প্রচণ্ড ধমক আমার, বাহিরে আসেন বলছি, তা না হলে সবাই মারা পড়বে।

তখন সে ধীরে ধীরে বাইরে আসে : চায়ের দোকানের সামনেকার জটলা পাতলা হয়ে গেছে । লোকজন সটকে পড়েছে ।

— ‘মালেক রেডি’ বলে সৈমতের বাঁ হাত শক্ত করে ধরে রাখি । মালেক দ্রুত রেডি হয়ে তার ৪/৫ হাত সামনে দাঁড়ায় । তার হাত ধরে থাকা অবস্থায় অর্ডার দিই, ফায়ার !

সৈমত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মালেকের টেনগান গঞ্জে ওঠে । সামনাসামনি সরাসরি আঘাত । ঢলে পড়ে সৈমত মিয়া ; আমার হাতের বাঁধন থেকে তার দেহ আপনাআপনি খসে পড়ে যায় । তখন একাব্বর তার হাতে ধরা টেনগান আকাশের দিকে তুলে ধরে পুরো ম্যাগজিন এক ব্রাশে শেষ করে দেয় । সৈমত চিত হয়ে পড়ে থাকে । আমরা দৌড়াতে থাকি হাটের মধ্য দিয়ে । হঠাৎ করে গুলির শব্দ, টেনগানের একটানা ব্রাশ পুরো জমজমাট বাজারের লোকজনকে ভয়ে হতকিকি করে তোলে । তাই উন্নাদের মতো দোকানপাট, কেনাবেচা ছেড়ে দিয়ে তারা দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি শুরু করে দেয় । চারদিকে হাঁকডাক-চিৎকার আর বিশৃঙ্খল অবস্থার চূড়ান্ত হয়ে যায় । এই রকম অবস্থার মুখে আকাব্বর একটা প্রেনেড ছোড়ার উপক্রম করতেই আমি জোর করে কেড়ে নিই মেটা । একটা প্রেনেড ছোড়া মানে বহু নিরপেরাধ সাধারণ মানুষের হতাহত হওয়ার প্রারণতি ভেকে আনা । তাই এই বিশৃঙ্খল অবস্থাটার প্রশমনে বাজারে ভীতিক্রিবল মানুষজনের উদ্দেশে আমি চিৎকার করে বলতে থাকি, আপনারা ভয় প্রিয়েন না । আমরা মুক্তিযোজ । আমরা আপনাদের বস্তু । আমরা আপনাদের সুরক্ষা আসি নাই । আমরা আপনাদের ক্ষতি করবো না । দেশের শক্ত, স্বাধীনভূক্ত শক্তকে আমরা খতম করেছি । আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন । অমাদেশ-আপনাদেরই ছেলে । আমরা জয়বাংলার জন্য লড়ছি । আমরা স্বাধীনতার শক্ত লড়ছি । যারা স্বাধীনতার শক্ত, যারা দেশের শক্ত, তাদের সবাইকে খতম করতে দেবো, আপনারা ভয় পাবেন না । আপনারা আমাদের সাহায্য করবেন । জয়বাংলার শক্তদের ধরিয়ে দেবেন ।

একটানা গলা ছেড়ে জনগণের উদ্দেশে চিৎকার করতে করতে একসময় আমরা বাজারের বাইরে চলে আসি । যে জায়গাটা দিয়ে আমরা হাটে মুকেছিলাম, রাস্তার সেই জায়গাটাতে আবার ফিরে আসি । বাজারে তখনও হৈচৈ, চিৎকার, দৌড়োপ আর বিশৃঙ্খলা চলছে । এই রকম অবস্থায় লক্ষ্য রাখিলাম, আমাদের দিকে কেউ এগিয়ে আসছে কিনা । না, বাজারের লোকজন কেবল তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা নিয়েই ব্যস্ত । আমাদের তিনজনকে তারা আটকাতে বা ধিরে ধরবে, এমন অবস্থা বা উদ্দেশ্য বাজারিদের মধ্যে নেই । তবুও সাবধানের মার নেই । তাই আমার টেনগান অটোমেটিকে দিয়ে ডান-বাঁয়ে আকাশের দিকে মুখ করে থেমে থেমে ব্রাশ করতে থাকি । একাব্বর মালেককে আগে রাস্তা ধরে দৌড়াতে বলি । এরপর টেনগানের পুরো ম্যাগজিন শেষ করে আমিও দৌড়াতে থাকি প্রাণপণ শক্ত এলাকার অপারেশন শেষে যত দ্রুত সঙ্গে যাওয়াই মঙ্গল, এখন আমরা সেটাই করছি ।

তিনজন একনাগাড়ে দৌড়ে একসময় সর্দারপাড়ার মোড়ের কাছে এসে থামি ।

প্রায় দু'মাইল দৌড়ে এসেছি। কোনোরকম বিপদ ছাড়াই নিরাপদ এলাকায় এসে পড়েছি। সামান্যক্ষণ দাঢ়িয়ে এবার একটু দম নেয়া প্রয়োজন। আমাদের দেখে একজন বৃন্দ এগিয়ে আসেন, বাবারা সহি সালামতে ফিরেছেন তো! কোনো ক্ষতি হয় নাই তো?

গভীর শ্বাস ফেলতে ফেলতে মাথা নাড়ি। বলি, না হয় নি।

— পানি খাবেন, আনবো?

মাথা নাড়ি, লাগবে না। ফিরবার পথে এখানে সর্দারপাড়ার মানুষ আমাদের জন্য লোক রেখেছে। গভীর কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে যায়। সুচারু শৃঙ্খলার সঙ্গে এরা আমাদের সমস্ত অপারেশনটাকে সফল করতে সাহায্য করেছে। এদের নিজেদের এই সংগঠিত শক্তি একদিন হয়তো সর্দারপাড়া গ্রামকে এবং গ্রামে বসতি স্থাপনকারী মানুষজনকে শক্তিশালী করে তুলবে। আজকের ভাসমান এই অবস্থা থেকে তাদের এই সংগঠিত শক্তি একদিন এ অঞ্চলে তাদের মজবুত ভিত্তি গড়তে সাহায্য করবে।

সক্ষ্য ছুই ছুই বেলায় হাইড আউটে ফিরতেই সৈমত খতম-এ খবর শোনামাত্র হাইড আউটের সবার মধ্যে ঝুঁপ্পোড় পড়ে যায়। মোতালেবসহ কয়েকজন আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে। ওদের কাঁধ থেকে নামামাত্রই মজিব দৌড়ে এসে হাত মেলায়। পিন্টু জাঙ্গিয়ে ধরে বুকের সাথে। এরপর সে হাঁক দেয় মিনহাজের উদ্দেশে চায়ের জন্য।

হাইড আউটের বাইরের চতুরে সবাই শিক্ষিত হয়ে বসি। সক্ষ্যার অঙ্ককারে জোনাকিরা তখনে আলো জ্বালে নি। কেবল সবাই উৎসুক হয়ে শুনতে চায় গোটা অপারেশনের বিবরণ। মিনহাজ চা দিয়ে থায়। আমার পাশে দাঢ়িয়ে থাকে দুই হিরো, একাকর আর মালেক। চলতে থাকে আজ বিকেলের ঠাকুরপাড়া হাটের সফল কমাড়ো হামলার বিবরণ।

১৯.৮.৭১

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

রাত নটায় আবার যাত্রা শুরু।

তখন এক ব্যাডের রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর প্রচারিত হচ্ছে। এবার নববীপ পাড়া মীরখানের বাড়িতে। পাকসেনার দল নিয়ে মীরখান তার ফসল তুলতে আসবে, এ ধরনের উড়ো খবর ক'দিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছিলো। মতিন সকালে খবর দিয়ে গেছে, আজ আসছে ওরা। ঠাকুরপাড়া মিশনে যাওয়ার আগে পিন্টুকে দল গঠন করে প্রস্তুত রাখতে বলেছিলাম। তৈরি ছিলো ২৫ জনের একটা শক্ত দল। নববীপ পাড়া এবং আশপাশের গ্রামের লোকদের খবর দেয়া হয়েছে। ডাক পাওয়া মাঝেই ওরা ছুটে আসবে। মীরখান পাক সেনাবাহিনী এবং বাজাকারদের সহায়তা নিয়ে আসবার চেষ্টা করলে ভেতরগড়ের নতুন হাটের কাছে তাদের বাধা দিয়ে আটকে দেয়া হবে। ফলে রাতের অঙ্ককারে আমাদের শক্তপক্ষের সঙ্গে হয়তো জড়িয়ে পড়তে হতে পারে বড় ধরনের যুদ্ধে। তাতে অসুবিধা নেই। যাদের যা করবার কথা, তারা তা চালিয়ে

যাবে। পরিস্থিতি যাই ঘটুক, মীরখানের সমস্ত ফসলের মাঠ আজ উজাড় করে দিতে হবে; সমস্ত ক্ষেত্রে যাতেকু ধান রয়েছে, তাও কেটে নিয়ে যাওয়া হবে। এ ব্যাপারে গ্রামের লোকজনদের আগে থেকেই জনান দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তারা সবাই ফসল কাটার জন্য কাস্টে ইত্যাদিসহ আসবে। মীরখানের ফসলের মাঠগুলো পরিষ্কার করে ফেলতে পারলে দুটো লাভ হবে। এক, ফসলগুলো গ্রামের অভাবী গরিব মানুষজনের ভেতরে বেটে দেয়া হবে। দুই, ফসলের ব্যাপারে প্রচণ্ড লোড নিয়ে মীরখান আর পাকবাহিনীসহ এ এলাকায় চুক্কবার সাহস পাবে না। ফলে পাকবাহিনী আর মীরখানের যে ত্যাগ সর্বক্ষণ স্থানীয়দের ছিলো, সেটা তাদের মনে আর থাকবে না।

মীরখানের বাড়িস্বর মুদ্রের প্রথম দিকে টোকাপাড়া বিদ্রোহী ইপিআর-এর দল জুলিয়ে দেয়। মীরখান তখন পঞ্চগড়ে পাকবাহিনীর আশ্রয়ে ঢলে যায়। কিন্তু টোকাপাড়া ক্যাম্পের কাছাকাছি নবদ্বীপ পাড়ায় তার পরিত্যক্ত বসতবাড়ি আর অন্যান্য সম্পদের ব্যাপারে নিজস্ব অনুচর পাঠিয়ে তার নিয়মিত খৌজখবর নেয়ার প্রচেষ্টা, স্থানীয় মানুষজনদের ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং সেই সাথে পাকবাহিনীর সহায়তায় জোর করে ফসল কেটে নিয়ে যাওয়ার সার্বক্ষণিক হুমকি এ এলাকার মানুষজনকে ভয়ে, বলা যায়, গুটিয়েই রেখেছে। মীরখান ফসল কাটার নাম করে এসে তার বসতবাড়ি জুলানোর প্রতিশোধ নেনে, জুকসেনাদের স্থানীয় নিরীহ অধিবাসীদের ওপর লেলিয়ে দিয়ে সমস্ত এলাকা জনপদ ছারখার করে দেবে, এ ধরনের ভীতিজনক উকি ভেতরগড় এলাকার জুককের কাছ থেকেই আমাদের শুনতে হয়েছে। টোকাপাড়া ক্যাম্প আক্রমণের পর তার ছেলেরা অন্য অনেকের সাথে পাকবাহিনীকে গাইড করে এনেছিলো মীরখানের পরিত্যক্ত বাড়িতে তারা সমবেত হয়ে টোকাপাড়া ক্যাম্প স্থাপনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়েছিলো। গোলাম গড়ানুর জীবন মান্যান্য জন্য রক্ষা পায়, তাও সময় মতো সরে যেতে পেরেছিলো বলে। তো, সেই মীরখানের ভয়-ভীতির বীজ চিরতরে উচ্চেদের জন্যই আজকের এই অভিযানের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি।

ঠাকুরপাড়া হাটের অপারেশন থেকে ফিরে প্রায় অবসন্ন শরীর নিয়ে বাইরের চতুরে ঘাসের মাদুরের ওপর শুয়েছিলাম। সমস্ত অপারেশনটায় নার্তের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে প্রচণ্ড চাপ। তখনও মাথা থেকে ভোঁ-ধৰা ভাবটা কেটে যায় নি। একটা সফল অপারেশন শেষে যাবতীয় টেনশনমুক্ত ইওয়ার পর মনের মধ্যে যে প্রশান্তি আসার কথা, সেটা যেনো আসছিলো না। কেমন একটা অস্থির্তি আর ছটফটে অশান্ত ভাব মন আর শরীর জুড়ে চেপে বসে আছে। হাইড আউটের বাইরের চতুরে ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে তাই শরীর আর মনকে সুস্থির করাবার চেষ্টা করছি।

তেতরে ছেলেরা আহারপর্ব শেষে তৈরি হচ্ছে। এক ব্যান্ডের রেডিও থেকে স্বাধীন বাংলা বেতারে বাবুল চৌধুরী খবর পড়ছেন। বাবুল চৌধুরীর পর ইংরেজিতে খবর পড়লেন পারভাইন হোসেন। কলম আর শব্দ সৈনিকেরা আগ্রাগ চেষ্টা করছেন তাদের ক্ষুরধার লেখনী বেতার মারফত প্রচার করে দেশের জনগণকে উদ্বৃত্তিপন্থায়

প্রাপ্তি করতে। এপারে আসা মানুষদের আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে আর যুদ্ধের মাঠে দিনরাত রণক্ট্রান্ট মুক্তিযোদ্ধাদের উজ্জীবিত করতে। নানা ধরনের প্রোগ্রাম করছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আছে বজ্রকষ্ট, জলাদের দরবার, চরমপত্র, নটক, দেশাঞ্চলবোধক গান আর যুদ্ধের অগ্রগতির খবর। আছে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার আর বিভাষিকার খবর। আছে তাদের পরাজয় আর মৃত সাথিদের লাশ ফেলে পালানোর খবর, ফ্রন্টে ফ্রন্টে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় ছিনয়ে আনার উদ্দীপনাময় খবর। আছে প্রবাসী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিকিবিদ, নানা পেশায় জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাত্কার, বক্তব্য ও কথিকা। স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সালাউন্ডিনরা মুক্তিযুদ্ধের তহবিল গড়ে তোলার জন্য ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলে বেড়াচ্ছেন তাদের খবর, আছে প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সংহতি প্রকাশের খবর। আছে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যির জন্য বিশ্ববিবেকের প্রতি আহ্বান। সেই সাথে বাংলাদেশকে সাহায্য ও স্থীরতি দেয়ার জন্য বিশ্বের সকল দেশ ও জাতির প্রতি আহ্বানের প্রচার সংবলিত অনুষ্ঠান।

আমাদের পক্ষে নিয়মিত স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবার সময় ও সৌভাগ্য হয় না। কিন্তু যুদ্ধযাত্রায় যাওয়ার আগে প্রতিদিনই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আমরা শুনে যাই। কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম নয়। সক্ষার পর সমস্ত প্লেই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কেউ না কেউ রেডিও অন করে দেয় চালু করে যারা যুদ্ধের জন্য নির্বাচিত হয় না, কেবল তারাই শুনতে পায় মনোযোগ দিয়ে। আমরা যারা প্রায় প্রতিরাতেই যুদ্ধযাত্রী, তারা যুদ্ধের সাজে সাজতে স্মরণে বিছিন্নভাবে শুনতে পাই প্রোগ্রামগুলো। শুব একটা মন বসানো যায় না তখন কিন্তু বজ্রকষ্টের বেলায়! সেই বলিষ্ঠ বিশাল হৃদয়ের সাহসৃত্ব বঙ্গবন্ধুর কষ্ট যথন শমগম করে বেজে ওঠে 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, বাংলার মানসে স্বাধীন করে ছাড়বোই ইন্শাল্লাহ', তখন থমকে দাঁড়াতে হয়। ইথারে ভেসে আসা সেই সিংহদণ্ডয় বাঙালি পুরুষের স্বাধীনতা ঘোষণার সেই বজ্র হস্কার না শুনে যুদ্ধে যাওয়ার উপায় থাকে না। কোথায় এখন বঙ্গবন্ধু? পাকিস্তানের কোনো এক অঙ্ককার কারাগারের প্রকোষ্ঠে। তার নাকি বিচার হচ্ছে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। বিচারের প্রসন্নে তাকে হয়তো মৃত্যুদণ্ড দেয়াও হতে পারে, ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত খবরাখবরে এ ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। অস্থির হয়ে ওঠে মনের ভেতরটা। ভালো লাগে না কোনো কিছু।

আমাদের সামনে বিরাট এক শক্তিশালী দখলদার বাহিনী। একদিকে চীন এবং আমেরিকা সমানে তাদের মদদ যুগিয়ে যাচ্ছে। এধরনের গেরিলা যুদ্ধ করে, কবে ওদের পরাজিত করা সম্ভব হবে? এভাবে কি দেশ স্বাধীন করা যাবে? ফিরিয়ে আনা যাবে কি বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে? কবে, কতোদিনে সম্ভব হবে সেটা? কিংবা আদো কি সম্ভব হবে? আমরা কি তাহলে ভিয়েতনাম কিংবা প্যালেস্টাইনের মতো দীর্ঘস্থায়ী কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিঃ ভারতই-বা আমাদের কতোদিন টানবে? এমনিতেই তো প্রায় কোটিখানেক মানুষের ভারে এই গরিব দেশটির অর্থনৈতিক

মেরুদণ্ড ভেঙে পড়াবার যোগাড়। আমাদের নিয়ে ওদের সামাজিক জীবনেও তোলপাড়ের অন্ত নেই। নকশালদের থামাতে এরা হিমশিম থাক্কে। ২৫ মার্টের কালরাতে যে যুক্ত পাকিস্তানিরা বাঙালি জাতির ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, এর শেষ কোথায়, কবে, কতোদিনে, কে জানে!

এইরকম নামা ভাবনা আর মনের আলোড়নের মুখে পিন্টু এসে বসে মাথার কাছে, মাহবুব'ভাই, আপনি থাকেন। খুব টায়ার্ড হয়েছেন। তাছাড়া বিকেলে এতো বড় একটা অপারেশন থেকে ফিরে এলেন।

পিন্টুর আন্তরিকতার ছোয়ার হঠাতে করে যেনো মনের সমস্ত অসারতা আর জড়তা দূর হয়ে যায়।

— বিড়ি আছে পিন্টু! ওর আন্তরিকতার সাথে সুর মিলিয়ে জিগ্যেস করি।

— আছে, আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।

— ধরাও।

বিড়ি ধরিয়ে দেয় পিন্টু। তারপর আকাশের দিকে মুখ করে গা ঘেঁষে দুঁজন শুয়ে থেকে বিড়ি টেনে ছলি। আকাশে হালকা মেঘের আন্তরণ। মাথার ওপরে গোলাকার চাঁদ। কখনো মনে হয় চাঁদ দৌড়াচ্ছে, কখনো মনে হয় ঘেঁষ। ছেলেরা ভেতরে তৈরি হতে থাকে। আমরা দুঁজন চৃপচাপ বিড়ি টেনে চল উঞ্জার আকাশে চাঁদ ও মেঘের দৌড়বাজি দেখি। এই সময় মুসা আর একরামুল ঝুঁকের সাজ পরে বের হয়ে আসে। রিপোর্ট দেয়, সব রেডি।

— সবকিছু নেয়া হয়েছে তো?

— জি, ঠিক আছে। এই সহজের কী হয়, আমি আমার টেনগানটা নিয়ে একরামুলকে আদেশ দিয়ে গাবান্ত দিয়ে উঠে দাঢ়াই। টোকাপাড়ায় একবার পিন্টুরা সাংঘাতিক মার খেয়েছিলেন, তাই টোকাপাড়ার কাছাকাছি আবার তাদের ভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। আস্তকে থাকতে হবে তাদের সাথে এবং থাকাটা একান্ত জরুরি। যুদ্ধের মাঠে আরাম আর বিশ্রাম, এসব হারাম। ইমোশনাল হওয়াটাও অপরাধ। যুক্ত যুক্তই। এর আলাদা কোনো সংজ্ঞা নেই।

ফসল কাটার অভিযান

রাত সাড়ে নটার দিকে টোকাপাড়া গড়টার কাছে এসে পৌছানো গেলো। গড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। গোলাম গউস যেখানে মারা গিয়েছিলো, তার ওপর দিয়ে আমাদের গড়টা পার হতে হবে। বাঁয়ে টোকাপাড়ার সেই পরিত্যক্ত ক্যাম্প। ডানে গড়ের নিচেই গোলাম গউসের কবর। দুটো জায়গার দূরত্ব প্রায় সমান। গড়ের এপারে এসে ঢালু প্রান্তরে বুনো লেবু পাতা ঘাসের আড়ালে সবাই অবস্থান নেবার পর পিন্টুকে বলি রেকি করার জন্য। না, আমাদের কেউ যাবে না। মতিন, মকতু এবং গ্রামের আরো দুচারজন লোক শিয়ে দেখে আসবে, মীরখানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পরিষ্কার আছে কি না। শোনামাত্রই মকতু আর জোনাব আলী উঠে দাঢ়ায়। মতিন গাইগুই করতে থাকলে পিন্টু তাকে একটা চাপা ধমক লাগায়। ওরা তখন এগিয়ে যায়

নবদ্বীপ পাড়ার রাস্তা ধরে মীরখানের বাড়ির দিকে। অঙ্ককারের দিকে মুখ করে জ্যোত্ত্বার আলোতে লেবু ঘাসের বুনো জঙ্গলের আড়ালে চমৎকার এক গুরু ছড়ানো পরিবেশে আমরা বসে থাকি। আজকের এই অপারেশনে দুলু আর মজিবসহ আমাদের হাইড আউটের প্রায় সবাই শামিল হয়েছে। বলতে গেলে একটা বিরাট দল। মুক্তিযোদ্ধা ২৫ জনসহ গ্রামের ৩০ জন মানুষ। সেই সাথে মজিব-দুলুরা ৫ জন। মোট ৬০ জনের একটা 'দু' প্লাটুনের বাহিনী মনে হচ্ছে আমাদের আজকের দলটাকে। মিনিট বিশেকের মধ্যেই ফিরে আসে মকতু ও মতিনের দলটা রেকি করে। না, কেউ নেই। নিশ্চিত আর নির্ভর গলায় জবাব দেয় মকতু মিয়া।

কেউ যখন নেই, তখন সোজাসুজি হেঁটে এগিয়ে যাওয়া যাবে। তবে সবার হাতেই হাতিয়ার থাকবে উদ্যত। সেফটি কেস থাকবে অন করা। সবার আঙুল থাকবে ট্রিগারের ওপর বসানো। এভাবে সবাইকে নির্দেশ দিয়ে আমাদের বাহিনীকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। আমাদের অনুসরণ করে অন্যরা আসতে থাকে পেছনে পেছনে। প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট একনাগাড়ে হেঁটে আমরা এসে পৌছাই মীরখানের পরিত্যক্ত পোড়োবাড়িতে। বাটপট রেকি করার কাজ সেবে একরামুল আর মুসাকে মতিনের গাইডে পাঠিয়ে দিই ভেতরগড়ের নতুন হাটে। পঞ্চগড়-ভেতরগড় আর অমরখানার সংযোগস্থল ওটা। শৰ্ক এলে সেখানে তারা প্রাথমিক বাধার সৃষ্টি করবে। এরপর এগিয়ে যাবো আমরা।

একরামুল মুসা এগিয়ে যায় ওদের ইঙ্গিষ্ট প্রতিবেদের দিকে। ফসল কাটা মানুষেরা তখন নেমে যায় হাঁটু অবধি পানিতে। পাটক্ষেতের মধ্যে খচাখচ শব্দ তরঙ্গ তুল তারা তাদের কাজ শুরু করে। ধৰ্মসংগ্রামের খেটে-যাওয়া পরিবারের ছেলে সদস্যদের নিয়ে গড়ে তোলা আমাদের মুক্তিবাহিনী। অনেকেই উশাখূশ করতে থাকে। পিন্টুকে বলি, যারা নামতে ক্ষুশ্যমামিয়ে দাও। পুরনো অভ্যেস ওরা ছাড়তে পারবে কেনো? তবে হাতিয়ার যেজো পিঠে ঝুলিয়ে রাখে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র ৮/১০ জন ঝাপিয়ে পড়ে ক্ষেত্রে মধ্যে। গ্রামের মানুষজনের সাথে তখন ওরা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

চাঁদের আলো-আঁধারির ভেতরে আমরা রাস্তার ওপর প্রায় নুয়েপড়া বাঁশঝাড়ের নিচে বসে থাকি। বিড়ি টানি। গল্প বলি। পিন্টু-দুলুর গলা মেশানো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি। সময় বহতা নদীর মতো দ্রুত এগিয়ে যায়। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। কেবল অঙ্ককারে দুজনের হাত কেটে যায় কঁচির আঘাতে। তবে তেমন মারাঘাক কিছু নয়। তোরের আলো ফুটবার সাথে সাথে কাজ শেষ হয়ে যায়। সামনের পাটক্ষেত ঝাকঝকে পরিষ্কার। বাটপট পাটের আঁটি পানিতে ডুবিয়ে রাখার কাজও শেষ হয়। ধানের আঁটি বাঁধা হয়। মুসা আর একরামুল তাদের দলবল নিয়ে ফিরে আসে। যারা ফসল কাটতে এসেছিলো, তাদের মধ্যে ধানের আঁটি ভাগ করে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে সকাল জেগে ওঠে। আমরা টোকাপাড়া গড় পার হয়ে এগিয়ে চলি নালাগঞ্জের দিকে।

'গুড় বাই' মেজর দরজি

মেজর দরজি এলেন সকাল সাড়ে দশটার দিকে। এসেই বেশ তাড়াহুড়ো শুরু করে দিলেন। তার আসবাব স্বল্পক্ষণ আগেই আমরা এসে পৌছেছি। রাতের অপারেশনের পরিশ্রমজনিত ধক্কল প্রত্যেকের সারা শরীরে। প্রতিদিনের মতো পিন্টু আছে আমার সাথে। সাথি হিসেবে এসেছে ৭/৮ জনের আর একটা দল। এদের সঙ্গে আনা হয়েছে গোলাগুলি, জিনিসপত্র আর ছাগল-বকরিসহ বেশনের রসদ বহন করার জন্য। সাধারণত এরা মুক্তে কম যায়, কিন্তু এসব কাজে এদের জুড়ি মেলা সত্যিই ভার।

দরজির মেজাজ-মর্জি আজ কেমন যেনো ঠেকছে। তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে বসেই বললেন, রিপোর্ট দাও জলাদি। আজ আমাদের অভ্যর্থনা জানানোর কোনো চিহ্ন নেই তার মধ্যে। কেমন একটা ভাব! আমরা বিগত তিন দিনের আমাদের তৎপরতার বিবরণ দিই। তিনি নির্বিকার ভঙ্গিতে লিখে নেন সেটা। আজ তাকে বেশ বিমর্শ আর অন্যমনক্ষ লাগে। একই রকমভাবে তিনি সব ধরনের হাতিয়ার আর সর্বশেষ গোলাবারুদের খরচ ও মজুদের হিসেব চান। অন্তর্শস্ত্রের হিসেব দিতে অসুবিধে হয় না। সর্বশেষ গোলাগুলি খরচের হিসেব নোট বুকেই পাওয়া যায়। তবে মজুদ গোলাবারুদের হিসেব দিতে গিয়ে কিছুটা মুশকিলে পড়তে হয়। কিন্তু দরজি আমাদের ইতস্ততভাব লক্ষ্য করে আজ আর রাগ করবন্স না। বরং বলেন, ইয়ার তোমাহারা নোট বইমে তো লিখ্যা হ্যায়। মিলাক্তে পাহলে, দেন টেল মি ইউর স্টক পজিশন।

কথাটা শোনায়াত্র দরজির সামনে প্রস্তুত রাখা লম্বা বেঝেও ওপর বসে পিন্টুসহ গোলাগুলির মজুদ মেলাতে থাকি। ভুক্তের বা নোট বুকের পাতা উল্টেপাল্টে। পিন্টু তার নোট বুক বের করে কিছুক্ষণ পাতা ওল্টায়। তারপর ফিসফিসিয়ে বলে, মাহবুব ভাই এ্যালা মুই কি করো? ভুক্তের তো আলাদা কোনো হিসাব নাই। যা-ও লেখাটেখা আছে, তা আমার চৌদ গোষ্ঠীও মেলাতে পারবে না।

আমি ওর কথার জবাবে বলি, চেপে যাও, একদম কথা বলবে না। শুধু পাতা উল্টে যাও। আর হিসেবের ভান করো। আমি সব ঠিক করে দিছি।

হিসেব হয়ে গেলে তোমার ফিগারটা শুধু আলাদা করে বলবে ব্যাস। পিন্টু সেভাবে তার ভায়েরি কাম নোট বইয়ের পাতার মধ্যে নিবিট হয়ে হিসেব মেলানোর ভান করে। মুখে বিড়বিড় করে সংখ্যার পর সংখ্যার উচ্চারণ করে। সত্যি পিন্টুটা শুধু রসিকই নয়, পাকা অভিনেতাও। গঁজির মুখে ওর বিড়বিড় করে হিসেব মেলানোর অভিনয় দেখে আমার হাসি পেয়ে যায় খুব। প্রায় হেসেই উঠছিলাম শব্দ করে, কিন্তু মেপালি ওস্তাদ সে যাত্রা বাঁচিয়ে দেন। চা-বিক্সুট নিয়ে আসেন তিনি। পরিবেশন করেন মেজরকে। আমাদের হাতেও ধরিয়ে দেন এক মগ করে চা।

চা খাই আর হিসেব মেলাই। ঠিক এই রকম অবস্থায় দুম করে কথাটা পাড়েন মেজর দরজি, মাহবুব, হাম আজ চলা যাত্ব হ্যায়। আই এ্যাম গোরিং টু-ডে। আজ মেরা আবারি দিন হ্যায়। আজ হাম আয়া তোমাহারা সাথ মিলনে আওয়া তোমাহারা লেটেট অপারেশন রিপোর্ট লেনেকে লিয়ে।

আপনা থেকেই চা খাওয়া থেমে যায়। সেটি বই দেখে গোলাবারুদের হিসেব
মেলানোর নিবিষ্টিতাও কেটে যায়। আমরা দু'জনই তার মুখের দিকে তাকাই।
আমাদের চাউনিতে কেমন বোকা বোকা ভাব। মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসে, স্যার,
আপ চলা যায়গা? হামলোগকা কেয়া হোগা? কোন্ দেখেগা?

হেসে ওঠেন মেজর দরজি। তার বিমর্শ ভাবটা কাটিয়ে ওঠে বলেন, আউর কু-ই
অফিসার আয়েগা, হি মে বি গুড অফিসার দ্যান মি।

— মগর স্যার— অনেক কথা মনের ভেতরে, সেগুলো বলতে চাই। তিনি তখন
হাসেন খুব শব্দ করে। আমাদের মান-বিবর্ষ মুখ লক্ষ্য করে বলেন, কেয়া রে, কেয়া
হুয়া। হামতো বোলাখা না, মুখকো জানে হোগা। মেরা ইউনিট মুখকো তলব কিয়া
হ্যায়। নাউ আই উইল হ্যাড টু বিজি উইথ মাই ওউন ইউনিট। হিন্দি-বাংলা-ইংরেজি
মিলিয়ে আবেগমথিত গলায় এবার তাঁকে বলি, স্যার, আপনি ছিলেন, আমাদের
সাহস ছিলে। আপনাকে আমাদের নিজের মানুষ মনে করতাম আমরা। মেজর শক্তির
ছিলেন আমাদের প্রথম অফিসার। তার প্রচণ্ড ভালোবাসা আমরা পেয়েছিলাম। তিনিই
আমাদের আপনার হাতে তুলে দিয়ে যান। সেই থেকে আপনি আমাদের সুখ-দুঃখ
দেখছেন, অত্যন্ত দৃঃসময়েও আপনজনের মতো পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। সাহস
দিয়েছেন। উৎসাহ জুগিয়েছেন।

উঠে দাঁড়ান মেজর দরজি। বলেন, বয়েজ ভুক্তি বি ইমোশনাল। ইউ গো অন
ফাইটিং। তোমলোগ জয়বাংলা চাহিয়ে, ইয়ে জিজ্ঞাস হোগা। হাম লোগ হ্যায় তুমহারা
সাথ।

এমন সময় বিওপি'র বাইরে থাকা সড়কের ওপর একটি প্রাইভেট
ঝ্যামবেসডর এসে থামে। দু'জন উচ্চলাক নামেন গাড়ি থেকে। তাদের চেনা চেনা
লাগে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেদের তিনি কী যেনো জিগ্যেস করতে থাকেন।
পিস্টুকে নিয়ে এগিয়ে যাই সেদিকে। আরে, এতো আমাদের গনি ভাই! আমাদের
পাড়ায় কিছুদিন ভাড়াটে ছিলেন। চাকরি করতেন, ল' পড়তেন। সেই সৃতে গনি ভাই
আমার চেনা। তাঁর পাশে দাঁড়ানো শক্ত-সমর্থ যুবকটিকেও চিনে ফেলি। ছাত্রলীগ
নেতা রফিকুল ইসলাম ওরফে গোলাপ। কারামাইকেল কলেজে আমাদের দু' ক্লাস
ওপরে পড়তেন। ছাত্র রাজনীতিতে নিবেদিতপ্রাণ। আমাদের সময় কলেজ সংসদ
নির্বাচনে সম্ভবত এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

গনি ভাই আর গোলাপ ভাই এখানে হাঁচাঁ ব্যাপার কি? মনে খটকা লাগে।
গাড়ির সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে তারা কথা বলছেন। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে
জিগ্যেস করি, গনি ভাই আপনি এখানে রফিকুল ভাই আপনি কোথা থেকে?

গনি ভাই প্রথমে চিনতে পারেন না। খালি পা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে চার
পকেটওয়ালা কালো শার্ট, ঘোঁচা ঘোঁচা দাঢ়ি, উক্তবুক্ত চুল, কাঁধে বোলানো চেনগান,
এ চেহারায় গনি ভাই কেনো, আমার নিজের বাড়ির আপনজনেরও আমাকে হয়তো
চিনতে কঠ হওয়ার কথা। তারা দু'জনই তাকিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে।
বলি, কি চিনতে পারেন নাই আমাকে? আমি মাহবুব, শামসুলের ছেট ভাই। আমিন

সাহেবের সামনের ইস্পেষ্ট্রের বাসা।

এইবার তিনি চিনে ফেলেন আমাকে, রফিকুল ভাইয়েরও আর অপরিচিত থাকি না।

গনি ভাই বলেন, মাহবুব, তুমি কেনে এখানে? তার গলায় এবার আন্তরিকতাৰ সূৰ বাজে। আমি বলি, এ এলাকায় আমি যুক্ত কৰছি। কোম্পানি কমান্ডার। পাশে পিন্টুকে দেখিয়ে বলি, একে চিনেছেন? এ হচ্ছে পিন্টু। মুসিপাড়াৰ ছেলে। তিনি তখন এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধৰেন প্রথমে আমাকে। তারপৰ পিন্টুকে। পরিয় পৰ্ব শেষ হলে জিগ্যেস কৰি, এদিকে কেনে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন? কোথা থেকে আসছেন? গনি ভাই আমার প্ৰশ্নে হঠাৎ কৰেই কেমন যেনো বিৰুষ্য হয়ে ওঠেন। প্ৰায় কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, কুচবিহাৰে আছি। ইয়াথ ক্যাম্পে। একটা উড়ো খবৰ শুনলাম ক'দিন আগে। আমার ছোট ভাইটা নাকি এদিকে কোথাও মুক্তিযুদ্ধে মারা গেছে।

— আপনার ছোট ভাই! কী নাম তার?

— গোলাম গউস।

— কী বললেন, গোলাম গউস? সে আপনার ভাই?

— হ্যা, ছোট ভাই, বি.এস.সি পড়তো কাৰমাইকেল।

পিন্টু তখন বলে ফেলে সে তো আমাদেৱ সৌভাগ্য টোকাপাড়াৰ যুদ্ধে মারা গেছে, গত মাসেৱ ১২ তাৰিখে।

— গউস তোমাদেৱ সাথে ছিলো? কোথা গেছে! গনি ভাই তখন হাউমাউ কৰে কেন্দে ওঠেন। গউসৰে বলে জড়িয়ে ধৰেন আমাকে। কাঁদতে থাকেন আৱ পাগলৰ মতো প্ৰলাপ বকতে থাকেন, ভাই! গউস তুই চলে গেছিস, খবৰটা জানতেও পাৰিনি। এতোদিন পৰ জানতে থাবুৰুম...

— শান্ত হন গনি ভাই, শান্ত হন, শোনেন আমাদেৱ কথা।

গনি ভাই ঢুকৰে ঢুকৰে কাঁদতে থাকেন। মাথায় বাঢ়ি মারতে থাকেন। বুকে মারতে থাকেন চাপড়। পিন্টু তখন শক্ত হাতে তাকে ধৰে থাকে। রফিকুল ভাইও তাকে জড়িয়ে ধৰেন। ভাইয়েৱ মৃত্যুৰ শোক হঠাৎ কৰে গনি ভাইকে এমনভাৱে পেয়ে বসে যে, তার বহিৰ্গৰ্কাশ একটা প্ৰচণ্ড উন্নাদনাৰ রূপ পায়। তার কান্নাৰ হাহাকাৰ ঘনি সবাৱ মনেই সংক্ৰামিত হয়। প্ৰতোকেৱ চোখ পানিতে ভিজে যায়। নেপালি সুবেদাৰসহ ক'জন বি.এস.এফ.-এৰ সেপাই এগিয়ে আসেন বিওপিৰ ভেতৰ থেকে। তাদেৱ পেছনে পেছনে আসেন মেজৰ দৱজি।

— কেয়া হুয়া মাহবুব! জানতে চান তিনি। তু আৱ দে?

— স্যার ইয়ে গোলাম গউসকা বড় ভাই। গোলাম গউসেৱ মৃত্যুৰ খবৰ পেয়ে এসেছেন, কুচবিহাৰে থাকেন।

— গোলাম গউসকা ভাই! বলে তিনি সোজাসুজি টোকাপাড়া ক্যাম্পেৰ অবস্থানেৰ দিকে তাকান। আমাদেৱ ইউনিটে তার যোগদানেৰ প্ৰথম দিনেই গউস মারা যায়। গউসেৱ অন্তোষ্টিক্রিয়ায় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। মৃত, ক্ষতবিক্ষত

রক্তাক্ত গড়সের সেই দৃশ্য হয়তো তার শৃঙ্খিতে এখনো জুলজুলে। অস্ফুট দ্বরে তিনি
বলেন, গড়সের ভাই কুচবিহারে থাকেন, অথচ এতোদিন পর খোঁজ নিতে এলেন?
আমি তখন গনি ভাইকে বলি, গনি ভাই, ইনি আমাদের মেজর সাহেব, ক্রমান্তিং
অফিসার। এনার সাথে কথা বলেন। গনি ভাই এগিয়ে গিয়ে মেজর দরজির হাত
জড়িয়ে ধরে একইভাবে কাঁদতে থাকেন। আর বলতে থাকেন, সাব মেরা ছেট ভাই
গোলাম গড়স মর গিয়া, আমার আর বেঁচে থেকে কি হবে। দু ভাই আমরা এদেশে
এসেছিলাম। একজন চলে গেলো, নাউ হাউ ক্যান আই সারভাইভ? এরকম অবস্থায়
দরজিও অসম্ভব বিহুল হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, আইয়ে সাব আন্দার মে আইয়ে।
বইঠিয়ে। ডোক্টর ভাই। হি ওয়াজ এ হিরো, এন্ড হি ডাইড লাইক এ হিরো। ইয়ে তো
আপকা লিয়ে বড় সম্মান কি বাত হ্যায়!

গনি ভাইকে এক রকম টেমে নিয়ে গিয়েই তিনি ভেতরে বসান। তাকে শান্ত
করার চেষ্টা করতে থাকেন। সুবেদারের উদ্দেশে হাঁক পেড়ে বলেন, চা-নাস্তা দেয়ার
জন্য। এই ফাঁকে ছান্নেতা রফিকুলের সাথে কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করি।
তাদের কুচবিহারের অবস্থান সম্পর্কে খোঁজখবর নিই। দেশ থেকে অর্থাৎ আমাদের
জেলা শহর বংপুর থেকে কে কে এসেছেন, তারা কে কে থায় আশ্রয় নিয়েছেন, এসব
জানতে চাই। দেশের ভেতরকার খবর তারা আমাদের ভৌইতে বেশি জানেন। তাই
অধিকৃত নিজের জেলা শহরের খবর জানবার একটি প্রচও তাড়না পেয়ে বসে যেনো
হঠাতে করে। রফিকুল ভাইকে এখানে এভাবে কেয়ে যাবো ভাবতেই পারি নি। তাই
ভালো লাগে খুব। অত্যন্ত আপনজন মনে রেখে তাকে।

পিন্টু ভেতর থেকে আসে চা প্রক্রিয়বর নিয়ে। রফিকুলকে নিয়ে আমরা ভেতরে
যাই। বিশেষ চতুরে গাছগাছালির হুয়ায় সেখানে চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ ইত্যাদি পাতা,
সেখানে বাসি। গনি ভাই কুচবিহারে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছেন। মেজরও চুপচাপ বসে
আছেন দুঃখী মানুষের মুখ দিয়ে। চা থেতে থেতে মেজর বলেন, মি. গনি, হামারা
বহুত দুঃখ হুয়া, আই এ্যাম রিয়েলি সবি। আই এম লিভিং দিজ ইউনিট টু-ডে। ইয়ে
লাড়কে লোগ কো ছোড়কার হাম আজ চলা যাতা হ্যায়। আপ আজহি আয়া। দেন
টেল মি হোয়াট কেন আই দ্জ ফর ইউ? এ কথা শুনে গনি ভাই আবার ফুঁপিয়ে ওঠেন।
তাঁর অদমিত কান্না চাপতে গিয়ে করুণ আর ভাঙা গলায় কেবল বলেন, আপকেয়া
করেগা সাব। মেরা ভাই তো চলা গিয়া। উত্তো আর নাহি ফেরেগা।

— ইয়েস মি. গনি, ইট ইজ দি রিয়েলিটি। উত্ত আউর কাভি নাহি ফেরেগা।
মগার ম্যায়ানে আপকো এক গ্যারান্টি দ্যাতা হ, ইট উইল গেট ইয়োর জয়বাংলা
সামাজে। ইয়ে খুন বেগার নাহি যায়গা।

— আপ ঠিক কাঁহা স্যার। হি হ্যাজ গান ফর এভাব ফর দ্য সেক অফ আওয়ার
ফ্রিডম। আভি আপ দেয়া করেগা। অনলি ইট গিভ মি এ সার্টিফিকেট দ্যাট হি ইজ
ডেড। এন্ড হি ওয়াজ কিন্ত ইন ফাইটিং— মেরা ভাই গড়স মুক্তিফৌজ থা আউর উহ
যুদ্ধমে শহীদ হুয়া ইয়ে লিখকার মুৰো আপ এক সার্টিফিকেট দি জিয়ে। আমি
সবাইকে এটা দেখাবো। বলবো আমার শহীদ ভাইয়ের কথা, সেটা আমি রেখে

দেবো। যদি দেশ স্বাধীন হয়, যদি দেশে ফিরতে পারি, যদি রংপুরের রানীপুকুরে আমাদের গ্রামের বাড়িতে আমার বাবা-মাকে জীবিত দেখতে পাই, তাহলে তাদের বিশ্বাস করানোর জন্য এই সার্টিফিকেটটা দেখাবো, বলবো, তোমাদের না বলে ইতিয়া চলে গিয়েছিলো গড়স, সে মারা গেছে যুদ্ধ করতে করতে হিরোর মতো।

একটানা কথা বলতে বলতে গনি ভাইয়ের গলা বুজে আসে। মেজের তার পিঠে হাত রাখেন অন্তরঙ্গভাবে। তারপর আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে সামনের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। কি যেনো ভাবেন। তারপর তার প্যাড টেনে নেন। আমাকে জিগ্যেস করেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য এফ.এফ নামার অফ গড়স?

— জে.এল টু তার প্রশ্নের জবাবে বলি। হি ওয়াজ জুনিয়র লিডার এন্ড হিস নামার ওয়াজ জে.এল টু ইন আওয়ার ইউনিট।

— ও.কে দেন বলে মেজের তার প্যাডের ওপর থসথস করে লিখে চলেন, দিস ইস টু সার্টিফাই দ্যাট মি. গোলাম গড়স ওয়াজ এ এফ.এফ অব চাউলহাটি ইউনিট বেস। হি ভায়েড ইন টোকাপাড়া এ্যাকশন অন টুয়েলপথ জুলাই, সেপ্টেম্বর ওয়ান। হি ওয়াজ এ ব্রেত এন্ড কারেজিয়াস ফ্রিডম ফাইটার...।

এর কিছুক্ষণ পর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিত্তি চলে যান। যাওয়ার সময় সবার সাথে হাত মেলান তিনি। পিস্টুর পর আস্তের সাথে হাত মেলাবার সময় কিছুক্ষণ হাত ধরে থাকেন তিনি। বাঁকুনি দেন এক হাত কাঁধের ওপর রেখে উষ্ণ গলায় বলেন, মাহবুব ম্যায় তোমকো বহুত সেমন্দ কিয়া, বহুত বুড়া ল্যাংগুয়েজ ইউস কিয়া, ডোক কিপ দোজ ইন টুজুরে মাইভ। আই হোপ নাউ ইউ আর ক্যাপাবল এনাফ টু ট্যাকল আপ দ্য হাইয়েশন। প্রিজ লুক আফ্টার ইউ এন্ড ইয়োর বয়েজ। রিয়েলি আই এ্যাম ক্যাবি। তোর মাচ এ্যাফেকশন টু ইউ এন্ড এভরিবিডি।

হাত ছেড়ে দিলে তাকে সম্মুট করি। আপনজন ছেড়ে যাওয়ার বেদনা বুকের মধ্যে হা-হা করে বেজে ওঠে। গাড়িতে উঠবার সময় তিনি বলেন, ফের দেখা হোগ।

— কব স্যার?

— ইন ইয়োর কান্ট্রি আফ্টার লিবারেশন। ও.কে? দেন গুড বাই।

— গুড বাই— প্রতি উত্তর দিয়ে তার উত্তোলিত হাতের জবাবে আমরা সবাই হাত তুলে নাড়তে থাকি। চোখের সামনে দিয়ে রওনা দিয়ে দ্রুতগতিতে মেজের দরজির সেই পরিচিত একটানি আর্মি ভ্যান্টা দূরে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। মনের মধ্যে তখন শুধু একটাই শব্দ বেজে চলে, গুড বাই মেজের দরজি। গুড বাই।

২১.৮.৭১

গনি ভাই

গোলাম গড়সের যুদ্ধে মৃত্যুর সার্টিফিকেটটা ভাঁজ করে পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে গনি ভাই জিগ্যেস করেন, তোমরা উয়াক কোটে মাটি দ্যাঙ্গেন!

মেজের দরজি চলে যাওয়ার পর গনি ভাই শান্ত হয়ে এসেছেন। এখন তার আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। পিস্টু দূরে টোকাপাড়ার অবস্থানের দিকে

আঙুল উঁচিয়ে ধরে।

— ওঠে যাওয়া যাইবে? জিগ্যেস করেন তিনি। কত দূর হইবে?

— বলি, মাইল ৩/৪ হবে, যাবেন?

এবার গনি ভাই পিটু আর আমাকে দু'পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে আগের মতোই ডুকরে ওঠেন, মাহিনুব-পিটু গটস চলে গেছে, তোরা আমার গটস, আমার আপন ভাই। তোরা মারা যাইস না ভাই।

গনি ভাইয়ের এ ধরনের আচরণে আমরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাই। কিছু বলতে পারি না। প্রবল কান্নার উচ্ছ্বস আবারো তার গলায় ভর করে, গটস মোর ওপর রাগ করি মুক্তিফৌজে চলি গেলো। হা-হারে ভাইয়াক আর দেইখবার পানু না। তোমরা এটে আছেন, তোমরা এ্যালা মোর ভাই, ইন্ডিয়াত এ্যালা মোর কেও নাই। মুই একেলো একলা হয়া গেমুরে ভাইয়া...

রফিকুল ভাই পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন, কিছু বলেন না। তার ডেতরে কেমন যেনো একটা অস্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়। গনি ভাইয়ের উচ্ছ্বস আর বাড়তে দেয়া যায় না। অনেকটা জোর করে আমার গলা থেকে তার হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিই। বলি, যাবেন না গনি ভাই গটসের কবর দেখতে?

এবার তিনি সুস্থির হন। কী যেনো ভাবেন। রফিকুলের সাথে কী যেনো পরামর্শ করেন।

— কতদুর কইলা? ৩/৪ মাইল? বাংলাদেশে কত ডেতে?

— না, সীমান্তের এপারে। টোকাপটু ঘৃতের ঠিক নিচে।

— কোনো অসুবিধা নাই তো, প্রকৃত আর্মি?

— না, তারা তো অনেক দূরে। এখন তো ওটা মুকাবল। গতকাল সারা রাতই কাটিয়ে এলাম ওদিকটায়।

— দেখো, ঠিক করি কত কোনো অসুবিধা নাই তো!

বিরক্ত লাগে। নিশ্চেহ, নিরাসক গলায় বলি, রিস্ক থাকলে আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইবো কেনো? আর থাকলোই-বা কিছু রিস্ক! এতোদূর এলেন, ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পেলেন, আমাদের মতো পরিচিত এফ-এফদের পেলেন, ভাইয়ের কবরটা দেখতে যাবেন না?

চট করে সামলে নেন গনি ভাই নিজেকে। বলেন, কও কি? যাবো না মানে? নিজের ভাইয়ের কবর দেখতে যাবো না? তোরা আছিস না? রিস্ক কিসের? গোলাম গটস নাই, এখন তোরা আমার ভাই, তোরা আমার গটস। ঠিক আছে চলেন তাহলে। তবে গাড়িটা থাইক। আমাদের যাইতে-আসতে ৩/৪ ঘণ্টা লাগবে। একেলো কুচবিহার থাকি ট্যাঙ্কি ভাড়া করি আসছি, হামার গুলার ফিরতো ফিরবার নাগবে।

— না গনি ভাই, গোলাম গটসের কবর দেখে আবার এদিকে ফেরা হবে না। ওদিক দিয়ে আমরা আমাদের হাইড আউটে চলে যাবো। আপনারা গাড়ি ছেড়ে দেন। আজ আমাদের হাইড আউটে থাকবেন। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে থাকি,

কী অবস্থায় যুদ্ধ করছি, কী খাচ্ছি-দাচ্ছি, এসব আপনারা দেখে যাবেন। নেতা মানুষ আপনারা। চাকুৰ অভিজ্ঞতা নেয়ার পর বড়ো নেতাদের বলবেন সে কথা।

দোনোমনো শয়ে গনি ভাই তার এ্যামবাসেড-এর ভাড়া ফিটিয়ে দেন। আমরা তখন টোকাপাড়ার রাস্তা ধরে চলা শুরু করি। মুসার নেতৃত্বে রেশন আর গোলাবাকুন্দবাহী ছেলের দল ফিরে যায় হাইড আউটের দিকে। আমাদের দলে এসে জুটে যায় মজিব আর দুলু। তাদের সাথে গনি ভাইয়ের পরিচয় আগেই হয়েছে। ৬ জনের দল নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি টোকাপাড়ার কাছে গোলাম গড়সের কবরের উদ্দেশে। গনি ভাই পথ চলতে চলতে একতরফা কথা বলে চলেন। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকছে না তার কথাবার্তা। অধিকাংশ সময় তিনি নেতাদের মৃত্যুপাত ঘাটিয়ে চলেন। গালমন্দ করেন একজন নেতার নামধার্ম ধরেই। গভীর উচ্চা ঝরে পড়ে তার গলা থেকে। শালারা ইভিয়াত আসি হোটেলোত উইঠেছে। সুনে আছে, আরামে আছে। রঙ ধাইরছে ওমার। আর এদিকে হামার ভাইয়েরা যুদ্ধ করোছে, মরোছে, কোনো খোঁজ নাই। এবার ফিরি যাও, একেলে ঘৃষিতে নাক ফাটে ফেলাইম শালার।

আমরা কেবল এগিয়ে চলি টোকাপাড়ার দিকে। গনি ভাইয়ের কথা কিছু কানে যায়, কিছু যায় না।

এক সময় পথ ফুরায়। বেলা তখন দুপুর প্রকাশের মতো। রোদের প্রথর তাপে সবাই ঘামে ভিজে জবজবে। বাশের সাকেটাইপেগারে বাংলাদেশ। এপারে ভারত। সাঁকোটা ডিঙিয়ে বাংলাদেশে এসে গড়েন্টু প্রেসের উঠি। একটা বাঁশবাড় আর কয়েকটা বড়ো গাছের সমাহার এখানে। এরা অক্তু সামনেই গড়ের ঢালে ক্ষতিবিক্ষিত রক্তাক্ত গোলাম গড়সের লাশ প্রথম দেখেন্টিলাম আমরা প্রায় মাস দেড়েক আগে। এতোদিনে একবারও গড়সের কবরের কাছে যাওয়া হয় নি। ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি ওর কবরটাকে। গড়স এতো আপন ছিলো যে, ওর মৃত্যুর পর ওকে যেখানে আমরা কবর দিয়েছি, তার কাছ যেঁষে কেউ যেতে চাইতাম না। এটা বেছাপ্রাণেদিত কোনো ব্যাপার নয়। মনের ভেতরে কোথায় যেনো একটা অলিখিত বাধা কাজ করেছে। এপারে এলে সেই ব্যাপারটা তাই আপনা থেকেই পা দুটোকে থামিয়ে দিতো। কিন্তু এবার আর পারা যাবে না। এবার তার বড়ো ভাই এসেছেন। নিজের রক্তের ভাই। তাকে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং, একটু জিরিয়ে নিয়ে গড়ের ঢালু পাড়ে বেয়ে নামতে থাকি।

গোলাম গড়সের কবরের পাশে এসে আবার ভেঙে পড়েন গনি ভাই। এ ভয়টাই করেছিলাম। যাকে বলে আছড়েপাছড়ে পড়ে কান্না। গনি ভাই তার শহীদ ভায়ের পাশে এসে আবার সেই একইভাবে কাঁদতে থাকেন। গোলাম গড়স মারা গেছে জুলাইয়ের ১২ তারিখে। আজ আগস্টের ২১ তারিখ। পুরো ৪০ দিন পর এলাম আমরা গড়সের কবরের পাশে। এর মধ্যে বয়ে গেছে ঝড়-বৃষ্টির ধারা। ভাই ওর কবর কিছুটা দেবে গেছে।

বাশের বেড়া দিয়ে ঘের দেয়া হয়েছিলো কবরটা। মকতু মিয়া আর জোনাব

আলী গউসকে কবর দেয়ার পরদিন এসে কাজটা করে গিয়েছিলো । এ ক'দিনে বৃষ্টির পানিতে ভিজে ভিজে বাঁশের বেড়া পূরনো হয়ে গেছে । নরমও হয়ে পড়েছে । লতিয়ে উঠেছে বুনো ঘাসের জঙ্গল—কবরের ভেতরে আর বাইরেও । গনি ভাইয়ের কান্নার উথাল-পাতাল ভাব কমে এলে আমি বলি, আসেন গনি ভাই, কবর জেয়ারত করবেন । আমরা তো ওকে ঠিকমতো দাফন-কাফনও করতে পারি নি । আপনি ওর আপনজন । দোয়া করেন ওর আস্থার জন্য । খুব কষ্ট পেয়েছে বেচারা মারা যাওয়ার সময় । আসেন, হাত তুলেন, দোয়া করেন । আমার কথা শুনে গনি ভাই হাত তোলেন ওপরে । রফিকুলসহ অন্যরাও হাত তোলেন । মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন জুলে ওঠে । গউসের মৃত্যু আস্থার জন্য কী চাইবো খোদার কাছে? মনে মনে বলি, গউসের আস্থার শান্তি হোক খোদা । একদিন আমরা ওর মৃত্যুর শোধ নেবোই । আমাদের দেশ স্বাধীন হবে । জয়বাংলা হবে আর সেদিন আমরা গউসের শ্রণে বিরাট শৃঙ্খলসৌধ গড়ে তুলবো স্বাধীন বাংলাদেশে । অন্যরাও যে যার মতো দোয়া দরকাদ পড়েন । সবার চোখ পানিতে ভেজা । এক সময় দোয়া দরকাদ শেষ হয় । সবাই হাত নামিয়ে নেয় । তারপর কেমন একটা নিখর, হিমশীতল নীরবতা নেয়ে আসে । কারো মুখে কোনো কথা নেই আর তখন গনি ভাই বলে ওঠেন, কবরটা পার্ক করতে হবে মাহবুব ।

— ব্যাপারটা আমাদের পরিকল্পনার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত র্যাষ্টা চলে গেলেই আমরা কাজে হাত দেবো ।

— না, আমার ভায়ের কবর আমিই পর্যন্ত করবো, এটা তোরা আমাকে করতে দে । আমি তো ওর জন্য কিছুই করতে পারি নি । অন্তত ভাই হিসেবে এ দায়িত্বটা আমার ওপর দে তোরা ভাই ।

গনি ভাই কথাগুলো বলে আমার যেনো কান্নায় ভেঙে পড়তে চান । তাই তাকে সংযত করতে বলি, ঠিক অন্তর্ভুক্ত আপনি করবেন । আমরা আপনাকে সাহায্য করবো । ইট সিমেন্ট এসব আনতে হবে জলপাইগুড়ি-বেরবাড়ি থেকে । সময় লাগবে । রাজমিঞ্চি যোগাড় করতে হবে । এসব যোগাড়-যন্ত্র করতে সময় লাগবে । এখন চলেন হাইড আউটে যাই । বেলা হলো অনেক । খাবেন, রেষ্ট নেবেন । রফিকুল ভাইও চলেন ।

গোলাম গউসের কবর পেছনে রেখে আলপথ ধরে সোজাসুজি আমরা এগিয়ে চলি নালাগঞ্জের দিকে । গনি ভাই এখন একদম স্বাভাবিক মানুষ । দিবি দুলুর সাথে গল্প জুড়ে দিয়েছেন ।

হাইড আউটে ফিরতে ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায় । মেহমানদের গোসল করাসহ অন্য দিকগুলো দেখার জন্য মুসা-একরামুলের ওপর দায়িত্ব হেঢ়ে দিই । মিনহাজকে ডেকে চট্টগ্রাম ভালো কিছু খাবার যোগাড় করতে বলি । মিনহাজ মাথা ঝাঁকিয়ে চলে যায় ।

ক্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসতে চায় । টেনগান্টা কাঁধ থেকে নামিয়ে গায়ের জামা কেবল খুলতে যাবো, এমন সময় বাইরে থেকে ডাক আসে । পিটুকে নিয়ে বাইরে আসি । নুরদিন দৌড়ে এসেছে । উত্তেজনায় সে কাঁপছে, হাঁপাচ্ছে তো একইভাবে ।

উদ্দেশের ভাব তার সারা অবয়বে ।

- কী হয়েছে? জিগ্যেস করি ।
- হড়িভাসায় ওরা এসেছে । পাকবাহিনী আর রাজাকারের দল ।
- কখন এসেছে?
- দুপুরের দিকে ।
- ঠিক আছে, চূপচাপ থাকো । এ খবর এখন যেনে কেউ জানতে না পাবে ।

খাওয়া-দাওয়া শেষে মেহমানদের বিছানা ছেড়ে দিয়ে চলে আসি পুরুর পাড়ে সেই আমগাছের নিচে । বাংলাদেশে হাইড আউট গড়ে তোলার পর এই প্রথম দু'জন সিভিলিয়ান মেহমান এসেছেন । দু'জনই রাজনীতির সাথে জড়িত । কিন্তু রাজনীতি আর যুদ্ধের মাঠ তো এক নয় । যাদের সাথে যুদ্ধের পরিচয় নেই, যারা যুদ্ধের ভেতরে থাকেন না, যারা যুদ্ধ কী বাস্তবে দেখেন নি, যুদ্ধের মাঠ থেকে যাদের নিরাপদ দ্রবণে অবস্থান, তারা আদতেই বুঝতে পারবেন না যুদ্ধ জিনিসটা কি । এটা যে কতোখানি ভয়াবহ, নশ্বর আর কী পরিমাণ অমানবিক, সেটা বুঝতে পারা যুদ্ধের বাইরের মানুষদের পক্ষে সত্যিই কঠিন । দূর থেকে যারা যুদ্ধকে পরিচালনা করেন তাদের ধারণাতেও থাকে না যুদ্ধের বাস্তব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা করে নির্মুক্ত! গনি আর রফিকুল ভাই দু'জন আজ আমাদের হাইড আউটের মেহমান । তারো রাজনীতি করেন ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে । ঘটনাক্রে ভাইয়ের মৃত্যু-স্তূপে থবর পেয়ে গনি ভাই তার সাথিকে নিয়ে এসেছেন । এদের কাছে হঠাৎ ক্ষেত্রে যুদ্ধের খবর, কাছাকাছি এসে যাওয়া পাক আর্মি আর রাজাকারদের খবর অনেকক্ষণ প্রভাব ফেলবে । এর শক তারা সামলাতে পারবেন না । ওরা আমাদের মেহমান মাত্র । আজ রাতে থাকবেন হাইড আউটে । দেখবেন ছেলেদের অবস্থা, দেখবেন হাতিয়ার আর গোলাবারুদ্দের অবস্থা, দেখবেন কতোটা সুযোগ-স্থানে আর গোলাবারুদ্দের সংস্কার নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে । তারা ছেলেদের সাথে মিশবেন, জানবেন তাদের সুধ-দুঃখ আর অভাব-অভিযোগের কথা । এটা তাদের জান প্রয়োজনও । তারা এসব জানলে নেতাদের কানে আমাদের কথা ভুলতে পারবেন । স্বাধীন বাংলার প্রবাসী সরকারের কানেও এর ভেতর দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের আসল ছবি পৌছানো সম্ভব হবে । আমাদের সরাসরি নেতৃত্ব করছেন তারতীয় সেনা অফিসাররা । এ পর্যন্ত আমাদের সরকারের কোনো প্রতিনিধি এলো না, কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি এলো না, এলো না কোনো ভারপ্রাণ লিয়াজে অফিসার পর্যন্ত । গনি ভাইদের যখন পাওয়া গেছে, তখন তাদের সাহায্যে ম্যাসেজ পৌছানো যাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে । ব্যাপারগুলো সত্যিই বাংলাদেশ সরকারের গোচরে আন প্রয়োজন । মুক্তিযুদ্ধ এখন একটা আকার নিয়েছে । জেনারেল ওসমানি সর্বাধিনায়ক হয়েছেন । রাগসনগুলো বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে । নিয়োগ করা হয়েছে সেক্টর কমান্ডার । স্ব-স্ব সেক্টরে তারা মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন । আমাদের এলাকা পড়েছে ৬ নম্বর সেক্টরের অধীনে । কিন্তু তারপরও আমাদের সাথে তাদের কোনো রকম যোগাযোগ নেই, কেনো? কেনো এখনো পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে মিত্রবাহিনীর ওপর? দখলদার পাকবাহিনী নিয়মিত তাদের গোয়েবলসীয় কায়দায়

প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে : আমরা ভাবতের অনুচর, অন্তর্ঘাত চালানোই আমাদের কাজ, দেশের ভেতরে সন্তোষ আর নাশকতা চালিয়ে নিরীহ জনজীবন অভিষ্ঠ করে তুলছি। নিজেদের লোকজনের সাথে, সরকারের সাথে, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে এভাবে দিনের পর দিন কোনো যোগাযোগ না থাকায় আসলেও মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। আবার মনে হয়, যুক্তা এখনো পুরোপুরি সংগঠিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। সেষ্টের কমান্ডাররা সবকিছু ঠিকঠাক মতো গুছিয়ে নিতে পারেন নি। যতোদিন আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী অর্ণানাইজড না হচ্ছে, সেষ্টেরগুলো সুসংহত না হচ্ছে, নিজেদের অফিসাররা দায়িত্ব বুঝে না নিচ্ছেন, ততোদিন ভারতীয় সেনা অফিসাররা এ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। এ অবস্থার মধ্যেও যারা আমাদের যুক্তে পাঠিয়েছেন, তারা হয়তো ব্যস্ত নানা ধরনের কাজ নিয়ে। ছেলেরা টেনিস-এ যাচ্ছে, ফিরছে টেনিস থেকে, যুক্তে যাচ্ছে, যুক্ত করছে— এটাতো তারা নিশ্চিতভাবে জানছেন!

হাড়িভাসায় শক্র মোকাবিলা

রউফ এসে খবর দেয় গনি ভাইয়েরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

—ঠিক আছে, তুই যা। মিনহাজকে চা পাঠিয়ে দিতে বল।

রউফ চলে যায়। রাতের বেলা হাড়িভাসা আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে আরো কিছুটা সময় লাগে। চা আসে। চায়ের পর বিশেষেটা গড়ালবাড়ি থেকে আজ সিগারেট আনা হয়েছে মেহমানদের জন্য। কিন্তু তার থেকেই একটা প্যাকেটের সম্ভবহার করে চলেছে।

একসময় পরিকল্পনা শেষ হয়। নিষ্পত্তি হয়, রাতে আঘাত হানা হবে হাড়িভাসায়। মধুপাড়ায় চৌধুরীকে খবর পাঠাতে হবে। সেও তার সেকশন নিয়ে দল যোগ দেবে। মুসা-একরামুল যাবে আমর স্কুলে। ১৫ জনের দল তৈরি হবে। শক্তিশালী দল। মুসা-একরামুল-মোতালেব প্লাটার মধুরাও সঙ্গে যাবে। হাইড আউটে থাকবে পিন্টু। যুদ্ধের তাওবলীলা চলবার সময়টায় সে সামাল দেবে মেহমানদের। আজ বড় শক্ত মোকাবিলা হবে শক্র সাথে। হয় হাড়িভাসা আমাদের দখলে থাকবে, নয়তো ওদের। হাড়িভাসায় ওরা আর যাতে সহজে আসতে না পারে, এমন একটা শিক্ষা দিতে হবে আজকে ওদের।

বিকেল গড়িয়ে আসে। পড়ত বিকেলে মেহমানদের ঘুম ভাঙে। অনেকখানি পথ ভাঙার ক্লিনিতে পরিশ্রান্ত তারা। বাইরের চতুরে বসি মেহমানদের নিয়ে। বৈকালিক চায়ের পর্বে চা পরিবেশন করে লঙ্ঘনখানার কমান্ডাররা। গনি ভাই চা পর্বের ফাঁকে ফাঁকেই হা-হুতাশ করে চলেন, এভাবে তোরা থাকিস, খাইস, যুক্ত করিস! এতো দারুণ দুরবস্থা!

মুখ ফসকে বের হয়ে আসতে চায়, আপনারা কেমন আছেন? কিন্তু মনে মনে কথাগুলো উচ্চারণ করলেও, মুখ ফুটে বলি মা গাউসের ভাই বলে।

— আমি যেয়েই রিপোর্ট করবো। তাজউদ্দিনকে জানাবো। ওসমানিকে জানাবো। এম.এন.এ মতিয়ারকে বলবো। কী পাইছো তোমরা? আমার ভাইয়েরা যুক্ত

করি মারা যাবে, না খায়া মারা যাইবে, আর ওনারা একেলে কোনো খোঁজ নিবার নয়। না, এইটা হইতে পারে না। রফিকুল তুমি সাঙ্গী থাকবা। দেখলাতো গ্যাদের জামা-কাপড় নাই, শোবার জায়গা নাই, অন্ত্রপাতিও তেমন নাই, আর থায় কি এরা! এই খেয়ে কি যুদ্ধ হয়?

গনি ভাই তার স্বভাবসূলভ খেদোক্তি করে চলেন। কিন্তু আমার মাথায় ঘোরে কেবল হাড়িভাসা অপারেশনের কথা। রাত ১১টায় শুরু হবে সেই অপারেশন। তাই এক সময় বিধার ভাবটা কাটিয়ে গনি ভাইয়ের কথার বেই ধরে বলে ফেলি, আজ রাতে আমাদের একটা অপারেশনে যেতে হবে, পিন্টু থাকবে আপনাদের সাথে।

কথাটা শোনামাত্র গনি ভাই লাফিয়ে এসে আঁকড়ে ধরেন আমাকে, না ভাই তুই যাবি না। আমার এক ভাই চলে গেছে, তোকে যেতে দেবো না।

গলা থেকে গনি ভাইয়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলি, কিন্তু হবে না ভাই, আমাকে যেতেই হবে, দেখবেন কিছুই হবে না। সকালের মধ্যেই ফিরে আসবো ইমশাজ্জাহ।

— কোথায় যুদ্ধ? কতো দূরে? কাদের সাথে—গনি ভাই প্রশ্ন করে বসেন। কিন্তু এসবের কিছুই তাকে জানানো হয় না। এমনিতেই যুদ্ধের কথা শুনে এরা যা তয় পেয়েছেন, পুরো ঘটনা শুনলে হয়তো এখনই তারা চলে যেতে চাইবেন। আর এখন তারা চলে যেতে চাইলে, তাদের পৌছে দেয়াটাও হচ্ছে কিলের ব্যাপার। যেমনটা আশা করেছিলাম, অবশ্যে তাই হলো। যুদ্ধের ক্ষেত্রে শুনে তয় পেয়েছেন গনি ভাই। তাই আর সংযত রাখতে পারেন না নিজের সোফকুলকে বলেন, কি বলো, যাবা নাকি চলে? যাথা নাড়েন তিনি। বলেন, ক্ষেত্রে হয়ে এলো, এখন যাওয়াও যাবে না। থেকেই যাই। তখন নিমরাজি গনি ভেঙ্গে থাম মেরে বসে থাকেন। পিন্টু কানে কানে বলে, গনি যিয়া তয় পাইছে মাঝে ভাই, এখন পালাবার চায়। না, তুম তাকে আটকে রাখবে। রাতের বেলাতত যুদ্ধটা কী জিনিস, আজ এটা ওদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

— তবে রাতে যত্নটুক করো। কোনো অসুবিধা যেনো না হয়। আমাদের বিছানাতেই শুতে দিও।

— কিন্তু বালিশ? পিন্টুর চোখে দুষ্টুমির হাসি। দুপুরে শোয়ার সময় নাকি বালিশ খুজছিলো।

— কেনো, বালিশের অভাব কি? ইট আছে না!

— তা আছে, পিন্টু মাথা নাড়ে।

— রাত ৮টায় রওনা দেয়ার সময় গনি ভাইয়ের ভেজা গলার ডায়লগ শুরু হয় আবার। গলা জড়িয়ে বুকে টেনে নেন, ভাইয়া তুই যাইস না। তোকে মোর যাওয়ার দিবার মন চায় না। গড়স গেইছে। তুই না থাইকলে মোর আর ইভিয়াত কোনো ভাই থাইকবে না। সত্যিই এবার বিরক্ত লাগে। যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি মুহূর্তে এ ধরনের বাধা এখন আর ভালো লাগে না। ন্যাকামো মনে হয়। যুদ্ধের ভামাড়েলে মনের কোমল অনুভূতি-টন্তুভূতি কবে কোথায় হারিয়ে গেছে। তাই এ ধরনের আবেগ-টাবেগ আর মনে ধরে না। তবুও তাকে আশ্বস্ত করি, কিন্তু হবে না। আপনারা

টায়ার্ড। রেষ্ট নেন। গল্প করেন পিন্টুর সাথে। দুলু রইলো, মজিব রইলো। তাদের সাথে কথা বলেন।

মাৰু রাস্তায় চৌধুৱী তাৰ দল নিয়ে যোগ দেয় আমাদেৱ সাথে। রাত ১২টায় হাড়িভাসাৰ দখল নিয়ে শুৰু হয়ে যায় তুমুল যুক। একটানা দু' ঘণ্টা মাটি কামড়ে পড়ে থাকে শক্রপক্ষ। গোলাগুলি চলে সমানে। আমৰা তিনদিক থেকে ওদেৱ ঘিৰে ফেলতে চাই। ব্যাপারটা ওৱা টেৰ পেয়ে পিছিয়ে যায়। কিন্তু যুক্ষেত্ৰ ছেড়ে চলে যায় না। হাড়িভাসাৰ আমাদেৱ দখলে এসে যায়। তখন শুৰু হয় ওদেৱ তাড়ানোৰ কাজ। গুলি হুঁড়তে হুঁড়তে ওৱা পঞ্চগড়েৰ রাস্তা ধৰে পিছিয়ে যায়। দুটো বাঙ্কাৰ তৈৰি কৰে ফেলেছিলো, রেমাৰ চার্জ দিয়ে সে দুটো উড়িয়ে দেয়া হয়। তন্মতন্ম কৰে খুঁজেও ওদেৱ কাউকে পাওয়া যায় না। তবে রাজাকাৰদেৱ একটা ক্যাপ্সে ওদেৱ ফেলে যাওয়া কিছু গুলি আৱ চাইনিজ রাইফেলেৰ একটা ম্যাগজিন পাওয়া যায়। রাতেৰ অঙ্ককাৰে ওপক্ষেৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানা যায় না। আমাদেৱ পক্ষে কোনোৱকম ক্ষতি নেই। হঠাৎ কেনো জানি, হাড়িভাসাৰ বটগাছটাৰ নিচেকাৰ ভুতুড়ে অঙ্ককাৰে দাঁড়িয়ে মনে হয়, আবাৰ ওৱা আসবে। এখানে ঘাঁটি গাড়াৰ চেষ্টা কৰবে এবং আমাদেৱকেও আসতে হবে ওদেৱ তাড়ানোৰ জন্য। এবাৰ নিয়ে বেশ ক' বার হলো হাড়িভাসাৰ আসা। আৱ কতোবাৰ আসতে হবে, কে জানে? তাৰ এটা ঠিক কোনো অবস্থাতেই ওদেৱকে এখানটোয় স্থায়ীভাৱে ঘাঁটি গাড়তে দেয়া কৰিব না। জীবন থাকতে না।

হাইড আউটে ফিৰতে ভোৱেৰ বালিশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গনি ভাইকে দেখা যায় বাইৱেৰ চৰুৱে পায়চারি কৰতেন। আমাদেৱ দেখে যেনো তিনি আৰ্থক্ষণ হন। বলেন, ভাইয়া তোমৰা ফিৰবাৰ পাইৱেন্তেন। রাইতেৰ বেলায় তোমার চিনায় মুই খালি ছটফট কইৱছোম। দেখলাম জেনে জোড়া তাৰ রাঙ্গজবাৰ মতো লাল। উদ্ভাব্বেৰ মতো চেহাৰা। গনি ভাই একজনৰে ভেঙে পড়েছেন। রাতেৰ যুক্ষেৰ গোলাগুলিৰ শব্দে সম্ভৱত একটুক্ষণেৰ জন্যও চোখ এক কৰতে পাৱেন নি।

পিন্টুৰ কাছ থেকে জানা যায় ব্যাপারটা। রসিয়ে রসিয়ে বলে সে রাতেৰ ঘটনা। বলে, আপনাৱা তো গোলেন, কিছুক্ষণ গল্পগুজৰ কৰাৰ পৰ শুতে গেলাম। মাথাৰ নিচে দুটো কৰে ইট। বালিশ মনে কৰে মাথায় দিয়েই বলে, ইস পিন্টু, এটা কি দিছিস, এতো শক্ত ক্যান?

পিন্টুৰ জবাৰ, ইট গনি ভাই। বালিশ তো নাই। আমৰা তো ইট মাথায় দিয়েই শুই।

ও, বলে গনি ভাই শোন, কিন্তু কিছুক্ষণ পৱই আবাৰ তিনি জিগ্যেস কৰেন, এই পিন্টু পাকবাহিনীৰ ডিফেন্স কতোদূৰ?

— কাছেই, বেশি দূৰ নয়।

— কী কলু? বলে লাফিয়ে ওঠেন। ওমৰা রাইতোত আইসবাৰ পাৱে?

— ইচ্ছে কৰলে তো পাৱেই।

— কী কলু? বলে আবাৰ লাফিয়ে ওঠেন। আবাৰ শোন। বলেন, তোমৰা এই মাটিত থাকেন কেমন কৱিবে?

— থাকি আর কোথায়? রাতে তো প্রতিদিনই যুক্ত। দিনে ঘুমাই।

ও, বলে কিছুক্ষণ চূপ থাকেন। আবার জিগোস করেন, পিন্টু ওমরা যদিল
রাইতোত আইসে তোমার গুলা এই রাইফেল দিয়া ঠেকাবার পাইরবেন?

— নাঃ, সেটা সম্ভব নাকি, ওদের তো সব মডার্ন চাইনিজ হাতিয়ার। পিন্টু ইচ্ছে
করেই এমনটা বলে। তাকে তয় পাইয়ে দিয়ে পরখ করবার জন্য।

— কী কলু? বলেই গনি ভাই আবার লাফিয়ে ওঠেন।

— না, কিছু হবে না। শোনতো গনি ভাই, দুমান।

— আব তোর ঘুম। এতো কাছেত খানের ঘরের ডিফেন্স, আব তুই কইস মোক
ঘুমাবাব?

— নেন, শোন, কিছু হবে না।

এবার গনি ভাই শোন। মাথার নিচে ইট, মাটিতে পাতা শতরঞ্জির ওপর বিছানা।
স্বত্তি পান না। আরাম পান না। শুধু নড়াচড়া করেন। সবে আমার ঢোকে সব ঘুম
লেগে এসেছে দুর্বলেন। ঠিক তখনি শুরু হলো আপনাদের গোলাগুলি। গনি ভাই
একটা চিক্কার দিয়ে বাঁপিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন, ঘনুরে পিন্টু
মনু বাঁচাও হামাক। কিন্তু যতোই বলি যুক্ত শুরু হয়েছে হাড়িভাসায়, সে তো ৬/৭
মাইল দূরে। রাতের বেলা দূরের গুলির আওয়াজ স্বচ্ছভাবে মনে হয় খুব কাছেই
বুঝি এসব ঘটছে। কিন্তু গনি ভাইয়ের অভিজ্ঞতা ছেলে না। তার ধারণা, খানের দল
হাইড আউট এ্যাটাক করেছে। রফিকুল ভাই পেটে পেয়ে যান। যতোক্ষণ গোলাগুলি
চলেছে, ততোক্ষণ তাদের অস্ত্রিভূতা যান্ত্রিক দ্রুতেন মাহবুব ভাই—বলে পিন্টু হেসে
ওঠে হো-হো করে। তারপর অবস্থা, পিন্টু বলে চলে, রাতের ঘুম হারাম।
মেহমানদের পাহারা দিয়ে বসে থাইলাম।

— বিয়ান হইলেই যেকুন আমরা যুইয়া আসেন, বীতিমতো কাঁপুনি দিয়ে বারবাব
তিনি একই কথা বলতে থাকেন।

থাক, তাদের যুক্তের বাস্তব অভিজ্ঞতা পাইয়ে দেয়া গেছে। সকালে নাস্তা খেয়ে
জয়নাল আব দুলুর হাতে ছেড়ে দিই দু'জনকে। দুলুকে বলি, আপনাদের
গোলজারদার আশ্রয়ে তাদের একটু যত্ন নিয়েন। রাতে ঘুমাতে পারেননি সে তো
দেখেছেনই। এদিকে ভাইয়ের মৃত্যু শোক। অন্যদিকে বাস্তব যুক্তের অভিজ্ঞতার শক।
একটু ভাই কষ্ট করতে হবে আপনাকে। পারলে বেরবাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেবেন।

জয়নালকে কিছু অতিরিক্ত রেশন দেয়া হয়। গোলজারদার বাড়িতে পাহারার
কাজে নিয়োজিত ছেলেদের জন্য প্রতিদিনকার অতিরিক্ত রেশনের ভাগ এটা। গনি
ভাই আব রফিকুলের জন্যও কিছুটা রেশন তুলে দিই। বিদায় হওয়ার আগে দুলুকে
মনে করিয়ে দিয়ে বলি, যদি গড়েসের কবর পাকা করাব কথা বলেন গনি ভাই, তবে
আমাদের পক্ষ থেকে আপনি পরিকল্পনা করে দিয়েন।

বিদায় নেয়ার সময় গনি ভাই এবার সত্যি সত্যিই ভেঙে পড়লেন। পিন্টু আব
আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভালো থাকিস ভাইয়া মুই ফিস আসিম। ছেলেদের
উদ্দেশে বললেন, তোমার গুলাক মুই দেখি গেনু, শুঙ্গি নাই, গেঁজি নাই, জামা নাই,

এগুলান মুই শিগ্গির ধরি আসিম। আর তোমার গুলার অবস্থা যাতে সচক্ষে সরকার দেইখবার পায় সে চেষ্টাও করিম। ভালো থাকেন ভাইয়েরা, বাঁচি থাকেন।

গনি ভাই রফিকুল ভাই চলে যাওয়ার পর আমাদেরও যেন কেমন একটা শূন্যতা পেয়ে বসে। সেই সাথে যোগ হয় শরীরের ক্লান্তি। চোখ আর খুলে রাখা যায় না। পিন্টুর পাতা মেহমানদের বিছানায় ডবল ইটের বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ি। রাজ্যের ঘূম এসে জড়িয়ে থরে। কেবল শরীরের পাশে লেপটে থাকা পিন্টুর অস্তিত্বের পাই ঘুমের অভলে তলিয়ে যাওয়ার আগের মৃহূর্তে।

সোনারবান হাইড আউট

নতুন হাইড আউট সোনারবানে পৌছানো গেলো রাত সাড়ে তিনটায়। আগটের ৬ তারিখে নালাগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তখন আমাদের একটা নিরাপদ আস্তানা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিলো। প্রতিটা অপারেশন আর লড়াইয়ের শেষে তখন হাইড আউট বদলাতে হচ্ছিলো। কোনো আস্তানাতেই দু'এক রাতের বেশি থাকা যাচ্ছিলো না নিরাপত্তার প্রয়োজনে। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে আস্তানা বদলের ব্যাপারটা ছিলো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। এমনিতেই সারারাত যুদ্ধ শেষে হাইড আউটে ফিরে আসতে ক্লান্তিতে-শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে আসতো, কাঁপের গোলাবারুদ, অস্ত্রপাতি, রেশন, বিছানাপত্রসহ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের লটবহর মাথায়-কাঁধে-পিঠে চাপিয়ে বহন করে নিয়ে যেতে পারে নতুন আস্তানার দিকে। নতুন আস্তানা ঝুঁজে পাওয়ার ব্যাপারটাও সহজস্থ ছিলো না। এলাকার মানুষজনের সাথে ছিলো না জানাশোনা। তাদের ওপর আশ্রয় আর বিশ্বাস স্থাপন করাও যাচ্ছিলো না পুরোপুরি। প্রায় গুরু শৌকার মাঝে করে পাকবাহিনী দু' দু'বার বসির মেঘারের বাড়িতে স্থাপিত মধুপাড়া হাইড আউটের দোরগোড়ায় হাজির হয়েছিলো। তাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে অত্যন্ত জোরালোভাবে। এর জন্য জীবন দিতে হয়েছে সেকশন কমান্ডার আক্ষাসকে। এছাড়া ঘন ঘন আস্তানা অর্ধাং হাইড আউট বদলের কারণে, নিজেদের দলকে যেমন সুস্থির রাখা যাচ্ছিলো না, তেমনি দলের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ আনাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিলো। তখন আমাদের দরকার ছিলো এমন একটা নিরাপদ আস্তানার, যেখানে সুস্থির হয়ে বসা যাবে, সুন্দরভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা করা যাবে এবং সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ বা অপারেশনগুলো পরিচালনা করে পাক হানাদারদের দেশের মাটি থেকে সমূলে বিভাড়িত করা যাবে। তখন দুর্ল এসে দাঁড়িয়েছিলো পাশে। সে তাদের নিজ গ্রাম নালাগঞ্জে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িতে আমাদের এনে ভুলেছিলো। নালাগঞ্জের সেই হাইড আউটের অবস্থান এবং নিরাপত্তা ছিলো সত্যিকারভাবেই ভালো রকমের। হাইড আউট হিসেবে নালাগঞ্জ ছিল আমাদের আদর্শস্থানীয় ব্যাপার। এধরনের নিরাপত্তাময় হাইড আউট এ অঞ্চলে আর একটাও ঝুঁজে পাওয়া যাবে না। এখান থেকেই সুস্থিরভাবে আমরা অনেকগুলো সফল অপারেশন করেছি। ডেতরগড়, সর্দারপাড়া আর তালমা হয়ে বেরুবাড়ি পর্যন্ত সমস্ত এলাকা থেকে পাকবাহিনীর অনুচর, দালাল আর শাস্তিবাহিনীর

লিডার এদের ব্যতীম করে এলাকাটাকে মোটামুটি মুক্তাপ্তল হিসেবে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। হাড়িভাসায় পাকবাহিনী কিংবা রাজাকার বাহিনীর কোনো স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টাকে সফলভাবে প্রতিহত করা গেছে; শহুর ঘাঁটি পানিমাছ বারবার আক্রমণ করে ওই ঘাঁটির চৌহদির ভেতরেই তাদের গতিবিধি সীমিত করে ফেলা সম্ভব হয়েছে। বক্ষ করা গেছে সীমান্ত এলাকার লুটতরাজের ঘটনা। বক্ষ করা গেছে সন্ত্রাস আর ভাকাতির মতো ঘটনাও। এলাকাবাসী তাদের ক্ষেত্রের ফসল কাটতে পারছিলো না, তাদের ফসল কাটার ব্যবস্থা করে দিয়ে নতুন ফসলের আবাদ করার ব্যাপারটাও নিশ্চিত করা গেছে। মোট কথা, মানুষজনের ভেতরে হস্তি আর আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আপাতত এ এলাকা থেকে নতুন কোনো অপারেশন পরিচালিত হওয়ার সংস্কারনা কর্মে গেছে। ফলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়েছে অমরখানা, জগদল, তালমা আর পঞ্চগড়ের দিকে। ওসব এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করা দূরবর্তী নালাগঞ্জ থেকে সম্ভব নয়। তাই আমাদের নালাগঞ্জ থেকে হাইড আউট গুটিয়ে নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কয়েকদিন ধরে এ নিয়ে সলা-পরামর্শও হয় নিজেদের মধ্যে। শেষে সিদ্ধান্ত হয়, জগদলহাট ও অমরখানা হচ্ছে পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি। তাই তাদের চলাচল ও সরবরাহের রুট পঞ্চগড়-অমরখানা পাকা সড়ককে টার্গেট করে সোনারবানে হাইড স্থাপনের মৌখিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আর সে অনুযায়ী আমরা নালাগঞ্জ হাইড আউট ছেড়ে চলে আসি। স্থাপন করি সোনারবানে আমাদের এই হাইড স্টেট।

হঠাতে করে বিকলে সিদ্ধান্তের কথাটা জ্ঞানাতেই দুলু ঘাবড়ে যায়। বলে, তাহলে আমাদের কী হবে মাহবুব ভাই, পিলু ভাই?

মজিব বলে, আমি তাহলে কেবল যাবো, কী করবো? জৰুরেরও একই প্রশ্ন। মোস্তক আগেই চলে গেছেন তার বেঙ্গবাড়ির কাছে জলপাইগুড়ি রোডের পাশের আস্তানায়। সেখান থেকে চীনি তার আর প্রফেসর আনোয়ার তাদের রাজনৈতিক প্লাটফর্মে কাজ করে যাচ্ছেন আগের মতোই। মজিবের বড়ো ভাই সফিকুল ইসলাম দুদু চলে গেছেন রংপুর-কুচিবিহার সীমান্ত এলাকায় তার কোনো এক দূর সম্পর্কের মামাৰ আশ্রয়ে। সম্ভবত সেখানে তাকে নিয়মিত শরণার্থী শিবির থেকে রেশন তোলাসহ অন্যান্য কাজ করতে হচ্ছে।

দুলুর সমস্যাই সবচাইতে বেশি। আমরা চলে গেলে, দেশের ভেতরে এবং সীমান্তের ওপারে সে আবার টার্গেট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া রয়েছে গোলজারদার বাড়িতে আশ্রিত তার এবং অন্যান্য পরিবারের নিরাপত্তার ব্যাপারটা। আমরা চলে গেলে তাদের অগ্রয়স্থলে নিরাপত্তামূলক প্রহরার জন্য যেসব ছেলে রাখা হয়েছে, তাদেরকেও হয়তো তুলে নেয়া হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তার পরিবার এক মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন হবে এবং তাদের পক্ষে সেখানকার আশ্রয়ে থাকা সম্ভব হবে না। তখন যাবে কোথায় তারা? তাই আমাদের হঠাতে করে নালাগঞ্জ ছাড়ার সিদ্ধান্ত এদের সবাইকে প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

ভাবিয়ে যে তুলবে, সেটা আমাদের ধারণাতে ছিলো এবং সে অনুযায়ী আমরা

সিদ্ধান্তও ঠিক করে রেখেছিলাম। দুলুকে বলি, তাদের আশয়স্থলে এখন যে ও জন মুক্তিযোদ্ধা পাহারা দিছে, তারা সেখানে আগের মতোই থাকবে। সুতরাং তার নিজের এবং তার পরিবার অন্যান্যের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনোরকম সমস্যা হবে না। মজিব, জব্বববাসহ অন্যরা চলে যাবে তাদের নিজেদের গ্রাম সর্দারপাড়ায়। সেখানে থাকা নিরাপদ না হলে চলে যাবে সোনারবানে। তারা নিজেরাও মুক্তিযুক্তে যোগ দেয়ার জন্য ট্রেনিংয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। জোনাব আলী, মকতু মিয়া ও মতিনের কোনো সমস্যা নেই। আমরা তাদের এলাকাতেই থাকছি। এতে করে তাদের খুশি হওয়ারই কথা। হয়েছেও তারা তাই। দাঁত বের করে হাসিখুশি মুখে মকতু আর জোনাব আলী ছেলেদের সাথে গুছিয়ে চলছে মালসামান।

রাত ন'টার পর নালাগঞ্জ ছেড়েছি। টৌধূরী তার সেকশন নিয়ে যথাসময়ে মধুপাড়া থেকে এসে মূল দলে যোগ দিয়েছে। প্রচুর লটবহর নিয়ে শয়েরও ওপর যোদ্ধাদের একটা বড় বাহিনী মন্ত্র পায়ে এগিয়ে চলেছে একটা লাইন ধরে। সামনে প্রোটেক্টিভ দল। শক্ত হামলা হলে তারা প্রথমে তা প্রতিহত করবে। পরবর্তীকালে পেছনের দল তাদের লটবহর ফেলে ঘৌপিয়ে পড়বে যুদ্ধে। এমনভাবেই এগিয়ে চলা সমস্ত দলটিকে সাজানো হয়েছে। একেবারে সামনে আসব সাথে রয়েছে মকতু আর জোনাব আলী আগের মতোই গাইড হিসেবে। সময়সূচী পেছনে পিছু। মাঝখানে মুসা। একেবারে শেষের দিকে একরামুল। প্রতেক সেকশন কমান্ডার তাদের স্ব-স্ব সেকশন পরিচালনা করছে। মুসা আর একজন আগে-পিছে করে তাদের তদারকি করতে করতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রোটেক্টিভ পার্টিতে আমাদের সাথে রয়েছে মোতালেব তার এল.এম.জি সেকশন সদয়ে। সবশেষে মিনহাজ তার লঙ্গরখানার বাহিনী আর রসদ সামগ্রী নিয়ে।

আকাশের চাঁদটা অনেক বেশ বড়ো আকারের। আকাশে মেঘ। তবে হালকাপাতলা। চাঁদের ঝাঙ্গসা আলোয় পথ দেখতে অসুবিধে হয় না। নালাগঞ্জের খাল পাড় হতে সবাইকেই বুক সমান পানিতে ভিজতে হয়েছে। এরপর বর্ষার ভেজা পেছল পথ। পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। না হলে পা পিছলে পপাত ধরণী তল। এর মধ্যে বেশ ক'জনের এই হাল হয়েছে।

সীমান্ত এলাকার পথঘাটে এখন জন-মনষ্যের চলাচল শূন্য। বুনো লতা, লজ্জাবতী লতা আর বুনো ঘাসের দাম বর্ষার পানিতে ইচ্ছেমতো বেড়ে উঠেছে। খালি পায়ে তাদের মাড়িয়ে হেঁটে চলতে হয়। পায়ের নিচে কী পড়লো আর কী পেরুনো গেলো সেটা খতিয়ে দেখবার ফুসরত নেই। উপায়ও নেই। একটাই লক্ষ্য, সোনারবান পৌছুতে হবে। পৌছুতে হবে আমাদের নতুন আস্তানা, নতুন হাইড আউটে।

ডাবুরডাঙ্গা পার হয়ে টোকাপাড়া গড়ের ওপর দিয়ে নবদেবপাড়ার মীর খানের বাড়ির পাশ দিয়ে মহারাজ দিঘি ডানে রেখে চলমান বাহিনী এসে থামে ভেতরগড়ের নতুনহাটের তিন রাস্তার মোড়ে। এর ভেতরে অবশ্য পথে তিনবার থামতে হয়েছে ছেলেদের বিশ্বাম দেয়ার জন্য। মতিন অপেক্ষা করছিলো নতুন হাটে তার রাত জাগানিয়া দলবল নিয়ে। সে রিপোর্ট দেয়, অল ক্রিয়ার। অর্থাৎ শক্তির কোনো

গতিবিধি নেই।

ছেলেরা এবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। বোধা টানার ক্লাসিতে হাঁসফাঁস করে দম নিয়ে। বিড়ি-সিগারেট টানতে শুরু করে শব্দ তুলে তুলে। এখন কোন্ পথে সোনারবান যাওয়া যাবে এই নিয়ে শুরু হয় পরামর্শ।

অমরখানা রাস্তা দিয়ে তালমা-শালমারা ব্রিজের কাছেই সোনারবানে ঢেকার মূল রাস্তাটা। ওটা ধরে যেতে চাই না আমরা। শক্রুর খুব কাছ দিয়ে এতো বড়ো দল নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। এছাড়া হঠাতে করে এতো বড়ো দল দেখে সংঘবদ্ধ সোনারবানবাসীরও তাদের তীর-ধনুক-বল্লম ইত্যাদির সাহায্যে ভুল বুঝে আমাদের আক্রমণ করার সঙ্গাবন্ধ রয়েছে। তাহলে বেঁধে যাবে এক ভুলকালাম কাণ। অথবা রক্ষফ্য আর মৃত্যুর খেলায় কে জড়তে চায়? সুতরাং যেতে হবে আমাদের সোজাপথে, যাতে করে সোনারবানের একেবারে পেটের ভেতরে চুকে পড়া যায়। সোনা মিয়ার বাড়ির কাছে যেতে হবে মদ্রাসার পাশের পথ ধরে। পথটা যদিও ইঁটা পথ, অনেকটা উচু আলপথের মতো, তবু ওই পথটা আমার মাথায় কাজ করে চলে বেশি করে। মকতু আর জোনাব আলীকে তাই বলি, নিতে পারবে সে পথে?

— জে পারন যাইব।

— মতিন, তুই গোছিস কখনো ওপথ ধরে? পিন্টু-জোস করে মতিনকে। মতিন মাথা চুলকোয়। মকতু তার মুখের ভেতর থেকে পোক দ্বিধাবে দাঁতের পাটি বের করে বলে, আমি গেছি স্যার, আপনাগো নিতে পারিনুন তয় রাস্তাটা ভালো নয়। খানাখন্দ রইছে।

— তা থাক, রাস্তাটা তো একেবারে সোজা গিয়ে উঠবে মদ্রাসার পাশে, তাই না মকতু?

— হ, বলে মাথা নাড়ে দেখো।

— নাও, তাহলে বিড়ি ভরাও। একটু দম নিয়ে নিই।

ছেলেরা একবার বসলে আর উঠতে চায় না। জোর করে ধমকধামক দিয়ে তুলতে হয়। পিন্টুকে কয়েকজনের পশ্চাত্তদেশে তার পা ব্যবহার করতে হয় এজন্য। বাগে, উঠেছি গে বলে উঠে দাঁড়ায় তারা। আবার শুরু হয় পুরনো কায়দায় কলামের এগিয়ে যাওয়া। ভেতরগড়ের দুই নম্বর গড়টার পাশ দিয়ে উচু-নিচু ইঁটাপথ। পথটা গাছগাছালি আর ঘন বাঁশবনে ছাওয়া। বুনো ঝোপঝাড় আর ঘাসের বন ঠেলেঠেলে এগুতে হয়। মকতু আর জোনাব পূর্বের মতোই আগে আগে চলেছে। তাদের পেছনে আমি। আমার ঠিক পেছনে পিন্টু, সঙ্গে তার মতিন। পায়ের নিচের মাটি শক্ত কিন্তু অস্তঙ্গ পিছল। বাঁ দিকে গড়ের খন্দক। ডানে আবার বুনো ঝোপঝাড়। গাছগাছালিতে ঢাকা। মাথার ওপরের আকাশের চাঁদ হারিয়ে যায়। একটা ঘন কালো অঙ্কারে সন্তর্পণে এগুতে হয়। কোনো গুহার ভেতরে চুকলে যেমন হাতড়ে চলতে হয়, ঠিক তেমনি করে। পিন্টু দাঁত খিচড়ে ওঠে মতিনের ওপর, শালা, ঠিক পথে আনছিস তো?

— মনে তো হয়, মতিনের জবাব শোনা যায়। এক লাখ মারবো হারামজাদা, পথ চেনো না, গাইড সাজছো! কষ্টের মধ্যেও হাসি পায় পিন্টুর রাগের ধরনধারণ

দেখে । বোৰা গেলো, এই বকম পথে বেচাৱাৰ ভাৰি স্বাস্থ্য নিয়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে খুব । যাই হোক সব পথের মতোই এ পথও এক সময় শেষ হয়ে আসে । আমৱা সোনাৱানে পৌছে যাই । জোনাৰ আলী আমাদেৱ একেবাৱে সোনা মিয়াৰ দোচালা-চৌচালা টিনেৰ ঘৰবিশিষ্ট বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে ।

অবশ্যে স্থাপন কৰা হলো সোনাৱানে হাইড আউট । সোনা মিয়া মেঘাবেৱ বাড়িতে । রাত তখন প্ৰায় শেষ হয়ে এসেছে । মালসামানা, অন্তৰ্পাতি আৱ গোলাবাৰুদ এসব কড়া পাহারায় রেখে বড় টিনেৰ ঘৰটোৱ মেঘেতে যে-য়াৰ মতো শুয়ে পড়ে । গোছগাছ যা কিছু হোক সব দিনেৰ বেলায় কৰা যাবে ।

পঞ্চগড়-তেতুলিয়াগামী পাকা সড়ক থেকে জেলা বোর্ডেৰ কংচা রাস্তাটা বেৱিয়ে একেৰেকে এসে ভেতৰগড় হয়ে চলে গেছে হাড়িভাসাৰ দিকে । তালমা নদীৰ ওপৰ কাঠেৰ পাটাতন লাগানো ব্ৰিটিশ আমলেৰ লোহার শক্ত পুল । শালমাৰা পুল নামেই তাৰ পৰিচিতি । যুদ্ধেৰ প্ৰথম দিকে পুলটিৰ অৰ্ধেক আমৱা উড়িয়ে দিয়েছিলাম বিস্ফোৱক দিয়ে । সেই শালমাৰা পুলেৰ পুৰ দিকে সোনাৱান গ্ৰাম ।

তালমা নদীৰ পাড় ঘেঁষে প্ৰচুৰ ঝোপজঙ্গল আৱ বনবাদাড় । বন কেটে বসত কৰেছে এখানে মানুষজন । এৱা সব কুমিল্লা জেলাৰ লোক । জনবহুল কুমিল্লা-ময়মনসিংহ এলাকা থেকে বেশ কিছু মানুষ উঠাৰু হয়ে আসে এখানে সন্তান জমি কিনে বসতি স্থাপন কৰেছে । পূৰ্ব বাংলাৰ এইসব মানুষ ভৱত্ত পৰিশ্ৰমী । জঙ্গলাকীৰ্ণ বুনো পশুদেৱ অবাধ বিচৰণ ক্ষেত্ৰ সাফ-সৃতৰো আৰু অসমতলে উচু-নিচু জমি সমতল কৰে এৱা তাৰ বুক জুড়ে গড়ে তুলেছে নিজেৰ বাড়িঘৰ, ফসলেৰ মাঠ । এৱা গড়ে তুলেছে জনপদ । এক নতুন সভ্যতা এদেৱ নিজেদেৱ ভেতৰে রয়েছে চমৎকাৰ সমৰোতা । আৱ একতা । এটা প্ৰদেৱ শক্তি । এৱ বলেই এৱা যেমন একযোগে মোকাবিলা কৰেছে বুনো পৰ্যাপ্তি, তেমনি মোকাবিলা কৰে চলেছে স্থানীয় বৈৱী অধিবাসীদেৱ । ঠিকিয়েছে ঢাঁৰ-ডাকাত এবং বাইৱে থেকে আসা অন্যান্য উৎপাত । এখনও এৱা ধৰে রেখেছে নিজেদেৱ এলাকা থেকে বয়ে আনা সামাজিকতা, আচাৰ-ৱৈতি কিংবা সংস্কৃতি । এদেৱ কথাবাৰ্তায় রয়েছে আঞ্চলিকতাৰ টান । স্থানীয় মানুষজনেৰ সাথে এদেৱ সম্পর্ক বৰাবৱাই শক্রতা পৰ্যায়েৰ । এৱা গড়ে তুলেছে নিজেদেৱ কমিউনিটি ।

সোনাৱান এমনি একটি কমিউনিটি । এই কমিউনিটিৰ নেতা ছিলো সোনা মিয়া মেঘাব । হয়তো গৌৰ বৰ্ণেৰ দীৰ্ঘদেহী, বলিষ্ঠ আৱ সদাহস্য অমায়িক এ মানুষটিৰ নাম অনুসৰেই এ জনপদটিৰ নাম হয়েছে সোনাৱান । সোনা মিয়া যুদ্ধেৰ আগে ছিলো মুসলিম লীগেৰ সমৰ্থক । যুদ্ধেৰ শুৰুতে তাকে ধৰবাৰ চেষ্টা কৰা হয়েছিলো বেশ ক'বাৰ । আমৱা জহুৱি ভাট্টোডায় ক্যাম্প স্থাপন কৰলৈ, সে আমাদেৱ কাছে আস্তসমৰ্পণ কৰে এবং মুক্তিযুদ্ধেৰ পক্ষে সব ধৰনেৰ সহযোগিতা দিতে থাকে । কিছুদিন আগে কে বা কাৰা চাউলহাটি বি.এস.এফ কমাতাৰ তাৰ সাথে কথা বলতে চান, এই বলে ডেকে নিয়ে যায় তাকে কিন্তু তাৰপৰ তাৰ আৱ কোনো খবৰ পাওয়া যায় নি । লোকটা বেঁচে আছে, না তাকে মেৰে ফেলা হয়েছে, সে ব্যাপারেও সঠিক

করে কিছু বলা যাচ্ছে না। ঘটনাটা নিয়ে আমরা বি.এস.এফ কম্যান্ডার ক্যাটেন নরেন্দ্র সিংহের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি সোনা মিয়ার ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে আমাদের বলেছেন।

সোনারবানের সোনা মিয়া না থাকলেও আমরা তার গাছগাছালি ঘেরা টিনের দোচালা টিনের বাড়িতে আমাদের আস্তানা গেড়েছি। এটাই এখন আমাদের হাইড আউট। সোনা মিয়ার পরিবার সরে গেছে অন্যথানে। বাড়িটা ফাঁকা। তবে একেবারে পরিত্যক্ত নয়। তার ছেট ভাই-মাকে নিয়ে কয়েকজন মানুষসহ বাড়িতে বসবাস করছে। আমাদের এবাড়িতে আশ্রয় নেয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছে। তার মদ্রাসায় পড়া ভাইটির সব সময় আমাদের পায়ে পায়ে ঘোরা, আমাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধার তদারিকিতে তার ব্যস্ততাই এর উজ্জ্বল প্রমাণ।

জানা গেলো, গত সপ্তাহে এ এলাকায় পাক আর্মি এসেছিলো। তারা ইজ্জত লুটেছে দুঁজন মহিলার। আর ৫ জনকে ধরে নিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে ফিরেছে ৪ জন। সম্ভবত অন্যজন আর ফিরবে না। সোনা মিয়া নেই, লোকজন নেতৃত্বাধীন অবস্থায় পড়ে ভয়ে দিশেহারা। এখন একমাত্র হজুর তাদের ভরসা। সোনা মিয়ার ছেট ভাই মালেক ছাড়াছাড়াভাবে তার মনের কথা বলে মেয়ে। এলাকার চালচিয় তুলে ধরে। ঠিক এই সময় হাতে হারিকেন ঝুলিয়ে হজুর স্বত্ত্বান্তর।

সোনারবানে আছে একটা দাখিল মদ্রাসা। স্থানের মানুষজন নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেছে এটা। মদ্রাসার জন্মগুরু হিসেবে এর সঙ্গে জড়িতে আছেন এর সুপারিনটেন্ডেন্ট মাওলানা মনসুর সাহেব। তিনি পেলে, তার আস্তারিক আর একটি সাধনার জোরেই মদ্রাসাটির জন্ম দান্ত হয়েছে। যুক্তের আগে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ভালোভাবেই চলছিলো। ছাত্রসংখ্যা পোড়িয়েছিলো দু' শ'র ওপর। যুক্তের ডামাডোলে এখন সেটা বৃক্ষ। তালেব এবং অর্থাত্ত ছাত্ররা চলে গেছে যে যার বাড়িতে। কেননা, সোনারবানে জীবনের নিরাপত্তা নেই। তাই তিনি শিক্ষক আর ছাত্রদের ছুটি দিয়ে তাদের বাড়িঘরে নিরাপদ আশয়ে চলে যেতে বলেছেন। তবে সবাই যান নি। ক'জন ছাত্র-শিক্ষক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে থেকে গেছেন। তাদের ভেতরে মাওলানা মনসুরও একজন। নেতৃত্বাধীন ভীত-সচকিত পাকবাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত সোনারবানবাসীকে মনোবল জোগাতেই তাঁর এই থেকে যাওয়া। হজুরের প্রতি তাদের অঙ্কিষ্ট আর ভালোবাসাই তাকে যেতে দেয় নি। এখন গ্রামবাসীর তিনিই একমাত্র ভরসাস্থল। মানুষের প্রতি তার অক্তিম ভালোবাসা আর তার ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতার কারণে তিনি স্থানীয় মানুষজনের কাছে পেয়ে বসেছেন পৌরের মর্যাদা।

হজুর বলেন, বাবারা কেমন আছেন? কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? কতোদিন ধরে অপেক্ষা করছি আপনারা আসবেন বলে। সালাম দিয়ে মাওলানা সাহেবকে পাশের চেয়ারে বসতে বলি। তিনি বসেন, মালেক এবং অন্যদের ডেকে কথা বলেন। খোজখবর নেন, সব ঠিকঠাক আছে কি না। তারপর বলেন, আসেন বাবারা, চা খাবেন।

— এতো রাতে চা পাবেন কোথায়?

— আমার তো নিজের কুকার আছে। চায়ের সব আয়োজন আছে আমার ঘরে। আসেন, অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, রাতও প্রায় শেষ হয়ে আসছে, চা খাইলে ভালো লাগবে।

একবামুল আর চৌধুরীর হাতে সব ভার ছেড়ে দিয়ে হজুরের সাথে চলি তার আশ্রয়স্থল সোনা মিয়ার বাইরের বৈঠক ঘরের দিকে।

এই হজুর যে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করছেন, সেটা সত্যিকারভাবেই একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ যখন চলছে, তখন পাকিস্তান আর ইসলাম রক্ষার জিগির তুলে দেশের অধিকাংশ মাদ্রাসার মণ্ডলানা আর ছাত্রকে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাদের দলে অত্যন্ত সুচতুরভাবে তেড়াতে পেরেছে। তাদের ভেতরে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে ভুলি তাদের অধিকাংশকে রাজাকার-আলবদর-আলশামস বাহিনীর সদস্য করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদেরও প্রাথমিক ধারণা ছিলো, হজুর পাকিস্তানের পক্ষের মানুষ কিংবা স্থানীয় শাস্তিবাহিনীর নেতা। তার মাদ্রাসার ছেলেদের তিনি দীক্ষা দিচ্ছেন রাজাকার-আলবদর-আলশামস ইত্যাদি হওয়ার ব্যাপারে, যাতে করে তারা সশ্রদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে পারে। এই এলাকায় তিনি পাকবাহিনীর চর হিসেবে কাজ করছেন, এরকম একটা ধারণা নিয়ে জুলাইয়ের শেষ দিকের এক অঙ্ককার রাতে আমরা তাকে হত্যা করতে এসেছিলাম। বিস্তু সে রাতে তাকে হত্যা করা হয় নি। তার সাথে আলাপ করার পর সেদিন বুবাতে পেরোচিলম যে, তিনি একজন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ। আমাদের মতেই জয়বাংলা চার্জেস। মনেপ্রাণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কামনা করছেন। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছেন।

হজুরের নিজের হাতের তৈরি চাউল-বিকুট খেতে খেতে তার কাছ থেকে স্থানীয় পরিষ্ঠিতি সম্পর্কে জানা হয়ে যায়।

রাত শেষ হয়ে আসে, হজুরের নামাজের আজান শোনা যায় মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদ থেকে। আমরা চলে আসি হাইড আউটে।

আমরা এখানে পৌছানোর প্রায় সাথে সাথে ভারতীয় কামান বাহিনী আক্রমণ শুরু করেছিলো। এক একটা শেল উড়েছে আর ফাটেছে দিগন্ত কঁপিয়ে। এক-দুই-তিনি করে এরই মধ্যে কম করে হলেও মোট ৮টি শেল উড়ে এসে বিস্ফোরিত হয়েছে অমরখানা, জগদল আর পঞ্চগড়ের ওপর। শেলের বিস্ফোরণের সেই তাওবে মাটি কেঁপে কেঁপে উঠে। বাতাসেও কেমন যেনো একটা ধাক্কা লাগে। মনে হয়, আমরা যুদ্ধের খুব কাছাকাছি এসে গেছি। এতোদিন তার থেকে বেশ দূরে থাকায় এ অনুভূতিটা মনের মধ্যে জাগে নি।

রেকি মিশন—বানিয়াপাড়া, পাকা সড়ক

ভোরের প্রথম আলোতেই সোনারবান গ্রামটা ঘুরে এর সঠিক অবস্থানটা বুঝে নেয়া হলো। শক্ত আগমনের সম্ভাব্য পথগুলো দেখে নেয়া হলো। ওদের আসবাব সম্ভাব্য দুটো পথ চিহ্নিত করা হলো। একটা জগদলহাট থেকে সোজাসুজি তালমা নদী পার হয়ে সোনারবান, অন্যটি অমরখানা বোর্ড অফিস হয়ে আমাদের আধাআধি উড়িয়ে

দেয়া সেই শালমারা পুল হয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা ধরে সোনারবান। তালমা নদী এবং এর পাড়বন্দি বিস্তীর্ণ ঝংলা ভূমি চমৎকার একটা প্রাকৃতিক বাঁধা। শক্র কয়েকবার সোনারবান গ্রামে এসে তার আতিথেয়তা নিয়ে ফিরে গেছে। এটা তাদের চেনা জায়গা। তারা এখানে আমাদের অবস্থানের খবর পেলে গুরু শুঁকে শুঁকে হানা দিতে আসবেই। তবে ওরা কোন পথ ধরে আসবে, তার কোনো আগাম নিষ্ঠ্যতা নেই। তবুও শক্র সজ্ঞাব্য আগমন পথ চিহ্নিত এবং সেভাবেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। ডিফেন্স বা হাইড আউটে থাকা যুদ্ধরত বাহিনীর জন্য এটা অন্যতম দীক্ষা আর একরামুল ও মুসা নিরাপত্তার দিকটা দেখছে। তালমা নদীর ধার থেবে একটা উঁচু আমগাছে বায়নোকুলার হাতে বসেছে দুই কিশোর সাহসী যৌন্দা জুটি মালেক ও মশু। সেখানে থেকে তালমার ওপারের বিস্তীর্ণ এলাকা নজরে আসে। অন্যান্য পোকেও সেক্সি বসানো হয়েছে। তবে জায়গাটার অবস্থা তালো নয়। গত সপ্তাহেই পাকবাহিনীর একটা দল এখানে এসেছিলো। জগদলহাট এখান থেকে সোজাসুজি দক্ষিণে দেড় মাইলের ব্যবধানে। সেখানে রয়েছে শক্রপক্ষের উত্তরাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম অগ্রবর্তী ঘাঁটি। একে অমরখানায় শক্র প্রথম অগ্রবর্তী দ্বিতীয় দুর্ভেদ্য লাইন হিসেবে মনে করা হয়ে থাকে। এক কোম্পানি নিয়মিত ইউনিটের সাথে রয়েছে প্যারামিলিশিয়া ইপিক্যাপ রাজাকার আলবদর সমন্বয়ে। আরো একটি কোম্পানি। রয়েছে তাদের প্রচুর রসদ আর সাজ সরঞ্জাম। তাদের সঙ্গে পাকা সড়কপথে পঞ্চগড় মূল গ্যারিসনের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। ফোন আর ওয়ারলেসযোগে তারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারছে তাদের হেড কোয়ার্টারের সাথে। জগদলহাট বাজারের প্রবেশমুখে একটা ছোট বাঁকুড়া আমগাছ। তার নিচে মাটি খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে পাকা কংক্রিটের ঘর। এই তাদের মূল ডাগ আউট বা কমান্ড পোস্ট। একজন মেজর থাকেন সেখানে।

সকালবেলা হাইড আউটের গোছগাছ। ইন্দ্ৰাহিমের পরিবেশিত নাস্তা খেয়ে পিন্টুকে হাইড আউটের সামগ্ৰিক দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে আমি বের হয়ে পড়ি। সকাল ৮টার মতো সময় তখন। শক্র অতি কাছাকাছি অবস্থানে এতোগুলো ছেলেকে নিয়ে লুকিয়ে থাকার ব্যাপারটা বিপজ্জনক, ঝুকিপূৰ্ণও। দিনেরবেলায় যতোদূর সম্বৰ এলাকাটা দেখে নেয়া প্ৰয়োজন। সাথে গাইড হিসেবে থাকে সোনারবানের তালমা পাড়ের সাবেক মুজাহিদ কমান্ডাৰ মতি। শক্রঘাঁটি জগদলের যতোটা কাছাকাছি যাওয়া যায়, ততোদূর পৰ্যন্ত যেতে চাই। মতিৰ প্রচুর সাহস। প্রাথমিক আলোচনায় সে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে, সে প্ৰয়োজনে পাকা সড়কের ওপৰ দিয়ে হাঁটিয়েও নিয়ে আসতে পারবে। শুধু তার একটাই শৰ্ত, চেহারা একটুখানি পাল্টে নিতে হবে। সুতৰাঙ এলোমেলো ছুল, হাঁটুৰ ওপৰ গোটানো লুঙ্গি, খালি পা, আধময়লা একটা শোঁজি, গায়ে-কাঁধে জড়ানো গামছা, ঠিক এ-ৰকম একটা আমের দেহাতি মানুষের চেহারা বানিয়ে পথ চলছি মতিৰ সাথে। কোমৰে জড়ানো রয়েছে দুটো ছেনেড আৱ একটা বেয়েনেট। ব্যাপারটা প্ৰথমে মতিকেও জানতে দেয়া হয় নি। আসবাৰ সময় পিন্টু বাধা দিয়েছিলো এই বলে, এভাবে দিনেৱবেলা আপনি একা যাবেন বিৱাট রিস্ক

হয়ে যাচ্ছে মাহবুব ভাই!

আরে ধ্যেৎ বলে ওকে আশ্রম্ভ করি। আমি তো যাচ্ছি মতির কাজিন পরিচয়ে পাট
কিনতে। পাটের দর জেনে আসতে হবে না কেনার আগে। কিস্মু হবে না। ডেন্ট
ওয়ারি। তোমরা সব গোছগাছ করে নাও। টেক কেয়ার অব এভরিবডি।

পিন্টু তাতে সায় দেয় কি না সেটা আর ফিরে দেখি না। তালমা নদীর বাঁকে
মতিকে নিয়ে আমি হারিয়ে যাই ওর দৃষ্টির আড়ালে।

কোমর-গলা পরিমাণ তালমা নদীর পানি পার হয়ে একটা সুড়ঙ্গের মতো পথ
বেয়ে আমরা ওপারে চলে আসি। বিড়ি ধরাও বলে মতিকে বিড়ি দিই। এরপর বিড়ি
ফুঁকতে ফুঁকতে এগিয়ে চলি সমাজের দুই ভিন্নতর থেকে আসা আমরা দুই যুবক।
তালমা পার হওয়ার পর একটা বিস্তীর্ণ সমতল প্রস্তর। শুধু ছোট বোপঝাড় আর
বুনোঘাসের দাম এখানে-সেখানে। মাঝ দিয়ে পায়ে চলার পথ। প্রাথমিক আড়ষ্টতা
কাটিয়ে মতি মিয়া সহজ হয়ে আসে। চলার পথে সে তার নিজের কথা বলে যায়।
আমি তা শুনি আর চোখ-কান সজাগ করে রাখি।

তালমা পারের ছেলে মতি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই সাংসারিক অসচ্ছলতার
ভেতর দিয়ে তার এ পর্যন্ত বেড়ে ওঠে। এখানকার আর সবার মতো তারও
আদিনিবাস কুমিল্লা জেলায়। তার বাবার সাথে ছোট কুমিল্লার সে এখানে চলে এসেছে।
বাবার অবস্থা ভালো ছিলো না। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব
তার ঘাড়ে এসে চেপেছে। সংসারে বৃক্ষ মাছিজৈন ছোট ভাই, এক বোন, তার ক্রী
আর দুটো শিশু সন্তান। প্রচুর মেহনত করে করে করে চলতে হয়। ১৯৬৫-এর পাক-
ভারত যুদ্ধের সময় মুজাহিদ বাহিনীর স্বীকৃত্য হয়ে টেনিং নিয়ে সে মুজাহিদ কমান্ডার
হয়েছিলো। যুদ্ধের শুরুতে পদ্ধতিগত শান্তি কর্মসূচির কাছ থেকে তার ডাক এসেছিলো
রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য। বেতন, পোশাক আর সেই সাথে লুটের
মালামালের ব্যবারার লোভন্যে প্রস্তাব ছিলো। কিন্তু সে যায় নি। সে নেকোয়ে ভোট
দিয়েছে। আওয়ায়া লীগের লোক। বঙ্গবন্ধুকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসে। সে
কেনো রাজাকার বাহিনীতে যাবে? তার জয়বাংলা চাই। পাকবাহিনী প্রায়ে এসে তাকে
খৌজাখুঁজি করার সময়টায় সে লুকিয়ে থেকেছে জঙ্গলে-বোপেঝাড়ে। ওরা চলে
যাওয়ার পর বের হয়ে এসেছিলো। লুকিয়ে থাকতে তার কষ্ট হলেও এবং যে
কোনোদিন ধরা পড়বার ভয় আছে এটা সে জানে। জয়বাংলার জন্য এতোটুকু কষ্ট
তো সইতেই হবে।

বিন্দ্র ভদ্র কিন্তু চোখেয়মুখে মতির একধরনের নিষ্ঠুরতার ছাপ আঁকা। তালমা
পারের সাহসী যুবক মতিরও জয়বাংলা তথা স্বাধীনতা প্রয়োজন। মনের মধ্যে এই
জিজ্ঞাসার উন্নত খুঁজি। জিগ্যেস করি না কিছু। এর উন্নত ওর কথার মধ্য থেকেই
বেরিয়ে আসে। জয়বাংলা না হলে মাতব্বারের কাছে তার যে জমি বাঁধা দেয়া রয়েছে,
তা সে ফেরত পাবে না। জয়বাংলা না হলে তার হালের বলদ হবে না। আর তার
ভেতে পড়া ঘৰের ছাউনি হবে না। প্রায় নিঃশ্ব দরিদ্র মতিকে হয়তো আবার ফিরে
যেতে হবে তার ফেলে আসা কুমিল্লা জেলার পিতা-পিতামহদের বাসভূমি, যেখানে

তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাই মতি স্বাধীনতা চায়। খুব আন্তরিকভাবে জয়বাংলাকে পেতে চায় সে। সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ এবং তার নিজের সামান্য সচলতার জন্য দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত মতির জয়বাংলা প্রয়োজন। স্বাধীনতা বিভিন্ন জনের কাছে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। সামাজিক অন্যায়ের শিকার খেটেখাওয়া দিনমজুর, বলিষ্ঠ দেহের টগবগে যুবক মতি এর ব্যক্তিক্রম হবে কী করে?

মতির গল্প শুনতে শুনতে একসময় পথ ফুরিয়ে আসে। বানিয়াপাড়া গ্রামের রাস্তার পাশে একটা বাড়িতে নিয়ে যেয়ে মতি যাত্রাবিবরতি করে। এর ভেতরেই আমরা বিস্তীর্ণ জলাভূমি, ঘানাখন্দ, বেশ ক'টা গ্রাম আর জনবসতি পার হয়ে এসেছি। রাস্তায় কেবল একজন মতিকে জিগোস করেছিলো, কাই যাও?

— এই সামনে যায় বলে মতি পাশ কাটিয়ে গেছে। এখানে এই বানিয়াপাড়ায় তার দোষ্টের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে ফিসফিসিয়ে বলে, স্যার, বাঁয়ে তাকায়ে দ্যাখেন, পোয়া মাইল দূর হবে জগদলহাট। আর এই রাস্তাটা গিয়া উঠছে পাকা রাস্তায়। তাকায়ে দ্যাখেন, সোজা পাকা রাস্তা দেখা যায়।

আরে সত্যিই তো, মাত্র দুশো গজের মধ্যে পঞ্চগজ অমরখানার আমাদের সেই কল্পিত পাকা সড়ক! পাকবাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে সড়ক থাকিছে। এটা তাদের সরবরাহ আর চলাচল লাইন। এ রাস্তা সম্পর্কে দূর থেকে আমাদের মনে একটা ভীতিকর অনুভূতি কাজ করেছে এতেদিন। আর এই এই মৃহূর্তে একেবারে তার প্রায় নাগালের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। শরীর জড়ে একটা শিউরানো অনুভূতি জেগে ওঠে। আপনাআপনি হাতটা চলে যায় কেমনতে, যেখানে গৌজা রয়েছে দুটো ছেনেড আর একটা বেয়নেট। এখানে যদি কপালের ফেরে কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে ছেনেড দুটোই একমাত্র উত্তরসূর্য।

মতি তার দোষ্টকে ডাকে। দোষ্ট বেরিয়ে আসে বাড়ির ভেতর থেকে। ২/৩টা ছনের ঘরের গাছগাছালি ঘেরা একটা জীৱশীর্ণ ধরনের বাড়ি। মতির দোষ্টের নামও মতি। একসাথে মুজাহিদ বাহিনীতে ট্রেনিং নেয়ার সুবাদে তাদের এই দোষ্টালি। দেখা হতেই দু'জন কৃশল বিনিময় করে। জড়িয়ে ধরে একে অপরকে। আমি নীরবে দাঁড়িয়ে তাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উত্তাপ অনুভব করি।

মতি বলে, সাথে মেহমান রইছে।

— ঠিক আছে আসো। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় মতি বলে, ভেতরে আসেন। বলেই সে এগিয়ে যায়। আমরা তাকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতরের ঘরে গিয়ে বসি।

— তা মতি যিয়া এ্যাতোদিন বাদে কী মনে কইরা আলা?

— আর কইও না! দ্যাশকালের অবস্থা দেখো না। কেমনে আসি? তুমি রাজাকাবে যাও নাই ক্যা?

— তুমি যাও নাই কি জন্যে? দু'জন দু'জনকে প্রশ্ন করে আর হাসে। এর উত্তর ওদের হাসির ভেতর থেকেই পাওয়া যায়।

— পাটের দর দেখতে আসছি দোষ্ট, ইনি মহাজনের মানুষ। এদিকের পাটের দর কও দেখি?

মতির দোষ্ট তখন আমার দিকে ভালোভাবে তাকায়। পাট কিনবেন? বর্ডারের ওপারে নেবেন বুঝি? ঠিক আছে দেয়া যাইবে দর, বসেন। কিছু নাস্তা পানি করেন।

কিছুক্ষণ পর গুড় মাখানো চিড়ে ভাজা আসে। ওরা দু' দোষ্ট পাকবাহিনীর অবস্থান, তাদের শক্তি আর তাদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে গল্প করতে থাকে। মতির দোষ্টকে নিয়মিত ডিউটি দিতে হয় চৈতনপাড়া ব্রিজে। বাজাকারে যাওয়া ঠেকানো গেলেও এটা না করে পারা যায় না, নইলে নির্ধারিত মৃত্যু।

ঘন্টাখানেক পর পাটের দামটাম জেনে নিয়ে আমরা তার বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি। রাস্তার পাশের খন্দে কয়েকজন মানুষ চটকা জাল দিয়ে বর্ষার পানিতে ভাসা মাছ ধরছে। তাদের মাছ ধরার ব্যাপারটা দেখতে যাচ্ছি, তাব দেখিয়ে পাকা সড়কের একেবারে কাছাকাছি চলে যাই। ওরা দু'জন সাথে থাকে। কোনো দুর্ঘটনা ঘটে না। বিদায়ের সময় মতির দোষ্ট বলে, আপনে কিছু পাট কিনতে আসেন নাই।

— তবে কী জন্য এসেছি? হাসিমুখে জানতে চাই।

এবার সে ফিসফিসিয়ে বলে, সবকিছু ভালো করে দেখে নিয়েছেন তো?

আমি হাসি, বলি না কিছুই। আবার দেখা হবে কিছু ফিরতি পথ ধরি। মতিকে জিগ্যেস করি, তোমার বঙ্গ আমাকে চিনলো কেমন করে? আপনাদের দেখলেই চিনা যায় স্যার, মতির সোজা এবং সরল উত্তর।

মরাল শ্রীবার সেই তরুণী

বেলা ১টায় হাইড আউটে ফিল্ম জাসি। পিন্টু জানায়, সব ঠিকঠাক মতো আছে। কোনো অসুবিধে নেই। দুপুরে খাবার-দাবারের পর একটা কড়া ঘুম। রাতে বের হতে হবে। তাই শরীরের বিশ্রাম আর ঘুম দরকার। ঘুম ভাঙে সেই গড়ানো বিকেলে। মিনহাজ চা-নাস্তা নিয়ে ঢোকে। তার পেছনে পেছনে হাফেজ নামের একটা কম বয়সী ফর্সা মতো ছেলেও এগিয়ে আসে। বাইরে চেয়ার পেতে একা বসে আছি। ছেলেটি মুসার প্লাটনের সাথে আমাদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এখনো তার জড়তা কাটে নি। ইতস্তত আর কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, ওস্তাদ একটা কথা কহিবা চাহচু।

— কি কথা বল।

— আপনি মাহতাব সাহেবকে চেনেন?

— কোন মাহতাব সাহেব?

— রংপুরে যিনি আপনাদের বাড়ির প্রতিবেশী!

তার কথায় উৎক্ষণ্ঠা বোধ করি, কেনো চিনবো না, কেনোঁ এক সঙ্গেই তো ইতিয়াতে এসেছি। ওলার কিছু হয়েছে নাকি?

— না না কিছু হয় নাই বলে হাফেজ মিয়া আশ্বস্ত করে আমাকে। তারপর বলে, তিনি তো আমার ভগ্নিপতি হন, আপন খালাতো ভগ্নিপতি।

— বলিস কিরে? তোর বাড়ি কোথায়?

- ভজনপুর।
- ভজনপুর তো কাছেই।
- তুইতো তাহলে বাড়ির কাছ থেকেই যুদ্ধ করছিস। বাড়িতে গেছিলি? হ্যা বলে মাথা নাড়ে হাফেজ মিয়া। বলে, আপনি যে ও দিন ছুটি দিছিলেন তখন বাড়ি গেছি, এখন তো ইতিয়ার সৈন্য ঘাঁটি করেছে হামার ভজনপুরত। মাহতাব ভাইয়েরা কোটগোছত্ আছে। ওউটা তো উমহার বাপের বাড়ি। মুই ছুটিত যায়া একদিন কোটগোছত্ আছিনু। উমহারাই কহিল তুমহার কথা।
- কি বললো?
- প্রথমে তুমহার নাম করিলে মুই কহিনু তিনি তো হামারলার কমান্ডার। খুব সাহসী আৱ ভালো মানুষ।
- তাৱপৰ! হাফেজেৰ কাছ থেকে আৱো কিছু জানবাৰ আগ্রহটা তখন জাঁকিয়ে বসে।
- উমহারা খুব কষ্টেৰ মধ্যে আছে। তুমহাক একবাৰ যাবা কহিছে।
- আমাকে যেতে বলেছে?
- জে।
- ঠিক আছে, যা, দেখা যাবে পৱে। কথাটা রেকলেওকে যেতে বলি। ও চলে যেতেই মুহূৰ্তে মনেৰ আয়নায় একটা ছবি ভেসে পড়ে।
- আমি হেঁটে হেঁটে কলেজে যাচ্ছি। আয়াৰ খণ্টা দিয়ে বায়ে যাওয়া বাতাসেৰ গায়ে তৱঙ্গ তুলে একটা রিকশা ছুটে চলেছে কুমুকাহকেল কলেজেৰ দিকে। সেই হুড়তোলা রিকশায় গৰিবত তঙ্গিয়া বসে আছে কুমুক শ্রীবাৰ এক তৱণী। চমৎকাৰ দেহে বলৱতী আৱ অপৰূপ মুখশীৰ সেই তৱণী তাৰ শাদা ওড়না উড়িয়ে রিকশায় চেপে যেনো ডানা মেলে উড়ে যাচ্ছে কলেজেৰ পথ ধৰে। আমাদেৱ পাশেৰ বাড়িৰই মেয়ে সে। এক ক্লাস জুনিয়ৱ। তবে কিথাবাৰ্তা তেমন নেই বললেই চলে। মেয়েটি প্রায় প্রতিদিনই তাৰ সেই গৰিবত তঙ্গি তুলে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তাৰ রিকশাসহ। আৱ আমি ডান হাতে খাতাখানা চেপে ধৰে সাধাৱশেৰ মতো প্রতিদিন হেঁটে যাই একইভাৱে। মেয়েটি যে আমাকে কোনোদিন লক্ষ্য কৱে নি, এমন নয়। কৱেছে, তবে রিকশা থামিয়ে একদিনও বলে নি, আসুন। কষ্ট কৱে প্রতিদিন হেঁটে যান, আজ আমাৰ রিকশায় যাবেন!
- আজ সোনাৱান হাইড আউটেৰ চৰাচৰ ঘিৱে ঘনিয়ে আসা অক্ষকাৱে একাকী যখন বসে আছি, ঘটনাটা তখন হঠাৎ কৱেই মনে পড়ে। কেনো যেনো মনে হয়, মেয়েটা ইচ্ছে কৱলেই তাৰ রিকশায় একদিনেৰ জন্য হলেও আমাকে ডেকে তুলে নিতে পাৰতো। নেয় নি। কেনো নেয় নি, তাৰ কাৰণ হয়তো সে-ই জানে। তখন কিৱে যেতে থাকা হাফেজ মিয়াকে হঠাৎ পেছন থেকে ডাক দিই, এই হাফেজ শোন। হাফেজ আসে। ওৱ দিকে তাকিয়ে জিগোস কৱি, মাহতাব সাহেবেৰ মেয়েটা কেমন আছোৱে?
- আছে এক ব্রকম। তবে তাক নিয়াইতো উমহারলার চিন্তা। ওই না

থাকিলেতো উমহারালাক ইভিয়া আসিবার দরকার আছিলো না। অর্থাৎ যুবতী মেয়েটির নিরাপত্তার কথা ভেবেই ওনারা ভারতে শরণার্থী হয়েছেন। হায়রে জীবন! কী ভয়াবহ একটা দৃশ্যময়ের যুখোযুখি আমরা! আমরা সবাই। না হলে পরিবারের যুবতী মেয়ের মান-সন্তুষ্টি রক্ষার জন্য মাহত্ব সাহেবকে তার পুরো পরিবারসহ ভারতে আসতে হবে কেনো? সেই আগুনের মতো মেয়েকে নিয়ে দেশের কোথাও থাকবার সাহস তিনি পান নি। একলা মাহত্ব সাহেব কেনো, একই কারণে তার মতো হাজার শত পরিবার এখন ভারতে শরণার্থী হয়ে মানবেতের জীবনযাপন করছেন। কিন্তু এপারে এসেও কি তাঁরা তাদের কাছিক্ষিত নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছেন? অনেকেই পান নি। হাফেজকে জিগ্যেস করি, তোর ভাগ্নি কিন্তু বলেছে?

— জি কহিছে, কহিছে। মুই যেনো তুমহাক কঁ-হে সময় পাইলেই যেনো একবার উমহাক দেখিবার যান।

— ঠিক আছে তুই যা।

হাফেজ চলে যেতেই বিড়ি টানতে টানতে একটা খুশি খুশি ভাব নিয়ে পিন্টুকে হেলেন্দুলে আসতে দেখা যায়। কাছে এসে পাশে বসতে বসতে বলে, একা বসে আছেন, আমাকে ডাকলেই তো হতো। জায়গাটা খাসে ছাঁড়ি। কিন্তু মাহবুব ভাই . . .

— কিন্তু কি? জিগ্যেস করি আমি। আমার প্রশ্নে সরাসরি উত্তর না দিয়ে ও বলে, নেন, বিড়ি ফুঁকান।

বিড়ি ধরাই ওর ম্যাচের আগুন। বিড়ি টানতে টানতে পিন্টু প্রায় আনমনেই যেনো বলে, বৃহত খতরালক জায়গা হয়েছেই বাঘের বাস। আমরা একেবারে বাঘের ঘরে ঘোগের মতো অবস্থানে অবস্থান করি।

— তোমার উপমাটা হচ্ছে গোসেন্ট ঠিক পিন্টু। দেখা যাক না কদিন থাকা যায়।

— রাতের বেলা এনি অসারেশন বস?

হ্যা, প্রেটলপার্টি, তৃষ্ণি যাবে। ১৫ জনের দল। মুসা আর চৌধুরী হাইড আউটের দায়িত্বে থাকবে। একরাতুল আর মোতালেবসহ শক্ত একটা দল গড়তে হবে।

— ঠিক আছে বলে পিন্টু উঠে দাঁড়ায় আর ‘যদি বারণ করো তবে গাহিব না’ গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ভেতর বাড়িতে হাইড আউটের অবস্থানে চলে যায়।

আজ মতি আমাদের গাইড। রাতে প্রোটেকটিভ প্রেটলসহ সকালবেলাকার সেই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি। চৈতন্পাড়া বিজের খুব কাছে থেকে জায়গাটা রেকি করে শেষ রাতের ভেতরেই ফিরে আসি হাইড আউটে।

২৩.৮.৭১

অধিকৃত পঞ্চগড় এবং শক্তির গতিবিধি

সোনারবানে হাইড আউট সেট হয়ে যায়। লঙ্ঘরখানা ও টোর কোত্ত এগুলো ম্যানেজ হয়ে যায় সুন্দরভাবে। দুটো বড়ো টিনের ঘরে ছেলেদের থাকার জায়গা হয়ে যায়। ছেলেদের বাড়ির বাইরে ঘোরাঘুরি নিষিদ্ধ। তাই তাস পেটায় দল বেঁধে। কেউ

গল্পগুজবে মন্ত থাকে। কোথাও থাল পিটিয়ে গানের আসর চলে।

সকাল থেকেই আকাশ মুখ গোমরা করে আছে। একসময় বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে। আকাশ ভাঙা সে বৃষ্টির ধারা। তার ভেতরেই সবার নাস্তা সরবরাহ করে মিনহাজ। টিনের চালে বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ তরঙ্গে কেমন যেনো একটা মাদকতা মেশানো। শুনতে ভালো লাগে। আবার মন উদাস হয়ে যায়। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। প্রচণ্ড পরিষ্কারের ধকল যাচ্ছে শরীরের ওপর দিয়ে। শরীর আর মন জুড়ে তাই আলস্য জড়িয়ে থাকে। বিছানায় শুয়ে থাকি চূপাচপ। পিন্টু বিছানার পাশে টিনের দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে অলস ভঙ্গিতে বসে থেকে বৃষ্টির গান জুড়ে দেয়। ওর গলায় বাজতে থাকে ‘আজি ঘৰ ঘৰ বাদল দিনে . . .’ শোয়া অবস্থাতেই পিন্টুর দিকে তাকাই। ওকে দেখি। ওর দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত। গলায় উদাস সুরের গান। মনে হয়, ও যেন কোথাও হারিয়ে গেছে মনে মনে। পিন্টুর মনে তাহলে কি কোনো দুঃখ আছে? চকিতে মনে হয় কথাটা। আর হতেই মনে মনে এর উত্তর খুঁজি আতিপাতি। খুঁজতে খুঁজতে একসময় মনে হয়, ওর মনের গহিনে কোথাও থাকতে পারে গোপন কোনো বেদন। সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না নিয়েই তো মানুষের জীবন। এমনও তো হতে পারে, পিন্টুর মনের গভীরে যে বেদনের দাগ, সেটা খুবই প্রগাঢ়। আর সেই বেদনকে আড়াল করবার জন্যই সম্ভবত ভানে এতো হাসে, হাসায় সবাইকে। রঙ-রসিকতার ভেতরে ভুবে ভুলতে চাই সেই সংগোপন বেদনার তিক্ত শৃঙ্খিকে। কে জানে এই যে এখন ও নিবিড় জৈব্যাতায় গভীর গলায় বৃষ্টির যে গান গাইছে, তার পেছনে রয়েছে তার মনের ভুজুরের সেই দৃঢ়বোধের চাপা আর্তি!

টিনের চালে ঝমঝম শব্দে তথমহৃষ্টির আবোর ধারা। সেই সাথে পিন্টুর গান, চোখ বন্ধ করে দুটোই উপভোগ করি প্রাণভরে। বৃষ্টিতে কাকভেজা হয়ে সেক্সিরা ডিউটি করতে থাকে। মাঝেকাল ভুজুটি চলে যায় বৃষ্টিতে ভিজতেই তাদের আমগাছের মগডালের সেই অবজারভেশন পোষ্টে। ওদের উৎসাহ দেখে ভালো লাগে। ছেলেরা যুদ্ধের প্রক্রিয়া কেমন সিজন্দ আর কষ্টসহিষ্ণু হয়ে উঠছে, ব্যাপারটা দেখে মনটা ভরে ওঠে।

একটু আগে আবেগের আচ্ছন্নতা ছেকে ধরেছিলো আমাকে, এখন সেটা আর সেটা নেই। বাস্তবে কিরে আসে মন। ভাবনা ভেবে চলি যুদ্ধের। আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করা দরকার। যুদ্ধের স্ট্রাটেজি ঠিক করতে হলে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের ওপর নির্ভর করতে হয় সম্পূর্ণভাবে। এখানে হাইড আউট গড়ে তোলা গেছে ভালোভাবেই। জগদলহাট ও চৈতনপাড়া পাকা সড়ক পর্যন্ত রেকি করা হয়েছে। আশপাশের অবস্থান সম্পর্কেও জানা হয়েছে। এখন পরিকল্পনা করতে হবে শুধু অপারেশনের। আর এই পরিকল্পনা প্রয়োনের জন্য শক্তির সঠিক অবস্থান এবং গতিবিধি ও তাদের শক্তি সম্পর্কে সুঅবিহিত হওয়া প্রয়োজন প্রথমে। তাই বেলা এগারোটা নাগাদ বৃষ্টি থামলে পিন্টুকে নিয়ে বের হই সংবাদের উৎস সন্ধানে। এখন আমাদের সঙ্গে এমন একজন বিশ্বাসী মানুষ দরকার, পঞ্চগড়ে যার নিয়মিত যাতায়াত আছে। তেমন একজনকে খুঁজে পেতে হবে আমাদের এবং এখুনি। ভাবনা মতো আমরা হজুরের আশ্রয়ে গিয়ে হাজির হই।

আমাদের দেখেই তিনি শশব্যন্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে আসেন। শুয়ে ছিলেন তিনি। আমাদের দেখে মুভাবসুলভ সৌজন্যের সঙ্গে নিজের বিছানায় নিয়ে বসান।

ক' জন তালের এলেম পড়াশোনা করছিলো তখন হজুরের ঘরে। তাদের তিনি ছুটি দিয়ে দেন। দিয়েই মাওলানা মনসুর আমাদের দিকে তাকান, বাবারা চা খাবেন?

— না আপনি কষ্ট করবেন কেন?

— কিসের কষ্ট আমার বলেন, কষ্ট করছেন তো আপনারা।

হজুর তার কুকার জালিয়ে নেন মুহূর্তে। তারপর কেতলিতে বাটপট পানি ভরে সেটা চাপিয়ে দেন কুকারে। কিছুক্ষণের ভেতরেই পানি গরম হয়ে কেতলির মুখ দিয়ে সো-সো আওয়াজ বেরতে থাকে। হজুরকে বলি, একটা কাজে এসেছি। আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

— ঠিক আছে, আগে চা খান। তারপর কাজের কথা।

কম বয়সী একজন তালেব এলেম আর মালেক যিয়া সাহায্য করে, হজুর নিজেই ধূমায়িত কেতলির ঢাকনা খুলে পানিতে চা ঢালেন। একটা বয়াম খুলে বিস্তুট বের করে আনেন। এসব কাজ করেন তিনি গভীর যত্ন আর পরিপাটিতার সঙ্গে। আমরা বসে বসে ব্যাপারটা লক্ষ্য করি। সবকিছু তৈরি হওয়ার পৰ্ব হজুর নিজেই এগিয়ে দেন চা-বিস্তুটের প্লেট। মনে হয় তিনি বেশ শৌখিন জুত পরিপাটি মানুষ। একটা সন্তুষ্টতা আর মাপা অন্তর ছাপ তার আচার-অচর্চে। মনে আর এই দ্বিধা থাকে না যে, তিনি কোনো ভালো বৎশ থেকে এসেছেন। সৈরশাল না ফরিদপুর, কোথায় যেনো তার পৈতৃক বাড়ি। কেনো যে তিনি জুহুজ ছাওয়া এই অঙ্ককার জনপদের বৃত্তে নিজেকে এভাবে নির্বাসিত করেছেন একে জানে তার হদিস। আমাদের দিয়েই হজুর নিজের জন্য এককাপ চা নিয়ে বাস্তুটের চেয়ারটায় বসেন। তারপর বলেন, কী চান আপনারা, বলেন?

— সংবাদ। সংবাদ চাই হজুর। সঠিক সংবাদ। এমন একজন বিশ্বাসী মানুষ দরকার, যার পঞ্চগড়ে নিয়মিত যাতায়াত আছে এবং যে নিখুতভাবে বলতে পারবে, পাকবাহিনীর অবস্থান আর সঠিক তথ্য।

হজুর মাথা নিচু করে ভাবেন কিছুক্ষণ। তারপর বলেন, ঠিক আছে। বসেন সামান্য সময়। আমি ডাকে আনতেছি।

তিনি বাইরে যান। গিয়ে মালেককে কি যেনো বলেন। মতিও দাঁড়ানো ছিলো বাইরে। তাদের দু'জনকেই পাঠিয়ে দেন স্লিপত ব্যক্তিকে ডেকে আনতে। আবার বৃষ্টি নামতে শুরু করে। এই ফাঁকে হজুরের বিছানায় বসে আমরা তার কাছ থেকে পাকবাহিনীর আগমন আর তাদের অভ্যাচারের কাহিনী শুনি। তিনি বলেন, আমাদের ধর্মে জেনা করা একটা মন্ত মহাপাপ। তারা এখানে যতোবার এসেছে, ততোবার তারা থেয়েছে, নিয়েছে আর লুটতরাজ করেছে। আবার বাড়ির ভেতরে ঢুকে বৌ-বিদের ওপর জেনা করে গেছে। এ মহাপাপ তাদের সইবে না বাবা, আমি কইতেছি। এদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। ওরা কোনোভাবেই ঠেকাতে পারবে না পাকিস্তানের ধ্বংসকে। অভ্যাচার আর লুটতরাজ তবুও সওয়া যায়, কিন্তু

নিজের বৌ-ঘিরের ওপর তাদের এই যে জেনা করা, ধর্ষণ করা, মানুষ সইবে কেনো? মানুষ তাদের ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তাদের ডয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটেছুটি করছে। দেশের মানুষের ওপর বিশ্বাস হারালে ওরা টিকবে কেমন করে এ দেশে? হজুর আপন মনেই যেনে বিড়বিড় করে চলেন, বেশিদিন টিকতে পারবে না ওরা, দেখবেন। ওদের পরাজয় হবেই। এদেশ ছেড়ে ওদের ভাগতে হবে একদিন। জয়বাংলা না হয়ে যাবে কোথায়? শেখ মুজিবকে ওরা আটকে রাখলেও জয়বাংলাকে রুখতে পারবে না ...।

বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় এক ব্যক্তিকে আসতে দেখা যায়। পরনে তার লুপ্তি আর পাঞ্জাবি। মুখে কালো দাঢ়ি। মাঝবয়সী বলেই মনে হয়। মজবুত বানের শরীর। তার পেছনে কাক-ভেজা অবস্থায় মালেক আর মতি মিয়াকে দেখা যায়। বাইরের পানিতে পা ধূয়ে ঘরের বাইরে ছাতা গুটিয়ে হজুরকে তাজিমের সঙ্গে সালাম দিয়ে ভেতরে ঢেকেন তিনি। হজুর তাকে বসতে বলেন। তারপর তাকে দেখিয়ে আমাদের দিকে তাকান, এনার নাম আজিজ মাস্টার। শিক্ষকতা করেন। আপনারা যা জানতে চান আজিজ বলতে পারবে তার সবকিছু। স্কুলের কাজে এবং বেতন তুলতে সে পঞ্চগড় যায়।

অদ্বৈত এবার কিছুটা সন্দিক্ষ চোখে আমাদের দিকে তাকান। মানুষের মুখচৰ্বি বলে দেয়, তার মনের চেহারা। এ লোক যে একজন চালাক-চতুর মানুষ, সেটা তার মুখভঙ্গিই বলে দিছে। মন বলে, একে বিশ্বাস কৰো যায়। আমাদের তো একজন চালাক-চতুর মানুষই দরকার। আর সেই শীঘ্ৰেই শিক্ষিত হলে তো আর কথাই নেই।

— আপনার নাম আজিজ মাস্টার হজুরকে জিগ্যেস করি আমি।

তিনি জে বলে উত্তর দেন।

— আপনার রেগুলার প্রক্ষেত্রে যাওয়া-আসা আছে? এবার পিন্টু জিগ্যেস করে তাকে একটুখানি কাঠখোটা দেবে। পিন্টুর জিজ্ঞাসার ধরনে লোকটা বোধ হয় ভয় পান। তিনি হজুরের দিকে তাকান। পিন্টুর কথার জবাব দেবেন কি না, কিংবা কীভাবে দেবেন তিনি, সেই স্মৃতি আদায় করার জন্য। হজুর তাকে আশ্বস্ত করেন, ভয় নাই কোনো, এনারা যা জিগ্যায়, তার উত্তর দেও তুমি যা জানো। এই ফাঁকে আমি তাকে বলি, আমাদের আপনি চিনেছেন?

এবার আজিজ মাস্টার আরো বিধায় পড়ে যান।

— ভয় পাচ্ছেন কেনো? কোনো ভয় নেই, আমরা শুধু আপনার কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য ডেকেছি। তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, আমরা যে এখানে আছি, এটা যেনে ওরা আপনার কাছ থেকে জানতে না পারে আর সত্য গোপন করবেন না একেবারেই, ঠিক আছে? এমন সময় সেন্ট্রি বদলের জন্য কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে আমাদের দলের দু'জন হজুরের ঘরের সামনে আসে।

— কিরে তোরা সেন্ট্রি ডিউটি নিয়ে ফিরলি, না যাচ্ছিস? যাচ্ছি বলে ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। আজিজ মাস্টার পেছন ফিরে দু'জন অন্তর্ধারীকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুভূতে যেনে জমে হিম হয়ে যান। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি

ওদেরকে নির্দিষ্ট পোষ্টে গিয়ে আগের দলকে রিলিফ দিতে বলি। ভজতে ভজতে চলে যায় শুভ্র আব করিম। ওরা চলে যেতেই আজিজ মিয়াকে বলি, বলেন মাস্টার সাহেব, আপনি তো নিয়মিত পঞ্চগড় যান, গতকালও গিয়েছিলেন, বলেন কি কি দেখেছেন, ওদের অবস্থান কোথায় কোথায়, সংখ্যায় ওরা কত, হাতিয়ারপত্র কি কি আছে, কখন কখন ওরা চলাফেরা করে, বলেন সবকিছু।

গলা খাকারি দিয়ে আজিজ মাস্টার পাকবাহিনীর প্রকৃত অবস্থান এবং গতিবিধির একটা চমৎকার বর্ণনা দেন। আমি তা লিখে নিই আমার ফিল্ড নোট বুকে। লোকটার পর্যবেক্ষণ শক্তি পাক অবস্থানের প্রায় নির্ণুত একটা ছবি তুলে ধরে। মাঝে মাঝে মেঝেতে একেও তিনি বুঝিয়ে দেন। আমি বা পিটু কেউই কোনোদিন পঞ্চগড় শহর আগে দেখি নি। অথচ যুদ্ধের শুরু থেকে পঞ্চগড়কে কেন্দ্র করেই শক্তির মুভমেন্ট বা চলাচলের ওপর আমাদের সবগুলো যুদ্ধ পরিকল্পনা গড়ে তোলা হয়েছে। এর আগেও পঞ্চগড় শহর এবং সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসা শক্তির বিবরণ আমরা সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে। আমাদের পিচ্ছি মুক্তিযোদ্ধা মালেককে পঞ্চগড় শহরে পাঠিয়ে একরাত তাকে সেখানে থাকবার পরামর্শ দিয়ে পঞ্চগড় শহরের শক্তির অবস্থানগত বেশ কিছু খুঁটিনাটি রেকি করে আনিয়েছি। কিন্তু এখন আজিজ মাস্টার যে বর্ণনা তুলে ধরলো, সেটা সত্যিই অতুলনীয় এবং সর্বজনীয় বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো। তার বর্ণনা অনুযায়ী আমার ডায়েরিতে পাকবাহিনীর অবস্থান এবং তাদের শক্তি ও গতিবিধির বিবরণ লিপিবদ্ধ করি এইভাবে :

সারণি-৭

১. পঞ্চগড়ের পাকবাহিনীর সামাজিক সংখ্যা বলা যাচ্ছে না।
২. জরুরি অবস্থায় তারা জাতির ঠাকুরগাঁও ক্যান্টনমেন্ট থেকে চলে আসে।
৩. তাদের ঘাঁটিগুলোর অবস্থান হচ্ছে এইসব জায়গায় :
 - ক. ফি পাইমারি স্কুলে, থানা ও স্কুলের সামনে ২/৩টা বাস্কার রয়েছে।
 - খ. ন্যাশনাল ব্যাকের দক্ষিণ দিকে দাঢ়াজ উদ্দিন চৌধুরীর বাড়ি। তার বাড়ির সামনে তাদের পাকা বাস্কার রয়েছে ১টা।
 - গ. মকবুলার রহমানের বাড়ির সামনে ১টা পাকা বাস্কার।
 - ঘ. পঞ্চগড় ব্রিজের দক্ষিণ দিকে ১টা পাকা বাস্কার। সে বাস্কারটার মুখ পঞ্চগড় শহরের দিকে।
 - ঙ. ব্রিজের উত্তর দিকে একটা হোটেল রয়েছে। হোটেলটার নাম কালুর হোটেল। পাকসেনারা সেখানে দিন-রাত অবস্থানে থাকে।
 - চ. ব্রিজের প্রায় ২০০ গজ পশ্চিমে দরবেশ বাড়ি। সেখানে রয়েছে ১টা পাকা বাস্কার।
- (ছ) শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌরাস্তি বা চৌমাথায় তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে মজবুত বাস্কার। ব্রিজ থেকে তার দূরত্ব প্রায় ৩০০ গজের মতো। সেখানে দিন-রাত চক্রিশ ঘটা পাকসেনাদের সতর্ক দাঢ়ানো ডিউটি থাকে।

জ. পঞ্জগড় চিনিকল এলাকায় তারা বড় ধরনের ডিফেন্স বা ঘাঁটি স্থাপন করেছে। কোনো লোকের মে এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ।

আজিজ মাস্টারের যুদ্ধাবস্থায় পাকবাহিনীর চলাচল এবং তাদের শক্তি সম্পর্কে বিবরণ এই রকম :

১. পঞ্জগড় থেকে পাকসেনাদের নিয়মিত বা রুটিন মাফিক চলাচলের ব্যাপারটা বোঝা যায় না।
২. জগদলহাটে তাদের মোট সেনা সংখ্যা কতো, তা বলা যায় না, তবে ১ প্লাটুনের মতো হতে পারে।
৩. সকাল ৮টা থেকে ১১টা রাতে ১-২টা জিপগাড়ি অমরখানা পর্যন্ত আসে পঞ্জগড় থেকে। ১ থেকে ৪ জন সৈনিক থাকে জিপগাড়িতে।
৪. পঞ্জগড়-অমরখানা পাকা সড়কের ওপর তারা নিয়মিত পেট্রেল করে না।
৫. যখন এপার থেকে প্রচও গোলাবর্ষণ শুরু হয়, তখন ৪/৫টা গাড়িযোগে তারা অমরখানা রাস্তা ধরে এগিয়ে আসে। রাস্তার পাশ থেকে মুক্তিকৌজের অবস্থানের ওপর গোলাবর্ষণ করে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পঞ্জগড়ে ফিরে যায়।
৬. এপার থেকে প্রচও গোলাবর্ষণ শুরু হলে পাকসেনারা তাদের বাক্সারের নিরাপদ আঞ্চল্যে থাকে।

(সূত্র : জায়েরী)

‘মোটামুটি আমি যা দেখেছি, তাই বললাম আপনাদের’ বলে আজিজ মাস্টার থামেন।

— ঠিক আছে, আপাতত ক্ষতিই চলবে আমাদের। তবে পরে যদি আরো কোনো তথ্য পান সাথে সাথে আমাদের জানাবেন।

— ঠিক আছে, আচ্ছ বলে মাস্টার যাথা নাড়েন। ‘তবে কথাটা মনে রাখবেন’ বলে এবার তাকে হৃশিয়ারি দিই আমাদেরকে যেসব কথা আপনি এখন বললেন, সেটা আর কাউকে বলবেন না। আমাদের সাথে আপনার দেখা হয়েছে কিংবা কথা হয়েছে, তাও যেনো কেউ জানতে না পারে। এখানে যে আমরা আছি, তা যদি বাইরে জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে ধরে নেবো, সেটা আপনি বলেছেন। বুঝেছেন মাস্টার সাহেব কি বলেছিঃ?

— জি হ্যাঁ বুঝেছি বলে মাস্টার ত্বরিত উন্নত দেন।

— ঠিক আছে, আপনি এখন যান। পরে আপনাকে আবার ডাকা হবে। তবে পঞ্জগড় এখন থেকে কম যাবেন, বুঝলেনঃ?

জি বলে মাস্টার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। তারপর বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছজুরকে সালাম দেন, আমাদের সালাম দেন এবং তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে যান। তার যাওয়া দেখে মনে হয়, প্রচও ভয় পেয়েছেন মাস্টার এবং যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যেনো হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। আমাদের কথাবার্তা যখন শেষ হলো, তখন মাদ্রাসার

মসজিদে জোহরের নামাজের আজান পড়ে। হজুব নামাজে যাবেন বলে তৈরি হতে থাকেন। আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি হাইড আউটের ভেতরে। আজ রাতে কোনো অপারেশন নেই, শুধু সোনারবান এলাকার চারদিকে প্রেট্রল চলবে কথাটা জানিয়ে দিই পিন্টুকে।

২৪.৮.৭১

লেফটেন্যান্ট পুরি

দশটার দিকে গড়ালবাড়ি বিওপিতে পৌছে দেখি, আমাদের সেই পরিচিত সিও-এর ১ টনি গাড়ির বনেটে বসে আছেন কম বয়সী একজন অফিসার। হ্যাংলা-গাতলা গড়নের। একেবারেই কাঁচা বয়স। আমরা গাড়ির কাছে পৌছুন্তেই লাফ দিয়ে নামেন তিনি। এগিয়ে এসে পরিচিত হন নিজের থেকে, আই এ্যাম লেফটেন্যান্ট পুরি, হাউ ডু ইউ ডু ফ্রেন্স? তার আন্তরিক অভ্যর্থনা ভালো লাগে। দিলখোলা প্রাণখোলা হাস্যেজ্বল ছেলেমানুষ ধরনের অফিসার লেফটেন্যান্ট পুরি। আমরা আমাদের পরিচয় দিই। পরিচয় পেতেই তিনি বলে ওঠেন, ম্যায় আপকা বাড়েমে সুনা হ্যায় ডিটেলস, মেজের দরজি কা পাস। আইয়ে বইঠিয়ে। লেট আস টক এও ডিসকাস।

হঠাৎ করে মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন উঠি মারে এবং জ্বলা মনকে দমিয়ে দেয়, এই ছেকরা অফিসার কি মেজের দরজির জায়গায় সুবেদারের সিও বা কমান্ডিং অফিসার হয়ে এলো? এর অধীনে থেকে এর কমান্ডে এগুল থেকে যুদ্ধ করতে হবে? পিন্টুর মুখের অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো, তারপুরাতের অবস্থা আমারই যতো।

বিওপির মুখে নেপালি সুবেদার হাতি জিগ্যেস করেন, কেয়া দাদু, আচ্ছা হ্যায়? কোথ খতরা তো নেই?

নেই দাদু, আচ্ছা হ্যায়, সুবেদার দাদু মাথা নাড়েন, লেফটেন্যান্টকে একটা স্যালুট ঠুকে বলেন, যাইয়ে সাব, বক্সাঠয়ে, ইয়ে লাড়কা লোক বহুত বড় ফাইটার হ্যায়, বহুত ফাইট কিয়া হ্যায় ইধার।

— হ্যা সুবেদার সাব, হাম সুনা হ্যায়, আইয়ে কমান্ডারাস্ বলে লেফটেন্যান্ট তার সাথে নিয়ে বিওপির ভেতরে আমাদের বসবার নিদিষ্ট জায়গায় আসেন। আমরা তার মুখোমুখি বসি। লেফটেন্যান্টের মধ্যে কেমন হেনো একটা অস্থিতির ভাব লক্ষ্য করি। তিনি সপ্রতিভ আর সহজ হতে চাইছেন, কিন্তু কেনো জানি পারছেন না। বুঝতে পারি, এসবের মূলে তার অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতা। কী ধরনের প্রশ্ন করে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিতে হয়, সেটা তার জানা নেই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি তাকে সহজ করার চেষ্টা করি, আর ইউ আওয়ার নিউ কমান্ডিং অফিসার?

— নেই ইয়ার, বলে পুরি হাসেন। ম্যায়তো প্রজ্ঞ দেনে আয়া হঁ। ইউ উইল গেট ইউর নিউ অফিসার সুন। তার জবাব শুনে মুহূর্তে স্পষ্টির কারণ ঘটে। যাক বাবা তাহলে বাঁচা গেল। পুরিকে আবার জিগ্যেস করি, হ ইজ কমিং এ্যাজ আওয়ার সিও?

পুরি মাথা নাড়েন, আই ডোক্ট নো। বাট ইউ উইল গেট গুড অফিসার, নো

ডাউট। এ কথা মেজর দরজিও যাওয়ার সময় আমাদের বলে গেছেন। এখন কে যে হবেন আমাদের সেই গুড অফিসার, কে জানে। পুরিকে বলি, সেট ইউ হ্যাভ আওয়ার রিপোর্ট অব লাস্ট থ্রি ডেজ।

— ওঁ ইয়েস বলে তিনি তার মোট বুক বের করেন। নালাগঞ্জ থেকে সোনারবান হাইড আউট পরিবর্তন, জগদলহাট-চৈতনপাড়া রেকি করার ঘটনাসহ পঞ্চগড়-অমরখানা পর্যন্ত পাকবাহিনীর অবস্থান, শক্তি এবং তাদের গতিবিধির ওপর রিপোর্ট দিই। পুরি মনোযোগ দিয়ে টুকে নেন সবকিছু। তার কাজ শেষ হলে বলি, শুধু রেকি, পেট্রেল এবং ইনফরমেশন সংগ্রহ নিয়ে আমাদের গত তিন দিন কেটেছে। তবে এখন স্ট্রাটেজি ঠিক করে আমরা শক্র ওপর আঘাত হানতে পারবো। ইফ ইউ কাম নেক্সট ডে ইউ মাস্ট গেট সাম পজেটিভ রেজাল্ট অব আওয়ার অপারেশনস।

— থ্যাঙ্ক ইউ ফ্রেন্ডস, আই শ্যাল সেভ ইউর ভেলুয়েবল ইনফরমেশনস টু আওয়ার হেড কোয়ার্টার। ইয়ে ইনফরমেশন হামারা বোহত কাজ দেগা। দেন টেল মি, হোয়াট অপারেশনস্ ইউ আর গোয়িং টু আভার টেক নেক্সট ডেজ? পিন্টুর দিকে তাকিয়ে ইশারায় তাকে চুপ থাকতে বলে, লে, পুরিকে আমাদের সংজ্ঞায় অপারেশন সম্পর্কে ধারণা দিই এভাবে, উই ক্যান হিট জগদলহাট ডিফেন্স। চৈতনপাড়া ব্রিজ ক্যান কিবি ডেমোলিশন, উই ক্যান এ্যামবুশ পাক অস্ট্রেলিয় ...। পুরি সব টুকে নেন। সুবেদার দাদুর চা খেতে খেতে তিনি তার প্রয়োজন আনা রেশন আমাদের বুঝিয়ে দেন। এরপর তার সাথে বিভিন্ন ধরনের আচৰণমো হয়। নবীন অফিসার পুরি। বছর দেড়ক হবে হয়তো তার সামরিক একাডেমি থেকে পাসিং আউট হওয়ার। ফলে যুক্ত সম্পর্কে তার ধারণাটা তেমন স্বচ্ছ নহু আঠাই স্বাভাবিক। প্রচণ্ড অনুসন্ধিস্থা তাই তার চোখে-মুখে। বারবার তিনি জামাতে চান, ভেতরে হাইড আউটে থেকে তোমরা কীভাবে গেরিলা যুক্ত করছো এতে তোমাদের কেমন লাগছে, তোমাদের কী কী অসুবিধে রয়েছে আর কী কী তোমাদের প্রয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি। পিন্টুকে এবার আর সামলে রাখা যায় না। দূম করে সে বলে ফেলে, হামারা প্রয়োজন তো বহুত। আপ কেয়সে সলভ করেগা?

— বলিয়ে না বলে পুরি হাসেন।

পিন্টু বলতে থাকে, অন্ত আর গোলাবারুন্দ লাগেগা, খালেকো পাছ টাকডুম টাকডুম চাইনিজ রাইফেল হ্যায়, হামারা পাছ ওল্ড মডেলকা রাইফেল আওর এস.এল.আর। এল.এম.জি আওর লাগেগা। মর্টার লাগেগা। রাউন্ড লাগেগা। সেভারেল থাউজ্যান্ডস। রেশন আছা নেহি। পর্যাণ নেহি হতো হ্যায়। বক্রিকা গোস যো মিলতা, খাওয়া নেহি যাতা হ্যায়। শুকনা বকরিকা মাংস প্লাস্টিককা মাফিক হতো হ্যায়। হামারা টাকা নেহি হ্যায়। ভাতা দেনেকো বাত থা, আভিতাক নেহি দিয়া, হামারা জামা নেহি হ্যায়, লুঙ্গি নেহি হ্যায়, গেঞ্জি নেহি হ্যায়, গামছা নেহি হ্যায় ...।

— ব্যাস ব্যাস বলে পুরি তাকে থামিয়ে দিয়ে হাসেন। বলেন, ইয়ের লিস্ট ইজ সো বিগ এন্ড আই এ্যাম সো টাইনি অফিসার। আই ক্যান নট ফুল ফিল দোজ বাট আই মাস্ট কনভে দিজ টু মাই কমাভার। পিন্টু তখন তার মুখস্থ নামতা বলার মতো

করে চাহিদার তালিকা পেশ করার ব্যাপারটা থামিয়ে দেয়।

সত্যিকার ছেলে মানুষ পুরি। এখনও তার কোনো বাস্তব মুক্ত দেখা হয় নি। মুক্ত সম্পর্কে তার জ্ঞানবার অনুসরিঙ্গো প্রবল। তাই প্রসঙ্গ পাল্টে এবার বলে, আবলোগ তো বহুত ফাইট কিয়া। পাক আর্মি দেখ্যা হ্যায়? কেয়েসা হ্যায় উহ লোগ?

পিন্টু আবারও মুখ খোলে, দেখা হ্যায় মানে বহুত দেখা হ্যায়, সামনাসামনি ফাইট কিয়া হ্যায়, এ্যাসা তাগড়া জোয়ান আওর মছুয়া হ্যায়, শ্যালে লোগ হামকো বহুত ডরাতা হ্যায়, মুক্তিফৌজ নাম শুনেছে ভাগতা হ্যায়।

পুরি চোখ বড়ো বড়ো করে তাকান। বিশ্বয়ের ভঙ্গ তার চোখেমুখে। বলেন, আচ্ছা ইয়ে বাত! তোম উচ্চকো পাকার নেহি সাকতা? অর্থাৎ তোমরা তাদের ধরতে পারো না?

পিন্টু দমবার পাত্র নয়। এবার সে তার গঁজের ঝাঁপি খুলে দেয়, উসদিন তো এক খান কো পাকার লিয়া থা হাড়িভাসা মে।

পুরি মাথা ঝুকিয়ে সামনে এনে বলেন, কেয়সে?

হাড়িভাসা মে বহুত ফাইট হুয়া। উই ক্যাপচার দেয়ার ক্যাম্প। শালে লোগ ভাগতা থা। হাম দৌড়কে এক খানকো পিছে ছে পাকার লিয়া। উহো চিন্নাতে থা, হামকো ছোড় দিজিয়ে। শ্যালেকো ফিগার মেরা হেঁজ উই উইল হোগা, বাট ম্যায় নেহি ছোড়া। বোলা, ব্যাটা স্যারেভার কর। নেহিতো খোল করেগা।

— তব কেয়া হ্যায়? হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন্ত পুরির বিশ্বয়সূচক প্রশ্ন।

— দেন হি সারেভারড। ম্যায় উসকো কান পাকাড়কে বোলা, ব্যাটা চল হামারা সাথ। তো, যব ম্যায় উসকো কান হাতকে আনথা থা, উও শালে মেরা হাত পিছাল কে ভাগ গিয়া। কানমেতো তেল থা, উল্ল লিয়ে পিছল কাটা। ম্যায় উসকো কের পাকার লিয়া। মগর শালে ভোচলাকুচে দোড় সে ভাগ গিয়া।

— ভোচলা কাটা কেয়া পুরি জিগ্যেস করেন।

পিন্টু এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলে, মাহবুব ভাই এ্যালা কি কও? তখন পুরিকে বুবিয়ে বলি, ইট ওয়াজ ডার্ক নাইট। পিন্টু যো খানকো পাকারাথা, উই ভাগা লাইক এ্যানিথিং। আফটার অল ইট ওয়াজ হিজ লাইফ এন্ড ডেথ কোচেন। ভোচলাকাটা মিন্স্ রান উইথ হাইরেন্ট স্পিড। কথাটা শেষ করে পিন্টুকে ইশারায় এবার থামতে বলি কেননা ওর গুলের বহর এখন মাত্রা ছাড়াবার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত ওর কথার তোড়ে থলের বেড়াল না বের হয়ে আসে আবার। পিন্টু ইশারা পেয়ে খেমে যায়। পুরিও আর বসেন না। যাওয়ার সময় বলেন, ফ্রেন্ডস হোপ উই উইল মিট এগেন।

— থ্যাঙ্ক ইউ বলে আমরা তাকে বিদায় দিই। বকরি আর রেশন সামানা দিয়ে ছেলেদের রওনা করিয়ে দিই। এবার হাতে পাই নিজেদের জন্য কিছুটা সময়। এই সময়টা খুবই দুর্লভ পাওয়া। সেই দুর্লভ সময়টা আমরা কাটাতে চাই একান্ত নিজেদের মতো করে। দুলু আর মজিব ইতিমধ্যে এসে হাজির। গড়ালবাড়ি বাজারের স্থায়ী চায়ের দোকানটায় পুরি বুদ্ধিয়ার আহার বা ভক্ষণ পর্ব শেষে রওনা দিই

বেরুবাড়ির দিকে। বেরুবাড়ির কাছাকাছি এতোদিন ছিলাম। সোনারবান অনেক দূরে। দূর থেকে বেরুবাড়ি সবসময় কেমন যেনে টানে।

বিয়ের আসর, শরণার্থী শিবিরে

বেরুবাড়ি পৌছুতেই একটা মজার দৃশ্য চোখে পড়ে। বিয়ে হচ্ছে শরণার্থী শিবিরে। বেরুবাড়ি শরণার্থী শিবিরের পাত্র এবং ৫ মাইল দূরের সাকাতি শরণার্থী শিবিরের পাত্রী। আক্ষাসের কবর জ্যোত করে রাস্তায় উঠবার সময় বরযাত্রীদের সামনাসামনি পড়ে যাই। ৮/১০টা রিকশায় বরযাত্রীরা সওধার। সামনে ব্যান্ড পার্টি। সানাই বাজছে চমৎকার সুরে। টোপর মাথায় দিয়ে তরুণ বরটি দুই নম্বর রিকশায় বসা। শরণার্থী মানুষেরা তাদের প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে দেখছে আনন্দ উচ্ছল সেই বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা। ব্যাপারটা আমার কাছে অন্তুত লাগে। সামনে যুক্ত। দেশ থেকে বিভাড়িত হয়ে এরা আজ ভিন দেশে শরণার্থী। প্রতিকূল অবস্থার পর অবস্থা চারদিকে। শরণার্থী শিবিরের মানবের জীবনযাপন, অভাব, ক্ষুধা-রোগ-ব্যাধি, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, শিবিরের তাঁবুতে তাঁবুতে মৃত্যুর পর মৃত্যু, পারম্পরিক অবিশ্বাস, ঝগড়া, কলহ, মারামারি, কাড়াকড়ি, লাঠালাঠি তারপক্ষে সেই নিজেদের মধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন। একজন পরিচিত শরণার্থীকে জিগ্যেস করি, কি ব্যাপার, এর মধ্যেও আপনারা বিয়ের আয়োজন করছেন। হৃষিত হাসি তার, কি আর করা যাবে। দেশেই ঠিক করা ছিলো এই বিয়ে। এখন দু'পক্ষই শরণার্থী হয়ে এসেছে এদেশে। একপক্ষ আশ্রয় নিয়েছে এই মেলেশ্প। অন্যপক্ষ সাকাতি ক্যাপ্সে। কবে দেশ স্বাধীন হবে, তার তো ঠিক মেইচতাই অভিভাবক পক্ষ তাদের আগের থেকে ঠিক করে রাখা বিয়েটা ছেলেমেয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে। এমনিতেই তো শরণার্থীদের জীবনে কিছু নেই। এই বিয়ে হচ্ছে বলেই একটুখানি হৈ-হল্লা, আনন্দ, এই আর কি!

অদ্রলোক চলে গেলেন। যাওয়ার পর কেনো জানি একটা বিষণ্ণ ভাবনা এসে মনের ওপর ভর করে। আমরা আক্ষাসের কবরের কাছ থেকে আসছি। মুক্তিযুদ্ধে আকাস জীবন দিলো। প্রতি মৃহুর্তে এখন ক্যাপ্সে লোক মরছে। তাদের সৎকার হচ্ছে না, ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী কোনো রকমে তাদের আঘাত-ব্জননরা মাটি খুড়ে পুঁতে রেখে দুটো দূর্ঘ ঘাস আর কটা আতপ চাল বেরুবাড়ি খালের ময়লা পানিতে ভাসিয়ে দিয়ে অন্যেষ্টিক্রিয়া সারছে। চারদিকে দম বক্ষ করা আর বাতাস ভারি করে থাকা একটা বিদ্যুটে দুর্গন্ধ। সীমান্ত পেরিয়ে মানুষের ঢল এখন আসছে। এ রকম এক অনিশ্চিত আর মৃত্যুময় জীবনের ভেতরেও মানুষ বাঁচছে। তাদের জৈবিক তাড়না মেটাচ্ছে। সেই সাথে বিয়ের আয়োজন করছে। মানুষের জীবন কখনও থেমে থাকে না। সময় প্রবহমান। এই প্রবহমানতার স্রোতে এক সাথে হাত ধরাধরি করে চলে জীবন আর মৃত্যু; সুব আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনা, ভালো লাগা আর ভালোবাসা।

বরযাত্রীদের ভেতরে বসে থাকা বরবেশী ছেলেটার ওপর একবার অনুরাগ জন্মে আবার রাগও ধরে। মনে মনে বলি, ব্যাটা বিয়েতো করছিস, কালই যদি তোকে যুক্তে হয় তখন কী করবি? আমাদের আক্ষাসও অমনি যুক্তে আসবার একমাস আগে

বিয়ে করে নতুন বউ ফেলে রেখে এসেছিলো মুক্তিযুদ্ধে। শেষে যুক্তেই সে একদিন মরে গেলো। ওর বড়টা এ খবর জানেও না। তোকে যদি যুক্তে হয় এবং আক্ষাসের মতো হঠাতে করে গুলি খেয়ে মরে যেতে হয়, তখন কি হবে? সাকাতি শরণার্থী ক্ষাপ্তে কনেবেশী সেই মেয়েটিরই-বা কি গতি হবে?

বরযাত্রী দলটা একসময় চলে যায় পাশ কাটিয়ে।

— এই সময় বিয়ে করা কি ঠিক হচ্ছে? মজিবকে কতকটা আনমনা হয়েই জিগ্যেস করি। পেছন থেকে উত্তর ভেসে আসে পিন্টুর, ডয়, যুক্তে যাওয়ার ভয়ে পাত্র বাবাজি বিবাহ করিতে চলিয়াছেন। যুক্তের ডাক আসলে শালা তাঁবুর ভেতর বউয়ের আঁচলের তলে লুকিয়ে থেকে বলবে, বাহে মুই ক্যাবল বিয়া করছেম। নয়া বউ ছাড়ি যাওয়ার পাইরবার নাও যদিল মোর বউ বিধবা হয় তখন কি হইবে? পিন্টু কথাটা মশকারা করে বললেও ওর ভেতর একটা বাস্তব সত্য লুকিয়ে আছে। দেখছি তো, হরহামেশা দেখছি, দেশ থেকে আসা কতো তরুণ-যুবক, রাজনৈতিক কর্মী এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করছে, শুয়ে-বসে থেকে অলস সময় কাটাচ্ছে। কিন্তু ঢেনিং নিয়ে যুক্তে যাচ্ছে না। কেনো যে যাচ্ছে না, বিষয়টা মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তুললেও, কোনো উত্তর মেলে না এর।

ঢাকাইয়া নুরুর দোকানের সামনে মোস্তফার সম্মুখীনত্ব হয়ে যায়। আমাদের দেখেই হৈচে করে ওঠে মোস্তফা। বলতে গেলে মালভদা করেই আমাদের নিয়ে চলে জলপাইগুড়ি রাস্তায় বেরবাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশিল দূরে তার পরিবারপরিজনের অশ্রয়স্থলে। প্রফেসর আনোয়ার এসে জোটেন। মোস্তফার অশ্রয়স্থলটা ভালো। হৈ-হল্লা, গালগল আর পিন্টু-দুলুর গান-শোভনায় জমে ওঠে পরিবেশটা। দুপুরে আয়োজন করা হয় ভূরিভোজের। এরপর পৰিচুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফিরতি যাত্রা। আবার সোনারবান অভিমুখে। প্রায় কুরো-চৌদ্দ মাইলের পথ। সবটাই হাঁটতে হবে। ভাবি, আমাদের ফুরসত এতো ক্ষম! আহ, কবে আসবে সেই দিন, যেদিন ইচ্ছে-বাধীন চলবার, মন খুলে কথা বলবার, গান গাইবার, হৈ-হল্লা আর ভালোবাসবার অফুরন্ত অবসর পাওয়া যাবে!

২৫.৮.৭১

চৈতন্পাড়া ব্রিজ অপারেশন

হাইড আউটে ফিরতে ফিরতে রাত নটার মতো হয়ে যায়। এরপর তাড়াহুড়ো করতে হয়। ইব্রাহিমের পরিবেশিত রাতের রেশন থেরেই কাজে লেগে পড়তে হয়। আকাশ ধন মেঘে ঢাকা শুমোট গরমে গা চিটাচিট করে। আকাশের বুকে বিদ্যুতের বিক্ষিণ চমক। তার মানে বৃষ্টি এলো বলে। বৃষ্টি মাথায় করে অপারেশনে যাওয়ার সুযোগ আমরা সহজে হাতছাড়া করি না। কেননা, শক্ত তখন তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে গা-ছাড়া দিয়ে থাকে। ভাবে, এমন বৃষ্টির দিনে তাদের কেউ আক্রমণ করতে আসবে না। এ অবস্থায় শক্তির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাদের পরাম্পর করার কাজটা সহজ হয়। হলদেটে রঙের প্লাস্টিক চার্জগুলোর সিলোফনের মোড়ক খুলে রেমার চার্জ তৈরি

করতে থাকি। ৮-১০ পাউন্ডের ৪ থেকে ৫টা ভারি রেমার চার্জ আজকের অপারেশনের জন্য প্রয়োজন। সেই সাথে ৩-৪ পাউন্ডের আরো অন্তর ৪টা একই রকমের চার্জ ধীরস্থিরভাবে তৈরি করতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা রেমার চার্জ দুইনটি ক্ষেত্রে ভালো ফল দেয় নি। তবে চার্জগুলো তৈরি করতে সময় লাগবে। এক সময় পিন্টু, মুসা আর একরামুলকে ২০ জনের একটা শক্ত দল তৈরি করতে বলি। পর্যাণ গোলাগুলি, হ্যান্ড গ্রেনেড এবং সব ধরনের অন্ত নিয়ে তৈরি করতে হবে দলটাকে। সাথে থাকবে ২ ইঞ্জিন মর্টারও। বলাৰ সঙ্গে ওৱা দল গড়াৰ কাজে লেগে পড়ে। চার্জ বানাতে আমাকে সাহায্য করে মধুসূদন, হাফেজ, জহুনাল আৰ মালেক ও মঞ্জু। রাত ১২টাৰ মধ্যেই অপারেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে হবে। হাতে সময় কম। তাই একটু তাড়াতাড়ি করতে হয়।

বিকেলের কাছাকাছি মতি তার দোষের বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে এলাকার সমস্ত পরিস্থিতি খেকি করে এসেছে। তার রিপোর্ট অনুযায়ী, গতকাল অর্ধাৎ ২৫ তারিখ বিকেলের দিকে ভারতীয় কামানের গোলা সরাসরি একটা ও টনি পাক আৰ্মি ভ্যানের ওপর আঘাত হনে। ফলে ছাতু হয়ে যায় ভ্যানটি। ২০ জন পাকসেনা ছিলো তাতে। সবাই খতম। আজ দূর থেকে সে নিজে দেখে এসেছে ভেঙে দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা সেই ভ্যানটি।

ইট ইজ এ গুড নিউজ, মন বলে ওঠে। যুদ্ধের শুরু থেকে এ ফ্রন্টে শক্তপক্ষের এতোবড়ো ক্ষতি আৰ হয় নি।

মতি আৰো রিপোর্ট দেয়, ৬/৭ জুন অশেনাসহ রাজাকারদের প্রায় ১০/১২ জনের একটা দল রাতে তৈনপাড়া দেৱগঞ্জ পাহারা দেয়। সাথে স্থানীয় কিছু মানুষজনও থাকে ২/৪টা সিভিল গানসহ। তাৰ দোষ্ট যেহেতু নিজেই প্রায় তৈনপাড়া ব্ৰিজ পাহারায় যায়, সেহেতু তাৰ প্রত্যেক নিচিতভাৱেই নিৰ্ভূল। ব্ৰিজের দু'পাশে দুটো বাক্সাৰ রয়েছে। সেখানটায় তাদের স্থায়ী মেশিনগান পোষ্ট থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। তাৰ মানে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজ রাতে আমাদেৱ প্ৰবল বাধাৰ সামনে পড়তে হতে পাৰে। ব্ৰিজ পাহারারত শক্ত বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে প্ৰথমে ব্ৰিজেৰ দখল নিতে হবে। এৱপৰ ধীৰস্থিরভাবে ব্ৰিজে চার্জ অৰ্ধাৎ বিক্ষেপণ লাগিয়ে সেটা উড়িয়ে দিতে হবে। মনেৰ মধ্যে কেনো জানি একটা গভীৰ ভীতিৰ ভাব আসে এবং সেই সাথে সংশয়ও, পাৱা যাবে তো?

এইৱেকম ভাবনাৰ দোলাচলেৰ মুখে শিস বাজাতে বাজাতে পিন্টু এসে দাঁড়ায়। হারিকেনেৰ লালচে আলোয় চার পকেটেলা কালো শার্ট পৱিহিত পিন্টুকে আজ অন্যৱক্তম লাগে। স্বাস্থ্যবান টগবগে যুৰক। যেনো বিদ্রোহী কবিৰ 'কাৱাৰ ঐ লোহকপাটি ভেঙে সব কৱো লোপাট' বলে এই মাত্ৰ আমাৰ সামনে উদয় হলো। হয়েই হাঁটু গেড়ে সে সামনে বসে পড়ে। বলে, ওৱা সব তৈৰি হচ্ছে। সময়েৰ আগেই সব ধৰনেৰ প্ৰস্তুতি সেৱে ওৱা কিছুটা বিশ্বাস নিতে পাৱাৰবে।

— গুড বলে ওকে বসতে বলি।

— ওপাশে এসে বসে। মেঝেৰ ওপৰ। পকেট হাতড়ে বেৱ কৱে আনে সিগাৱেট

আর ম্যাচ !

তারপর বলে, মাহবুব তাই, মহৎ কাজে যাওয়ার আগে ভালো সিগারেট খাওয়া
দরকার। নেন ধরান।

— ঠিক আছে তুমি ধরাও; কিন্তু সাবধানে। সামনে এক্সপ্লোসিভের পাহাড়।
আগুনের সামান্য স্পর্শেই গোটা এলাকাটা মুহূর্তে নরক কুণ্ড হয়ে উঠতে পারে।

— ঠিক আছে বলে একটুখানি তফাতে নিয়ে দুটো সিগারেট ধরায় সে। সন্তর্পণে
তারপর আবার এগিয়ে এসে জুলানো সিগারেটের একটা আমার মুখে গুঁজে দেয়।
এক্সপ্লোসিভের ধাতব বাতাসে বাহিত হয়ে এসে চোখে জুলা ধরিয়ে দিতে থাকে।
মধুসূন তার দলবল নিয়ে গোলা ময়দার মতো প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভগুলো ঠেলে
ঠেলে গোলাকার আকৃতি দেয়ার চেষ্টা করছে। আমি কারটেস ডেটোনেটের আর
সেফটি ফিল্ডেজের লাইন সংযোগ করে যাচ্ছি। আর ঠিক ওই সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি
নামে। সেই সাথে কড়াৎ কড়াৎ শব্দে বিদ্যুতের চমক। কোথায় কোন্‌ অজানা
পরিবেশে জঙ্গলাকীর্ণ অখ্যাত কোনো এক সোনারবান ফ্রামের সোনা মিয়া মেঘারের
বাড়িতে বসে ভাঙ্গাচোরা এক হারিকেনের তিমটিমে ভূতুড়ে আলোতে আমরা যুদ্ধের
প্রস্তুতি নিছি। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অস্তুত আর অবিশ্বাস্য লাগে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে যাত্রা শুরু হচ্ছে আজকের পাইড মতি।
মালেকসহ আরো তিনজন যাচ্ছে সাথে। তাদের সাথে কোদাল। রওনা দেয়ার আগে
হজুর নিজের হাতে চা তৈরি করে খাইয়েচ্ছেন। দলের সফলতা কামনা করে
আন্তরিকভাবে বলেছেন, আপনারা ফিল্ডে আসা পর্যন্ত আমি জেগে থাকবো।
আল্লাহর কাছে দোয়া করবো, আপনারা যেনো কামিয়াব হন। দলের কারো যেনো
কোনোরকম ক্ষতি না হয়। এই বক্তব্য কথা বলে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ
আর দোয়া করে বিদায় দিয়েছে হজুর। সামনের অপারেশনে কী ঘটবে, একেবারেই
অনিশ্চিত। যুদ্ধের মাঠে দোয়া-দরবন্দ-ঝাড়কুঁক এগুলো শক্রের গোলাগুলির মুখে কোনো
কাজে আসে না, যুদ্ধের সৈনিক কেনো, একটা পাগলও সেটা ভালোভাবে জানে।
কিন্তু তবুও তারা এই রকম বিপদেআপদে ঝাড়কুঁকের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যে যার
ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তাকে ডাকে, নয়তো, বিড়বিড় করে দোয়া-দরবন্দ কিংবা মন্ত্র
ইত্যাদি আউড়ে চলেন। আর সেটা এই বিশ্বাসবোধ থেকে যে এর সাহায্যে হয়তো
সে বেঁচে যাবে, তার বিপদ হবে না কোনো। আসলে মৃত্যুর মতো মানুষের আর
কোনো গভীর ভীতি অন্য কিছুতে নেই। তাই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময়
একজন যোদ্ধার মনের মধ্যে যে অনুভূতিটা কাজ করে সেটা আর কিছু নয়, সে
সোজাসুজি এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। তাই তার মনে হয় সৃষ্টিকর্তাকে ডাকবাব
তাড়না। সেই তাড়না আপনাআপনি মনের ভেতরে কাজ করে চলে। কারো মনে এটা
কাজ করে গভীরভাবে, কারো-বা হালকাভাবে। কিন্তু তারপরও মনের গভীর থেকে
অনেকটা আন্তরিক বিশ্বাসের মতো গেয়ে ওঠে, খোলা কোনো বিপদ যেনো না হয়।
যাই হোক, আজকের রাতের বিদ্যায় মুহূর্তে একজন আল্লাহঅলা পরহেজগার মানুষের
দোয়া সারা শরীর ও মনে একটা পরিত্র স্পর্শ বুলিয়ে দেয় যেনো। পথচলার সারাটা

সময় ধরে কাজ করতে থাকে সেটা।

নদী-খাল-বিল-জলাভূমি আর ভাঙচোরা কাদাপাঁকে ভরা রাস্তা কোনোরকম বাধা আর বিপদ ছাড়াই আমরা পাড়ি দিয়ে আসি। গাইড মতির কথায় একটা ঘন অঙ্ককারাটাকা বাঁশতলায় এসে আমাদের যাত্রাবিরতি করতে হয়। এখান থেকে রাস্তাটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। জায়গাটা মুহূর্তে আমি চিনতে পারি। ডান পাশের রাস্তাটা সামনে মোড় নিয়েছে। লাল ঝুলের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে উঠেছে চৈতনপাড়া ত্রিজের কাছে পাকা সড়কে; বাঁ দিকের রাস্তাটাও ঘুরে গিয়ে উঠেছে পাকা রাস্তায়। আমাদের যেতে হবে ডান দিকের রাস্তা ধরে। ঠিক হয়, এ জায়গাটা হবে আমাদের রিটার্ন পোস্ট অর্থাৎ অপারেশন শেষে মিলিত হওয়ার জায়গা। আমার এই রকম মনো-জরিপের মুখে মতি কিছুটা সময় চেয়ে নিয়ে বাঁ দিককার রাস্তা ধরে তার দোষ্টকে ডেকে আনতে যায়। ছেলেদের অলরাউন্ড পজিশনে রেখে পিন্টু, মুসা আর একরামুলসহ আমরা অপারেশন পরিকল্পনাটা আবারো ঝালাই করে নিই।

মতি ফিরে আসে কিছুক্ষণের মধ্যে। তার সাথে তার দোষ্ট। আজ সে ত্রিজ পাহারায় যায় নি। সম্ভবত মতি তাকে আগাম জানান দিয়ে রেখেছিলো। অঙ্ককারের ছায়ায় বসে সে চাপা অথচ রীতিমতো উৎকঢ়া ভরা গল্ম ত্রিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিবরণ তুলে ধরে। তার কথা অনুযায়ী, আজ রাতে ত্রিজের ওপর ৮/১০ জনের দল পাহারায় আছে। সিভিল লোকের সাথে পাকসেন্ট এবং রাজাকারও আছে।

— বড়ো সাংঘাতিক! আপনেরা সেখানে থাইবেন কি কইয়া? মতির দোষ্টের উৎকঢ়িত প্রশ্ন। আসলে মতির দোষ্ট সেজুলে দেবেছে, সেভাবেই বলেছে। ওর দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমরা এসেছি আমাদের কাজ সারতে। আমরা সেই কাজ সারবো আমাদের মতো করে। সেইরাও দ্বিধাদন্ত সবকিছু বেড়ে ফেলে চূড়ান্ত সিন্ধান নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

পিন্টুর মর্টার পজিশন থাবে এখানেই। ঠিক রাস্তার তিনমাথার মাঝে বরাবর সে তার ২ ইঞ্জিং মর্টার বসিয়ে গোলাগুলি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের সাপোর্ট দিতে থাকবে। ত্রিজের পজিশন আন্দজ করে নিয়ে সে তার মর্টার থেকে গোলা ছুঁড়বে, যাতে করে শেলগুলো ত্রিজের ওপারে রাস্তার আশপাশে পড়ে বিস্ফোরিত হতে পারে। তার সাথে সহযোগী হিসেবে থাকবে ৫ জন। তবে মতির দোষ্ট আমাদের সাথে যেতে চায় না। তব আছে পাছে তাকে কেউ চিনে ফেলে। তাই সে এখানেই থাকবে। আমাদের সাথে যাবে না। সে যেতে চাইলেও আমরা তাকে আমাদের সঙ্গে নিতাম না। কারণ আছে। সেই কারণের জন্যই তাকে এখানে পিন্টুর সাথে থাকতে হবে।

যুদ্ধের মাঠে মানুষের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। আগেকার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে এটা শিখিয়ে দিয়েছে। হঠাৎ করে নতুন কাউকে বিশ্বাস করার পরিণতি কী ভয়াবহ হতে পারে। তাই মতির দোষ্টের ওপর আস্থা থাকলেও এখন তাকে ছাড়া যাবে না। কে জানে, আমাদের আগেই সে ত্রিজে পৌছে গিয়ে পাকসেনাদের জানিয়ে দেয় যদি যে, আমরা আসছি। আসলে ত্রিজ প্রহরা দলের সেওতো একজন সক্রিয় সদস্য, তাকে আর কতোখানি বিশ্বাস করা যায়?

পিন্ডু আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানেই থেকে গেলো। আমরা তাকে খোদা হাফেজ বলে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এগিয়ে যেতে লাগলাম একেবারে চৃপচাপ, নিঃশব্দ কিন্তু খুবই দ্রুততার সঙ্গে। পৌছুলাম লাল ক্ষুলের কাছে। আর পৌছেই সঙ্গে রাস্তার দু'পাশে আড়াল নিয়ে সবাই চলে গেলো পজিশনে। এখানে থেকে রেকি করে ব্রিজের সঠিক অবস্থানটা বুঝতে হবে। মাথাটা একটুখানি তুলনেই উঁচু পাকা সড়কটা দেখা যায়। দেখা যায় প্রায় $25/30$ গজ সামনেকার সড়কের দু'পাশের গাছগাছালির সারি। ডানদিকে জলাভূমি। একটা খালের মতো ফসলের মাঠ। ডানদিক দিয়ে নেমে গেলে প্রায় বুক সমান পানি কেটে যেতে হবে। ব্যাপারটা সুবিধেজনক মনে হয় না এবং কঠিনও। এছাড়া শক্রপক্ষ ব্রিজের ওপর থেকে সহজেই আমাদের চিহ্নিত করে ফেলবার সুযোগ পাবে। সূতরাং পানি কেটে যাওয়ার ব্যাপারটায় মন থেকে সায় আসে না। এখন একটাই সম্ভাব্য পথ সেটা হলো সরাসরি পাকা এই সড়ক ধরে এগিয়ে গিয়ে অকস্মাৎ শক্রের ওপর একযোগে ঝাপিয়ে পড়া। কিন্তু তার আগে দরকার রেকি করে আসা। একরামুল আর মতিকে নিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হ্যামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাই আমি। মুসাকে ইশারায় বলে যাই, পজিশনে থেকে কভার দিতে। একটু সামান্য এণ্ডিক-ওদিক দেখলে ওরা এগিয়ে গিয়ে ঝাপিয়ে পড়বে দ্রুত।

লাল ক্ষুলটা বাঁয়ে রেখে আমরা তিনজন পাঞ্চ সড়কের একেবারে বুকের ওপরে গিয়ে দাঢ়াই। সেখান থেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে চালিং করে এগিয়ে যাই ব্রিজের দিকে। মনের ভেতরে এই এখন একটা শূন্য জলাভূমি কাজ করে যেতে থাকে। লক্ষ্য একটাই, ব্রিজের একেবারে কাছাকাছি উসমে নবীন অথচ ঝোকড়া আমগাছটার নিচে পৌছুতে হবে। ব্রিজের ওপর দেখে গেলো, লোকজন সব সজাগ। তাদের অশ্পষ্ট কথাবার্তা কানে এসে বাজতে থাকে। আমাদের আরো সাবধান হতে হয়। গতি আরো নিঃশব্দ করতে হয়। ধ্বাস-প্রাপ্তাসের টু মাত্র শব্দও যাতে না হয়, এমনভাবে নাক-মুখ দিয়ে বাতাস নিতে আর ছাড়তে হয়। এমনভাবে সাপের মতো এঁকেবেঁকে মাটির সাথে বুক ঘেঁষতে ঘেঁষতে একটু একটু করে আমরা পৌছে যাই একসময় সেই টিঙ্গিত আমগাছটার নিচে। রাস্তার ঢালের একেবারে প্রান্তদেশে। তারপর কোনো চিন্তা-ভাবনা না করেই ওদের দু'জনকে একঠাই রেখে চট করে আমি উঠে আসি আমগাছের গোড়ায়। সেখান থেকে গাছের গুড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি তাকাই ব্রিজের দিকে। প্রায় 15 ফুট স্প্যানের পাকা ব্রিজ দু'পাশে রেলিং, সেখানে বসে আছে অলসভঙ্গিতে লোকগুলো। $2/1$ জনকে বিড়ি-সিগারেটও খেতে দেখা যাচ্ছে। সেই সাথে কথা বলছে তারা মৃদুরে। এপারের বাকারটা স্পষ্ট দেখা যায়। এই গাছটা থেকে $20/25$ হাতের দূরত্বে। বাস্কারে লোক আছে কি নেই সেটা অবশ্য বোঝা যায় না। হঠাৎ মনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার তাগিদ শুনতে পাই। সব দেখে নেয়ার পর এবার বঙ্গদের কাছে ফিরবার প্রস্তুতি নিতে হয়। গাছের নিচে বসে যাই। তারপর গড়িয়ে নামার মতো করে দ্রুত নেমে আসি। একরামুল আর মতির পিঠে চাপ দিয়ে ইশারা করি, পেছনে সরে যেতে। আবার শুরু হয় শামুকের গতিতে নিঃসাড়

শৰ্দহীনভাবে ইঞ্জি ইঞ্জি করে পিছিয়ে যাওয়ার কাজ, যেভাবে এসেছিলাম ঠিক তেমনিভাবে। এইভাবে ফিরে আসি লাল স্কুলটার কাছে। কী হলো মাহবুব ভাই, মুসার ফিসফিসানো উত্তেজিত প্রশ্ন।

— ওরা আছে তবে সবাই সজাগ। আছে লুজ ভঙ্গিতে; আমাদের একেবারে বাঁপিয়ে পড়তে হবে ত্রিজের কাছাকাছি গিয়ে। রাস্তার ওপর থেকে, পাশ থেকে, নিচে থেকে একসাথে সবগুলো হাতিয়ারের ফায়ার ওপেন করে এগিয়ে যেতে হবে একটুও না থেমে। আমরা রাস্তার নিচে দিয়ে এগিয়ে যাবো। ইশারা দেয়া মাত্র মোতালেব তার এল.এম.জি নিয়ে উঠে যাবে পাকা সড়কের মাঝামাঝি। একরামুল তার এস.এল.আর এবং জয়নাল ও শঙ্খকে নিয়ে থাকবে। তার সাথে মুসাও থাকবে আমার ডানে মধুকে নিয়ে। সোজা-সুজি আমি উঠবো আমগাছ বরাবর। মতি-মালেক এরা পেছনে থাকবে এক্সপ্রেসিভ আর ত্রিজ উড়িয়ে দেয়ার সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে। একাকর থাকবে তাদের সাথে। মালেক-মঙ্গু দু'জন থাকবে আমার দু'পাশে। ফিসফিস করেই আক্রমণ রচনার কৌশল সম্পর্কে তাদের বুঝিয়ে দিই। শেষে বলি, আমাদের লক্ষ্য ত্রিজ দখল। যতো তাড়াতাড়ি পারি, যেভাবে পারি। সবাই সমানভাবে হাতিয়ার থেকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগুবে। কেউ আহত হলে বা ঘুড়ে গেলে তার দিকে কেউ তাকাবে না। কেবল কাজ এবং লক্ষ্য একটাই, শক্ত চিন্তা তাক করে আকস্মিকভাবে গুলিবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে গিয়ে ত্রিজ দখল করো।

— ও. কে, অক্ষকারে মাথা নেড়ে সাধ করো।

— দেন মুভ, ফলো মি, বলে ওদেন্ট অভিয দিই। তারপর একেবারে সোজা হেঁটে পাকা সড়কের শেষ প্রান্তে চলে আসি এসে কোমর বাঁকা করে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে এগুতে থাকি। ডান কাঁচুটা ফিতেয় মোলানো স্টেন। হাতের আঙুল থাকে ট্রিগারে। আরো কিছুটা এগুন্তো যাই। প্রায় আমগাছের কাছাকাছি। মোতালেবকে ইশারায় পাকা সড়কের ওপর চলে যেতে বলি। মুসাকে আরো ডানে ত্রিজের গোড়ার দিকে। এরপর আমগাছের আড়ালে পৌছেই ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরি। একরাশ বুলেট ছুটে যায় ত্রিজের দিকে আগুনের ঝলক তুলে। মোতালেবের এল.এম.জিরও ত্রাশ শুরু হয় সাথে সাথেই। মুসাসহ দলের সবার হাতিয়ারই গর্জে ওঠে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিলো, সেখান থেকেই ত্রিজমুখী হয়ে বুলেটবৃষ্টি ঝরাতে থাকে। এমন সময় পিন্টুর ২ ইঞ্জি মৰ্টার থেকে গোলা উড়ে আসতে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে পো- ও শব্দ তুলে শেল পড়তে থাকে ৪০/৫০ গজ সামনে। প্রচণ্ড শব্দ তুলে বিক্ষেপিত হয় সেগুলো। ত্রিজের ওপর হস্তা ওঠে একটা: ইয়া আল্লাহ, ‘মরগিয়া’ বলে আহি স্বরে একজনের চিংকার শেৱা যায়। তারপরই ঝপাং ঝপাং করে পানিতে লাফিয়ে পড়বার শব্দ ভেসে আসে পরপর। ধূপধাপ করে দৌড়ুবার শব্দের সঙ্গে পলায়নপর লোকগুলোর বুটের শব্দও ভেসে আসে। আমাদের আচমকা আর প্রচণ্ড এই আক্রমণে ত্রিজ প্রহরারত লোকগুলো কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করবার সুযোগ পায় না। ফলে কেউ পানিতে বাঁপিয়ে পড়ে, কেউবা রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড়ে পাশের ঝোপের আড়ালে মিলিয়ে যায়। ত্রিজ দখলে এসে যায় আমাদের প্রায় আপনাআপনি। আর আসবার

সঙ্গে সঙ্গেই মোতালেব আর একরামুলকে ব্রিজের ওপারে পজিশনে নিয়োগ করা হয়। বাঙ্কার দুটো চার্জ করা হয়। কেউ নেই। সব ফাঁকা। বালুর বাঁধের মতো উড়ে যায়। শক্তি বাহিনীর চৈতনপাড়া ব্রিজ পাহারা দেয়ার প্রয়াস। সামনে অমরখানা। পেছনে জগদলহাটে শক্তির ভয়াল অবস্থান। চৈতনপাড়া আক্রমণ এটা টের পেয়ে গেলে তারা তাদের অবস্থান ছেড়ে উঠে আসবে এক্ষুণি ডালকুন্তুর মতো। সুতরাং সময় কম। বেশিক্ষণ থাকা যাবে না এই মৃত্যুপূরীতে। তাই একাকর এগিয়ে আসে মতি-মালেকসহ চার্জের বোমা হাতে। মুসাকে নিয়ে আমি দ্রুত ব্রিজ ওড়ানোর কাজে হাত লাগাই। পিন্টুর মর্টার তখন থেমে গেছে। হিসেবি ছেলে পিন্টু। সন্তুষ্ট বুঝে গেছে, ব্রিজ আমাদের দখলে এসে গেছে এবং আমরা ব্রিজ ওড়ানোর আসল কাজে হাত দিয়েছি। এখন তার মর্টার থেকে শেল বর্ষণ করলে সেটা এসে পড়বে আমাদের ওপরেই।

ব্রিট্যাপ পরখ করে নেয়ার পর দু'পাশে দুটো করে চারটা বড়ে চার্জ বসানো হয়। রাস্তার নিচে ধপাস ধপাস কোদাল চালাতে থাকে মতি আর মালেক। অন্যের হাতে হাতে করে মাটির বড়ো বড়ো চার্জ বয়ে আনতে থাকে। মুসা সেগুলো বসাতে থাকে চার্জগুলোর ওপর। আমি সাকিটগুলো হাতড়ে হাতড়ে টিক করে নিই। চারটা চার্জের জন্য দুটো সাকিট। মুসাকে আরো দ্রুত হাত চালাতে বলি। চার্জের ওপর মাটির চাপ যতো দেয়া যাবে, ততোই তার ভার বা প্রেসারে চার্জগুলো বিস্ফেরিত হয়ে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে নিচের দিকে চলে গিয়ে বিস্ফেরিপ্লাটফরম্টাকে দাবিয়ে দিয়ে উড়ে যাবে, গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেবে সবকিছি। তিক এই সময় অমরখানার দিক থেকে শক্তপক্ষের গুলিবর্ষণ শুরু হয়। মোতালেব চেঁচিয়ে ওঠে, কহেন গে কি করিম?

— চুপচাপ থাক, বলে থামিয়ে দিই মোতালেবকে। আর সামান্যক্ষণ, আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মধুকে আরো দুটো চার্জ আনতে বলি। মুসার হাতে সাকিট দুটো ধরিয়ে দিয়ে তৃতী চলে যাই ব্রিজের ওপারে প্রথম বাঙ্কারটায়, সেখানে চার্জটা সেট করে তার সাকিটটা মধুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে আসি এবার এপারের দ্বিতীয় বাঙ্কারে। সেখানে চার্জ সেট করে মালেককে ডেকে সাকিটটা ধরিয়ে দিই। মালেক-মধু ইশারা পাওয়া মাত্র সেফ্টি ফিউজে আগুন দিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসবে বাঙ্কার থেকে। আমাদের এইরকম প্রস্তুতির মুখে জগদলহাটের পাক ডিফেল্স যেনো হঠাত করেই সাপের মতো ফুঁসে ওঠে। গুলির তুবড়ি বাজি শুরু করে দেয় তাদের অবস্থান থেকে। অমরখানার ওপারে ভারতীয় সীমান্ত থেকেও সমান তালে শুরু হয়ে যায় গুলিবর্ষণ। এরি মধ্যে পঞ্চগড়ের দিক থেকে ভেসে আসে পাকবাহিনীর কামানের গর্জন। উড়ে যায় কামানের গোলা অমরখানা পার হয়ে। ভারতীয় কামান আর মর্টার বাহিনীও এর জবাব দিতে থাকে। আমাদের মাথার ওপর দিয়েও দু'পক্ষের ভারি কামান আর মর্টারের গোলার ছোটাছুটি শুরু হয়। তবুও দয়ি না। আমাদের হাতের কাজ প্রায় শেষ। মোতালেব-একরামুলদের উঠিয়ে আনা হয়। এবার সবাইকে রাস্তা থেকে নেমে দূরে নিরাপদ অবস্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে ফিউজে একসাথে আগুন দিতে বলি। মধু আগুন দিয়ে দৌড়ে ছুটে এসে আমার পাশে দাঢ়ায়। মালেক

জুলিয়ে ফেলে তার ফিউজ। এবার মুসা তার আগুন জ্বালে। আমারটাও আমি জুলাই প্রায় একই সাথে। ওদের তিনজনকে এবার সাথে নিয়ে মাথা নিচু করে দৌড়ে চলি আমগাছের দিকে। আম গাছটা পার হয়ে চলে আসি রাস্তার ঢালের শেষ মাথায়। সেখান থেকে আরো সামান্য দূরে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে বিজলির চমকের মতো লাল সবুজাত আলোর রশ্মি ঝল্সে ওঠে। ওদের শুয়ে পড়তে বলে, দু' হাত দিয়ে কানের দু'পাশ চেপে ধরি এবং মাটির সাথে বুক মিশিয়ে উবু হয়ে থাকি। আর তবুনি মাটির নিচে যেনো শুরু হয় এক প্রবল ভূমিকঙ্গের আলোড়ন। পেছনে বিজের ওপর কড়াৎ কড়াৎ শব্দ তুলে দুনিয়া কাঁপানো বিস্ফোরণ হয় পরপর চারটা। বালু-কানা-পানি শৃন্য থেকে ঝুরঝুর করে পড়তে থাকে পিঠের ওপর। পোড়া বারুদের গন্ধ নাকে এসে লাগে। মুহূর্তে গা-মাথা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াই। প্রচও শব্দের শক ওয়েভ কাটতে কিছুটা সময় লাগে। সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসে হেলতে-দুলতে কঢ়া ছায়ামূর্তি। ওরা কেউ নয়, একরামুল আর মোতালেব। ওদের সঙ্গে আরো ক'জন। এগিয়ে এসেছে আমাদের সজ্ঞাব্য বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

— কিগে, সব ফিনিস? মোতালেবের গলায় খুশি আর ফুর্তির ছোঁয়া।

— হ্যা, ফিনিস, তোরা এখানে থাক, আমরা দেখে আসি কতোদূর ক্ষতি হলো ব্রিজের।

মোতালেব তার দলবল নিয়ে এখানে থাকে। প্রকা রাস্তায় ওঠে হনহনিয়ে হেঁটে চলি আমি বিজের দিকে মুসাসহ। একরামুল মুঝে মধুও সাথে থাকে। বিজের ওপর আশপাশে এখনো কালো ঘন ধোয়ার স্মৃচ্ছণ, পোড়া বারুদের গন্ধ। মুহূর্তে তোখে জুলা ধরিয়ে দেয়। তবুও পথ হাতড়ে হাতড়ে আমরা বিজের কাছে আসি। দেখি বিজের রেলিং দুটো নেই। মাঝখালের চারটা জায়গা নিয়ে বিজের পাটাতনটা নিচের দিকে ধূমে গেছে। একটা স্ক্রিনড়ে কাঠামোর মতো দাঁড়িয়ে আছে এখন সেটা একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো চেহারা নিয়ে। দেখি বাকার দুটোও উড়ে গেছে স্পৃণু।

অমরখানার দিক থেকে শুরুবাহিনী উঠে আসছে। ফায়ার এন্ড মুভ ভঙ্গিতে। অবস্থা বুঝে বটপট নির্দেশ দিই। আমাদের কাজ ফুরিয়েছে এখানে আর একটুক্ষণও নয়।

নির্দেশ পেয়ে সবাই রাস্তার নিচে নেমে পড়ে। এবার কাজ শেষে ফিরে চলার পালা।

দলের সবাই যেনো ছুটে চলেছে তাড়া ঝাওয়ার ভঙ্গিতে। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, এই মৃত্যুগুরি থেকে যতো তাড়াতাড়ি পালানো যায়, ততোই মঙ্গল।

আসবার সময় ছিলাম আমি সবার আগে। ফিরবার সময় সবার পেছনে। প্রতিটা অপারেশনের সমাপ্তিতে ফিরে যাওয়ার সময় এমনটাই ঘটে থাকে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ভাবনারও কিছু নেই। যুক্তের ব্যাকরণই বলে দিয়েছে, আক্রমণের সূচনায় কমান্ডার থাকবে আগে আর রিট্রিট করার সময় সবার পেছনে। সফল আক্রমণ এবং সফল রিট্রিট অর্থাৎ পিছিয়ে আসা এ দুটোর যাবতীয় দায়িত্ব তো কমান্ডারের। সুতরাং ফিরবার সময় আমাকে পেছনেই থাকতে হচ্ছে, যেহেতু আমি

এদের কমান্ডাৰ। পিন্টুকে আৱ.পি.-তে পাওয়া যায়। আমাদেৱ দেখেই ও যেনো হামলে ওঠে, আৰি ক্যাজুয়েলটি?

— নো, ডিয়াৰ। কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত কৰি ওকে।

— ত্ৰিজ? পিন্টু আবাৰ প্ৰশ্ন কৰে।

— খতম। অবসন্ন গলায় জবাৰ দিই।

— খতম মানে? পিন্টু যেনো হকচকিয়ে যায়।

— খতম মানে উড়ে গেছে, চলো বলে ওকে ফিৰবাৰ নিৰ্দেশ দিই। মতিৱ দোষ্টকে সাবধানে থাকবাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ফিৰতি যাতা শুলুক হয় আমাদেৱ হাইড আউট সোনারবানেৰ দিকে।

২৬.৮.৭১

তুই ফেলে এসেছিস কাৰে মল

সকালে গড়ালবাড়ি বিশুপ্তিতে উপস্থিত হওয়া গোলো। নটাৰ দিকে দেখা গেলো কমান্ডাৰেৰ গাড়ি। পাকা সড়কেৰ ওপৰ দাঁড়িয়ে আমৱা অফিসাৰকে সম্মান দেখিয়ে রিসিভ কৰি। আজকেৰ অফিসাৰ লেফটেন্যান্ট কৰ্নেল শুবৰা। গাড়ি থেকে মেমেই হৈচে কৰে ওঠেন তিনি।

— আৱে ইয়াৰ তোমলোগ ক্যায়সা হ্যায়? থুক থট ইউ উড বি অ্যানএ্যাবল টু কাম টুডে ফৱ রিপোর্টং। কাল রাত তোমৰ সেহত বড় অপারেশন কিয়া, শালে লোগ ডৰ গিয়া ...।

— আপলোগ ক্যায়সে জান কৰে, স্যার! মনেৰ মধ্যে অজন্ম কৌতুহল। চৈতনপাড়া ত্ৰিজ অপারেশনেৰ বিষয়ত এখন পৰ্যন্ত কৱা হয় নি। তাৰ আগেই সেই খবৰ এৱা জানলো কি কৰেং।

কৰ্নেল শুবৰা হাসতে ঝুসতে বলেন, ইয়ে তো ওয়্যার ফিল্ড ইয়াৰ, হামনে তো অল ইনফৰমেশন জান নে চাহিয়ে।

— তাতো ঠিক, মগার সোৰ্স? ফ্ৰম হোয়াট সোৰ্স? কৰ্নেলেৰ মুখেৰ ওপৰ চোখ রেখে জানতে চাই।

কৰ্নেল এবাৰ থেমে থেমে বলতে থাকেন, হামনে ইন্টাৱসেণ্ট কিয়া পাক আৰ্মিকা ওয়াৱলেস মেসেজ। আওৱা হামৱা ওয়াচম্যান ভি রিপোর্ট কিয়া যো পাক আৰ্মিকা কুই ভেহিকেল অমৱখানা তক নেহি আয়া ইসলিয়ে কি তুমনে চৈতনপাড়া ত্ৰিজ ডেমোলিশ কৰ দিয়া। প্ৰোবেৰলি ইউ নো ইচ আৰ্লি মৰ্নিং ওয়ান অৱ টু ভেহিকেল ইউজড টু কাম আপডু অমৱখানা ফ্ৰম পঞ্জাব। ইউ ইজ দেয়াৰ কুটিন কামিংস, ইন দোজ ভেহিকেলস দে ক্যারি আৰ্মস এ্যামুনিশনস, রেশন্স এন্ড রি ইনফৰ্মেশন ইফ নিডেড। অৰ্থাৎ দুটো সূত্ৰ থেকে তাৰা চৈতনপাড়া ত্ৰিজ ওড়ানোৰ খবৱটা জানতে পেৱেছেন। প্ৰথমত, পাকবাহিনীৰ ওয়াৱলেসে প্ৰেৰিত বাৰ্তা নিজেদেৱ ওয়াৱলেস সেট মাৰফত ধৰে। দ্বিতীয়ত, অমৱখানাৰ উল্টোদিকে সীমান্ত হেঁষে বিৱাট উচু আমগাছেৰ ওপৰ স্থাপিত পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰ থেকে। প্ৰতিদিন সকালে নিয়মিতভাৱে একটা কিংবা

দুটো আর্মি ভ্যান পঞ্জগড় থেকে অমরখানা পর্যন্ত আসে, রেশন নিয়ে গোলাবারুদ ভরে নতুন সৈন্য নিয়ে। যাওয়ার সময় গাড়িগুলো রাতে সংঘটিত যুক্তে আহত বা নিহতদের নিয়ে যায়। আজ সকালবেলার পর্যবেক্ষণ থেকে ধরা পড়েছে পাকবাহিনীর কোনো গাড়ি আসে নি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী পাকবাহিনীর প্রেরিত ওয়ারলেস বার্তা নিজেদের সেটে ধরে এবং সেটা পাঠ করে জানা গেছে, মুক্তিবাহিনী রাতে চৈতনপাড়া ট্রিজ উভয়ে দিয়েছে।

কর্নেল তখন সুস্থির হয়ে বসেছেন। আমরা তার সামনে মুখোমুখি অবস্থানে। আমাদের মধ্যে দূরত্ব সামান্যই। তিনি নোট বই খুলে কলম হাতে নিয়ে আমাদের মুখের দিকে হাসি ফুটিয়ে বলেন, আভি বাতাইয়ে ক্যায়সে তুমনে কিয়া চৈতনপাড়া ব্রিজ অপারেশন।

তাকে বিশ্বারিতভাবে বলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। নোট বুক খুলে গোলাগুলি খরচের হিসেব দিই। নিবিট মনে তিনি শোনেন সব। নোট নেন। গোলাবারুদের খরচের হিসেব। মজুদের হিসেবটাও সেই সাথে লিখে নেন। এরপর জানতে চান আমাদের হাইড আউটের অবস্থান এবং পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে। সিনিয়র আর্মি অফিসারের সাথে যুক্তের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে ভালো লাগে। বয়স, যুক্ত আর চাকরির অভিজ্ঞতা এদের যথেষ্ট। সামান্য কথাদের স্বরে নেন সমস্ত ব্যাপারটা। তারপর নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝিয়ে দেন ক্ষেত্রটা করলে ভালো হবে, কোন্ট্রা করলে খারাপ হবে। এদের অভিজ্ঞতা থেকে স্টুডি যুক্ত পরিকল্পনাগুলো তাই ব্যর্থ হয় না সহজে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল শুক্র প্রি নিজের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমানে অমরখানার উল্টো দিকে নিজেদের উল্টোনটসহ শক্তির মুখোমুখি অবস্থানে থেকে তাদের গতিবিধি আর সমরাঙ্গেন পদবীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল হয়ে আমাদের পরবর্তী সম্ভাব্য যুক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করে চলেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। সুবেদার দাদু তার স্বাভাবিক আভিযোগ দেখিয়ে চা-নাস্তা পরিবেশন করেন। আলোচনা আর চা-পর্ব শেষে কর্নেল রেশন বুঝে নিতে বলেন। একরামুল গাড়ির কাছে দাঢ়িয়ে থাকা সাথে আনা ছেলেদের নিয়ে রেশন বুঝে নিতে থাকে। কর্নেল জিগ্যেস করেন, তোমাদের সমস্যা কি কি বলো, যেগুলো আমি সল্ভ করতে পারিঃ তাকে বলি, গোলাবারুদের স্টক করে এসেছে। পাক আর্মির খুব কাছাকাছি এখন আমাদের অবস্থান। গোলাবারুদ সরবরাহ দিতে হবে দ্রুত।

তিনি বলেন, ঠিক হ্যায় কাল ভেজেগা। তুম ইয়ে বিওপিছে গোলাবারুদ লে যান। আওর কোই প্রোত্রে?

— ইয়েস বলে কিছুটা ইতস্তত করতে করতে উচ্চারণ করি, হাতে কোনো টাকাকড়ি নেই। দু'মাস থেকে ভাতার টাকা পাওয়া যায় নি। টাকাটা পেলে খুব সুবিধে হতো। আমরা মাটার রোল করে দিয়েছিলাম মেজের দরজির কাছে। তিনি বলেছিলেন, টাকাটা শিগগিরই পাওয়া যাবে।

পিন্টু আমার কথা লুকে নিয়ে বলে, হামারা বিড়ি-সিগারেট কিননেকো পয়সাচি নেই হ্যায়। কর্নেল হাসেন পিন্টুর কথায়। তার পানামার প্যাকেটটা এগিয়ে দেন তার

দিকে। বলেন, লেও ইয়ার, নেতৃত্ব মাইত। পিন্টু একটু লাজুক হেসে হাত বাড়িয়ে দেয়। কর্নেল আমার দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরেন, আমিও নিই একটা টিক তার প্যাকেট থেকে। তিনি লাইটার জুলিয়ে নিজেই আমাদের সিগারেট ধরিয়ে দেন। নোট বই বের করে জিগ্যেস করেন, ক' মাস ধরে তোমরা ভাতা পাও নি?

— তিন মাস, হিসেব করে বলি তাকে। তিনি লিখে নেন তার নোট বুকে। তারপর বলেন, ঠিক হ্যায় তুমলোগকো জলদি পেমেন্ট মিল যায়গা। আওর কোই গ্রোগ্রেম?

— হ ইজ গোয়িং টু বি আওয়ার কামান্ডিং অফিসার, আর ইউ?

— নেহি ইয়ার, ম্যায়তো প্রক্সি দেনে আয়া। তোমরা সহসাই তোমাদের কমান্ডিং অফিসারের দেখা পাবে। প্রেবেলি ফ্রম ইউর নেরুট রিপোর্ট ডে। কর্নেল 'গুড বাই' বলে বিদায় নেন। ভালো লাগে শুব্বাকে। একদিনের জন্য এসে ভদ্রলোক আমাদের মন জয় করে গেলেন।

রিপোর্টিং পর্ব শেষে কমান্ডারের গাড়ি চলে যাওয়ার পর বাদবাকি সময়টা আমাদের নিজস্থ সময় হয়ে যায় একেবারে। হঠাৎ করেই নির্ভর লাগে নিজেদের। একরামুল তার রেশনবাহী বাহিনী নিয়ে ব্যন্ত হয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি করে সবকিছু গোছগাছ করতে থাকে। গড়ালবাড়ি বাজারের সিলেক্ষনেকে আসতে দেখা যায় নুরউদ্দিন মিয়াকে। একহারা লম্বাটে গড়নের প্রাণের সহজ-সরল ছেলে নুরউদ্দিন। বর্তমানে সে বেলতলার গোলজারদের ব্যক্তিজ্ঞানযোজিত নিরাপত্তা বাহিনীর তিন সদস্যের একজন। সে এসেছে প্রতিবাত্রে মতো তাদের দলের রেশনের ভাগ বুঝে নিতে। এবার এখন থেকেই ওদের জেনারেল রেশন দিয়ে দেয়া হয়। সেই সাথে ওর ওখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতির ওপর রিপোর্টও নেয়া হয়। তাকে জিগ্যেস করি, কিরে, নুরউদ্দিন, কোনো খবর আছে?

— হ আছে।

— কি খবর?

— গনি ভাই আলছে।

— গনি ভাই আসছে? কবে? কেনো, কোথায় উঠেছেন? এক নিষ্পাসে প্রশংগুলো জিগ্যেস করি তাকে।

— কাইল সক্ক্যায় আলছে। গোলজারদা'র বাড়িতে উইঠেছে। আইজ মোক আইসবার সময় কাইল, আপনার গুলাক ধরি নিয়া যাবার জইন্যে।

— হামাক কেনৱে? পিন্টুর গলায় কৌতুহল।

গোলাম গড়েস ভাইয়ের কবর বাইন্ধবে, তাই নিয়া বুবিল পরামর্শ কইবাবে।

গনি ভাই আবার এসেছেন, উঠেছেন গোলজারদা'র আশ্রয়ে। নিষ্যাই দুলুদের পরিবারের সঙ্গে তার বাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এমনিতেই বেচারাদের টানাটানি। তার ওপর আবার গনি ভাইয়ের মতো মেহমান। ব্যাপারটা দেখা দরকার। আর এবারের পরিকল্পনায় তার যদি গোলাম গড়েসের কবর বাঁধানোর ব্যাপারটা থেকে থাকে, সেটাও সেরে ফেলা দরকার। একরামুলকে ডেকে নুরউদ্দিনের কাছে স্বাভাবিক

বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত একজনের রেশন দিতে বলি। জিগ্যেস করি, এবার বকরি কয়টারে?

— ৭টা, উচু গলায় জবাব দিয়ে সিরিয়াস একরামুল আবার রেশনের হিসেব মেলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

— একটা বকরি নুরউদ্দিনকে দিবি। তাকে বলি।

— ঠিক আছে বলে নুরউদ্দিনের রেশন আলাদা করে বুঝিয়ে দিয়ে সে তার রেশন গোছানোর কাজ শেষ করে। ওদের সোনারবানের দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমরা বেলতলার পথ ধরি। গনি ভাই সেখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাদের দেখে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে উথলে উঠেন গনি ভাই। প্রায় দৌড়ে এসে পিন্টু আর আমাকে দুঃহাতে দুর্দিক থেকে জাপটে জড়িয়ে ধরে তিনি বলতে থাকেন, তাইয়া বাঁচি আছেন তোমরাঃ তোমার চিনতাতে মুই একেলে শুমাবার পারো না। গোলাম গউস নাই, তোমরা এলা মোর ভাই। কুচবিহার যায়া যাইকবার মন চাইলে না, এ জাইন্যে চলি আনু তোমাক দেইকবার। গনি ভাইর গলা ধরে আসে, তিনি ঢুকরে কেঁদে উঠেন। দারুণ এক অস্তিত্বের অবস্থা। এই রকম জমজমাট পরিবারপরিজন নিয়ে বসবাসরত মানুষগুলোর সামনে গনি ভাইস্বরে উচ্ছ্বসিত কানুনার দৃশ্য পরিবেশটাকে মুহূর্তে অন্যরকম করে দেয়।

ভাই তাকে দ্রুত ঘরের ভেতরে নিয়ে এসে বসি। তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন গনি ভাই। আমরা বসে থাকি নীরবে স্লুস পাশে। দুলু দাঙিয়ে থাকে সামনে নির্বাক হয়ে।

গনি ভাই তার আপন যে ছেইভাবকে হারিয়েছেন এই মুক্তে, সেই গোলাম গউস ছিলো টেনিং সেন্টার থেকে পুরু করে এই মুক্তের বিস্তৃত ময়দানে তার মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের স্বত্ত্বাত্মক সহযোগী, অন্তরঙ্গ সাথি। ফলে আমাদের দেখলেই গনি ভাইস্বরে ভাইস্বানোর শোকটা উথলে উঠতেই পারে। কিছুই করার নেই। আমরা ভাই তার উথালপাতাল শোকের বর্ষিপ্রকাশ প্রশংসিত হওয়ার সুযোগ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি।

রাউফ, নুরউদ্দিন আর আসগার— এই তিনজন এখন এখানকার শরণার্থী পরিবারগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। ওদের তিনজনের সাথে কথা বলি। হাতিয়ার-গোলাবারুন্দ চেক করি। কীভাবে ওরা পালাত্রমে ডিউটি দেয়, সেটা জেনে নিই। ছেলেগুলো মুক্তের মাঠের বাইরে, এই পারিবারিক পরিবেশে খুবই ভালো আছে। সেটা তাদের চেহারার দিকে তাকালে সহজেই বোৱা যায়। ক'দিনের ভেতরেই ওরা যেনো এখানকার পরিবারগুলোর সদস্যই হয়ে গেছে। একসময় দেখা যায়, ওরা ওদের ভাগে পাওয়া রেশন সামগ্রী বাড়ির ভেতরে পাঠিয়ে দিছে। দুবেলা ভাত আর এক বেলার নাস্তা বাড়ির ভেতর থেকে তৈরি হয়ে আসে। প্রাপ্ত রেশনের তুলনায় ওদেরকে পরিমাণে একটু বেশি দেয়া হয়। এর পেছনে যে উদ্দেশ্যটা আমাদের কাজ করে, সেটা হলো, এখানে আশ্রিত শরণার্থী পরিবার ক'টিকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করা। এমনিতে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ সাহায্য করবার উপায়

আমাদের নেই। দুলুর ছোট দুই ভাই টুকু আর তরু পায়ে পায়ে ঘোরে। কী খবর,
কেমন কাটছে দিনকাল তোমাদের? জানতে চাইলে তারা লাজুক হেসে জবাব দেয়,
আমরা রাইফেল চালানো আর গ্রেনেড ছোঁড়া শিখে গেছি।

— সর্বনাশ! কে শেখালো তোমাদের এসব?

— বলেই রাউফের দিকে আঙুল নির্দেশ করে দেখিয়ে দেয়। গাধা কমান্ডার
রাউফ যেখানেই যাবে, একটা না একটা নিয়ে মেতে থাকতেই হবে তাকে।
চাউলহাটিতে যখন ছিলো তার সঙ্গী ছিলো একটা গাধা। আর এখানে এই বাঢ়া
ছেলে দুটো। মনে শঙ্কা জাগে, কোনো দুর্ঘটনা না আবার ঘটিয়ে বসে রাউফ। তাই
ইশ্বারায় তাকে কাছে আসতে বলি। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসে সে।

— কী রাউফ মিয়া, এরা কতোদূর শিখেছে হতিয়ার চালানো?

কথায় খুব উৎসাহ বোধ করে রাউফ। বলতে থাকে, এমার উৎসাহ দেখিয়া মুই
দিনভর ট্রেনিং দেও। সব শিখি ফ্যালাইজে তাড়াতাড়ি।

— তাই নাকি, দিনে এই নিয়েই বুঝি ব্যস্ত থাকিস? জিগ্যেস করি তাকে।

— হ, দেখেন কেমন ভাবি শিখেছে!

— কতোদূর যায় রাইফেলের গুলি?

— ১৭০০ গজ।

— মানুষ মারার রেঞ্জ কতো?

— ৩০০ গজ।

— গ্রেনেড কতোদূর ফিক্বার লাগে?

— ১৫ থেকে ২০ গজ।

— গ্রেনেড ফাটে কয় সেকেন্ডে?

— ৩০ সেকেন্ডে।

— গুড়, ভেরি গুড়, খুবচালো শিখেছো তরু মিয়া, আমি বলি।

শিয়া বাহু পাওয়াতে ওস্তাদ রাউফ মিয়া দাঁত বের করে হাসে। আনন্দ আর
পরিভ্রান্তির হাসি।

— দেখিস, ফের এ্যাকসিডেন্ট না করিস, রাউফকে সাবধান করে দিই।

— নোয়ায় এ্যাকসিডেন্ট হইবে কেন? মুই ওমাক কি গুলি ভরা রাইফেল নিয়া
শিখাও? ওমরা শিখবার চায়, মোরও দিলোত কানও কাজ নাই।

ঠিক আছে বলে সামনের দিকে যাই। মনের মধ্যে একটা ভাবনা নিদারণভাবে
থেকে থেকে তোলপাড় করতে থাকে। যুদ্ধটা যেভাবে চলছে, তাতে সহজে দেশ
স্বাধীন হবে বলে মনে হয় না। ভিয়েতনামের মতো, লাওস, কংগোডিয়া কি
প্যালেটেইনের মতো দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যেতে হতে পারে এই যুদ্ধ। টুকু আর
তরুরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম। একদিন হয়তো সেই প্রলুব্ধ যুদ্ধের মাঠে
আমাদের জায়গায় ওদেরকেও অন্ত হাতে শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে হতে পারে। যুদ্ধটা
যদি সত্যিকার অর্থেই প্রলুব্ধ হয়, তাহলে আজকের এই অন্ত বয়সী ছেলেদের এখন
থেকেই অন্ত আর গোলাবারুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার। যেনো সময়

হলেই তারা সরাসরি যুদ্ধের মাঠে চলে যেতে পারে। আমাদের মতো প্রস্তুতিপর্বের প্রয়োজন হবে না এদের। এভাবেই পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের তৈরি করে ফেলবে যুক্তোপযোগী করে। এদিক দিয়ে রাউফ নিজে একটা নিরেট বোকাসোকা ছেলেও বলতে গেলে খুবই বিচক্ষণতার কাজ করেছে। মিছেমিছি বসে না থেকে এই দুটি কিশোরকে অন্তরিদ্যায় পারদর্শী করে তুলছে।

গনি ভাই বাইরে বেরিয়ে আসেন। এখন তিনি স্বাভাবিক মানুষ। পুরুরপাড়ে আমগাছের নিচে চেয়ার পেতে দেয় দুলু। চা-নাস্তার আয়োজন করে ফেলেছে সে এরি মধ্যে।

— আপনি কি গড়সের কবর এবার পাকা করবেন? গনি ভাইকে জিগ্যেস করি।

— হ্যাঁ বলে তিনি মাথা নাড়েন।

— তাহলে তো আমাদের বেরুবাড়ি যেতে হয়, ইট-সিমেন্ট-বালু এসবের দরদাম জানতে হবে। সেগুলো বয়ে আনার ব্যাপারটাও দেখে আসতে হবে। সেই সাথে মিঞ্চি ও ঠিক করতে হবে।

— মুইও যাইম তোমাগুলার সাথে, গনি ভাই বলে উঠেন।

— না, আপনি কেনে যাবেন। আমরা তো এমনিষ্টেই যাবো বেরুবাড়ি, জেনে আসবো সবকিছু।

— ঠিক আছে বলে গনি ভাই কিছুক্ষণ খেলন কী ভাবেন। তারপর বলেন, তোমরা কইল দাম দেম না মোরাটে টাকা আইচ্ছে মোর ভাইয়ের কবর বাধবার টাকা মুই নিজে দেইম।

— আপনার কাছে তো টাকা ছিছেনশা। টাকা পেলেন কোথা থেকে গনি ভাই? পিন্টু থাকতে না পেরে কথাটা জিজ্ঞাস করে বসে।

— কী কলু? যেনো ভুজুন্দেয়ে উঠেন গনি ভাই।

— হামরা হতিছি পলিটিকাল মানুষ, এমার দেশোত পলিটিকাল শেল্টার নিছি, দ্যাশ স্বাধীন কইবারার আলছি, ভাসি আসি নাই, ভিখ কইবারাও আসি নাই। স্বাধীনতা যুদ্ধে মোর আপন ছোট ভাই মারা গেছিছে। কয়জন শা... পলিটিসিয়ানের ভাই যুদ্ধে মইরহে মোর ভাই গোলাম গড়সের মতন? কয়জন ক?

পিন্টুর এভাবে কথাটা পাঢ়া ঠিক হয় নি। গনি ভাই সত্যিই সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠেছেন। ভাই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, ঠিক আছে গনি ভাই আপনিই তো টাকা দেবেন। আমরা শুধু সবকিছু ঠিকঠাক করে আসবো। আমরা দুলুকে নিয়ে যাচ্ছি। সবকিছু দেখেশুনে এসে ওই তারপর আপনার সাথে থেকে সবকিছু করবে। আমার কথায় গনি ভাই মুহূর্তে ঠাণ্ডা হয়ে যান। হাসেন। তারপর বলেন, তোমারগুলো এ্যালা কোনটে হাইড আউট নেছেন রে?

— সোনারবান, অমরখানা আর জগদলহাটের কাছাকাছি। পঞ্চগড় পাকা সড়কের কাছেই।

— এতোদূর তোমরা গেইছেন কেনে? একেবারে পাকবাহিনীর হাতের নাগাদ। না ভাইয়ারা তোমরা ফিরি আইসো, ওতো দূর একেবারে শক্র হাতের নাগাদ যাওয়া

তোমার ঠিক হয় নাই। এমনিতে মুই চিনতাত বাঁচো না। একেলে ফির আবার নতুন করিয়া তোমরা মোক চিনতাত ফেলাইলেন। এ ধরনের কথা আর ভালো লাগে না। দুর্দশকে তাই ইশারা করি। ইশারা মতো দুর্দশকে উটপট ভেতর থেকে রেডি হয়ে আসে। গনি ভাইকে রেষ্ট নিতে বলে আমরা তিন যুবক কেটে পড়ি বেরুবাড়ির উদ্দেশে।

আবার বেরুবাড়ি। ঢাকাইয়া নুরুর দোকান। আদি ও অকৃত্রিম নুরুর ভাই আজ আমাদের দেখে দাঁত কেলিয়ে হাসেন।

— আইছে তোমরা! আস বসো। ক্যামন আছো কও দেখি!

নুরুর দোকানে আমরা জাঁকিয়ে বসি। বলি, নুরুর ভাই আজ পাঠার গোসত আর গৱরণ ভাত খাবো। হাঁটতে হাঁটতে খিদের চোটে নাড়িভুঁড়িসুন্দ হজম হয়ে গেছে।

— ঠিক আছে হবে। ব্যবস্থা করতেছি বলে—নুরুর মিয়া তার কর্মচারীকে বেরুবাড়ি বাজারের হোটেলটার দিকে পাঠান। পিন্টু আর দুর্দশকে নাড়িভুঁড়িসুন্দ হজম হয়ে গেছে। ইট-সিমেন্টের দাম আর মিঞ্চি ঠিক করবে ওরা। নুরুর ভাই একজন কাটমারের সাথে গেঞ্জি-লুঙ্গির দরদাম করতে থাকেন। আমি নিবিষ্ট মনে সিগারেট টেনে চলি। আর গনি ভাইয়ের উত্তেজিতভাবে বলা কথাগুলো মনের ভেতরে নাড়াচাড়া করতে থাকি। রাজনৈতিক আশ্রয়ে থাকা পলিটিসিয়ানদের পয়সন অভাব নেই, গনি ভাই এ সত্য কথাটা বলে ফেলেছেন। আসলেও তো ভাই! বিভিন্ন সোর্স থেকে রাজনীতিবিদরা টাকা-পয়সা পাচ্ছেন, তা না হলে তাদের চলছে কি করে? কি করে রয়েছে তাদের আশ্রয়ে দেশ থেকে আগত কঁাক্কাইলো? এর আগেরবার ফিরবার সময় গনি ভাইয়ের হাতে টাকা ছিলো না। শুধু তার হাতে টাকা এসেছে বলে বোঝা যাচ্ছে। এ টাকা তিনি পেলেন কোথায়কে? এই প্রশ্নের তোলপাড় করা হতে হতে হঠাৎ সার্টিফিকেটটার কথা মনের নিয়ে বিলিক দিয়ে ওঠে। মেজার দরজি তাকে মুক্ত নিহত গোলাম গড়সের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। গনি ভাই সেটা চেয়ে নিয়েছিলেন তার কাছ থেকে। সেই থেকে তিনি একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার ভাই। এপারের এই ভাসমান রাজনৈতিক মহলে ওই সার্টিফিকেটটার মূল্য অনেক। যাই হোক না, এই সুযোগে অন্তত গোলাম গড়সের কবরটা পাকা হয়ে যাবে। থাক না, গড়সের কবরটা চিহ্নিত হয়ে থাক, ভালোই হবে।

পিন্টুরা হস্তদণ্ড হয়ে ফিরে আসে। কি ব্যাপারঃ জিগ্যেস করি।

— শরণার্থীদের সাথে পুলিশের গোলমাল।

— কেনো? উৎকৃষ্টার সাথে জানতে চাই।

— শরণার্থীদের নিয়ে টানা-হেঁড়া শুরু হয়েছে। এখানে আর আশ্রয় দেয়ার মতো জায়গা নেই। তাই কিছু শরণার্থীকে নাকি দণ্ডকারণ্য না মেঘালয়ে কোন দিকে যেনো শিফ্ট করতে চায় কর্তৃপক্ষ। শরণার্থীরা যাবে না, এই নিয়ে গোলমাল।

পিন্টুর খবর মনটা খারাপ করে দেয়।

শরণার্থী আসছে তো আসছেই। এপারে এসেও নিচিত হওয়া যাচ্ছে না। এখন অনেককেই যেতে হবে পাহাড়ের ওপর বা জঙ্গলাকীর্ণ কোনো নির্জন প্রান্তের বা এলাকায়, যেখানকার পরিবেশ তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। এখানে থাকতে

পারলে তবুও ওপারের বাংলাদেশের কাছাকাছি থাকতে পারায় একটা সন্তুষ্টি থাকতো। সবারই মনের আকৃতি বা ইচ্ছে ফেলে আসা বাড়িঘরের কাছাকাছি সীমান্ত বরাবর এধারে থাকবার। কিন্তু অগুনতি মানুষের স্মৃতি কি এই শরণার্থী শিবিরগুলো ঠেকাতে পারবে? পারবে না। অনেককেই তাই হয়তো চলে যেতে হবে দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইচ্ছে না থাকলেও। হায় জীবন!

নুরু ভাই তার দোকানে সেলস্ম্যানকে বসিয়ে নেমে আসেন। বলেন, চলো যাইগা।

— যাইগা মানে কোথায় যাবো? জানতে চাই।

— খাইবা না! হোটেলে পাঁচার গোস্ত নাই, চলো আমার গরিবখানায়।

— না না, এটা কি করে হয়! আপনার এমনিতেই কভো অসুবিধা।

— আরে অসুবিধা আর কিসের! খাইবা তো হালার রেশনের আতপ চাল। তিনি আন্তরিকভাবে তাগিদ দেন, চলো।

— একটু দাঁড়ান বলে পিন্টু হনহনিয়ে চলে যায় দোকানের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসে হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে।

— কি পেলে? জিগ্যেস করি।

— ডিম এক ডজন।

— ঠিক আছে চলো।

পথ চলতে চলতে অত্যন্ত নিরীহভাবে ঝাঁজতে চায় পিন্টু, কি খাওয়াবেন নুরু ভাই?

— পাঁচা তো পাওয়া গেলো নাইবুার। ভারি চশ্মার আড়ালে ঢাকাইয়া নুরুর চোখ নাচানো নিঃশব্দ হাসি।

— বকরি! বকরি পাইবৈকাই? আমাদের বক্রি তো এতেদিন থাকবার কথা নয়। পিন্টুর গলায় কৌতুহল। আহিদার পাঠায়ে দিছে। যাইবাৰ সময় কইয়া গেছিলো, লোক দিয়া পাঠায়ে দিছে। আহিদারের দিলটা আসলেই খুব বড়। মনে মনে বলি। পারলে ও সবকিছু দিয়ে দেয়। সুৰী দিল দৱিয়া আৰ শৈবিন ছেলে আহিদার। মুক্ষের মাঠে ওকে কেমন যেনো বেমানান লাগে।

নুরু ভাইয়ের আশ্রয়ে খাওয়া-দাওয়া, গল্প-গুজব শেষে বেঝবাড়ি ছাড়তে ছাড়তে বিকেল গড়িয়ে যায়। বেলতলায় গোলজারদার বাড়িতে পৌছতে রাত নেমে আসে। অধীর আঘাত নিয়ে গনি ভাই অপেক্ষা করছিলেন। আমাদের দেখেই বলে উঠলেন, আইলেন ভাইয়াৰা তাইলেন মুই কতোক্ষণ ধৰি তাকে আছো তোমার পানে। কও ব্যবৰ কি?

বাইরে পাতা চেয়ারে ক্লান্ত শৰীর এলিয়ে দিয়ে বসে পড়ি। গনি ভাইকে বিস্তারিত জানায় পিন্টু। দুলু সব যোগাড়যন্ত্র করে দেবে। কাল-পৱশু আপনি কাজ শুরু করতে পারবেন।

গনি ভাই সবকিছু জেনে নিয়ে যেনো স্বত্তি পান অনেকটা। দুলু এৰ ভেতরে বাড়িৰ ভেতৰে তাগিদটাগিদ দিয়ে চা-নাস্তা বানিয়ে বাইয়ে নিয়ে এসেছে। গনি ভাই

জিগ্যেস করেন, আইজ রাইতোত কি তোমরা যাইবেন?

— যাবো না মানে? যেতে হবেই! কাল রাতের অতোবড় অপারেশনের পর
আজ হাইড আউটের বাইরে থাকা ঠিক হবে না, তাছাড়া ওরাও চিন্তা করবে।

— না, তোমরা পাইরবান নন; আইজ এ্যাটে মোর সাথোত থাইকবেন, গনি
ভাই আমার কথা থামিয়ে সোজাসুজি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। সব শুনে আমি কিছু
কিছু করি। পিন্টুর দিকে তাকাই।

— আইজ যুদ্ধ না কইলে কিছু ক্ষতি হওয়ার নয়। দেখো না এপারে কতো
মানুষ দিব্য শরণার্থী সাজি বসি আছে, ঘূরতচে-ফিরতচে। দেশে যে যুদ্ধ চলে, তা
ওমারগুলার চিন্তাতে নাই। খালি খালি কি হইবে? কিছু হওয়ার নয়। একবাশ ক্ষেত্রে
আর হতাশা আরে পড়ে গনি ভাইয়ের গলা বেয়ে। হয়তো তার মনে এই মুহূর্তে কাজ
করে থাকবে এ ধরনের কোনো ধারণা, এভাবে যুদ্ধ না করলে তার ভাই গোলাম
গউস মারা যেতো না। পাশে দাঁড়ানো দুলু গনি ভাইজ্জিত, কথায় সায় দেয় অত্যন্ত
আগ্রহ ভরে, থেকে যান আজ রাতটা। অনেক দিন সামনের বসে নি গানের, আজ রাতে
গানের আসর জমাই। রাউফ-নুরুদ্দিন ওরাও ফ্লাব তোলে, থাকেন আজ রাতটা
আমাদের সাথে।

— ঠিক আছে বলে পিন্টুর দিকে তাকাই। ওর চোখে-মুখে সম্মতির উজ্জ্বল
হাসির ঝিলিক। রাউফ বলে, যুদ্ধ ভাইলে হারমোনিয়াম ধরি আইসো। বলেই সে
দৌড় দেয় বাড়ির ভেতর পানে।

কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যিই ঘরের ভেতর জমে ওঠে গানের আসর। দুলু বলে,
কি দিয়ে শুরু করবো বলেন?

— ওটা ধরেন, আপনার জলপাইগুড়ির ওস্তাদ যেটা শুনিয়েছিলো। দুলু তখন
গান ধরে। বাইরে নিকষ কালো অক্কার। হিমালয়ের মাধ্যায় ঝিকিমিকি আলো নিয়ে
গাড়ির ওঠা-নামা। দূর অমরখানা থেকে ভেসে আসা একযোগে গোলাগুলির শব্দ।
এরি মধ্যে দুলুর দরদি গলায় গেয়ে যাওয়া গান ভেসে বেড়ায় আমাদের চারপাশে,
তুই ফেলে এসেছিস কামে মন মনরে আমার . . .